Contents (সূচীপত্র)

(আপনার যদি কম্পিউটার থাকে তবে Microsoft Edge দিয়ে পিডিএফটি ওপেন করুন, আর যদি মোবাইল ফোন থেকে পড়তে চান তবে playstore এ যেয়ে Microsoft Edge(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx) ইন্সটল করে সেটি দিয়ে পিডিএফটি ওপেন করুন। এতে করে আপনি সূচীপত্রের যেকোনো অধ্যায়ের নামের উপর ক্লিক করলে সাথে সাথে সরাসরি ওখানে চলে যাবে, আবার যেকোনো পেজ থেকে সূচীপত্রে আসতে চাইলে যেকোনো পেইজের একদম নিচের দিকে ↑ চিহ্নে ক্লিক করবেন। যার ফলে পাঠকের পেইজ স্ক্রল করে খুঁজে বের করার ঝামেলা থাকবেনা। ধন্যবাদ)

ভূমিকা

অতি সংবেদনশীল, গন্ডিবদ্ধ_ চিন্তাচেতনা, ভাবাদর্শ; গোঁড়ামিপূর্ণ, অসহনশীল, উগ্র মানসিকতাকে- ভিতরে লালন করা মানুষেরা জীবনে অনেক কিছু জানতে পারা ও শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।
যেমন আপনি প্রতারিত হচ্ছেন দেখে বা আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন কিন্তু সে গাড়ির টায়ারে সমস্যা এটা বাইরে থেকে দেখে অথবা আপনার ছেলে পিছন থেকে আপনাকে খুন করতে আসছে দেখে - যদি কেউ আপনাকে সাবধান করতে আসে, আর আপনি তাদের কথাকে বিন্দুমাত্র ভাবতে না চেয়ে নিজের একগুঁয়েমি অন্ধবিশ্বাসী হয়ে থাকেন,, তবে দিনশেষে ক্ষতি আপনারই হবে, আপনিই পস্তাবেন।

প্রিয় পাঠক,, আপনি কি মানবেন আর কি মানবেন না, কিসে বিশ্বাস করবেন – তা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে কোনকিছু জানার সাথে এর সম্পর্ক নেই। আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সাথে কোনকিছু না মিললে যে সে বিষয়টি পড়া বা জানা যাবেনা এমন কিন্তু নয়।

কারণ নতুন কিছু জানার মাধ্যমে মানুষ শুধু নিজেকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। এর বেশি কিছু নয়। একজন মুসলিম হিন্দুদের বেদ,গীতা, রামায়ণ পড়ে হিন্দু হয়ে যায়না। ঠিক তেমনি হিন্দুসহ সকল ধর্মালম্বী ও ভাবাদর্শের মানুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই। তাই নতুন কিছু যে কেউই জানতে পারেন এতে জ্ঞানে ও চিন্তাধারায় শুধু তিনিই সমৃদ্ধ হবেন অন্য কেউ নয়।

আমার তরফ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমি একজন প্রাক্তন মুসলিম। কারো প্ররোচনায় নয় বরং সুস্থ মস্তিষ্কে ইসলাম সমন্ধে প্রচুর ঘাটাঘাটি করে, জেনে, বুঝে, যাচাই করেই – ইসলাম যে মানবসৃষ্ট ধর্ম নয় – এ কথার উপর আমার পক্ষে আর বিশ্বাস রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ আমার মন- কোন কিছুকে fraud ধরতে পেরেও শুধুমাত্র কোন কল্পিত psycho type শাস্তির ভয় দেখানোতে ভীত হয়ে সেই fraud এর প্রতি বিশ্বাস রাখতে মোটেও রাজি নয়।।

এখানেই আমার সাথে অন্যান্য মুসলিমদের পার্থক্য। কারণ ইসলাম সম্পর্কে অনেক hypocracy, অসংগতির প্রমাণ পেয়েও অনেক মুসলিমের ইসলামে বিশ্বাসটা টিকে আছে শুধুমাত্র অজানা, পুরোপুরি অনিশ্চিত পরকালের সাইকো & হরর টাইপ নির্যাতনের আতঙ্কে ভীত হওয়ার কারণে। আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নবি মুহাম্মদ– মানুষের এই মনস্তাত্ত্বিক দূর্বলতাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন।
কেননা, ভয় দেখিয়ে ,অজানা বিষয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, ব্ল্যাকমেইল করে– মানুষের কাছ থেকে সব কিছু আদায় করিয়ে নেয়া যায়। সেখানে বিশ্বাস আদায় করা তো খুব সামান্য একটা বিষয় (আপনারা যারা লালসালি উপন্যাস পড়েছেন তারা কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন বিষয়টা কতটা বাস্তব)। আর তিনি মানুষের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে_ এটাকে তার প্রধান হাতিয়ার বানিয়ে অর্থাৎ মানুষের এ দুর্বলতা ও মানুষের সরল বিশ্বাস ও অগজ্ঞতাকে ভিত্তি করে স্বপ্রবর্তন করলেন এক বর্বর ধর্মের। ইসলামের মত অধিকাংশ ধর্মই মানুষের এসব দুর্বলতাকে ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছিল এবং আজ অবধি অত্যন্ত দাপটের সাথে টিকে আছে ।

**প্রিয় পাঠক, আপনাকে ছোট একটা বিষয় জিজ্ঞেস করি।
শাস্তি/ নির্যাতন/অত্যাচার এর ভয়ে কেউ কাউকে/কোন কিছুতে বিশ্বাস করলে সেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় ??
আপনার উত্তর- "অবশ্যই না"। তাইতো ?

কিন্তু সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় !!!! !! কেননা কুরআন ও সহীহ হাদীসে অনেক স্থানে স্পষ্ট করে বার বার উল্লেখ আছে – যেকোন কারণেই হোক যে মুসলমানের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে একদিন না একদিন জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে !
অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয় ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখার পর আপনার মনে যদি ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ হয় কিন্তু পরক্ষনেই কাল্পনিক অনন্তকাল হরর শাস্তির ভয় যা কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে দেখানো হয়েছে _ তা যদি আপনার মনে চেপে বসে- তখন যদি আপনি সেই ভবিষ্যত শাস্তির আতঙ্কে- আপনার মনের সব সন্দেহ, সংশয় ঝেড়ে ফেলে ইসলামীয় ঈশ্বর(আল্লাহর) কাছে তওবা করে নেন এবং সেই ভবিষ্য শাস্তির ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে অন্তরের দিক দিয়ে ভয়ে চুপসে যেয়ে পরবর্তীতে ইসলামকে যাচাই করার সাহস না দেখান– তবে আল্লাহর কাছে আপনার ঈমানটা কিছুটা দুর্বল তবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে এবং আপনি একদিন না একদিন জান্নাতে যাবেন ই যাবেন।

তাহলে কি এক্ষেত্রে আল্লাহর মানসিকতা আমাদের (মানুষের) চেয়েও নিচে নেমে গেল না ?

আপনি যদি মুসলিম হয়ে থাকেন তবে আপনাকে এই প্রশ্ন করা হলে, এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলবেন:- "আমি বলতে পারব না"। তখন আপনাকে যদি প্রশ্ন করি কেন বলতে পারবেন না !?? তখন আপনি উত্তর দিবেন: "অনন্তকাল ভয়ঙ্কর শাস্তি পাওয়ার ভয়ে কারণ এর সঠিক উত্তর যেটা আমার বিবেক আমাকে বলছে – সেই উত্তর দিলে আমার ঈমান চলে যাবে, যার পরিণাম জাহান্নাম নামক ভয়াবহ শাস্তি"।

আর এভাবেই, ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ নির্যাতনের আতঙ্কে/ ভয়ে – অসংখ্য মুসলমান আজ তার বিশ্বাস ইসলামের উপর কোনমতে টিকিয়ে রেখেছে। নাহলে এতসব ভুল, অসঙ্গতি, বেইনসাফি, জুলুম, বৈষম্য উপলব্ধি করার পর [[যা আপনিও উপলব্ধি করতে পারবেন নিচের দেয়া ইসলামের অসংখ্য অথেনটিক রেফারেন্স- হাতে সময় নিয়ে মনোযোগের সাথে, একদম নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে, বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পড়ার ও বোঝার মাধ্যমে]] বেশিরভাগ মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বাস হারাতো।

এসব জানার পরেও তার পরেও নাকি,- শুধুমাত্র সেই মৃত্যুর পর শাস্তির ভয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করা মানুষদের বিশ্বাস- আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য !!! চিন্তা করা যায় এটা কতটা নিম্নস্তরের মানসিকতা !! এই মানসিকতা যে– কেবলমাত্র নিচু মন মানসিকতার #*মানুষের* পক্ষেই হওয়া সম্ভব তা আর উল্লেখ করে বলে দিতে হয় না। এ থেকেও আপনারা কিছুটা হলেও বুঝতে পারছেন – এ ধর্মের প্রবর্তক যিনি কিনা এর সকল মূলনীতি, বিষয়বস্তু ও নিয়মকানুন তৈরি করেছেন তিনি কী আসলে মানুষ নাকি মহান কোনো সত্ত্বা।

তো যা বলছিলাম, আপনি যদি পুরো পৃথিবীর অনেক বড় খ্যাতিমান,প্রভাবশালী লোক হন – তাতে করে আপনার খারাপ অভ্যাস বা চরিত্রগুলো – আমার কাছে খারাপ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

সমগ্র পৃথিবীর মানুষও যদি আপনাকে follow করে – তাতে আপনার কৃতকর্ম ন্যায় হয়ে যায়না, প্রচুর টাকা/সুযোগ সুবিধার লোভ বা আপনার ক্ষমতার ভয়ংকর শাস্তির ভয় দেখালেই, আমি- আপনার সম্বন্ধে নিজের ভিতরে ভালো ধারণা পোষণ করবো– এতটা সস্তা, ডিজঅনেস্ট আমার মন নয়। আমার মন নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে- সাদাকে সাদা ও সবুজকে সবুজ হিসেবে রায় দেয়, কোন ধরণের ভবিষ্যৎ শাস্তির ভয় ভীতি, হুমকি ধামকি, কতজন সেই বিষয়কে সঠিক বলে, ব্যাক্তিগত ভালোলাগা, আবেগ...... ইত্যাদি কোন কিছুই আমার নিরপেক্ষ যাচাইয়ে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। তাই judgement এর ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব হয়না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে- মুসলিমদের ৯৫%ই এই পক্ষপাতিত্বমূলক চিন্তাভাবনা ছাড়া তাদের ধর্মের সত্যতাকে যাচাই করতে পারেনা। তারা চিন্তাভাবনা বা যাচাই শুরুর আগেই ধরে নেয় কোরআন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। তাই এবার তারা এই নিজেদের নাযাচাই করা একটি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে অন্যান্য কিছু যাচাই করে, যাকে বলা হয় CONFIRMATION BIAS. আর তাই এই পক্ষপাতিত্বমূলক চিন্তাভাবনা- মুসলিমদেরকে ইসলাম সম্পর্কে লুকোনো সত্য বিষয়গুলো না বুঝতে পারার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।।

প্রিয় পাঠকদের কাছ থেকে ধৈর্য্য ও মনযোগ এবং আন্তরিকতা প্রত্যাশা করছি। আপনার আজীবনের মিথ্যা বিশ্বাসের মুখোশ উন্মোচন করতে চাইলে এতুকু কষ্ট আপনাকে করতেই হবে।

এ পর্যন্ত আমাদের এই পৃথিবীতে আসা ৪২০০+ ধর্মের প্রতি আমার একটাই মন্তব্য- তা হল এগুলোর সবগুলোই মানবসৃষ্ট। আর এ মন্তব্য করতে যেয়ে আমাকে দিনরাত এক করে দীর্ঘ চার বছর অনবরত অসংখ্য ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় গঠনমূলক ও প্রমাণভিত্তিক সমালোচনামূলক লেখা ও ডকুমেন্টারি পড়তে হয়েছে, নিরপেক্ষভাবে চিন্তা ও যাচাই করতে হয়েছে। তারপর আমার সামনে থেকে **ধর্মের কৃত্তিম মিষ্টি আবরণ(Sugar Coating)** সরে যেয়ে প্রকৃতরূপ উন্মোচিত হয়েছে।।

♦আমাদের মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি আমার সামান্য কথা : আমরা মুসলিম বলেই কিনা ইসলামের কোন বিষয় সম্বন্ধে গঠনমূলক সমালোচনাকারীদের- তাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাসহ মন্তব্য, পোস্ট ও যৌক্তিক প্রমাণসহ রেফারেন্সসমৃদ্ধ লেখনীসমূহকে – **"নিতান্তই শিশু সুলভ চিন্তাভাবনা, এদের চেয়ে একটা পাগলও/নাবালক শিশুও ভালো বোঝে, এরা কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করেছে, এদের হৃদয় সংকীর্ণ , মস্তিষ্কের বিকৃতি, চিন্তাচেতনার বিকৃতি, অন্তরে রোগ আছে, আল্লাহ ওদের হেদায়েত দিক, ইহুদি নাসারাদের ষড়যন্ত্র, ইহুদি, ইসরাইল,খ্রিস্টান মিশনারিদের টাকা খেয়ে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা, ওদের দালাল, অল্প বিদ্যা ভয়ংকর, যার মনে আছে যা ফাল দিয়ে উঠে তা, এসব মূর্খদের অখাদ্য বকবকানি, শুভঙ্করের ফাঁকি, ওদের জানার সীমাবদ্ধতা আছে আরেকটু বেশি জানলে এরকম মন্তব্য করতো না , আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেয়, এসব শয়তানের ওয়াসওয়াসা, ওদের বাবা মার পরিচয় ঠিক নাই,.........."** ইত্যাদি অজস্র বাক্য- আমাদের মুখে, চিন্তায় এবং কমেন্টের কিবোর্ডে চোখের পলকেই চলে আসে।

↥

অথচ তাদের চেয়েও কম পড়াশোনা করা একজন মুসলিম যখন –"ইসলাম বিরোধীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব" এই শিরোনামে কোন পোস্ট/লেখা লেখেন- তখনই আমাদের মুসলিমদের মনে হয়- অসাধারন, দূর্দান্ত, এটাই প্রকৃত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা, এটাই তো হবার ছিল, আমি জানতাম ওরা(ইসলামের সমালোচনাকারীরা) যেসব যুক্তি দিয়েছে তা ধোপে টিকবে না, ওদের পতন তো সব সময়ই, 'ভাই' আপনার মত ইসলামিক স্কলারদেরই তো প্রয়োজন, আশা করি ভবিষ্যতেও আরো সুন্দর সুন্দর লেখা উপহার দিয়ে মুরতাদ নাস্তিকদের দাঁত ভেঙে দিবেন, এত সুন্দর জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি।।

অর্থাৎ "ইসলামের সমালোচনাকারীদের জবাব" লেখাগুলো নিঃসন্দেহে অকাট্য, প্রকৃত যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে আমরা বলিনা/বলতে চাইনা যে – 'আপনার জ্ঞানের স্বল্পতা আছে, ভাই আরো জানেন তারপর কথা বলেন '।

Public demand অনুযায়ী এক বিষয়কে হেয় প্রতিপন্ন করা, অপবাদ দেওয়া; আর অন্য বিষয়কে তেল মারার যোগ্যতা থাকলেই- যুক্তিযুক্ত, জ্ঞানগর্ভ, গ্রহণযোগ্য লেখা হয়ে যায় না।

যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা, যারে ভালোবাসি তার রাঁধা- নুনে পোড়া খাবারও লাগে অমৃত। (অর্থাৎ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করি বলে – সে সঠিক কথা বললেও মনে হয় তার কথাগুলো ভুল, কিন্তু অতি আবেগী ধর্মান্ধ মুসলিম ভাইবোনেরা,- আপনারা শুধুমাত্র নিজ ধর্মের ব্যাপারে প্রশ্ন এলেই এই কথাটা কেন ভুলে যান যে — **ব্যক্তিগত পছন্দ/বিশ্বাস কখনই কোন কিছু যাচাইয়ের মাপকাঠি হতে পারেনা)**

আর তাই, কোন কিছুকে বিচার করতে- এই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ,বিশ্বাসকে টেনে নিয়ে আসা কখনই নিরপেক্ষ বিচার হতে পারে না। এই অভ্যাস বা মনোভাব আমাদের মুসলিমদের যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের ছোটকাল থেকে পালন করে আসা ধর্মটি -কতটুকু সত্য বা এটিও কি মানবসৃষ্ট ধর্ম কিনা – তা প্রকৃত নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা – আমাদের জীবন শেষ হওয়ার আগে সম্ভব হবে না ।।

মনে রাখবেন – যে বিষয়টি প্রকৃত সত্য তার সত্যতা যাচাই করার জন্য যতই প্রশ্ন, সমালোচনা করা হোকনা কেন তাতে তার সত্যতা তো বিন্দুমাত্র কমেইনা উপরন্তু বেড়েই চলে। তাই ধর্মের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করতে ভয় পাওয়া যাবেনা, কারণ এটা আমাকে তথা নিজেকেই যাচাই করতে হবে যে, আমি কি কোনো অন্ধবিশ্বাসের বলি হয়ে- প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছি কিনা, ধর্মের অন্ধকার দিকসমূহ যা মানুষ প্রকাশ করে না সেগুলো খুঁজে খুঁজে জানার চেষ্টা করতে হবে।

কারণ যে fraud সেই চায় না যে – তাঁর সত্যতা যেন কেউ যাচাই না করে। সে তার নিজের hypocracy ধামাচাঁপা দেয়ার জন্য- অত্যন্ত ধূর্ত চিন্তা ও কৌশলের মাধ্যমে- সাধারণ মানুষের- বিশ্বাস,ভয়, সরলতাকে ব্যবহার করে।

তাই নিজ ধর্মের সমালোচনা মোটেই নিন্দনীয় কোন বিষয় নয়, কারণ এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ধর্মকে নিরপেক্ষ চিন্তা, বুদ্ধি, বিবেচনা দ্বারা যাচাই করতে পারি। আমাদের নিজস্ব ধর্ম যদি প্রকৃতই প্রতারণা হয়ে থাকে তবে এসব লেখার মাধ্যমে আমরা সেই প্রতারণাকে বুঝতে পারব এবং নিজেকেসহ আরো অনেক সরলবিশ্বাসীকে এই ভন্ডামির বেড়াজাল থেকে মুক্তি দিতে পারব।
কিন্তু প্রতিটি ধর্মকে প্রতিনিয়ত তেল মারতে থাকা নিজ ধর্মের পন্ডিতদের বক্তব্য ও লেখালেখি থেকে সারাজীবনেও সেটি বোঝা সম্ভব নয়।।

কারণ তাদের অনেকেই ধর্ম ব্যবসায়ী, আর বাকি সকলেই confirmation biased. **চিন্তায়- নিজের বিশ্বাস বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করলেই– তা আর নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা হয়না, আর যেখানে নিরপেক্ষ চিন্তাই হয়না সেখানে নিরপেক্ষ যাচাই করা সম্ভব নয়** ।।।।।।।। ♦

আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন, সামান্য একটা হাজার টাকার জিনিস যা হয়তো বড়জোর বছরখানেক ইউজ করবেন, সেটা কিনার আগে আপনি কত কিছু যাচাই বাছাই করে কিনেন, পণ্যটির রিভিউ নেট ঘেটে বের করেন, খারাপ দিক, ল্যাকিংস, সেই সাথে সেটি ফেইক কিনা বুঝার জন্য, ফ্রডের হাত থেকে বেচে অরিজিনাল পণ্যটি পাচ্ছেন কিনা সেটা নিশিত হবার জন কত কনসার্ন থাকেন, বাসার কেউ বা অন্য কেউ ভালো বললেই অন্ধবিশ্বাসের সাথে সেটা কিনতে যাননা বরং নিজে বুঝেশুনে সময় নিয়ে জেনে, যাচাই করেই তবে কিনেন।
অথচ সেই একই মানুষ আপনিই সারাজীবন জন্মের পর থেকে আজীবন যে ধর্মটা আপনার পরিবারের সবাই পালন করছে দেখে আপনিও অন্ধবিশ্বাসের সাথে পালন করে যাচ্ছেন, এত এত সময়, পরিশ্রম, টাকা তার পিছনে ব্যয় করছেন, সেই ধর্মের থিওরি অনুসারে নিজের পুরো জীবন চোখ বন্ধ করে নাকে দড়ি বাধা উটের মতো ফলো করে যাচ্ছেন, শুধুমাত্র সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে, অন্য কোনো ধর্মের অনুসারি কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও, আপনি ঠিক একইভাবে মাথায় ছোট থাকতেই মাবাবার গেথে দেওয়া কথা অনুসারেই অন্ধবিশ্বাসের সাথে চোখ বন্ধ করে সেই ধর্মকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করতেন, এবং পুরো জীবন

এভাবেই চলতেন ___ কখনো কি ভেবে দেখেছেন, আপনি এই ধর্মকে ভালোভাবে জেনে, ভালোখারাপ যাচাই করে গ্রহণ করেননি। এবং যাচাই করার প্রয়োজনও মনে করেননি। অথচ সামান্য হাজারটাকার জিনিস কিনার তুলনায়, এবিষয় যেটাকে কেন্দ্র করে পুরো জীবনটা আপনি লিড করছেন_ সে বিষয়ে ভালভাবে যাচাই করাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি ! কোনো বিশয়ে জন্মগত,পরিবেশগত অন্ধবিশ্বাস এমন একটা বিবেকবুদ্ধি লোপ করার ভাইরাস, যা একটা বুদ্ধিমান মানুষকেও সেবিষয়ে অজ্ঞ অন্ধভক্ত রেখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

অতি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয় সতর্কতা : আমাদের আশেপাশের কাছের মানুষের অধিকাংশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় – তারা ধর্মের সমালোচনার ব্যাপারে মারাত্মক স্পর্শকাতর ও কট্টরপন্থী। তারা নিজেরা তাদের ধর্মের সম্বন্ধে কিছু জানুক বা না জানুক – কেউ তাদের ধর্মকে যাচাই করবে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে_ এটা তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনা। ফলশ্রুতিতে আপনার এই নিজের ধর্মের সত্যতা ও প্রকৃত রূপ যাচাই করার জন্য সমালোচনামূলক পড়াশোনা ও ঘাঁটাঘাটি– একবার তাদের কারো নজরে পড়েছেই কি আপনার সর্বনাশ হয়েছে! আপনি তখন কতটা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হবেন তা আপনি আগে কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনার ব্যক্তিগত জীবন- তখন তাদের রোষানলে পড়ে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। পারিবারিকভাবে ভয়ংকর হেনস্তার শিকার হবেন।

তারা আপনার মৌলিক অধিকারটকুও দেবেনা। এমনকি বিষয়টি সমাজে কোনভাবে জানাজানি হলে আপনার মৃত্যুমুখে পতিত হবারও ঘোর আশঙ্কা দেখা দিবে। আপনি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত হবেন যা আপনাকে মানসিকভাবে পুরোপুরি শেষ করে দিবে। **আপনি কিন্তু কোন অপরাধ করেননি।** আপনি প্রতিনিয়ত যে ধর্মের দাসত্ব করছেন, আপনার সকল কাজকর্ম ও চিন্তাচেতনায় যে ধর্ম প্রভাব বিস্তার করছে, যে ধর্মের আদেশ নিষেধ ও মূলনীতি আপনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মেনে চলছেন – **সে ধর্মটা কতটুকু সত্য/ এটি কি আসলেই সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত ধর্ম কীনা, নাকি এটিও একটি মানবসৃষ্ট ধর্ম_ যার প্রবর্তক মানুষের বিশ্বাসের সরলতার সুযোগ নিয়ে নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ধূর্তভাবে সেটিকে সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত ধর্ম বলে চালিয়ে দিয়েছে, যেটির দ্বারা এখন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত আমরা প্রতারিত হচ্ছি, – এসব যাচাই করার অধিকার আমাদের প্রত্যেকের আছে এবং এটা প্রত্যেকটা সচেতন মানুষের দায়িত্বও বটে।**

কিন্তু এশীয় সমাজের বাদবাকি – ধর্মের বেড়াজালে পড়ে, অবিকশিত মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারার মানুষেরা- আমাদের এ অধিকার বিন্দুমাত্র দিতে রাজি নয়। উপরন্তু, ধর্মকে যাচাইয়ের/ ধর্মের মুখোশ উন্মোচনের/ ধর্মের ভন্ডামি প্রকাশ করার কারণে- আমাদের উপর ভয়াবহ টর্চার করতে থাকে।

তাই সুপ্রিয় পাঠকগণ, আপনারা অবশ্যই নিজ ধর্মের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পড়া ও অনুসন্ধান চালিয়ে যান। কিন্তু সেই সাথে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুরক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

নিচের লেখাগুলোতে অসংখ্য কোরানের আয়াত ও সহিহ হাদীসের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। সেই মূললেখায় প্রবেশের আগে, এখন একটু বিরতি নিয়ে আসুন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জেনে নেই — ♦ **যুক্তির নামে কুযুক্তি / লজিক্যাল ফ্যালাসি কী ?** এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানার মাধ্যমে আপনি যাচাই করতে পারবেন আপনার আশেপাশের মানুষ আপনাকে আপনার ধর্মের নানা বিষয়কে সমর্থনের জন্য প্রতিনিয়ত যেসব যুক্তি দিচ্ছে তা কি আসলে যুক্তি নাকি যুক্তির নামে কুযুক্তি=

- https://drive.google.com/file/d/1-9skzQKnRR_ow3JHutJ7PmBcYF9iM1Px/view?usp=drivesdk
- An overview of some common logical fallacies

আসুন এবারে একনজরে উদাহরণগুলোর উপরে চোখ বুলিয়ে নিই,

" যা প্রমাণ ছাড়া দাবি করা যায়, তা প্রমাণ ছাড়া খারিজ করা যায়। "

↥

আপনি দাবী করলেন- মেঘের উপর বিশেষ প্রজাতির কচ্ছপ থাকে যেগুলো রেগে যেয়ে চিল্লাচিল্লি করলে বজ্রপাতের শব্দ হয়, আর সেগুলো কান্নাকাটি করলে পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়।
যখন আপনার কাছে আপনার দাবীর ব্যাপারে প্রমাণ চাওয়া হল তখন আপনি বললেন- সেই কচ্ছপগুলো ডিটেক্ট করার জন্য যতটা উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োজন - বিজ্ঞান এখনো সেখানে পৌঁছতে পারেনি। এটা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। তবে ভবিষ্যতে একদিন বিজ্ঞান সেগুলো আবিষ্কার করবে।

আপনি আরও একটি দাবী করে বসলেন- পৃথিবীতে এমন এক প্রজাতির জন্তু আছে যেগুলো রাক্ষষের মতো দেখতে। তারা সংখ্যায় কয়েকহাজার কোটি। আপনার বংশের এক লোক ১২০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর কোনো এক যায়গায় তাদেরকে প্রাচীর দিয়ে আটকে রেখেছে যার কারণে তারা বেরোতে পারছেনা, তবে একদিন তারা এ প্রাচীর ভেঙে মানববসতিতে চলে আসবে। কিন্তু বিজ্ঞান তার প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে তাদেরকে এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি।

ব্যাপারটা হলো বার্ডেন অফ প্রুফ , আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করার থেকে বরং একটা উদাহরণ দিই,- আমি বললাম শনি এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে একটা চাইনিজ টি-পট সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।
এখন বিজ্ঞানীরা আমার কাছে প্রমাণ চাইলে আমি বললাম আপনারা প্রমাণ করেন যে শনি এবং বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে কোন চাইনিজ টিপট সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে না।
তখন বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপ দিয়ে খুজলেন, আমি বললাম, টি-পট টি এতই ছোট যে আমাদের টেলিস্কোপ এর রেজুলেশনের সাহায্যে ডিটেক্ট সম্ভব নয়।
তখন বিজ্ঞানীরা নিশ্চই বলবে যে এটা ভুয়া , আমি বলবো বিজ্ঞান সেটা খুঁজে পাচ্ছে না সেটা বিজ্ঞানের ব্যর্থতা । 😂😂
অনুরূপভাবে , কালকে মরুভূমি থেকে কোন একজন রাখাল বালক বেরিয়ে যদি বলে- ৯ম আকাশের উপরে থাকে 'রাম' নামে এক ভদ্রলোক, যে আমাদের সকল ঘটনা কন্ট্রোল করছে, এবং 'রাম' নাকি তাকে বলেছে যে সেই তার সবচেয়ে প্রিয় লোক এবং তাকে সকলের মান্য করতে হবে। তখন বিজ্ঞান মেনে নেবে না যে আসলেই ঐ রাম ভদ্রলোকটি তাকে পাঠিয়েছে।

চার পায়ের মানুষ আছে হিমালয়ে। বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারেনি! বিজ্ঞান ব্যর্থ

শাকচুন্নির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারলে বিজ্ঞান ব্যর্থ.. আফসোস বিজ্ঞানের জন্য, বড়ই আফসোস !

রহিম আমাকে বলল- আমি উড়তে পারি , এবং এটা তোমার বিশ্বাস করতে হবে....। আমি বললাম তুমি যে উড়তে পারো - এটার বাস্তবতা আগে প্রমাণ কর। রহিম কোনোরকম প্রমাণ না দেখাতে পেরে উল্টো প্রশ্ন করল-- আমি যে উড়তে পারিনা সেটা আগে প্রমাণ করে দেখাও !!

এটা কি বিজ্ঞানের ব্যর্থটা নয় যে সে উড়ন্ত হাতি, ডানাওয়ালা ঘোড়া, ৪ তলার সমান অদৃশ্য ভরহীন কুকুরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারছে না? এটা কি বিজ্ঞানের ব্যর্থতা নয় যে সে হগওয়ার্টস স্কুল খুঁজে বের করতে পারে নাই?
ফাইজলামির সীমা থাকা উচিত।

আমি দাবি করলাম,,,,আপনার কাছ থেকে আমি ১০০ কোটি টাকা পাই,,,, আমার টাকা ফেরত দিন,,।
আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন যে আমি আপনার কাছ থেকে কোন টাকা পাই না,??
যদি প্রমাণ করতে না পারেন,,,,,দ্রুত আমার টাকা ফেরত দিন,,।

একজন উকিল আসামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন- জজ সাহেব, আমার মক্কেল গতরাতে খুনের সময় রাত ২-৩টা পর্যন্ত চাঁদে অবস্থান করছিলো যারকারণে তার পক্ষে ঐসময় খুন করা সম্ভব নয়।
বিচারক সাহেব আপনি যেহেতু প্রমাণ করতে পারলেন না যে ঐ সময়ে সে চাঁদে ছিলনা, তাই আমার আসামী সম্পূর্ণ নির্দোষ হিসেবে আমি বিশ্বাস করি।
এখন বিচারক হিসেবে আপনার রায় কি

আর একটা বিষয় সম্পর্কে শুরুতেই জানিয়ে রাখি,

কোরানের যেকোন ধরনের কোন ভূল/অসংগতি দেখালেই আমাদের মুমিন ভাইদের নিম্নলিখিত অসংখ্য মন্তব্য ও ত্যানাবাজী লক্ষ্য করতে পারবেন (যার প্রত্যেকটাই লজিক্যাল ফ্যালাসি যা আপনারা মাত্রই ক্লিয়ারলি বুঝেছেন) –

"কোরআন বোঝা এত সহজ নয়", "অত্যন্ত হাই লেভেলের ভাষা ও জ্ঞান আল্লাহ প্রয়োগ করেছেন, এটা মানুষের জ্ঞানের ও চিন্তার পরিসীমার বাইরে । তাই এটা কোরানের ভূল নয় বরং মোজেজা"!

- ⇨ তাহলে, চলুন দেখে নিই তার এই ধূর্ত দাবীর ব্যাপারে ইসলাম কি বলে (পড়তে লেখার উপর ক্লিক করুন)।

"অনুবাদ সঠিক নয়"

- ⇨ তাহলে বিশ্বের আন্তর্জাতিক ভাষায় অনুবাদ এবং অনুবাদ শেষে মুদ্রণের পূর্বে কী আপনার থেকে আরবী ভাষা, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে কম জানা আলেমগণ কতৃক যাচাই করা হয়?

তখন সে বলবে- "তাফসির দেখতে হবে"।

- ⇨ অথচ জীবনে সে কখনো কোনো তাফসির খুলেও দেখে নাই, এবং যখন বিশুদ্ধ তাফসির থেকেও বৈজ্ঞানিক ভূল দেখাবেন__ তখন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করবেন তাদের এই মন্তব্য_

"কুরআনে এটা রূপক(মেটাফোর) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে/ এই শব্দ দিয়ে এটা বুঝায় নাই", এই বলে সে হুট করে মনগড়া একটা অর্থ এবং গোজামিল দিয়ে ইচ্ছামত একটা ব্যাখ্যা দাড় করায় দিবে যেমন- "এখানে কোপাকুপি বলতে দুই পক্ষের তরবারির কোলাকুলি বুঝানো হয়েছে" !

- ⇨ কিন্তু মুমিন ভাই আপনার হয়তো জানা নেই যে–কুরআনের যেসব অর্থের ব্যাখ্যা নবী মুহাম্মদ ও তার সাহাবীরা রূপক হিসেবে করে যাননি সেটাকে পরবর্তীতে রূপক হিসেবে নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমেরও নেই, সেখানে আপনি কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যৎসামান্য জ্ঞান অর্জন করে সেই অধিকার কোত্থেকে পেলেন ?? তাহলে কী, ঐশব্দের অর্থ দিয়ে কি আসলে আল্লাহ কি বুঝিয়েছেন সেটা নবীকে না জানিয়ে- আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে এসে জানিয়ে দিয়ে গেছে ! মাছের মতো, গায়ে তেল মাথা চোরের মতো পিছলা কাটা মুমিন ভাই, আপনার হয়তো এটাও জানা নেই যে- **কোরআনের প্রত্যেকটা শব্দ, আয়াতের মানে সাহাবী এবং তাবে-তাবেঈনরা যা বুঝেছেন, যা বলেছেন, যা ব্যাখ্যা করেছেন___ এর বাইরে পরবর্তীতে আসা কোনো মানুষের নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যা ইসলামের নিকট কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না।** তাই আপনার নিজের ত্যানা প্যাচানো গোজামিল দিয়ে বানানো সান্ত্বনার ব্যাখ্যা দিয়ে চানাচুর মাখায়ে খান, ইসলামের কাছে সেটার একফোটাও স্বীকৃতি নেই, উপরন্তু আপনি কুরআন মনগড়া ব্যাখ্যা করার স্পর্ধা দেখানোর কারণে ভয়ংকর কবীরা গুনাহে লিপ্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন ইসলামের দৃষ্টিতে।

এখন মুখ বাচাতে সে বলে উঠবে- "এর উত্তর আল্লাহই ভালো জানেন"

- ⇨ কিন্তু আল্লাহ জানলে আমাদের লাভ কি, আমাদের মুসলমানদের কাজ কুরানের সত্যতা যাচাই করা। আল্লাহ জেনে বসে থাকলে আমাদের এ কাজে কি কোন সাহায্য হবে?

[যারা কোনো উত্তর দিতে পেরে কথায় কথায় শুধু আল্লাহই ভালো জানেন বলে কোনো ইসলামের কোনো অসংগতিকে জাস্টিফাই করতে চান, তাদের উদ্দেশ্যে- সহীহ বুখারী, তাওহিদ পাব্লি. ৪৫৩৮। একদা উমার (রা.) নবী সা-এর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন যে, أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَه جَنَّةٌ এ আয়াতটি যে উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী? তখন **তারা বললেন, আল্লাহই জানেন। উমার (রাঃ) এতে রেগে গিয়ে বললেন, বল- আমরা জানি অথবা আমরা জানি না**।]

সেই সাথে এই ধরনের হাস্যকর কথা পৃথিবীর যেকোনো গাঁজাখুরি কথার সাথে লাগানো যায়, তাতে কি সেটা সঠিক হয়ে যায় ? কোনো খুনের পলাতক(অনুপস্থিত) আসামীর উকিল যদি বলে এই খুনের কারণ আসামীই ভালো জানে_ তাহলে কই সে নির্দোষ হয়ে যায় বা এই কথার কারণে কই তার অপরাধ একটুও কমে ? বরং এরকম হাস্যকর কথা মাথায় ঘিলু থাকলে বলা সম্ভব না।

এভাবে প্রত্যেক কথায় ধরা খেয়ে হঠাত করে সে বলে উঠবে "কুরআন আগুনে পুড়েনা", অতএব কুরআন সত্য !

- ⇨ আপনাকে কে বলেছে- কোরআন আগুনে পুড়েনা? যদি সেটা কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপানো থাকে এবং সেই কাগজে যদি তাপ নিবারক কোন ক্যামিকেল ইউজ না করা হয়ে থাকে তবে অবশ্যই পুড়বে।

সর্বশেষ অস্ত্র এবং দাঁতভাঙ্গা জবাব:- "আসলে অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ রহমত উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এজন্যই আপনি কোরআনের অর্থ সঠিকভাবে বুঝেন নি, তবে একদিন অবশ্যই বুঝবেন আর সেটা হলো মৃত্যুর পরে ।"

⇨ এটা তো যেকোনো ধর্মের অন্ধ অনুসারীরাই বলতে পারে, এসব ফালতু দাবী যে কেউ করলে তাদের সত্যতা যে সামান্যও বাড়েনা তা ইতোমধ্যেই আপনারা জানেন। আমি যদি বলি "আমার বাপ বলে গেছে আপনি মরার পর ইদুর হয়ে পুনর্জন্ম নিবেন, এই সত্য আপনি একদিন বুঝবেন মৃত্যুর পরে"! এতে করে আমার এই দাবি ১% ও সত্য হয় কি ?।

– কী মুমিন ভাইয়েরা ! আমি কি ঠিক বললাম !

অবশ্য আমিও ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বাস হারানোর আগ পর্যন্ত_ কেউ কুরআন, হাদীসের যেকোন অসংগতি/ভূল দেখালে তাদের প্রতি এইসকল মন্তব্যের বেশ কয়েকটি ব্যবহার করতাম।

এখন সেগুলো ভেবে খুব বুঝতে পারি – কনফার্মেশন বায়াস(Confirmation Bias) মানুষের নিরপেক্ষ বিবেচনাবোধ, চিন্তাশক্তির ক্ষমতাকে কতটা হ্রাস করে দিতে পারে। এই রোগের আরো একটি ভয়াবহ উপসর্গ হল- সে মনে করে যে সে নিরপেক্ষই আছে। সে ই সঠিকভাবে এবং যৌক্তিকভাবে চিন্তা করে যাচাই করেছে।

প্রত্যেকটি ধর্মই মানবরচিত, এবং সে কারণেই অসংগতি ও ভুলে পরিপূর্ণ। আর তাই ধর্মের আসলরূপ সবার সামনে প্রকাশ হওয়া ঠেকাতে প্রত্যেক ধর্মের ধর্মকে পুজি করে চলা আলেমরা বিভিন্ন সান্তনামুলক ডিফেন্সিভ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। **যেমন আমি বললাম ফেরেশতারা কান্না করে এজন্য বৃষ্টি হয়**, এখন আমি যদি একটা ধর্ম প্রচার করতাম তাহলে আমার ধর্মের অন্ধবিশ্বাসী অনুসারী এপলোজিস্টরা সবার সামনে আমার কথাকে ভুল প্রমাণ হওয়া থেকে বাঁচাতে এ ত্যানা পেঁচিয়ে ডিফেন্সিভ চিয়ে/ব্যাখ্যা দিত যে,- "যেহেতু আমরা ফেরেশতাদের চোখে দেখতে পাইনা, তাই বৃষ্টির পেছনে তাদের কান্নার ভুমিকা নেই, একথা আমরা নিশিতভাবে বলতে পারিনা। তাই আমাদের ধর্মের কথাটিকে ভুল বলা সম্ভব না"। ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী এপলোজিস্টদের এদের ডিফেন্সিভ/সেলফ প্রোটেকটিভ ব্যাখ্যা শুনে তাদের ধর্মের সরল বিশ্বাসের অনুসারীরা একথা ভুলে যায়- আদালতে প্রকৃত আসামির পক্ষেও অনেক বাকপটু,ধূর্ত বুদ্ধিসম্পন্ন উকিল নিয়োগ করা যায় যারা সেই প্রকৃত আসামিকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নানাভাবে তার অপরাধের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণসমূহকে ধামাচাপা দিয়ে ঢাকবার জন্য ধূর্তবুদ্ধি প্রয়োগ করে নানাভাবে কথার মারপ্যাঁচ ও গোঁজামিল দিয়ে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করে রেসপন্স ও ডিফেন্স করে। এসব বক্তব্য শুনে আসামির সাপোর্টাররা যারা তার অপরাধ সচক্ষে দেখেনি তারা যারপরনাই খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন প্রকৃত বিচক্ষণ বিচারক কখনোই প্রকৃত আসামির পক্ষের উকিলের এসব ছলচাতুরিতে বিভ্রান্ত হননা বরং অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এসব যুক্তি ও ব্যাখ্যাকে যাচাই করেন। ফলশ্রুতিতে তার কাছে প্রকৃত আসামি পক্ষের উকিলের অপরাধীর দোষ ধামাচাপা দেয়ার জন্য উপস্থাপিত যুক্তির অসারতা ও গোঁজামিল অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তাই একজন প্রকৃত বিচক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিবেচনার গুনসম্পন্ন বিচারক প্রকৃত আসামিকে শনাক্ত করতে পারেন। ধর্মীয় এ্যাপোলজিস্ট ও ডিফেন্স স্কলাররাও ঠিক একইভাবে তাদের ধর্মের বিভিন্ন ভূল ও অসংগতিসম্পন্ন বিষয়কে সেই ধর্মের অনুসারীদের ও বাকি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও নির্ভুল প্রমাণ করতে- তাদের ত্যানাপ্যাঁচানোর সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে অসংখ্য গোঁজামিলীয় যুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রদানে সর্বদা সচেষ্ট ছিল, আছে এবং থাকবে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার এ বৃথা চেষ্টার যে- কোনো মানে নেই একজন নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে চাওয়া মানুষের কাছে, সে কথা বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

তো চলুন শুরু করা যাক আল্লাহ(ওরফে নবী মুহাম্মদের) ধর্মের আসল রূপের মুখোশ উন্মোচন

কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসারে শয়তানের কি কোনো প্রয়োজন আছে ?

শয়তান	আল্লাহ
অবশ্যই শয়তান তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। কোরআন ৩৬/৬২ তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। কুরআন ৫৮/১০ ইবলীস শয়তান বললঃ আপনি(আল্লাহ) যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন...... কুরআন ৭/১৬	1. আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তারপর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। কোরআন ৪২/৪৪ [৪২ নং সূরার ৪৪ নং আয়াত] 2. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথ নেই। কোরআন ৪২/৪৬ 3. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কি তাকে হিদায়াত করতে চাও?! আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোন পথ পাবে না। কোরআন ৪/৮৮ 4. এরাই যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, ফলে তাদেরকে বধির ও তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন। কোরআন ৪৭:২৩ 5. **আর অবশ্যই আমি বহু মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি**। কোরআন ৭:১৭৯ 6. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন, তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। কোরআন ৩৯/২৩, কোরআন ৩৯/৩৬-৩৭ 7. যদিও তুমি তাদের হিদায়াতের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা কর, তবু নিশ্চয় আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হিদায়াত দেন না এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। কোরআন ১৬/৩৭ 8. যদি আল্লাহ চাইতেন, তোমাদের সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতেন, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। কোরআন ১৬/৯৩ 9. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বুক সঙ্কুচিত করে দেন, যেন সে আসমানে আরোহণ করছে। কোরআন ৬:১২৫ 10. যারা কুফরী করেছে তারা যেন মনে না করে যে, আমি তাদের জন্য যে অবকাশ দেই, তা তাদের নিজদের জন্য উত্তম। **আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই- যাতে তারা পাপ বৃদ্ধি করে**। কোরআন ৩/১৭৮ 11. আর আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা ইচ্ছা করবে না। কোরআন ৭৬/৩০ তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। কোরআন ৮১/২৯ 12. **আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না**। কোরআন ৭৪:৫৬ 13. যদি আল্লাহ চাইতেন, তারা শির্‌ক করত না। কোরআন ৬/১০৭ 14. যদি আমি সবকিছু সরাসরি কাফিরদের সামনে সমবেত করতাম, তাহলেও তারা ঈমান আনত না, যদি না আল্লাহ চাইতেন। কোরআন ৬/১১১ 15. নিশ্চয় যাদের উপর তোমার রবের বাণী সত্য হয়েছে, তারা ঈমান আনবে না। যদিও তাদের নিকট সকল নিদর্শন এসে উপস্থিত হয়। কোরআন ১০/৯৬-৯৭ 16. আমি যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার সম্পদশালীদেরকে আদেশ করি। অতঃপর তারা তাতে সীমালঙ্ঘন করে। তখন তাদের উপর নির্দেশটি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। কোরআন ১৭:১৬ 17. আর **আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম যে, তোমরা যমীনে দু'বার অবশ্যই ফাসাদ করবে এবং ঔদ্ধত্য দেখাবে মারাত্মকভাবে**। কোরআন ১৭/৪ 18. আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাদের পরবর্তীরা লড়াই করত না, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর। আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তারা লড়াই করত না। কিন্তু আল্লাহ যা চান, তা করেন। কোরআন ২/২৫৩ 19. **আমি**(আল্লাহ) জ্বীন শয়তানদের ও মানুষের মধ্য হতে **শত্রু বানিয়ে দিয়েছি**, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয়। **তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না**। কুরআন ৬/১১২ 20. আমি তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা উসকে দিয়েছি। কুরআন ৫/১৪

21. যাকে তার **মন্দ কর্ম- শোভনীয় করে দেখানো হয়,** অতঃপর সে সেটাকে উত্তম মনে করে (সে কি তার সমান, যে সৎ পথে পরিচালিত?) **আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বিপথগামী করেন,** আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। কোরআন ৩৫/৮

22. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, **তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর- উভয়ই তাদের জন্য বরাবর, তারা ঈমান আনবে না**। কোরআন ২/৬

23. আর **কারও পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনবে**। কোরআন ১০/১০০

24. আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। কোরআন ৪০/৩৩

25. আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহ ও তাদের শ্রবণশক্তির উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, এবং তাদের দৃষ্টির উপর রয়েছে আবরণ। আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানকশাস্তি। কোরআন ২/৭ **আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা** তা (কুরআন) **বুঝতে না পারে**। আর তাদের কর্ণসমূহে রয়েছে বধিরতা এবং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের প্রতি আহবান করলেও তারা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না। কোরআন ১৮/৫৭

26. আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোন উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। কোরআন ১১:৩৪

27. তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। সুতরাং **আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন**। কোরআন ২/১০

28. আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। কোরআন ১৮:১৭

29. যাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত আর যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। **অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে**। কোরআন ৭:১৭৯

30. আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হিদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার কথাই সত্যে পরিণত হবে যে, 'নিশ্চয় আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব'। কোরআন ৩২/১৩

31. **আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে**। কোরআন ২১/১০১

32. অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর (আল্লাহর) বাণী অবধারিত হয়েছে, ফলে তারা ঈমান আনবে না। কোরআন ৩৬/৭

- **আমি প্রত্যেক বস্তুকে তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।** কোরআনঃ সূরা ক্বামার, আয়াত: ৪৯
- **পৃথিবীতে ও তোমাদের জানের উপর যে বিপদই আসুক না কেন আমরা তা সৃষ্টি করার আগেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।** কোরআনঃ সূরা হাদীদ, আয়াত: ২২

Al-Kahf 18:80 ...

'আর বালকটির বিষয় হল, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমি আশংকা* করলাম যে, সে সীমালংঘন ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে'।

* তাঁর আশংকা নিছক ধারণা ভিত্তিক ছিল না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নিশ্চিত জানতে পেরেছিলেন।

Al-Kahf 18:74 ...

অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন তারা এক বালকের সাক্ষাৎ পেল, তখন সে তাকে হত্যা করল। সে বলল, 'আপনি নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, যে কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো খুবই মন্দ কাজ করলেন'।

Al-Kahf 18:81 ...

'তাই আমি চাইলাম, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দান করবেন, যে হবে তার চেয়ে পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়ামায়ায় অধিক ঘনিষ্ঠ।

Pure Takdir / if allah knows all , why the playback movie

↥

❖ আল্লাহ যা ইচ্ছা মনোনীত করেন। কোরআনঃ সূরা কাসাস, আয়াত: ৬৮

❖ নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব, তিনি যাকে ইচ্ছা আযাব দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। কোরআনঃ ৫/৪০

❖ আল্লাহ যা ইচ্ছা সেটাই করেন। কোরআনঃ সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ২৭

❖ **তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।**

❖ গোপন পরামর্শ তো হল মুমিনরা যাতে দুঃখ পায় সে উদ্দেশ্যে কৃত **শয়তানের কুমন্ত্রণা** মাত্র। **আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না।** কোরআনঃ সূরা আল মুজাদিলা, আয়াত ১০।

৩৭২ তাফসীরে ইব্ন কাছীর

30. আর আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা ইচ্ছা করবে না; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কাহারো ইচ্ছা পূরণ হইবার নহে। আল্লাহ্র মঞ্জুরি ব্যতীত কেহ নিজেকে হিদায়াত করিতে, ঈমান আনয়ন করিতে এবং নিজের কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে।

৪৩২ তাফসীরে ইব্ন কাছীর

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ মানুষ যাহা চাহে তাহাই বাস্তবায়িত হয় না। বরং মানুষের ইচ্ছার বাস্তবায়ন আল্লাহ্র মঞ্জুরির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কেহ চাহিলেই হিদায়াত লাভ করিতে পারে না আবার ইচ্ছা করিলেই পথভ্রষ্ট হইতে পারে না– বরং আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়াত দান করেন সেই হিদায়াত পায় আর যাহাকে বিভ্রান্ত করেন সেই বিভ্রান্ত হয়।

সুফিয়ান ছাওরী (র)........ সুলায়মান ইব্ন মূসা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, لِمَنْ شَاءَ الخ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবূ জাহ্ল বলিল, ক্ষমতা তো সবই আমাগিদের হাতে। আমরা ইচ্ছা করিলে সঠিক পথে চলিতে পারি আর ইচ্ছা করিলে বিপথেও চলিতে পারি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا تَشَاءُونَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

তাফসীরে মাযহারী/৩৭৫

'তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন'। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! তোমরা ভেবেছো কী? ইচ্ছা করলেও তো তোমরা সরল পথের পথিক হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা লাভ করবে আল্লাহ্র ইচ্ছার আনুকূল্য, অনুমোদন অথবা সমর্থন। কেননা তিনিই সর্বাধিপতি। এই সুবিশাল সৃষ্টির প্রতিটি অস্তিত্বকে তিনিই দান করেছেন গতি-প্রকৃতি-প্রবৃদ্ধি ও পরিণতি, সে অস্তিত্ব মৌল হোক, অথবা হোক যৌগ। তিনিই সকলের ও সকল কিছুর একক সৃজয়িতা, পালয়িতা ও নিয়ন্ত্রয়িতা। এমন কি তোমাদের অভিপ্রায় সৃজয়িতাও তিনিই। সুতরাং কাউকে যদি সরল পথাভিমুখী হতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে তার ইচ্ছার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্পাকের দয়ার্দ্র অভিপ্রায়ের অনুমোদন।

শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া ৪২৩

ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ "তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হবে না; বরং তারা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। *(সূরা আম্বিয়া: ২৩)* অতএব, যে ব্যক্তি একথা জিজ্ঞাসা করবে তিনি কেন এ কাজ করলেন? সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি কিতাবের হুকুম অমান্য করল, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৬৮ তাহক্বীক্ব মিশকা-তুল মাসা-বীহ

অধ্যায়-৩ : তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

ক্বাদর বা তাক্বদীর তাই যা আল্লাহ ফায়সালা করেছেন এবং কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করেছেন।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ : এ বিশ্বাস রাখা যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা ভাল হোক আর মন্দ হোক, ক্ষতিকর হোক বা উপকারী হোক তা' নির্ধারিত। এমনকি বান্দার কর্মকাণ্ড যার মধ্যে ঈমান আনা, কুফরী করা, আনুগত্য করা, অবাধ্য হওয়া, পথ ভ্রষ্ট হওয়া ও সৎ পথে চলা সব কিছুই আল্লাহর ফায়সালা। এসব তাঁরই নির্ধারণ, ইচ্ছা, সৃষ্টি ও প্রভাবের ফল। তবে তিনি ঈমান আনয়নে ও তাঁর আনুগত্যে সন্তুষ্ট হন এবং এজন্য তিনি প্রতিদানের অঙ্গীকারও করেছেন। পক্ষান্তরে কুফরী ও অবাধ্যতায় সন্তুষ্ট হন না বরং এজন্য তিনি শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি কোন কিছু অস্তি

তিনি শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু নির্ধারণ করেছেন।

٨٠-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৮০। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহর ক্বাদ্‌র (তাক্বদীর) অনুযায়ী রয়েছে, এমনকি নির্বুদ্ধিতা ও বিচক্ষণতাও।[৮]

পর্ব-১ : ঈমান (বিশ্বাস) ৬৯

ব্যাখ্যা : حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা ও অপারগতা– এ দু'টিও আল্লাহর তাক্বদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে। অর্থাৎ বান্দার উপার্জন ও কাজকর্মের বিষয়ে তা' শুরুর ব্যাপারে ইচ্ছা বা অবগতি থাকলেও তা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাদের দ্বারা সম্পাদন হয় না। সবকিছুই স্রষ্টার নির্ধারণ বা তাক্বদীর অনুযায়ীই হয়। এমনকি বুদ্ধিমত্তা যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তার অভিষ্ঠ লক্ষে পৌছে অথবা অপারগতা যার কারণে তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছতে বিলম্ব ঘটে বা পৌছতে পারে না এটিও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

সহীহ হাদিসসমূহ

মিশকাতুল মাসাবীহ হাদিস একাডেমী পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৯৪, সহীহ মুসলিম (ইফা) ৬৫০৭, সূনান তিরমিজী (ইফা) ২১৫৮।

পরিচ্ছদঃ তাকদীরের প্রতি ঈমান

রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বস্তুটি সৃষ্টি করেছিলেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি কলমকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কী লিখব? আল্লাহ বললেন, তাকদীর সম্পর্কে লিখ। সুতরাং কলম- যা ছিল ও ভবিষ্যতে যা হবে, সবকিছুই লিখে ফেলল**।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তাআলা আরশ, পানি ও বায়ু সৃষ্টির পরে সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। কেননা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ "**আকাশ ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জীবের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন**।" তখন আল্লাহর আরশ(আসন) ছিল পানির উপরে। ফাতহুল বারীর ১৩ খণ্ডের ১৮৬ পৃষ্ঠায় মারফূ সূত্রে উল্লেখ আছে, **"আরশ সৃষ্টির পূর্বে পানি সৃষ্টি করা হয়েছে"**। হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, **আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল। তাহলে পানি কিসের উপর ছিল? তিনি বললেনঃ পানি বায়ুর পিঠে ছিল**।

সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৫০৭৬

আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন, আমি নবী সা-এর কাছে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন যুবক। আমার ভয় হয় যে, আমার দ্বারা না জানি কোন গুনাহর কাজ সংঘটিত হয়ে যায়; অথচ আমার কাছে নারীদেরকে বিয়ে করার মতো কিছু নেই। আমি কি খাসি হয়ে যাব? এ কথা শুনে নবী সা চুপ থাকলেন। এরপর উত্তর দিলেন, হে আবূ হুরাইরাহ! **তোমার ভাগ্যলিপি লেখা হয়ে গেছে আর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। তুমি খাসি হও বা না হও, তাতে কিছু আসে যায় না।**

১০ হাদীস সম্ভার (প্রথম খণ্ড) ৬৫

তকদীরের প্রতি ঈমান

(১১৪) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমস্ত উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।" *(তিরমিযী ২৫১৬)*

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) ৪৫৬০।

রাসুলুল্লাহ সা বলেনঃ **যদি কোন জিনিস তাকদীরের অগ্রগামী হতে পারত**, তবে বদনযরই তার অগ্রগামী হত।

সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমী পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৬৬৬৭

রাসুলুল্লাহ সা বলেন- **এমন বলো না যে, যদি আমি এমন এমন করতাম তবে এমন হত না। বরং এ কথা বলে যে,আল্লাহ তা'আলা যা নির্দিষ্ট করেছেন এবং যা চেয়েছেন তাই করেছেন**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) ১১৩।

রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা পাঁচটি বিষয়ে তাঁর সৃষ্টজীবের জন্য চূড়ান্তভাবে তাক্বদীরে লিখে দিয়ে নির্ধারিত করে রেখেছেনঃ ১) তার আয়ু (বয়স/জীবনকাল), ২) **তার 'আমল (কর্ম)**, ৩) তার মৃত্যুস্থান, ৪) **তার চলাফেরা (গতিবিধি)** এবং ৫) এবং তার রিযিক (জীবিকা)।

সহীহ বুখারী তাওহীদ পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৬৬০১

রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেনঃ **কোন নারী নিজে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে যেন অন্য নারীর তালাক না চায়। কেননা, তার জন্য (তাকদীরে) যা নির্ধারিত আছে তাই সে পাবে।**

সুনানে ইবনে মাজাহ(তাহকীককৃত) হাদিস নম্বরঃ ৯১

সুরাকাহ(রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কার্যকলাপ কী তাই- যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্ধারিত হয়েছে, না ভবিষ্যতে যা করা হবে তা? রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ" বরং তাই যা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্দিষ্ট হয়েছে। যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তা সহজসাধ্য করা হয়েছে"।

সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমী পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৬৬২৮

সুরাকাহ্ ইবনু মালিক (রা) রসূলুল্লাহ সা এর নিকট আসলেন, অতঃপর বললেন, **হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সামনে আমাদের দীন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, যেন আমরা এই মাত্র সৃষ্ট হয়েছি।** আজকের আমল কি ঐ বিষয়ের উপর যার সম্পর্কে কলম লিখে শুকিয়ে গেছে এবং তাকদীর তার উপর চলছে? নাকি আমরা ভবিষ্যতে তার সামনাসামনি হব? রাসুলুল্লাহ সা বললেন- না, বরং **কলম যা কিছু লিখার লিখে শুকিয়ে গেছে ও সে অনুযায়ী তাকদীর জারী হয়ে গেছে**।

সুনান আর তিরমিজি (তাহকীককৃত) হাদিস নম্বরঃ ২১৩৫

উমর (রাঃ) প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. আমলের ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি? **আমরা যেসব কাজ করি তা কি নতুনভাবে ঘটল না আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে?** রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ হে খাত্তাবের পুত্র! **তা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে**। আর সকলের করণীয় বিষয় সহজ করে রাখা হয়েছে। যারা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তারা অবশ্যই সাওয়াবের কাজ সম্পাদন করে আর যারা দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তারা দুর্ভাগ্যজনক কাজই সম্পাদন করে থাকে।

সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমী পাব্লি.,হাদিস নম্বরঃ ৬৬৩০

বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! জাহান্নামীদের হতে জান্নাতীদের সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে কি? রাসুলুল্লাহ সা বললেন, "হ্যাঁ হয়েছে। **প্রত্যেক লোকের জন্যে সে কর্মটি সহজ করে দেয়া হবে, যার জন্যে তাকে বানানো হয়েছে**"।

৬২১৭ আলী (রা.) হতে বর্ণিত যে, আমরা এক জানাযায় নবী সা এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটা লাকড়ি দিয়ে যমীনে মৃদু আঘাত দিয়ে বললেনঃ তোমাদের কোন লোক এমন নয় যার বাসস্থান জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়ে যায়নি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ তা হলে কি আমরা তার উপর নির্ভর করব না। তিনি বললেনঃ আমল করে যাও। কারণ যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য তা সহজ করে দেয়া হবে।

৬৫৯৬ নবী সা কে এক ব্যক্তি (তাকদীরের ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করল যে- তাহলে আমলকারীরা আমল করবে কেন? নবী সা বললেনঃ **প্রতিটি লোক ঐ আমলই করে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে;** অথবা যা তার জন্য সহজ করা হয়েছে।

সহীহ বুখারী তাওহীদ পাবলিকেশন পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৬৫৯৬

আল্লাহর বাণীঃ "আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে গুমরাহ করেছেন"- (সূরাহ জাসিয়াহ ৪৫/২৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, নবী সা আমাকে বলেছেনঃ যার সম্মুখীন তুমি হবে (তোমার যা ঘটবে) **তা লেখার পর** কলম শুকিয়ে গেছে। **প্রতিটি লোক ঐ আমলই করে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।**

সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমী পাব্লি.,হাদিস নম্বরঃ ৬৬২৪

রসূলুল্লাহ সা বলেন, তোমাদের মাঝে এমন কোন লোক নেই, যার পরিণাম আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারণ করেননি এবং সে দুর্ভাগ্যবান হবে বা সৌভাগ্যবান হবে, তা লিপিবদ্ধ করেননি। যে লোক সৌভাগ্যবান সে সৌভাগ্যবানদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। যে হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত সে হতভাগার আমালের প্রতি ধাবিত হবে।

আবু দাউদ (তাহকীককৃত) হাদিস নম্বরঃ ৪৭০২

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ মূসা (আ) বললেন, হে রব! যে আদম (আ) আমাদেরকে ও তাঁর নিজেকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছেন, তাঁকে আমি দেখতে চাই। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁকে আদম (আ)-কে দেখালেন। তিনি বললেন, আপনিই আমাদের পিতা আদম? আদম (আ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, আমাদেরকে ও আপনার নিজেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করার জন্য আপনাকে কোন বস্তু উদ্ধুদ্ধ করেছিল?

এবার তাঁকে আদম (আ) বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি মূসা (আ)। তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর কিতাবে দেখতে পাওনি যে, সেটি নির্ধারিত ছিলো আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আদম (আঃ) বললেন, **যে বিষয়ে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত আমার পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ সে ব্যাপারে আমাকে কেন অভিযুক্ত করছো?** রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ সুতরাং এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আঃ)-এর উপর জয়ী হলেন

সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমী পাব্লি.,হাদিস নম্বরঃ ৬৬৩৮

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আদম (আ) ও মূসা (আ) বাদানুবাদ করেন। তখন মূসা (আ) তাকে বললেন, আপনি তো সে আদাম (আ) যাকে তার ভুলে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছে। এরপর আদম (আ) তাকে বললেন, **তুমি আমাকে তিরস্কার করছ, এমন একটি ব্যাপারে, যা আমার জন্মের আগে আমার উপর ভাগ্যলিপিতে নির্ধারিত হয়েছিল**। অতঃপর আদম (আ)- মূসা (আ) এর উপর জয়ী হলেন।

সহীহ মুসলিম (ইফা) ৬৫০১,৬৫০৩।

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ ...... মূসা (আ) বললেন, **হে আদম! আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদের বের করে দিয়েছেন ! তখন আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি এমন বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করছেন যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।** অতঃপর আদম (আ)- মূসা (আ) এর উপর তর্কে জয়ী হলেন।

৬৫০২। .... আদম (আ) বললেন, **আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে ভৎসনা করেছেন, যা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার উপর নির্ধারণ করা হয়েছে।**

৩৩৪০ হাশরের ময়দানে আদম (আ.) তার ভুলের জন্য শাফায়াত করতে পারবেনা না।

৩৪০৯ রাসূল সা বলেছেনঃ আদম আ. ও মূসা আ. তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। তখন মূসা (আ.) তাঁকে বলছিলেন, আপনি সেই আদম যে আপনার ভুল আপনাকে বেহেশত হতে বের করে দিয়েছিল।

আদম (আ.) তাঁকে বললেন, **আপনি আমাকে এমন বিষয়ে দোষী করছেন, যা আমার সৃষ্টির আগেই আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল**।

রাসূল সা দুবার বলেছেন, এ বিতর্কে আদম আ., মূসা (আ.)-এর ওপর বিজয়ী হন।

৪৭৩৬ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ মূসা আ. আদম আ.-কে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, মানব জাতিকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন এবং তাদের জান্নাত থেকে বের করিয়েছেন? আদম আ. তাঁকে বললেন, আপনাকে আল্লাহ্ তাঁর রিসালাতের জন্য নির্বাচিত করেছেন, এবং আপনার ওপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন? মূসা আ. বললেন, হ্যাঁ। আদম আ. বললেন, আপনি তাতে অবশ্যই পেয়েছেন যে, **আমার সৃষ্টির আগেই আল্লাহ্ তাআলা তা আমার জন্য লিখে রেখেছেন**। মূসা আ. বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সা বললেন, এভাবে আদম আ. মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন।

সুনান আবূ দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৪৫৩৭

আবদুল্লাহ ইবন জাররাহ (র)বলেনঃ আমি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করিঃ আদম (আ)-কে কি আসমানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, না যমীনের জন্য? তিনি বলেনঃ 'তাকে যমীনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল।' আমি বললাম: যদি তিনি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করতেন? তিনি বলেনঃ -"**এ ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না, (কেননা, তাঁর তাকদীরে এরূপ লেখা ছিল)**"।

আমি বললাম: আপনি আমাকে এ আয়াত সম্পর্কে বলুনঃ-" শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ করতে পারে না, তবে তাকে, যে জাহান্নামের যাবে"। তিনি বললেনঃ **অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীতে কাউকে আবদ্ধ করতে পারে না, তবে তাকে, যার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম অবধারিত করেছেন**।

সূনান আবু দাউদ (ইফা) ৪৫৩৯।

খালিদ (র) বলেনঃ আমি হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করি, এ আয়াতের অর্থ কি? যেখানে বলা হয়েছেঃ শয়তান তোমাদের কাউকে গুমরাহ করতে পারে না, তবে যে জাহান্নামে যাবে তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি বলেনঃ **অবশ্যই শয়তান তার গুমরাহীর ফাঁদে তাকেই আবদ্ধ করবে, যার জন্য আল্লাহ্ জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন**।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) হাদিস নম্বরঃ ২১৫২, সহীহ মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৬৫১৩, ৬৬৪৬

পরিচ্ছেদঃ বনী আদমের যিনা ইত্যাদির অংশ পূর্ব নির্ধারিত

নবী সা বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা প্রতিটি আদম সন্তানের মধ্যে যিনার একটি অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন, **যা সে অবশ্যই করবে**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) ৮৬।

পরিচ্ছেদঃ তাকদীরের প্রতি ঈমান

রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিখে রেখেছেন, সে তা নিশ্চয়ই করবে**। চোখের ব্যভিচার হলো দেখা, জিহবার ব্যভিচার কথা বলা (যৌন উদ্দীপ্ত কথা বলা)। আর মন চায় ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং গুপ্তাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।

সহীহ মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে, **আদম সন্তানের জন্য তাক্বদীরে যিনার অংশ যতটুকু নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে**। দুই চোখের যিনা তাকানো, কানের যিনা যৌন উদ্দীপ্ত কথা শোনা, মুখের যিনা আবেগ উদ্দীপ্ত কথা বলা, হাতের যিনা (বেগানা নারীকে খারাপ উদ্দেশে) স্পর্শ করা আর পায়ের যিনা ব্যভিচারের উদ্দেশে অগ্রসর হওয়া এবং মনের যিনা হলো চাওয়া ও প্রত্যাশা করা। আর গুপ্তাঙ্গ তা সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।

সূনান তিরমিজী (ইফাঃ) ২১৫৮।

অধ্যায়ঃ তাকদীর

উম্মূল কিতাব কি তা জান? আমি বললামঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ **এ হল একটি মহাগ্রন্থ, আকাশ সৃষ্টিরও পূর্বে এবং যমীন সৃষ্টিরও পূর্বে আল্লাহ তাআলা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এতে আছে ফির'আওন জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত, এতে আছে তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবীও ওয়া তাব্বা(تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ) আবু লাহাবের দুটি হাত ধ্বংস হয়েছে আর ধ্বংস হয়েছে সে নিজেও।**

সহীহ বুখারী, তাওহীদ পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৭৪৫৪, ৩২০৮, সহীহ বুখারী (ইফা) ৬৯৪৬

পরিচ্ছদঃ আল্লাহর বাণীঃ আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ কথা আগেই স্থির হয়ে গেছে। (সূরাহ আস্ সাফফাত ৩৭/১৭১) রসূল সা বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হল এরূপ বীর্য থেকে যাকে মায়ের পেটে চল্লিশ দিনরাত একত্রিত রাখা হয়। তারপর অনুরূপ সময়ে আলাক হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে গোশতপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করেন।। এই ফেরেশতাকে চারটি বিষয় সম্পর্কে লেখার করার জন্য হুকুম দেয়া হয়। যার ফলে ফেরেশেতা তার রিযক, **আমল**, আয়ু এবং **দুর্ভাগা কিংবা ভাগ্যবান হওয়া সম্পর্কে লিখে দেয়**। **তারপর তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়**।

এজন্যই তোমাদের কেউ জান্নাতীদের আমল করে এতটুকু এগিয়ে যায় যে, **তার ও জান্নাতের মাঝে কেবল এক গজের দূরত্ব থাকতেই তার ওপর লিখিত তাকদীর প্রবল হয়ে যায়। তখন সে জাহান্নামীদের আমল করে। পরিশেষে সে জাহান্নামেই প্রবেশ করে**। আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের মত আমাল করে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক গজের দূরত্ব থাকতে তার উপর তাকদীরের লেখা প্রবল হয়, ফলে সে জান্নাতীদের মত আমল করে, শেষে জান্নাতেই প্রবেশ করে।

সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমী পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৬৬১৬

রাসূলুল্লাহ সা বর্ণনা করেন- নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝ হতে কেউ জান্নাতীদের আমলের ন্যায় আমাল করতে থাকে। অবশেষে **তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র একহাত দূরত্ব থাকে। অতঃপর ভাগ্যের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের কর্ম শুরু করে।** এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

৩৪৭০ নবী সা বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল **যে, নিরানব্বইটি মানুষ হত্যা করেছিল**। অতঃপর বের হয়ে একজন পাদরীকে জিজ্ঞেস করল, আমার তওবা কবুল হবার আশা আছে কি? পাদরী বলল, না। **তখন সে পাদরীকেও হত্যা করল**।

অতঃপর পুনরায় সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সে রওয়ানা হল এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল। সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল।

মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফেরেশতামন্ডলী তার রূহকে নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। আল্লাহ্ সামনের ভূমিকে আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও। এবং পশ্চাতে ফেলে আসা স্থানকে (যেখানে হত্যাকান্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও।

অতঃপর ফেরেশতাদের উভয় দলকে নির্দেশ দিলেন— তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর। পরিমাপ করা হল, দেখা গেল যে, মৃত লোকটি সামনের দিকে এক বিঘত বেশি এগিয়ে আছে। কাজেই তাকে ক্ষমা করা হল।

রিয়াযুস স্বা-লিহীন

পরিচ্ছেদঃ: তওবার বিবরণ

৮/২১। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের যুগে একটি লোক ছিল যে, **নিরানব্বইটি মানুষ হত্যা করেছিল**। অতঃপর সে একটি খ্রিষ্টান সন্নাসীর কাছে এসে বলল, সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন কি তার তওবার কোন সুযোগ আছে? উনি বলল, 'না'। **সে ক্রোধান্বিত হয়ে তাকেও হত্যা করে একশত পূরণ করে দিল**। সে লোকদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাকে এক আলেমের খোঁজ দেওয়া হল। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? উনি বলল, 'হ্যাঁ আছে! তার ও তওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশে চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর। সুতরাং সে ব্যক্তি ঐ দেশ অভিমুখে যাত্রা করল। যখন সে মধ্য রাস্তায় পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু এসে গেল। তার আত্মা নেয়ার জন্য রহমত ও আযাবের উভয় প্রকার ফিরিশ্তা উপস্থিত হলেন। **ফিরিশ্তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল**। রহমতের ফিরিশ্তাগণ বললেন, 'এই ব্যক্তি তওবা করে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে তার আগমন ঘটেছে।' আর **আযাবের ফিরিশ্তারা বললেন, 'এ এখনো ভাল কাজ করেনি এই জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত**।' এরপর ফায়সালা হল, 'তোমরা দূরত্ব মেপে দেখ। সে যে এলাকা থেকে এসেছে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার দূরত্ব, এই দুয়ের মধ্যে সে যার দিকে বেশী নিকটবর্তী

↥

হবে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে।' অতএব তাঁরা দূরত্ব মাপলেন এবং **যে দেশে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেই ভালো দেশকে বেশী নিকটবর্তী পেলেন। সুতরাং রহমতের ফিরিশতাগণ তার জান কবয করলেন।**

মূলত আল্লাহ তাআলা যেখান থেকে সে আসছিল সে দেশকে আদেশ করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎশীলদের দেশকে আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, 'তোমরা এ দু'য়ের দূরত্ব মাপ।' সুতরাং তাকে সৎশীলদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পেলেন। যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।

সহীহ মুসলিম (ইফা)

৬৭৫২। .... যখন তার মৃত্যু এল, তখন সে বুকের উপর ভর দিয়ে (কিছু এগিয়ে) গেল।

কোরআন, সূরা আন'আম, আয়াত ১২৫।

আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন।
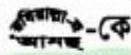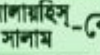
সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) আল্লামা আলবানী একাডেমী পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৪৭০৩, মিশকাতুল মাসাবীহ(মিশকাত) হাদিস একাডেমি পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৯৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৩৯৫, তিরমিযী ৩০০১; আবূ দাউদ(ইফা)৪৬৩০, ৪০৮১, সহীহ সুনান আবূ দাউদ

রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ-"মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর স্বীয় ডান হাতে তাঁর পিঠ বুলিয়ে তা থেকে তাঁর একদল সন্তান বের করে বললেন, **আমি এদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতবাসীর উপযোগী কাজই করবে।** অতঃপর আবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে একদল সন্তান বেরিয়ে এনে বললেন, এদেরকে **আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং জাহান্নামীদের উপযোগী কাজই করবে।**" একথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমলের কি মূল্য রইলো?

রাসূলুল্লাহ সা বললেন,- "মহান **আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দ্বারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষে সে জান্নাতীদের কাজ করেই মারা যায়। আর আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আর যখন তিনি কোনো বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজই করিয়ে নেন। অবশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করে মারা যায়। অতঃপর এজন্য তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান**"।

৮০ তাহক্বীক্ব মিশকা-তুল মাসা-বীহ

৯৫। মুসলিম ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব -কে কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল : "(হে মুহাম্মাদ!) আপনার রব যখন আদাম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সব সন্তানদেরকে বের করলেন" (সূরাহ্ আল আ'রাফ৭ : ১৭২) (...আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। 'উমার বললেন, আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তিনি জবাবে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আপন ডান হাত তাঁর পিঠ বুলালেন। আর সেখান থেকে তাঁর (ভবিষ্যতের) একদল সন্তান বের করলেন। অতঃপর বললেন, এসবকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি, তারা জান্নাতীদের কাজই করবে। আবার আদামের পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে (অপর) একদল সন্তান বের করলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারা জাহান্নামীদেরই 'আমাল করবে। একজন সহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে 'আমালের আর আবশ্যকতা কি? উত্তরে রসূল বললেন, যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জান্নাতীদের কাজই করিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। এভাবে আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা জাহান্নামীদের কাজই করিয়ে নেন। পরিশেষে সে জাহান্নামীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে, আর এ কারণে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করেন।[১১৪]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসখানা আবূ দাউদ এবং তিরমিযী থেকে সংকলিত, যেখানে সুস্পষ্ট যে, শুধু 'আমালের দ্বারা জান্নাত বা জাহান্নামে কেউ যাবে না বরং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত বিষয় 'তাক্বদীর' এখানে বিশেষভাবে কার্যকর। অতএব, যার তাক্বদীরে যা লিখা আছে সে তারই হকদার হবে।

↥

মুয়াত্তা মালিক (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), রেওয়ায়েত ২।

উমর (রা)-এর নিকট (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ) (সূরা আ'রাফঃ ১৭২) আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সা এর নিকট এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাসেহ করিলেন, অতঃপর **আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার সন্তানদেরকে বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আমি ইহাদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। ইহারা বেহেশতের কাজ করবে**। অতঃপর **পুনরায় তাহার পৃষ্ঠদেশে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বুলাইলেন এবং তাহার আর কিছু সংখ্যক সন্তান বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আমি ইহাদেরকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। ইহারা দোযখের কাজ করবে**। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে আমল করায় লাভ কি? রাসূলুল্লাহ সা বললেন, আল্লাহু পাক যখন কোন বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাহার দ্বারা বেহেশতীদের কাজ করান অথবা মৃত্যুর সময়েও সে নেক কাজ করিয়া মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। আর যখন কোন বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তাহার দ্বারা দোযখীদের কাজ করাইয়া থাকেন। অতঃপর **মৃত্যুর সময়েও তাহাকে খারাপ কাজ করাইয়াই মৃত্যুবরণ করান**। আর আল্লাহ তখন তাহাকে দোযখে প্রবেশ করাইয়া থাকেন।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) ৮২।

পরিচ্ছদঃ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই জন্ম হয় এভাবে যে, তার মায়ের পেটে শুক্ররূপে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত **লাল জমাট রক্তপিন্ডরূপ** ধারণ করে। তারপর পরবর্তী চল্লিশ দিনে মাংসপিন্ডর রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য পাঠান। ফেরেশতা লিখে তার- (১) 'আমাল (সে কি কি 'আমাল করবে), (২) তার মৃত্যু, (৩) তার রিযিক ও (৪) তার নেককার বা দুর্ভাগা হওয়ার বিষয়, আল্লাহর হুকুমে তার তাক্বদীরে লিখে দেন, **তারপর তন্মধ্যে রূহ্ প্রবেশ করান**। অতঃপর সে সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত প্রকৃত আর কোন ইলাহ নেই! তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতবাসীদের 'আমাল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় **তার প্রতি তাক্বদীরের লিখা তার সামনে আসে। আর তখন সে জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে** এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। তোমাদের কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের মতো আমাল করতে শুরু করে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তার প্রতি সে লেখা (তাক্বদীর) সামনে আসে, তখন সে জান্নাতীদের কাজ করতে শুরু করে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

৬৬০৭ নবী সা বলেনঃ নিশ্চয় **কোন বান্দা জাহান্নামীদের আমল করে, কিন্তু আসলে সে জান্নাতী। আর কোন বান্দা জান্নাতের অধিবাসীর আমল করে কিন্তু আসলে সে জাহান্নামী**।

19. সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নাম্বার:৭/৮২। কুতুবুত সিত্তাহ: মুসলিম ২৬৬২/১-২, নাসায়ী ১৯৪৭, আবূ দাঊদ ৪৭১৩, আহমাদ ২৩৬১২, ২৫২১৪

রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা একদল লোককে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতাদের মেরুদন্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি জাহান্নামের জন্যও একদল সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতাদের মেরুদন্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদের জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) ৪৭১৩।

আয়িশা (রা) বলেন, একদা নবী সা এর নিকট জানাযার সালাতের জন্য এক আনসারী বালকের লাশ আনা হলো। আয়িশা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এর কি সৌভাগ্য সে কোনো গুনাহ করেনি এবং তার বয়সও পায়নি। তিনি বললেন, হে আয়িশাহ! এর বিপরীত কি করে হতে পারে! মহান আল্লাহ জান্নাত ও তার অধিবাসীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং **তা যখন তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদন্ডে(অবচেতন) ছিলো**। **আবার তিনি জাহান্নাম ও তার জন্য একদল ভুক্তভোগী সৃষ্টি করেছে**ন এবং **তা তাদের জন্য যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন তখন তারা তাদের পিতাদের মেরুদন্ডে(অবচেতন) ছিলো**।

ইমাম মালিক ইব্‌নে আনাস (র) বর্ণনা করেন যে, মুসলিম ইব্‌নে য়াসার (র) বলেন, উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রা)-কে وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ الـخ এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন, এ আয়াত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর পিঠে নিজের ডান হাত বুলিয়ে তাঁর সন্তানদের একদল বের করে এনে বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করলাম। এরা জান্নাতীদের আমলই করবে। তারপর পুনরায় হাত বুলিয়ে আরেক দল সন্তানকে বের করে এনে বললেন, এদের আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা জাহান্নামীদেরই আমল করবে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমল করার প্রয়োজন কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আল্লাহ যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তার থেকে তিনি জান্নাতীদেরই আমল করান। আমৃত্যু জান্নাতীদের আমল করতে করতেই শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতে চলে যাবে। পক্ষান্তরে যাকে তিনি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন; তার দ্বারা তিনি জাহান্নামীদের আমলই করান। আমৃত্যু জাহান্নামীদের আমল করতে করতেই শেষ পর্যন্ত সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।"

সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমী পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৬৬১৮, ৬৬২১

নবী সা বলেন- জরায়ুতে চল্লিশ অথবা পয়তাল্লিশ দিন রেণু জমা থাকার পর সেখানে ফেরেশতা গমন করে। অতঃপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রভু! সে কি হতভাগ্য না সৌভাগ্যবান? তখন উভয়টাতে লিপিবদ্ধ করা হয়। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে হতভাগ্যবান কিংবা সৌভাগ্যবান বানিয়ে দেন।

সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমী পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৬৬১৯

ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, দুর্ভাগা সে লোক, যে তার মায়ের গর্ভ হতে দুর্ভাগা। একথা শুনে এক ব্যক্তি রাসূল সা এর সাহাবী হুযাইফাহ (রাযিঃ) এর কাছে আসলেন। তখন তিনি তার নিকট আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) এর কথা বর্ণনা করলেন এবং বললেন,- **আমলহীন কোন লোক কিভাবে দুর্ভাগ্যবান হতে পারে**? অতঃপর হুযাইফাহ্ (রাযিঃ)তাকে বললেন,"তুমি কি এতে আশ্চর্য হচ্ছো"? আমি রাসূলুল্লাহ সা কে একথা বলতে শুনেছি।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) ১১১।

আয়িশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা কে জিজ্ঞেস করলাম, মুমিনদের নাবালেগ বাচ্চাদের জান্নাত-জাহান্নাম সংক্রান্ত ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি উত্তরে বললেন, তারা বাপ-দাদার অনুসারী হবে। আমি বললাম, কোন নেক আমল ছাড়াই? তিনি বললেন, আল্লাহ অনেক ভালো জানেন, তারা জীবিত থাকলে কী আমল করতো। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, **আচ্ছা মুশরিকদের নাবালেগ বাচ্চাদের কী হুকুম? তিনি বললেন, তারাও তাদের বাপ-দাদার অনুসারী হবে**। অবাক দৃষ্টিতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন বদ আমল ছাড়াই? উত্তরে তিনি বললেন, সে বাচ্চাগুলো বেঁচে থাকলে কী আমল করত, আল্লাহই ভালো জানেন।

সূনান আবু দাউদ ইফা, হাদিস নম্বরঃ ৪৬৪২

পরিচ্ছেদঃ ১৮. **মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে**।

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **জীবন্ত পুঁতে ফেলা শিশুকন্যা এবং তার মা- উভয়ই জাহান্নামী**।

↥

৪৯০ তাফসীরে ইব্ন কাছীর

সূরা তূর

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন : হযরত খাদীজা (রা) একদিন জাহেলিয়াতের যুগে মৃত্যুপ্রাপ্ত তাহার দুই ছেলের পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলিলেন : "তাহারা জাহান্নামী।" এই উত্তর শুনার পর হযরত খাদীজা (রা)-এর মুখ মলিন হইয়া যায়। হুযূর (সা) উহা অনুভব করিয়া বলিলেন, "খাদীজা! তুমি যদি তাহাদের অবস্থান দেখিতে পাইতে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে।" অতঃপর হযরত খাদীজা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আপনার ঔরসে আমার যে সন্তানদি হইয়াছেন তাহাদের পরিণাম কি হইবে? উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলিলেন, "তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন : ঈমানদার মাতা-পিতা এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর মুশরিক মাতা-পিতা ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) .... وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইবনে কাছীর ১০ম খণ্ড—৬২

সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯০

রাসূল (সা) বলেছেনঃ কারোর জন্য এমন বলা খুবই নিকৃষ্ট যে, আমি অমুক অমুক সূরা এবং অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি ; বরং সে বলবেঃ আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

আবু দাউদ (তাহকীককৃত) হাদিস নম্বরঃ ৪৭০৬, ৪৭০৭

রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ খিযির (আ) এক কিশোরকে বালকদের সঙ্গে খেলাধূলারত দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি তার মাথা ধরে তাকে হত্যা করলেন। তখন মূসা (আ) বললেনঃ 'আপনি এক নিষ্পাপ জীবন হত্যা করলেন..." (সূরা কাহফঃ ৭৪)। উবাই ইবনু কাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা কে আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে বলতে শুনেছিঃ **যেদিন মোহর মারা হয়েছিল সেদিন তাকে কাফির হিসেবেই সীলমোহর মারা হয়েছিল**।

সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমী পাব্লি., হাদিস নম্বরঃ ৬৬৫৯

রসূলুল্লাহ সা বলেনঃ নিশ্চয়ই যে ছেলেটিকে খিযির (আ) আল্লাহর আদেশে হত্যা করেছিলেন তাকে কাফিরের স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছিল। **যদি সে জীবিত থাকত তাহলে সে অবাধ্যতা ও কুফরী করত**।

৪৭২৬ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেন, খাযির (আ) **বালকদের খেলাধূলা করতে দেখতে পেলেন। তিনি একটি বুদ্ধিমান কাফের বালককে ধরলেন এবং তাকে পার্শ্বে শুইয়ে জবাই করে ফেললেন**। মূসা (আ.) বললেন, ''আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন জীবনের বদলা অপরাধ ব্যতীতই? সে তো কোন গুনাহর কাজ করেনি!"। খিযির (আ) বলেন- বালকটি ছিল কাফের। আমি শংকা করলাম যে, সে অবাধ্য আচরণ ও কুফরী করে তাদের জ্বালাতন করবে। অর্থাৎ তারা তার প্রতি মহব্বতের কারণে বালকটির ধর্মের অনুসারী হয়ে যাবে।

সূরা কাহফঃ৮০- আর বালকটির বিষয় হল, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমি আশংকা* করলাম যে, সে সীমালংঘন ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে'। * তাঁর আশংকা নিছক ধারণা ভিত্তিক ছিল না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নিশ্চিত জানতে পেরেছিলেন।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী), ৬৬৫৯।

পরিচ্ছেদঃ তাকদীরের প্রতি ঈমান

রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ নিশ্চয়ই **যে ছেলেটিকে খাযির (আ) আল্লাহর আদেশে হত্যা করেছিলেন তাকে কাফিরের স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছিল**।

সহীহ মুসলিম (ইফা) ৫৯৪৯।

রাসূলুল্লাহ সা বলেন- **বালকটি সৃষ্টিতেই ছিল জন্মগত কাফির**।

৭২৩৬ রাসূলুল্লাহ সা বলেন- হে আল্লাহ্! **আপনি যদি না করতেন তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না এবং আমরা দান-সাদাকা করতাম না, আর আমরা সালাতও পড়তাম না**।

১১৪৯ বিলাল (রা.) রাসূল সা কে বললেন, আমি সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা ছিল।

সহীহ মুসলিম (ইফা) ৬৭৫৫।

পরিচ্ছদঃ **হত্যাকারীর তাওবা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য; যদিও সে বহু হত্যা করে থাকে**

আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানকে এক এক জন খ্রীষ্টান বা ইয়াহুদী দিয়ে বলবেন, এ হচ্ছে তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তিপণ।

৪৮৯০ উমার (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন এক্ষুণি আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী সা বললেন, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জান না, আল্লাহ্ অবশ্যই বদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেনঃ ''তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।''

৬২৫৯ উমার (রা.) বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী সা বললেনঃ হে উমার! তোমার কি জানা নেই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, **তোমরা যা ইচ্ছে- করতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে আছে**।

৬২৪৩ নবী সা বলেছেনঃ **নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বানী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। যেমন চোখের যিনা, জিহবার যিনা,ইত্যাদি**।

৬১৭৩ উমার (রা.) একদল সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ সা এর সঙ্গে ইবনু সাইয়্যাদের নিকট গমন করেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে তাকে বালকদের খেলায় মগ্ন পেলেন। তখন সে বালেগ হবার নিকটবর্তী বয়সে পৌঁছেছে। সে নবী সা এর আগমন টের পেল না যতক্ষণ না নবী সা তাঁর হাত দিয়ে তার পিঠে মারলেন। তারপর তিনি বললেনঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমিই আল্লাহর রাসূল! তখন সে নবী সা এর দিকে তাকিয়ে বললোঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মী সম্প্রদায়ের রাসূল। এরপর ইবনু সাইয়্যাদ বললঃ আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমিই আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ সা তাকে ধাক্কা মেরে বললেনঃ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান রাখি।

তারপর আবার তিনি ইবনু সাইয়্যাদকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কী দেখতে পাও? সে বললঃ আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাচারী উভয়ই আসেন। রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ বিষয়টি তোমার উপর এলোমেলো করে দেয়া হয়েছে। এরপর নবী সা ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ আমি তোমার জন্য কিছু গোপন রাখছি। সে বললঃ তা 'দু:খ'। তখন নবী সা বললেনঃ **'দূর হও'। তুমি কখনো তোমার ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারবে না**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) ২৩২৮।

পরিচ্ছেদঃ ক্ষমা ও তাওবা

রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আল্লাহর কসম! **যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সরিয়ে এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত ও আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইত**।

কুরআন যে মানবরচিত, সেটা প্রমাণ করার জন্য এর স্ববিরোধী বাক্যগুলোই যথেষ্ট

[কোনো পাঠকের ক্রসচেকের প্রয়োজন হলে রেফারেন্সের উপর ক্লিক করুন]

1. প্রথম মুসলিম কে?	**মুহাম্মাদ** বল- 'আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি প্রথম মুসলিম হই।' কোরআন ৩৯:১২	**ইবরাহীম** ইবরাহীম ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। কোরআন ৩:৬৭
2. ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম কি গৃহীত হবে ?	**হ্যাঁ** নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। কোরআন ৫/৬৯, ২/৬২	**না** যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতি গ্রস্ত। কোরআন ৩/৮৫
3. মানুষ কি অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে?	**হ্যাঁ** তারা কিয়ামতের দিনে নিজদের পাপের বোঝা পুরোটাই বহন করবে এবং তাদের পাপের বোঝাও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু পথভ্রষ্ট করে। কোরআন ১৬:২৫	**না** যে হিদায়াত গ্রহণ করে, সে তো নিজের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই পথভ্রষ্ট হয়। আর কোন বহনকারী অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না। কোরআন ১৭:১৫
4. যারা কুফরী করেছে তারা কি ঈমান আনবে ?	**হ্যাঁ** **নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে,** তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য বরাবর, **তারা ঈমান আনবে না**। কোরআন ২/৬	**না** আল্লাহ **তাদের কুফরীর কারণে** অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছিলেন। সুতরাং **স্বল্পসংখ্যক ছাড়া তারা ঈমান আনবে না**। কোরআন ৪/১৫৫
5. আল্লাহ যাদেরকে লা'নত করেছেন। তারা কি ঈমান আনে ?	**হ্যাঁ** **নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে লা'নত করেছেন।** কোরআন ৩৩:৬৪ **আল্লাহ যাকে লা'নত করেন তুমি কখনো তার কোনো সাহায্যকারী পাবে না।** কোরআন ৪:৫২ **যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন, ফলে তাদেরকে বধির ও তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন।** কোরআন ৪৭/২৩ আমি মোহর মেরে দেই তাদের হৃদয়ে। অতঃপর তারা শোনে না। কোরআন ৭:১০০ আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। **তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা না কর, তারা ঈমান আনবে না।** কোরআন ৩৬:১০ আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না। কোরআন ২:২৬৪	**না** তাদের কুফরীর কারণে **আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। অতঃপর তারা খুব কমই ঈমান আনে।** কোরআন ২/৮৮

6. কোন মুসলিম ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে সে কি জান্নাতে যাবে ?	**না** আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। কোরআন ৪:৯৩	**হ্যাঁ** নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ' অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। কোরআন ৪৬:১৩-১৪
আল্লাহর সন্তান আছে বললেই যেখানে ক্ষেপে যায়, সেখানে মেয়েসন্তান নিয়েছেন বললে সেটা না বলে বলছে বৈষম্য বন্টন!	তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন''। তোমরা তো এক ভয়ানক বিষয়ের অবতারণা করেছ। সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়। কোরআন ১৯:৮৮-৯২	তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এটাতো তাহলে এক অসঙ্গত বণ্টন! কোরআন ৫২:৩৯, ৫৩;২১-২২
7. সবকিছু কখন নির্ধারিত হয় ?	**ক্বদরের রাতে** এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই প্রেরণকারী। কোরআন ৪৪/৪-৫	**সৃষ্টির পূর্বেই** আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। কোরআন ২৭/৭৫
8. সবচেয়ে বড় যালিম কে ?	**তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে, যে আল্লাহর মাসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে।** কোরআন ২:১১৪	তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে যে সাক্ষ্য রয়েছে তা গোপন করে। কোরআন ২:১৪০ **আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে।** কোরআন ১৮:৫৭
9. আল্লাহ কি যালিমদের ক্ষমা করেন?	**যারা যালিম হয়তো তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন।** কোরআন ৩:১২৮	**সাবধান! যালিমরাই থাকবে স্থায়ী আযাবে।** কোরআন ৪২:৪৫
10. যালিমদেরকে সতর্ক করে কোন লাভ আছে ?	**হ্যাঁ** **এটি কিতাব, আরবী ভাষায়; যাতে এটা যালিমদেরকে সতর্ক করতে পারে।** কোরআন ৪৬:১২	**না** **নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদেরকে হিদায়াত দেন না।** কোরআন ৫:৫১
11. কুরআন সর্বকালের সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে? [সেইসাথে জেনে নিই, নবীর সাথে কথা বলার জন্য আল্লাহ কি নির্লজ্জের মতো সাহাবীদের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল। মুহাম্মদ ওরফে কোরআনের আল্লাহ যদি কোন কিছু আগেথেকেই জানতে সক্ষম হতেন, তাহলে এভাবে টাকা চাওয়ার আয়াত নাযিল করে লজ্জা পেতেন না]	**হ্যাঁ**	**না** নিশ্চয় আমি তো একে আরবী কুরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। কোরআন ৪৩:৩ আর আমি তোমার ওপর আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যাতে তুমি মূল জনপদ ও তার আশপাশের বাসিন্দাদেরকে সতর্ক করতে পার। কোরআন ৪২:৭ হে মুমিনগণ, তোমরা যখন রাসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার পূর্বে কিছু সদাকা পেশ কর। কিন্তু যদি তোমরা সক্ষম না হও তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে যে, তোমাদেরকে নবীর সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা বলার আগে সদাক্বাহ দিতে হবে? যখন তোমরা সাদাকাহ দিতে পারলেনা, আর আল্লাহও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কোরআন ৫৮:১২-১৩
12. আল্লাহকে কি ধোঁকা দেয়া সম্ভব ?	**না**	**হ্যাঁ** **নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়।** কোরআন ৪:১৪২

↥

13. আল্লাহর বিধানের কি পরিবর্তন হয় ?	**না** **তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন ব্যতিক্রমও দেখতে পাবে না।** কোরআন ৩৫:৪৩, কোরআন ৩৩:৬২ আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই। কোরআন ১০:৬৪	**হ্যাঁ** ▪ যখন আমি একটি আয়াতের স্থানে পরিবর্তন করে আরেকটি আয়াত দেই- আল্লাহ ভাল জানেন সে সম্পর্কে। কোরআন ১৬:১০১ ▪ আমি যে আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার মত আনয়ন করি। কোরআন ২:১০৬ ▪ "যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলে আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না"। কোরআন ১৬:১০১ ▪ তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। কোরআন ২:২১৯ ▪ তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদক ও উত্তম রিযক গ্রহণ কর। কোরআন ১৬:৬৭ ▪ হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা বল। কোরআন ৪:৪৩ ▪ ইয়াহূদীদের যুলমের কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল। কোরআন ৪:১৬০
14. আল্লাহ কি সব জানেন ?	**হ্যাঁ** নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ। কোরআন ২:১১৫	**না** **যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন**, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। কোরআন ৫৭:২৫ তারপর আমি(আল্লাহ) তাদেরকে জাগালাম, **যাতে আমি জানতে পারি**, যতটুকু সময় তারা অবস্থান করেছিল, দু'দলের মধ্যে* কে তা অধিক নির্ণয়কারী। কোরআন ১৮:১২ তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল দুই দল মুখোমুখি হওয়ার দিন তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং **যাতে তিনি** মুমিনদেরকে **জেনে নেন**। কোরআন ৩:১৬৬ নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয় **তবে সম্ভবত** তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী। কোরআন ৬৬:৫ তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ **আল্লাহ এখনো জানেননি** কারা ধৈর্যশীল। কোরআন ৩:১৪২

15. মানুষের যে কল্যাণ, অকল্যাণ হয় – সব কি আল্লাহর পক্ষ থেকে ?	**হ্যাঁ** যদি তাদের কাছে কোন কল্যাণ পৌঁছে তবে বলে, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে’। আর যদি কোন অকল্যাণ পৌঁছে, তখন বলে, ‘এটি তোমার পক্ষ থেকে’। **আপনি বলুন– “সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে”**। কোরআন ৪:৭৮	**না** তোমার কাছে যে কল্যাণ পৌঁছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যে অকল্যাণ তোমার কাছে পৌঁছে তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে। কোরআন ৪:৭৯
16. আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে মুশরিকরা শিরক করত না-এটি কি সত্য ?	**হ্যাঁ** আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তারা শিরক করত না। কোরআন ৬:১০৭	**না** অচিরেই মুশরিকরা বলবে, ‘আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না’। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আযাব আস্বাদন করেছে। কোরআন ৬:১৪৮
17. জাহান্নামীদের একমাত্র খাদ্য কোনটা	**তাদের জন্য কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না।** কোরআন ৮৮:৬	**তাদের জন্য ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না।** কোরআন ৬৯:৩৬
And so on.........	And so on.........	And so on.........

↥

Grammatical Error & Mistakes in Your Quran

Do you Know ?

1	22:17 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱل**صَّٰبِـِٔينَ** وَٱلنَّصَٰرَىٰ 5:69 إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱل**صَّٰبِـُٔونَ** وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ In 2nd sentence the word **Saabi'uuna** has been declined wrongly, In the word the *'uu, waw* which is the sign of "raf'a" (as in cases of nominative or indicative). But In 1st sentence the word was declined correctly- because the word *inna* in the beginning of the sentence causes a form of declension called "nasb" (as in cases of accusative or subjunctive) and the "yeh" is the "sign of nasb".
2	63:10 رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ**أَكُن** مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ The verb *'akun* was incorrectly conjugated. It must be ***'akuuna***, i.e. the last consonant must have the vowel "a", instead of being vowelless, because the verb *'akun*, is in the subjunctive. Indeed the previous verb (*'assaddaqa*) has been correctly conjugated and is in the subjunctive. The reason is that in Arabic the present tense is placed in the subjunctive mood if it is preeceeded by certain words (huruf nasebah). One of such words is the "causative fa".
3	22:19 هَٰذَانِ خَصْمَانِ **ٱخْتَصَمُوا۟** فِى رَبِّهِمْ In Arabic, words are declined or conjugated with respect to number & the verbs and nouns are treated according to the singular / the dual / the plural. The verb in that verse was conjugated as if the subject is more than two. But the verse speaks only of two. So the word *'ikhtasamuu* must be ***'ikhtasamaa.***
4	49:9 وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ **ٱقْتَتَلُو** فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا error is like the previous one. The number again is dual but the verb was conjugated as if the subject is plural. So the verb *'eq-tatalu* must be ***'eqtatalata.***
5	16:66 وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى **بُطُونِهِ** The Quran repeats the same pattern of the above errors in the verse. The word '**butunihi**' is an obvious mistake and should be butuniha. But in verse 23:21 with the same sequence of words and the same grammatical position, but this time is written correctly butuniha. وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى **بُطُونِهَا**

6	إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ 7:56 The above verse is a nominal clause. In such a clause the predicate must match the subject (*rahmata*) of the nominal clause in gender. The word *qaribun* (meaning "near") is the predicate of *rahmata Allahi* ("mercy of Allah"), they have to match each other in gender. But this is not the case in the Arabic text. *Rahmata* is feminine in Arabic and so the word ***qaribun*** (which is masculine) must instead be *qaribah* (its feminine form). This rule was correctly observed in other Qur'anic verses. For example, in 9:40 we read: "كَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا" Here both *Kalemat* and *heya* are feminine. To say instead: "Kalemat ul-llah howa al-a'la" would never be correct. That would be just as wrong as saying: "... inna rahmata Allahi qaribun min ..."
7	وَقَطَّعْنَـٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا 7:160 Instead of *asbatan* it must be ***sebtan***. In the Arabic it literally says "twelve tribes". That is correct in English but not correct in Arabic. In Arabic it has to say twelve tribe because the noun that is counted by a number above ten to be singular. This rule is observed correctly for example in 7:142, 2:60, 5:12, 9:36, 12:4.
8	خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ 3:59 The word "*yakuun*(is)" must be "***kana***(was)" to be consistent with the past tense of the previous verb "qala(said)".
9	لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُو 21:3 In Arabic, for such a verbal sentence where the verb comes before the (masculine) subject, the rule is that- the verb must be in the third (masculine) singular form, if the active subject of the verbal sentence is stated in the sentence. (The same rule holds for substituting the two mentionings of "masculine" by "feminine"). But the verb in the above verse is in plural form. But the rule is correctly declined in the following verses: 3:52, 10:2, 16:27, 16:35, 3:42, 49:14
10	فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ 41:11 Heaven and earth in Arabic are feminine nouns, the verb said in "they said" is accordingly **feminine and dual (*qalata*)**, but the adjective "willing" at the end of the verse is **masculine and plural (*ta'e'een*)**, being at variance with the rule that the adjectives must have to match their nouns in number in gender, thus *ta'e'een* which is used for plural, must be ***ta'e'atain*** which is used for feminine dual.

11	وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا 91:5 The word *bana* in *banaha* is not a noun but a verb in the past tense. The word *ma* must have been ***man*** (meaning "who") After that The word '***ma***(that which)' in the Arabic language is used for the impersonal. But the subject of the above verse is God. So the word which must be used is the arabic word '***man***(him who)'. But English translators corrected the impersonal word 'ma 'and translated the verse as follows: "By the heaven and Him Who built it."
12	لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ 2:177 In the above verse there are five gramatical errors. In four of them the wrong tense was used, as the sentence begins in the present tense with the verb *tuwalluu*, while the other four verbs were written in the past tense: *'aaman* would be *tu'minuu*; *'aata* would be *tu'tuu*; *'aqaama* would be *tuqimuu*; But the English translators have observed the tense, and corrected those verbs and translates as- "It is not righteousness that you **turn** your faces to the East and the West; but righteousness is he who **believed** in Allah and the Last day and the angels and the Book and the Prophets; and **gave** his wealth, ... and **performed** prayer and **paid** the alms." The fifth error is the wrong declension of the word '*saabiriina*'. It must be declined ***saabiruuna*** like the preceeding word '*muufuuna*'.
13,	14,15, 16,17.......... beyond description

❖ Abdullah narrated from Al-Fadhal bin Hamad al-Khayri narrated from Ibn Khalid from Zaid Ibn Hubab narrated from Ashath from Saeed Ibn Jubayr: "**There are mistakes in Quran**: 'WAALSSABI-OON' [5:69], 'FAASSADDAQA WAAKUN MINA ALSSALIHEEN' [63:10], 'WAALMUQEEMEEN' [4:162]" (**Imam Abi Daud, *Kitab Al-Musahif*, p. 42**)

❖ These same sources state that both Aisha and Uthman b. Affan admitted that there were grammatical mistakes within the Muslim scripture:

Abu Bakr bin Abdoos and Abu Abdullah bin Hamid narrated from Abu al-Abbas al-Asim from Muhammad bin al-Jahm al-Samri from al-Fara from Abu Mu'awiyah from Hisham bin Arwa from his father that

Ayesha was asked about Allah's statements in Surah Nisa (verse 162) 'LAKINI ALRRASIKHOONA' and 'WAALMUQEEMEENA' and the Almighty's statement in Sura Maidah (verse 69) 'INNA ALLATHEENA AMANOO WAALLATHEENA HADOO WAALSSABI-OON'. Ayesha replied: '**O my nephew, this is due to mistakes committed by the scribe**'. (*Tafsir al-Thalabi*, Volume 6, p. 250; bold emphasis ours)

"There is disagreement over 'ALMUQEEMEENA ALSSALAT'. **Aisha and Aban bin Uthman said that was written in the Quran due to a mistake on the part of the transcriber**. Its correction is essential and it should be written as 'ALMUQEEMOONA ALSSALAT'. Similarly in Surah Maidah 'AALSSABI-OONA' and in Surah Taha 'IN HATHANI LASAHIRANI' have also been written due to the mistake of scribes. **Uthman stated that he had seen some mistakes in the Quran** and Arabs would correct them through their language and they had asked him to change them but he said that these mistakes did not change Haram to Halal and vice versa." (*Tafsir al-Baghawi–Ma'alim at-Tanzil*), Q. 4:161, Volume 3, p. 361; bold emphasis ours)

সালাত কায়েম করা বা নামাজ প্রতিষ্ঠার কথা আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে—আল মুক্বিমিনাস্ সলাহ্ (যারা সালাত কায়েম করে)। বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আয়েশা এবং হজরত আবান বিন ওসমান বলেছেন, কথাটি লিখতে হতো এভাবে—আল মুক্বিমুনাস্ সলাহ (যারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী)। সুরা মায়িদার মধ্যেও এ রকম ভুল রয়েছে। যেমন একস্থানে 'সাবেয়ুন' লেখা হয়েছে। অথচ শব্দটি লেখা উচিৎ ছিলো 'সাবেইন।' আরেকস্থানে লেখা হয়েছে 'হাজানি'— যার শুদ্ধ লিখিতরূপ 'হাজাইনি।' হজরত ওসমান বলেছেন, কোরআনে এ রকম কিছু কিছু ভুল উচ্চারণের শব্দ লিপিবদ্ধ রয়েছে যেগুলোকে আরববাসীরা পাঠ করার সময় সঠিকভাবে উচ্চারণ করে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, আপনি শব্দগুলোকে শুদ্ধরূপে লেখার ব্যবস্থা করেননি কেনো? উত্তরে হজরত ওসমান বলেছিলেন, এভাবেই থাকতে দাও। এর মাধ্যমে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা হয়নি।

তাফসীরে মাযহারী/৩৪৮

- ❖ Abu Muawiyah narrated from Hisham Ibn Urwah from his father that Aisha(R) was asked about the following mistakes in the Quran 'WAALMUQEEMEENA assalata walmutuuzzakata' and 'innallazina amanu wallazina haduu WAALSSABI-OON'. She replied: "O son of my nephew, this is due to the act of the scribes of the Quran who committed a mistake whilst transcribing them.
The chain of this tradition is Sahih according to the conditions of the Shaikhain. (**Jalaludin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Uloom al Quran*, Volume 1, p. 210**)"There is no strength with the replies that are advanced against the above cited reply of A.isha, namely that it contains a weak chain. **The chain is *Sahih*.**" (Jalaludin al-Suyuti, *Al-Itqan fi Uloom al Quran*, Volume 1, p. 212)

------------------------------ So, Quran Can't never be the words of Creator (Proven) ---------------------------

কোরআন এবং সহিহ হাদিস পড়ুন - ইসলামকে জানুন

[বি.দ্র.: নিচে প্রদত্ত ৫২১৫ এরকম আইকনে যেসব হাদীস দেয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটার রেফারেন্স হচ্ছে- সহিহ বুখারী তাওহীদ পাব্লিকেশন। পাঠকের সুবিধার্থে এভাবে সংক্ষেপে আইকনে দেয়া হয়েছে।]

অমুসলিমদের প্রতি ইসলাম

কোরআনের আয়াতসমূহ

1. নবী এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। কোরআন ৪৮:২৯

2. তুমি কখনো কাফির(ইসলামে অবিশ্বাসী)দের জন্য সাহায্যকারী হয়ো না। কোরআন ২৮:৮৬

3. হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কোরআন ৫:৫১

4. **মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে ইচ্ছকৃতভাবে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই**। কোরআন ৩:২৮

5. হে মুমিনগণ, তোমরা মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিপক্ষে কোন স্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত করতে চাও? কোরআন ৪:১৪৪

6. হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ইসলামে বিশ্বাস না করে(ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে)। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম। কোরআন ৯:২৩

7. কাফেরদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে চলে আসে। অত:পর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। কোরআন ৪:৮৯

8. তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে(কুতিবা আ'লাইকুমুল ক্বিতালু), অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। কোরআন ২:২১৬

9. যদি তোমাদের পিতা, সন্তান, স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। কোরআন ৯:২৪

10. হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন। কোরআন ৯:৭৩

11. তোমরা যুদ্ধ কর (ক্বাতিলু- কতল বা হত্যার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ) ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম। যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে **নত হয়ে** জিযিয়া প্রদান করে। কোরআন ৯:২৯

12. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। কোরআন ৯:১২৩

13. আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করব। অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের উপরে আঘাত হান, আর আঘাত হান তাদের আঙ্গুলের প্রতিটি জোড়ায়। কোরআন ৮:১২

14. তিনিই কাফেরদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিস্কার করেছেন। কোরআন ৫৯:২

15. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শিরক) খতম হয়ে যায় আর ধর্ম পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। কোরআন ৮:৩৯

16. আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার (কুফর ও শিরক) অবসান হয় এবং ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কোরআন ২:১৯৩

17. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। কোরআন ৪৮:১৬

18. নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিক (মূর্তিপূজারী)দের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। তবে যদি তারা তওবা করে, ইসলাম কবুল করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম দয়ালু। কোরআন ৯:৫

19. অতঃপর তাকে **নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে**। সেখানে কোন **খাদ্য** নাই, **ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ** ব্যতীত। সুরা হাক্ব, আয়াত ৩৬

20. সুরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৫। যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে **পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে**।

- কোরআন ৯:১১৩। নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা **প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী**।

- সূরা নিসা ৪, আয়াত ৫৬। যখন জাহান্নামীদের **দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে পুড়ে গলে যাবে, তখন সেখানে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেবো; যেনো তারা আজাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে**।

- কোরআন ৩৫:৩৬। আর যারা ইসলামে অবিশ্বাসী হয়েছে, **তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না**।

- কোরআন ৬:৭। তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে- (ইসলামে) অবিশ্বাসের কারণে।

আরো অসংখ্য psycho টর্চার করার হুমকির আয়াত রয়েছে........। বর্বর মরু ডাকাতের তৈরী আল্লাহ নাকি সন্তানের প্রতি পিতামাতার চেয়েও দয়ালু!! ইসলামের মিথ্যা হওয়ার পিছনে হাজার প্রমাণ আছে যা নিচে পড়তে যেয়ে পাবেন, সেটা বাদ দিয়েই না হয় চিন্তা করেন যে, পৃথিবীর কোনো পিতামাতাকে যদি তার কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান পিতামাতা হিসেবে স্বীকার না করে বা বিশ্বাস না করে, ডিএনএ টেস্ট করে প্রমান পাবার পরও , তাহলে কি সেই পিতামাতা উপরের আয়াতের মত বর্বর শাস্তিগুলো তার সেই সন্তানকে দেয়া তো বহু দূরের কথা, এসব শাস্তি দেয়ার কথা কল্পনা করতে পারবে কখনো ?! তাহলেই বুঝতে পারছেন মরু ডাকাতের ওসব দয়ালু আল্লাহর আসল নমুনা !

উপরে দেয়া আয়াতগুলো ভাল করে দেখেন। আল্লাহ পাকের রুচিবোধ কী চমৎকার! তাকে যারা বিশ্বাস করবে না, মান্য করবে না তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ খেতে দিয়ে। একটু ভেবে দেখেন তো প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুনে জ্বালিয়ে একজন মানুষকে শাস্তি দেয়া হবে অনন্তকাল, পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে, পাপীকে বেঁধে রাখা হবে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। দেহের চামড়া একবার পুড়ে গেলে পুনরায় নতুন ভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হবে আজাব ভোগের জন্য।

আমরা দেড় হাজার বছর আগের অসভ্যতাকে পেছনে ফেলে অনেক অনেক এগিয়ে এসেছি। আমরা আমাদের চরম শত্রুকেও পুঁজ খাওয়ানোর কথা ভাবি না, এক ঘন্টার জন্যও আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়ার কথা ভাবি না। যুদ্ধাহত শত্রুর সেবা করার কথাও ভাবি কখনো কখনো। কেউ শত্রু হলেও যদি পানি চায় আমরা এগিয়ে দেই। আমরা অনীপ্সিত, হিংস্র, বর্বরতার প্রতিচ্ছবি কাল্পনিক আল্লাহ পাকের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সভ্য, তাই না?

আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন তার গুণে গুণান্বিত হতে। যারাই আল্লাহ পাককে অনুসরণ করতে যাবে তারাই আইএসআইএস, আল কায়দা এর মত বর্বর হবে, এতে আশ্চর্যের কী আছে?

কোরান নি:সন্দেহে এক মরু-বর্বর রচিত।

- যারা ইসলামে অবিশ্বাসী, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। **তারাই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী (তারাই হল নিকৃষ্ট সৃষ্টি/ সৃষ্টির অধম)** । কোরআন ৯৮:৬, ৮:৫৫

- কোরআন ২:১৬১। নিশ্চয় যারা ইসলামে অবিশ্বাসী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের অভিশাপ।

- কোরআন ১৮:১০৫। তাদের যাবতীয় আমাল নিস্ফল হয়ে গেছে। কিয়ামাতের দিন আমি তাদের (ভালো কাজের) জন্য কোন ওজন কায়িম করব না (অর্থাৎ তাদের এসব আমল ওজনযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে না)।

- কোরআন ৯:২৮। **মুশরিকরা হল নাপাক/অপবিত্র(unclean)**, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদে হারামের নিকট না আসে।

তাফসির ইবনে কাসির

সূরা তাওবা ৫৬৩

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۔

মুশরিকগণ হইতেছে অপবিত্র ; অতএব এই বৎসর পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।

ইমাম আবূ আমর আওযাঈ (র) বলেন : উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে লিখিতভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন—তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের লোকদিগকে মুসলমানদের মসজিদসমূহে প্রবেশ করিতে দিও না। তিনি উক্ত নিষেধ-সম্বলিত বাক্যের পর কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন : اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ।

আতা (র) বলেন : সমগ্র হারাম শরীফই হইতেছে মসজিদ; কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ব্যক্তি অপবিত্র। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত মুশরিক ব্যক্তির দেহও অপবিত্র। হাসান বসরী হইতে আশআস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : মুশরিক ব্যক্তির সহিত কেহ করমর্দন করিলে সে যেন অযূ করে। ইমাম ইব্ন জারীর

- কোরআন ২৫:৪৪। ওরা তো পশুরই মত; বরং ওরা আরও অধম। They are not except like livestock. Rather, they are even more astray in way.

- কোরআন ৭৪:৫০। তারা যেন ভীত-চকিত (বন্য) গাধা।

- কোরআন ৭:১৭৬। তার দৃষ্টান্ত হল কুকুরের দৃষ্টান্তের মত। যদি তুমি তার উপর বোঝা চাপাও তাহলে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে এবং তাকে ছেড়ে দিলেও জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। এটাই হল ঐ সম্প্রদায়ের উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যে মনে করে অমান্য করে।

কাফের মুশরিকরা চিরকালের জন্য জাহান্নামী। অনন্তকাল তাদের আল্লাহ আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেবেন যা কোনদিন শেষ হবে না। তারা পুরো জীবন ভাল কাজ করলেও এর বিনিময়ে কিছুই পাবেনা, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

৫৯৮ তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, সপ্তম খণ্ড [৩০তম পারা]

এখানে কুফর অর্থ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর শেষ নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। আল্লাহর সৃষ্টিতে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কোনো সৃষ্টি নেই। এমনকি জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষাও তারা নিকৃষ্ট।

সুরা আনফাল ঃ আয়াত ৩৯, ৪০

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

❒ এবং তোমরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিত্‌না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহের দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তাহারা বিরত হয় তবে তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

ফেত্‌না অর্থ বিশৃংখলা। আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বিশৃংখলা হচ্ছে শিরিক

তাফসীরে মাযহারী/১১৭

হাদিসসমূহ

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) ১৬০৫। সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) হাদিস নং ৪৮৩২, ২৭৮৭।

পরিচ্ছদঃ **মুশরিকদের সাথে বসবাস করা নিষেধ**।

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না, তাদের সংসর্গেও যেও না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে।”

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

মুশরিকদের এলাকায় অবস্থান সম্পর্কে

২৭৮৭। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **কেউ কোনো মুশরিকের সহচর্যে থাকলে এবং তাদের সাথে বসবাস করলে সে তাদেরই মতো।**

তিরমিজী (তাহকীককৃত)

১৬০৫। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস করো না, তাদের সংসর্গেও যেও না**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

৫০১৮। নবী সা বলেছেন, **মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না** এবং **তোমার খাদ্য আল্লাহভীরু লোক ছাড়া যেন অন্য কেউ না খায়**। আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) ৪৮৩২

তাফসীর ইবনে কাসির

২৮। মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে; এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে

٢٨- لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন না করে এবং তাদের পরস্পরের

যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা গোপনীয়ভাবে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে যোগাযোগ ও ভালবাসা স্থাপন করে থাকে এবং অজুহাত পেশ করে বলে–এরা যদি মুসলমানদের উপর জয়যুক্ত হয়ে যায় তবে না জানি আমরা বিপদে পড়ে যাই। এ জন্যই তাদের সাথে মিল রাখছি। কারও মন চটিয়ে আমাদের লাভ কি? আল্লাহ পাক বলেন–খুব সম্ভব, আল্লাহ মুসলমানদেরকে স্পষ্ট বিজয় দান করবেন। মক্কাও তাদের হাতে বিজিত হবে এবং শাসনকর্তা তারাই হবে। আল্লাহ তাদেরই পায়ের নীচে হুকুমত নিক্ষেপ করবেন অথবা ইয়াহূদী নাসারাদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করতঃ তাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করার নির্দেশ তিনি মুসলমানদেরকে প্রদান করবেন। সুতরাং আজ যেসব মুনাফিক গোপনীয়ভাবে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে এবং নেচে কুদে বেড়াচ্ছে, সেদিন এ চালাকির জন্যে তাদেরকে রক্তাশ্রু বহাতে হবে। তাদের পর্দা উহুদ যুদ্ধের পর একটি লোক বলে– "আমি এ ইয়াহূদীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি, যাতে সুযোগ আসলে আমি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারি।" অপর একটি লোক বললোঃ "আমি অমুক খ্রীষ্টানের নিকট গমনাগমন করে থাকি এবং তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে আমি তাকে সাহায্য করবো।" তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, লুবাবাহ ইবনে মুনযিরের ব্যাপারে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যখন নবী (সঃ) তাঁকে বানূ কুরাইযার নিকট প্রেরণ করেন তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন? তখন তিনি স্বীয় গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করেন অর্থাৎ তিনি ইঙ্গিতে বলেনঃ "তিনি তোমাদের সকলকে হত্যা করবেন।"

হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ বহু ইয়াহূদীর সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু তাদের সবারই বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দিলাম।

অতঃপর আল্লাহ পাক ঐ লোকদেরকে অনুমতি দেন যারা কোন শহরে কোন সময় অবিশ্বাসীদের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে মৌখিক তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখে কিন্তু তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখে না। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবু দ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ 'কোন কোন গোত্রের সাথে আমরা প্রশস্ত বদনে মিলিত হই, কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'শুধু মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে হবে কিন্তু কাজে-কর্মে এরূপ অবস্থাতেও কখনও তাদের সহযোগিতা করতে হবে না'। এ উক্তিটিই অন্যান্য ব্যাখ্যাকারী হতেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলার নিম্নের ঘোষণাটিতেও এ উক্তিরই

'তোমরা মুশরিকদের গ্রামের পার্শ্বে থেকো না, তাদের প্রতিবেশী হয়ো না এবং তাদের শহর হতে হিজরত কর।' যেমন সুনান-ই-আবূ দাউদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যকার যুদ্ধ কি তোমরা দেখ না?' অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যারা মুশরিকদের সাথে মেলামেশা করে, তাদের সাথে বসবাস করে, তারা তাদের মতই।'

↥

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মুমিনদেরকে নিষেধ করছেন, যদিও তারা তাদের মাতা, পিতা, ভাই, বোন প্রভৃতি হোক না কেন, যদি তারা ইসলামের উপর কুফরীকে পছন্দ করে নেয়। অন্য আয়াতে রয়েছে- لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ........ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ অর্থাৎ "(হে নবী!) যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে তুমি পাবে না যে, তারা বন্ধুত্ব রাখবে এমন লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে শত্রুতা রাখে, যদিও তারা তাদের পিতা হয় বা ছেলে হয় অথবা ভাই হয় কিংবা স্বগোত্রীয় হয়। এরা

ইমাম বায়হাকী (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আবু উবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ (রাঃ)-এর পিতা তাঁর সামনে এসে মূর্তির প্রশংসা করতে শুরু করে দেয়। তিনি তাকে বারবার বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বেড়েই চলে। তখন পিতা-পুত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবু উবাইদাহ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করে দেন। তখন আল্লাহ তা'আলা لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয়

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ) যখন পিতার সাথে মিলিত হবেন তখন দেখবেন যে, সে অত্যন্ত ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। তিনি তার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যাবেন। ঐ সময় তাঁর পিতা তাঁকে বলবেঃ "হে ইবরাহীম (আঃ)! (দুনিয়ায়) আমি তোমার কথা মানিনি। কিন্তু আজ আমি তোমার কোন কথাই অমান্য করবো না।" তখন ইবরাহীম (আঃ) বলবেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমার সাথে ওয়াদা করেননি যে, কিয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করবেন না? তাহলে আজকের দিন এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে (যে, আমার পিতা অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে)?" তখন তাঁকে বলা হবেঃ "তোমার পিছন দিকে তাকাও।" তিনি তখন দেখতে পাবেন যে, একটি অর্ধমৃত জানোয়ার পড়ে রয়েছে এবং একটি বেজীর আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। ওর পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জানমাল কেড়ে নেয়ার ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মগ্রহণে বাধ্য করত নবী

২৫ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সা আল্লাহর রাসূল, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়। **তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার হতে নিরাপত্তা লাভ করলো।**

১৩৯৯ রাসূল সা বলেছেনঃ **কালেমা বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার** নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে, **যে কেউ তা বললো, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিলো**।

২৯৪৬ রাসূল সা বলেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, **যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে** আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে সে তার জান ও মাল **আমার হাত থেকে বাঁচিয়ে নিল**।

সুনানে ইবনে মাজাহ

৩৯২৯। আওস (রাঃ) বলেন, আমরা নবী সা এর নিকট বসে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে অতীতের ঘটনাবলী উল্লেখপূর্বক উপদেশ দিচ্ছিলেন। এসময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁর সাথে একান্তে কিছু বললো। **নবী সা বললেনঃ তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করো। লোকটি ফিরে গেলে রাসূলুল্লাহ সা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই"? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ যাও, তোমরা তাকে তার পথে ছেড়ে দাও। কারণ লোকেরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" না বলা পর্যন্ত আমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা তাই করলে তাদের জান-মালে হস্তক্ষেপ আমার জন্য হারাম হয়ে গেলো।**

↥

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত),

পরিচ্ছেদঃ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ “লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত **তাদের** বিরুদ্ধে **কিতাল করতে আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি।** ২৬০৭। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **মানুষ যে পর্যন্ত না “আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই” এই কথার স্বীকৃতি দিবে** সেই পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। **আর যে ব্যক্তি বললো,** “আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই” **সে আমার থেকে তার মাল ও রক্ত(জীবন) নিরাপদ করে নিল**।

রাতের আধারে অতর্কিত আক্রমণ করত নবী ও সাহাবীরা, যাতে অন্য ধর্মের নারী ও তাদের নিষ্পাপ শিশু নিহত হত। নবী এটাকে কোনো খারাপ কাজ মনে করতেন না বরং পরিষ্কারভাবে অনুমোদন দিয়েছেন

৩০১২ নবী সা কে জিজ্ঞেস করা হল, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুরা অনিচ্ছাবসত নিহত হয়, তবে কী হবে? রাসূল সা বলেন- **তারাও মুশরিকদেরই অন্তর্ভুক্ত**।

তিনি আরো বলেন, **সংরক্ষিত চারণভূমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না**।

সহীহ মুসলিম (হাদিস একাডেমী)

পরিচ্ছদঃ রাতের আকস্মিক হামলায় অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশু হত্যায় দোষ নেই

৪৪৪২। সা’ব ইবনু জাসসামা (রাযি) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সা কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! **আমরা রাতের অন্ধকারে আকস্মিক হামলায় মুশরিকদের শিশুদের উপরও আঘাত করে ফেলি। রসূলুল্লাহ সা বললেন, তারাও মুশরিক যোদ্ধাদের মধ্যে গণ্য**।

সহীহ মুসলিম (ইফা)

পরিচ্ছদঃ রাতের অতর্কিত আক্রমনে অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশু হত্যায় দোষ নেই

৪৩৯৯। রাসুলুল্লাহ সা কে মুশরিকদের নারী ও শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, **যখন রাতের আধারে অতর্কিত আক্রমণ করা হয়, তখন মুশরিকদের নারী ও শিশুরাও আক্রান্ত হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সা বললেনঃ তারাও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত**।

সহীহ মুসলিম শরীফ- ১৭তম খণ্ড ৩১

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

معهم قال نعم (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমরা কি তাহাদের সহিত তাহাদেরকে হত্যা করিতে পারিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ।) ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, জিজ্ঞাসাকারী স্বয়ং রাবী সা'ব (রাযি.)। -(তাকমিলা ৩:৩৯)

عَنِ الذَّرَارِيِّ (শিশুসন্তানদের সম্পর্কে)। الذَّرَارِيِّ শব্দটির ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে الذرية (সন্তান-সন্ততি)-এর বহুবচন। ইহা نسل الانسان (মানুষের বংশধর) অর্থে ব্যবহৃত, নর হউক বা নারী। -(মাজমাউল বিহার)-(তাকমিলা ৩:৩৯)

يُبَيَّتُوْنَ শব্দটির দ্বিতীয় ى বর্ণে তাশদীদসহ التبييت হইতে مجهول এর সীগা। ইহা হইল রাত্রিতে আক্রমণ করা। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, রাত্রিতে আক্রমণের সময় পুরুষদের হইতে নারী ও শিশুদের পার্থক্য করা জটিল। এমতাবস্থায় যদি অনিচ্ছাকৃত নারী ও শিশু হত্যা হইয়া যায় তবে ইহা জায়িয কি না? -(ঐ)

هُمْ مِنْهُمْ (তাহারাও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত)। অর্থাৎ তখন নারী ও শিশু হত্যা হওয়াতে কোন দোষ নাই। তবে ইহা দ্বারা এই মর্ম নহে যে, মুশরিক যোদ্ধাদের সহিত তাহাদের নিরস্ত্র নারী ও শিশুদের সেচ্ছায় হত্যা করা মুবাহ; বরং ইহার মর্ম হইতেছে যে, শিশুদের হত্যা না করিয়া যদি তাহাদের পিতার কাছে পৌছা সম্ভব না হয় এবং তাহাদের সহিত তাহাদের সংমিশ্রণ থাকে তবে তাহাদেরকেও হত্যা করা জায়িয। -(ফতহুল বারী)

অতঃপর জমহুরে উলামার মতে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম হওয়া শর্তের সহিত শর্তায়িত। অর্থাৎ তাহারা যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলে তাহাদের হত্যা করাতে কোন দোষ নাই। -(তাকমিলা ৩:৩৯-৪০)

(৪৪২৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ "هُمْ مِنْهُمْ".

(৪৪২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... সা'ব বিন জাছ্‌ছামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রাত্রির অন্ধকারে হামলায় মুশরিকদের শিশুসন্তানদের উপরও আঘাত করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারাও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।

٤٧٨٥۔ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْطَاَتْ خَيْلُنَا اَوْلاَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ۔

৪৭৮৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী মুশরিকদের শিশুদের পদদলিত করে বসেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তারা তাদের পিতা-পিতামহদেরই শামিল।

٤٧٨٦۔ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِى رَبِيْعَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلدَّارُ مِنْ دُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ نَفْتَحُهَا فِى الْغَارَةِ فَنُصِيْبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُوْنِ الْخَيْلِ وَلاَ نَشْعُرُ فَقَالَ اِنَّهُمْ مِنْهُمْ۔

৪৭৮৬. আবূ উমাইয়া (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সা'ব ইব্‌ন জাছ্‌ছামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা অতর্কিত আক্রমণ করে মুশ্‌রিকদের কোন গৃহের উপর বিজয় লাভ করি এবং তাদের শিশুরা আমাদের ঘোড়ার পায়ের নিচে পদদলিত হয়, অথচ আমাদের (এ ব্যাপারে) খবরই থাকে না। তিনি বললেন, তারা তাদের মধ্যে শামিল।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ থেকে নিষেধ করেন নাই এবং তাতে তাদের শিশু ও নারীদের পর্যন্তও পৌছাত

২৫৪১ রাসূলুল্লাহ (সা) **বনী মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিতভাবে অভিযান পরিচালনা করেন**। **তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিল**। **রাসুলুল্লাহ সা তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম তাদের হত্যা করেন এবং নাবালক ও নারীদের বন্দী করেন**।

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)

পরিচ্ছদঃ যে সকল **বিধর্মীর** কাছে **ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে আক্রমন পরিচালনা বৈধ**।

৪৩৭০। ইয়াহইয়া (র.) বলেন, আমি নাফি (র.) কে এই কথা জানতে চেয়ে পত্র লিখলাম যে, যুদ্ধের পূর্বে বিধর্মীদের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া প্রয়োজন কি না? তখন তিনি আমাকে লিখলেন যে, এ নিয়ম ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। রাসুলুল্লাহ সা বনূ মুসতালিক **গোত্রের উপর আক্রমণ করলেন এমন অবস্থায় যে, তারা অপ্রস্তুত ছিল (তারা জানতে পারেনি)**। তাদের পশুদের পানি পান করানো হচ্ছিল। তখন **তিনি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করলেন** এবং অবশিষ্টদের (নারী ও শিশুদের) বন্দী করলেন। **আর তারা সেই দিনেই তাঁর হস্তগত হয়েছিল**।

সহীহ মুসলিম (ইফা)

পরিচ্ছদঃ **অমুসলিম দেশে** কোন গোত্রে আযানের ধ্বনি শোনা গেলে সেই গোত্রের উপর হামলা করা থেকে বিরত থাকা।

৭৩৩। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা ভোরে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতেন। আযান শোনার অপেক্ষা করতেন। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন। আযান শুনতে না পেলে আক্রমণ করতেন।

তিরমিজী (তাহকিককৃত)

পরিচ্ছদঃ **অগ্নিসংযোগ ও (বাড়িঘর) ধ্বংস সাধন**।

১৫৫২। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, **কাফের বনু নাযীর গোত্রের খেজুর বাগানে** রাসূলুল্লাহ সা **অগ্নিসংযোগ করেন এবং গাছগুলো কেটে ফেলেন**। তখন আল্লাহ এই বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন- "তোমরা যেসব খেজুরের গাছ কেটেছ বা এদের কাণ্ডের উপর যেগুলোকে স্বঅবস্থায় দাড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা সবই আল্লাহর অনুমতিক্রমেই করেছ, যাতে তিনি ফাসিকদের লাঞ্ছিত করতে পারেন"(সূরাঃ হাশর-৫)।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)৬৯১৫, ইবনে মাজাহ

পরিচ্ছদঃ কাফের ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না, কাফেরের বদলে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।

২৬৫৮। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **কোন অমুসলিমকে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না**।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), রক্তমূল্য(দিয়াত), পরিচ্ছেদঃ কাফির হত্যার দায়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবে কি না?

৪৫৩০। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **সাবধান! কোনো মুমিনকে কোনো কাফির হত্যার অপরাধে- হত্যা করা যাবে না।**

ফিক্হে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৫৫

[খ.১] মুসলিম কর্তৃক কোনো অমুসলিমের ক্ষতি সাধন : কোনো মুসলমানের হাতে যদি কোনো অমুসলিম (সে যিম্মি হোক কিংবা না হোক) নিহত হয়, সে জন্য মুসলিম থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে দিয়াত গ্রহণ করতে হবে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) কোনো মুশরিককে হত্যা করার কারণে কোনো মুসলমান থেকে কিসাস গ্রহণ করতেন না। তার সময়ে একজন মুসলমান এক যিম্মীকে ইচ্ছে করে হত্যা করেন। সে জন্য তিনি কিসাস গ্রহণ করেননি বরং দিয়াতু মুগাল্লাযা (অর্থাৎ পুরো দিয়াত) প্রদানের নির্দেশ দেন।[৯] যদি কোনো মুসলমান

অমুসলিমের জীবনের মূল্য ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কম। অমুসলিমদের হত্যার জন্য কোন মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। তাহলে অমুসলিম হত্যার জন্য কী শাস্তি দেয়া হবে? ইসলামের বিধান অনুসারে, অমুসলিম হত্যার জন্য রক্তপণ বা দিয়াত দিতে হবে এবং তবে তা হবে- মুসলিমের অর্ধেক দাম।

সুনানে ইবনে মাজাহ, রক্তপণ, পরিচ্ছেদঃ কাফের-এর দিয়াত

২৬৪৪। রাসূলুল্লাহ সা ফয়সালা দেন যে, **ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দিয়াত হবে মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক**।

আবু দাউদ (ইফা), রক্তপণ/রক্তমূল্য, পরিচ্ছেদঃ যিম্মীর দিয়াত সম্পর্কে।

৪৫১৪। নবী সা বলেছেনঃ **যিম্মীর দিয়াত হলো স্বাধীন ব্যক্তির দিয়াতের অর্ধেক**।

তিরমিজী (তাহকীককৃত)

১৬০২,১৬০৮। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **তোমরা রাস্তায় চলাচলের সময় ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের কারো সাথে দেখা হলে তাকে রাস্তার কিনারায় ঠেলে দিও**।

হাদীসটির তাৎপর্য হলো, মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ হল এদের(ইয়াহূদী খৃষ্টানদের)কে লাঞ্ছিত করার। এমনিভাবে পথে এদের কারো পাওয়া গেলে তার জন্য পথ ছাড়া হবে না কেননা, এতে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

২৯২৫ রাসূল সা বলেছেন, তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাহলে **পাথরও বলবে**, ‘হে আল্লাহর বান্দা, **আমার পেছনে ইয়াহূদী আছে, তাকে হত্যা কর**।’

রিয়াযুস স্বা-লিহীন (তাওহীদ)

১৮২৯। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, **”কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে। এমনকি ইহুদী পাথর ও গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলে পাথর ও গাছ বলবে ’হে মুসলিম! আমার পিছনে ইহুদী রয়েছে। এসো, ওকে হত্যা কর।’ কিন্তু গারক্বাদ গাছ এরূপ বলবে না। কেননা এটা ইহুদীদের গাছ**।’’

৪৩৭ রাসূল সাঃ বলেনঃ আল্লাহ ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

৩৮৭৩ নবী সা বলেন, খ্রিষ্টানদের কোন নেক্কার লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মাসজিদ তৈরি করত এবং এসব ছবি অঙ্কিত করে রাখত, **এরাই** কিয়ামতের দিনে **আল্লাহর সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হবে**।

৪০৭০ রাসূলুল্লাহ সা সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ, সুহায়ল ইবনু আমর এবং হারিস ইবনু হিশামের জন্য বদ দুআ করতেন।

২৮০১ আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে আল্লাহর রাসূল সা ক্রমাগত চল্লিশ দিন যাকওয়ান, বানূ উসাইয়্যা গোত্রের বিরুদ্ধে দুআ করেন।

৮০৪ রাসূল সা বললেনঃ হে আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও কঠোর করুন, ইউসুফ (আ.)-এর যুগে যেমন খাদ্য সংকট ছিল তাদের জন্যও তেমন খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে দিন। আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী মুদার গোত্রের লোকেরা নবী সা এর বিরোধী ছিল।

৬২০০, ১০০৬ নবী সা সালাতের রুকু থেকে মাথা তুলে দুআ করলেনঃ হে আল্লাহ্! মুযার গোত্রের উপর তোমার শাস্তি কঠোর করে দাও। **ইউসুফ আ. এর সময়ের দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত এদের উপরেও কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দাও।**

৪৬৯৩ আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন- **যখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ্ সা-এর ইসলামের দাওয়াত অস্বীকার করল, তখন তিনি আল্লাহর নিকটে আরয করলেন, হে আল্লাহ্! যেমনিভাবে আপনি ইউসুফ (আ.)-এর সময় সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে ওদের ওপর দুর্ভিক্ষ দিন।**

৪৫৬০ আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ সা কয়েকটি গোত্রের ব্যাপারে ফজরের নামাযে বলতেন, হে আল্লাহ! অমুক এবং অমুককে অভিশাপ দিন।

অন্যান্য ধর্মালম্বীদের তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতেন নবী, হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতেন নবী

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) ১৬০৭। সহীহ মুসলিম (হাদিস একাডেমি)
4486। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **নিশ্চয়ই আমি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে আরব উপ-দ্বীপ থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করব (বিতাড়িত করব)**। পরিশেষে **মুসলমান ব্যতীত অন্য কাউকে** এখানে **বসবাস করতে দেবো না**।

৬৯৪৪ আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন, একবার আমরা মসজিদে ছিলাম। হঠাৎ **রাসূলুল্লাহ্ সা বেরিয়ে এসে আমাদের বললেনঃ তোমরা ইয়াহূদীদের কাছে চল। আমি তাঁর সঙ্গে বের হয়ে গেলাম এবং তাদের শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন নবী সা দাঁড়িয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা মুসলিম হয়ে যাও, নিরাপদ থাকবে। এটাই আমি চাই। তোমরা জেনে রেখো, যমীন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে দেশান্তর করতে মনস্থ করেছি। তাই তোমাদের যার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, তা যেন সে বিক্রি করে ফেলে। তা না হলে জেনে রেখো, যমীন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।**

৩১৬৭ রাসূল সা একদা মসজিদ থেকে বের হলেন এবং বললেন, তোমরা ইয়াহূদীদের কাছে চল। আমরা চললাম এবং তাদের পাঠকেন্দ্রে পৌঁছলাম। রাসূল সা তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে নিরাপত্তা পাবে। **আর তা না হলে জেনে রাখ, পৃথিবী আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের। আমি ইচ্ছা করেছি, আমি তোমাদের এ দেশ হতে নির্বাসিত করব।**

সহীহ বুখারী (ইফা)২৮৩৮। **রাসূলুল্লাহ সা এর মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করেন- মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত কর**।

২৩৩৮ উমার (রা.)- **ইয়াহূদী ও নাসারাদের হিজায হতে নির্বাসিত করেন।** রাসূল সা যখন খায়বার জয় করেন, তখন ইয়াহূদীদের সেখান হতে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। কেননা যখন তিনি কোন স্থান জয় করেন, তখন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের জন্য হয়ে যায়। কাজেই ইয়াহূদীদের সেখান হতে বহিষ্কার করে দিতে চাইলেন। তখন ইয়াহূদীরা রাসূল সা এর কাছে অনুরোধ করল, যেন তাদের সে স্থানে বহাল রাখা হয় এ শর্তে যে, তারা সেখানে চাষাবাদ করবে আর ফসলের অর্ধেক তাদের থাকবে। রাসূল সা তাদের বললেন, আমরা এ শর্তে তোমাদের এখানে বহাল থাকতে দিব আমাদের যতদিন ইচ্ছা। কাজেই তারা সেখানে বহাল রইল। অবশেষে উমার (রা.) তাদেরকে নির্বাসিত করে দেন।

সহীহ বুখারী (ইফা)
পরিচ্ছেদঃ খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছ কেটে ফেলা।
২১৭৫। **নবী সা বনূ নাযির গোত্রের** বুওয়াইরা নামক স্থানে অবস্থিত বাগানটির **খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং বৃক্ষ কেটে ফেলেছেন।** এ সম্পর্কে হাসান (রা) (তাঁর রচিত কবিতায়) বলেছেন, বুওয়াইরা নামক স্থানে অবস্থিত বাগানটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

৪০৩১ রাসূলুল্লাহ্ সা বনু নাযীর গোত্রের যে খেজুর গাছ ছিল তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু কেটে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়ঃ "তোমরা যে খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কান্ডের উপর ঠিক রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে"(৫৯/৫)।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)
জিহাদ ও সফর
পরিচ্ছেদঃ **কাফিরদের গাছ-পালা কাটা ও জ্বালিয়ে দেয়া বৈধ**
৪৪৪৪। আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সা নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিলেন এবং কেটে দিলেন।

৩৯১১ নবী সা ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে তার কাছে উপস্থিত হল। তিনি বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে আমি সত্য রাসূল, সত্য নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছি। সুতরাং তোমার ইসলাম গ্রহণ কর।
তারা উত্তর দিল, আমরা এসব জানিনা। তারা তিনবার একথা বলল।
৩৯৪১ নবী সা বলেন- তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহূদী ঈমান আনত তবে গোটা ইয়াহূদী সম্প্রদায়ই ঈমান আনত।

৪১১০ খন্দকের যুদ্ধের দিন কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী মদিনা ছেড়ে যেতে বাধ্য হলে **নবী সা বলেন, এখন থেকে আমরাই তাদেরকে আক্রমণ করব। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। আর আমরা তাদের এলাকায় গিয়ে আক্রমণ চালাব**।

Thousands of Bangladeshi Muslims Burn over 10 Buddhist Temples in Ramu (Aljazeera; September 30, 2012)

৩০২০ জারীর (রা.) বলেন- আমাকে আল্লাহর রাসূল সা বললেন, তুমি আমাকে যুলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দাও। যুলখালাসায় **খাশআম গোত্রের একটি মূর্তিঘর ছিল। তখন আমি দেড়শ অশ্বারোহীকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা করলাম। অতঃপর জারীর (রাঃ) সেখানে যান এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জ্বালিয়ে দেন**। অতঃপর রাসূল সাসে সংবাদ শুনে সে অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দুআ করেন।

ইফা ৩৫৪৯, তাওহীদ ৪৩৫৫ জারীর (রা.) বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে (খাসআম গোত্রের একটি প্রতীমা রক্ষিত মন্দির) যুল-খালাসা নামে একটি ঘর ছিল। যাকে কাবায়ে ইয়ামানী ও কাবায়ে শামী বলা হত।। নবী সা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসা থেকে আমাকে শান্তি দিতে পার? এ কথা শুনে আমি আহমাস গোত্রের ১৫০ জন অশ্বারোহী নিয়ে ছুটে চললাম। **আমরা (প্রতীমা ঘরটি) বিধ্বস্ত করে দিলাম** এবং **সেখানে যাদেরকে পেলাম তাদের হত্যা করে ফেললাম**। তারপর নবী সা এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ **জানালাম। রাসুলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত খুশী হয়ে আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দু'আ করলেন**।

সহীহ বুখারী (ইফা)

৪০১৮। জারীর (রাঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সা বললেন, তুমি কি আমাকে যুল-খালাসার পেরেশানী থেকে স্বস্তি দেবেনা? আমি বললাম: অবশ্যই। এরপর আমি আমাদের আহমাস গোত্র থেকে একশত পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম। তাদের সবাই ছিলো অশ্ব পরিচালনায় অভিজ্ঞ। **যুল-খালাসা ছিলো ইয়ামানের অন্তর্গত খাসআম ও বাজীলা গোত্রের একটি তীর্থ ঘর। সেখানে কতগুলো মূর্তি স্থাপিত ছিলো। লোকেরা এগুলোর পূজা করত এবং এ ঘরটিকে বলা হতো কা'বা**। রাবী(বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর তিনি সেখানে গেলেন এবং ঘরটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন আর এর **ভিটামাটিও চুরমার করে দিলেন**। রাবী আরো বলেন, আর যখন জারীর (রাঃ) ইয়ামানে গিয়ে উঠলেন তখন সেখানে এক লোক থাকত, সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্নয় করত, একদা সে ভাগ্য নির্নয়ের কাজে লিপ্ত ছিল, সেই মূহুর্তে জারীর (রাঃ) সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, **তীরগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই- এ কথার সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব**। লোকটি তখন তীরগুলো ভেঙ্গে ফেলল এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এ কথার সাক্ষ্য দিল। এরপর জারীর (রা), এক ব্যক্তির মাধ্যমে খবর পাঠালেন-**"ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরটিকে ঠিক খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত উটের মতো কালো করে রেখে আমি এসেছি**। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সা আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকদের সার্বিক কল্যাণ ও বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬৫৭

খাছআম গোত্রের ইবাদতখানা ভাংগার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারা এটাকে ইয়ামানী কা'বা বলতো এবং মক্কার কা'বা গৃহের শাখা মনে করতো। তারা মক্কার কা'বাকে আল-কা'বাতুল শামিয়া (সিরিয়ার কা'বা) এবং তাদের ওটাকে আল-কা'বাতুল ইয়ামানিয়া (ইয়ামানী কা'বা) বলতো। ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইউসুফ ইব্ন মূসা - - - - জারীর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, "তুমি কি আমাকে যুল-খালাসার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করবে না"? আমি বললাম "জ্বী, হ্যাঁ"। তখন আমি আহমাস গোত্রের একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ছুটে চললাম। এরা সবাই ছিল ঘোড়-সাওয়ারে পারদর্শী। কিন্তু আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমার এ বিষয়টি ব্যক্ত করলে তিনি তাঁর মুবারক হাত দ্বারা আমার বুকে একটি মৃদু আঘাত করলেন। আমি আমার বুকে তার হাতের স্পর্শের প্রভাব অনুভব করলাম। আঘাতের সাথে তিনি দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! তাকে স্থির হয়ে থাকতে দিন এবং তাকে হিদায়াত লাভকারী ও হিদায়াত দানকারী হিসেবে কবূল করুন"। জারীর (রা) বলেন, এরপর আর কখনও আমি ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যাইনি। তিনি বলেন, যুল-খালাসা ছিল ইয়ামানের অন্তর্গত খাছআম ও বুজায়লা গোত্রের ইবাদত গৃহ। সেখানে কিছু মূর্তি স্থাপিত ছিল। লোকেরা এর পূজা করতো। এ ঘরটিকে বলা হতো ইয়ামানী কা'বা। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সেখানে এসে ঘরটিকে ভেংগে দিলেন এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী আরও বলেন, জারীর (রা) যখন ইয়ামানে পৌছেন তখন সেখানে এক ব্যক্তি থাকতো এবং সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য গণনা করতো। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত এখানে আছেন, তোমাকে ধরতে পারলে গর্দান উড়িয়ে দিবেন। একদিন সে তীর দিয়ে ভাগ্য গণনা কাজে রত ছিল। এমন সময় জারীর (রা) সেখানে উপস্থিত হন। তিনি তাকে বললেন, "তীরগুলো ভেংগে ফেলো ও আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এ কথার সাক্ষ্য দাও ; অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব"। লোকটি তখন তীরগুলো ভেংগে ফেললো এবং এক আল্লাহ্র সাক্ষ্য দিল। এরপর জারীর (রা) আহমাস গোত্রের আরতাত নামক এক ব্যক্তিকে এ সংবাদ জানাবার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। লোকটি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে

বিভিন্ন অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ (السرايا والبعوث) : (১) মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজকর্ম সুসম্পন্ন করার পর যখন তিনি কিছুটা অবকাশ লাভ করলেন তখন ৮ম হিজরীর ২৫ রমযান উয্যা নামক দেব মূর্তি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। উয্যা মূর্তির মন্দিরটি ছিল নাখলা নামক স্থানে। এটি ভেঙ্গে ফেলে খালিদ (রাঃ) প্রত্যাবর্তন করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, (هل رأيت شيئا؟) 'তুমি কি কিছু দেখেছিলে?' খালিদ (রাঃ) বললেন, 'না' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করলেন, (فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها) 'তাহলে প্রকৃতপক্ষে তুমি তা ভাঙ্গ নি। পুনরায় যাও এবং তা ভেঙ্গে দাও।' উত্তেজিত খালিদ (রাঃ) কোষমুক্ত তরবারি হস্তে পনুরায় সেখানে গমন করলেন। এবারে বিক্ষিপ্ত ও বিস্রস্ত চুলবিশিষ্ট এক মহিলা তাঁদের দিকে বের হয়ে এল। মন্দির প্রহরী তাকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। কিন্তু এমন সময় খালিদ (রাঃ) তরবারি দ্বারা তাকে এতই জোরে আঘাত করলেন যে, তার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনি এ সংবাদ অবগত করালে তিনি বললেন, (نعم، تلك العزى، وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا) 'হ্যাঁ', সেটাই ছিল ওয্যা। এখন তোমাদের দেশে তার পূজা অর্চনার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে পড়েছে (অর্থাৎ কোন দিন তার আর পূজা অর্চনা হবে না)।

২. এরপর নাবী করীম (ﷺ) সে মাসেই আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)-কে 'সোয়া' নামক বেদমূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন। এ মূর্তিটি ছিল মক্কা হতে তিন মাইল দূরত্বে 'রেহতা' নমাক স্থানে বনু হোযাইল তখন প্রহরী একটি দেবমূর্তি। আমর যখন সেখানে গিয়ে পৌছেন তখন প্রহরী জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি চাও?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর নাবী (ﷺ) এ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।'

অতঃপর মূর্তিটির নিকট গিয়ে তিনি তা ভেঙ্গে ফেললেন এবং সঙ্গীসাথীদের নির্দেশ প্রদান করলেন ধন ভাণ্ডার গৃহটি ভেঙ্গে ফেলতে। কিন্তু ধন-ভাণ্ডার থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি প্রহরীকে বললেন, 'বল,

৩. এ মাসেই সা'দ বিন যায়েদ আশহলী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে বিশ জন ঘোড়সওয়ারী সৈন্য প্রেরণ করেন মানাত দেবমূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। কোদাইদের নিকট মোশাল্লাল নামক স্থানে আওস, খাযরাজ, গাসসান এবং অন্যান্য গোত্রের উপাস্য ছিল এ 'মানত' মূর্তি। সা'দ (রাঃ)-এর বাহিনী যখন সেখানে গিয়ে পৌছেন তখন মন্দিরের প্রহরী বলল, 'তোমরা কি চাও?'

তাঁরা বললেন, 'মানাত বেদমূর্তি ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি।'

সে বলল, 'তোমরা জান এবং তোমাদের কার্য জানে।'

সা'দ মানাত মূর্তির দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে একজন উলঙ্গ কালো ও বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেলেন। সে আপন বক্ষদেশ চাপড়াতে চাপড়াতে হায়! রব উচ্চারণ করছিল।

প্রহরী তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মানত! তুমি এ অবাধ্যদের ধ্বংস কর।'

কিন্তু এমন সময় সা'দ তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর মূর্তিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিলেন। ধন-ভাণ্ডারে ধন-দৌলত কিছুই পাওয়া যায় নি।

বনু আল-নাদিরের সঞ্চিত ধনরত্নের হেফাজত ছিল কিনানা ইবনে আল-রাবির ওপর। তাকে রাসুলের (সা.) কাছে আনা হলে সে তা অস্বীকার করল, ওগুলো কোথায় আছে সে জানে না। একজন ইহুদি রাসুলের (সা.) কাছে এসে জানাল [তাবারির ভাষ্য: তাকে আনা হয়েছিল], সে কিনানাকে ধ্বংসাবশেষের একটি নির্দিষ্ট স্থানে রোজ সকালে যেতে দেখেছে। রাসুল (সা.) কিনানাকে বললেন, 'আমরা যদি প্রমাণ পাই তোমার কাছে সব ধনসম্পদ আছে, তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে, সেটা তুমি জানো?'

সে বলল, সে তা জানে।

রাসুল (সা.) হুকুম দিলেন, ধ্বংসাবশেষ খোদাই করে ধনরত্ন পেতে হবে। কিছু সম্পদ পাওয়া গেল। বাকি ধনরত্ন কোথায় রাসুল (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলে সে তা বলতে অস্বীকার করল। রাসুল (সা.) আল-জুবায়ের ইবনে আল-আওয়ামকে হুকুম দিলেন, 'ওর কাছে যা আছে বের করে না দেওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি দাও।'

জুবায়ের তার বুকের ওপর চকমকি পাথর আর ইস্পাত রেখে তার ওপর অগ্নিসংযোগ করলেন। এই অবস্থায় তার শেষ দশা উপস্থিত হলো। তারপর রাসুল (সা.) তাকে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার হাতে তুলে দিলেন। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তার শিরশ্ছেদ করে ভ্রাতহত্যার প্রতিশোধ নিল।

৫৫৬ ● সিরাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)

↥

এই সব শর্তে খাইবারের লোকজন আত্মসমর্পণ করে রাসুলের (সা.) কাছে অনুরোধ জানাল, তাদের জমিতে কাজ করতে দিলে অর্ধেক ফসল তারা গ্রহণ করবে, বাকি অর্ধেক রাসুলকে (সা.) দেবে। তারা বলল, 'জমির ব্যাপারে আমরা আপনাদের চেয়ে বেশি জানি, আর কৃষক হিসেবে আমরা ভালো।' রাসুল (সা.) এই শর্তে রাজি হলেন, 'যখন তোমাদের বহিষ্কার করতে চাইব, তখনই তোমাদের বহিষ্কার করে দেব।' ফাদাকের লোকজনের সঙ্গেও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। সুতরাং খাইবার মুসলমানদের যুদ্ধার্জিত সম্পত্তিতে পরিণত হলো। আর ফাদাক হয়ে গেল রাসুলের (সা.) ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কারণ, তার বিরুদ্ধে কোনো ঘোড়া বা উটের সেখানে যেতে হয়নি।

সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

১০৪৯. আলী রা বলেছেন, নবী সা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তা হলো, **কোন প্রতিকৃতি বিধ্বংস করা ব্যতীত ছাড়বে না**।

Islamweb, Islamqa থেকে বাংলা অনুবাদ-

প্রশ্নঃ কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যে, ইব্রাহিম মুর্তি ভেঙে মানুষকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মুর্তির কোন শক্তি নেই। কোরআনের আরেক জায়গায় ইব্রাহিম প্রবর্তিত ধর্মকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এখন, হিন্দু দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের কি মুর্তি ভাঙা বাধ্যতামূলক? এতে কি ধর্মীয় ঘৃণা ছড়ানো এবং সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস হয়ে যাবে না? ইসলামিক দেশে হিন্দু মন্দির স্থাপন করা কি জায়েজ? ইসলামে প্রতিকৃতি ভাঙ্গা কি আবশ্যক; এমনকি সেটা যদি মানব ঐতিহ্য ও সভ্যতার ঐতিহ্য হয় তবুও?

উত্তরঃ ইসলামে মুর্তি ভাঙার নির্দেশনা বিষয়ে আমরা পাই,

আলী ইবনে আবু তালিব বললেন, নবী আমাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন,তোমাকেও সে কাজে পাঠাতে পারি কি-কোন মুর্তি আস্ত রাখবে না, যতক্ষন পর্যন্ত সেগুলো ধংসস্তুপ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই উচু ধ্বংসস্তুপ সমতল ভূমিতে পরিণত হয়।(মুসলিম)

আর ইব্রাহিম নবী যা করেছেন, তিনি সক্ষমতা অর্জনের পরেই কাজটা করেছিলেন। **মুর্তি ধ্বংসের কাজটা তখনই করতে হবে, যখন সেটার সামর্থ্য আপনার হবে**।

খারাপকে বদলাবার ব্যাপারে ইব্রাহিম নবীর দৃঢ় মনোভাব ছিল কারণ নিজ হাতে মুর্তি ভাঙার উদয়োগ তার দৃঢ় ইচ্ছার বিষয়টি নিশ্চিত করে। কিন্তু মুর্তি পূজারীদের উপস্থিতিতে তিনি সেটা করতে পারতেন না। কারণ, এর ফলে সেই প্রচেষ্টা ব্যার্থ হতে পারে। খারাপকে বদলাবার মানে হল, যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা ও নিজ হাতে ধ্বংস করা। সেটা তখনই সম্ভব, যখন আপনার সামর্থ্য হবে। সবশেষে, মুসলিম দেশে কোন অমুসলিম মন্দির স্থাপন কিংবা কোন মুসলিম দেশকে করতে দেয়া, মুসলমানের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব না। হযরত উমরের ইসলামিক শাসনের অধীনে অমুসলিমদের জিজিয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা দিয়ে শর্ত দিয়েছিলেন, আমরা আমাদের নগরে কোন ধর্মালয় তৈরী করতে দেব না”

আর মূর্তিগুলো না ভাঙ্গার পক্ষে এ কথা বলে কারণ দর্শানো যে, এ মূর্তিগুলো মানব ঐতিহ্য- এমন কথার প্রতি দৃষ্টিপাতের সুযোগ নাই। এগুলো ঐতিহ্য ঠিকই; কিন্তু হারাম ঐতিহ্য যা ধ্বংস করা ওয়াজিব। যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ এসে যায় তখন একজন মুমিন দেরী না করে সে নির্দেশ পালন করে। এ সমস্ত দুর্বল যুক্তি দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে না।

৫৯৪ তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, সপ্তম খণ্ড [৩০তম পারা]

سُورَةُ الْكٰفِرُونَ : সূরা আল-কাফিরূন

কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মূলা পেশকারী সূরা মনে করার কোনো প্রশ্নই হবে না। আর কুফর যেখানে যেরূপ অবস্থায়ই থাকুক না কেন মুসলমানদেরকে তা হতে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও বর্জনের ঘোষণা করতে হবে।

দীনের ব্যাপারে মুসলমানরা যে কাফেরদের সাথে কোনো প্রকার সন্ধি-সমঝোতার আচরণ গ্রহণ করতে পারে না। তা কোনো রূপ খাতির-উদারতা ও সংকোচ-কুণ্ঠা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে। আর আগুন ও পানির ন্যায় ইসলাম ও কুফরি দু'টি বিপরীতমুখি আদর্শ। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ প্রদত্ত একত্ববাদের ধর্ম, আর কুফরি মানব রচিত মানব মন গড়ানীতি, ইসলামের পরিপন্থি। মুসলমানদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। আর কাফেরদের উপাস্য তারা ধার্য করেছিল ৩৬০টি মূর্তিকে অতএব, মুসলমান ও অমুসলমানদের নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। -[আশরাফী]

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ বলার কারণ : অর্থাৎ তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার। এ আয়াতটির অর্থ অবলোকন করে অনেক লোক বিভ্রান্ত হয়। তারা বলে– তা দ্বারা ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছে।

↥

এ

আয়াত ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই কতিপয় তাফসীরকার বলেন- এ আয়াতের বিধান দ্বারা কাফেরদেরকে ইসলামের প্রথম যুগে ধর্ম পালনের যেটুকু অবকাশের কথা ভাবা যায়, তা জিহাদের বিধান দ্বারা রহিত করা হয়েছে। মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য লড়াইগুলোই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। বস্তুত দীনকে ধর্ম অর্থ গ্রহণ করলে আমরা এ কথাও বলতে পারি, এটা ঠিক অনুরূপ কথার ন্যায়, যেমন আমরা ধিক্কার ও ভর্ৎসনাভাবে বলে থাকি- তোমার পথে তুমি, আমার পথে আমি। এ কথা দ্বারা আমরা যেমন তার পথের স্বীকৃতি দেই না এবং সহাবস্থানেরও অবকাশ বুঝাই না; বরং তা দ্বারা পথের ভয়াবহ পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়। আয়াতেও অনুরূপভাবে 'তোমার দীন তোমার আমার দীন আমার' বলে তাদের জীবনাদর্শ ও শিরকি কর্মপন্থার ভয়াবহ পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের শিরকি জীবনাদর্শ ও মতবাদের স্বীকৃতি বা পাশাপাশি অবস্থানের কথা বলা হয়নি।

৬৮৭২ উসামাহ ইবনু যায়দ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা আমাদেরকে জুহাইনা কওমের বিরুদ্ধে পাঠালেন। আমরা ভোরে এ কওমের কাছে এলাম এবং তাদেরকে পরাস্ত করে ফেললাম। আমরা তাদের একজনকে ধাওয়া করে তার কাছে পৌঁছে গেলাম। আমরা যখন আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম তখন সে বলে উঠল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিনি বলেন, আনসারী ব্যক্তি তার থেকে বিরত হয়ে গেল। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে হত্যা করলাম।

আমরা যখন মদিনায় আসলাম, তখন নবী সা এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি বলেন, আমাকে তিনি বললেনঃ হে উসামাহ! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরও হত্যা করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আসলে হত্যা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। তিনি বললেনঃ আহা! তুমি কি তাকে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' বলার পরও হত্যা করলে ?

৪৩৩৯ নবী সা এক অভিযানে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রা)-কে বানী জাযিমার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। **সেখানে পৌঁছে খালিদ (রা.) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন।** কিন্তু 'আমরা ইসলাম কবুল করলাম', এ কথাটি তারা ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারছিল না। তাই তারা বলতে লাগল, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম। **খালিদ(রা) তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকলেন** এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দীদেরকে সোপর্দ করতে থাকলেন। **অবশেষে একদিন তিনি আদেশ দিলেন আমাদের সবাই যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করে ফেলি।**

২৩০১ আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আমি উমাইয়া ইবনু খালফের সঙ্গে এ মর্মে একটা চুক্তিনামা করলাম যে, সে মক্কায় আমার মাল-সামান হিফাযত করবে আর আমি মাদীনায় তার মাল-সামান হিফাযত করব।

বদর যুদ্ধের দিন যখন লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি উমাইয়াকে রক্ষা করার জন্য একটি পাহাড়ের দিকে গেলাম। **বিলাল (রা.) তাকে দেখে ফেললেন।** তিনি দৌড়ে গিয়ে আনসারদের এক মজলিসে বললেন- "এই যে উমাইয়া ইবনু খালফ। যদি উমাইয়া বেঁচে যায়, তবে আমার বেঁচে থাকায় লাভ নেই।" তখন আনসারদের **একদল তার সাথে আমাদের পিছে পিছে ছুটল।**
যখন আমার আশঙ্কা হল যে, তাঁরা আমাদের নিকট এসে পড়বেন, তখন আমি উমাইয়ার পুত্রকে তাঁদের জন্য পেছনে রেখে এলাম, যাতে তাঁদের দৃষ্টি তার উপর পড়ে। তাঁরা তাকে হত্যা করল। তারপরও তাঁরা ক্ষান্ত হল না, তাঁরা আমাদের পিছু ধাওয়া করল। উমাইয়া ছিল স্থূলদেহী। যখন আনসাররা আমাদের কাছে পৌঁছে গেল, আমি তাকে বাঁচানোর জন্য আমার দেহখানা দ্বারা তাকে আড়াল করে রাখলাম। কিন্তু **তাঁরা আমার নীচে দিয়ে তরবারি ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল।**

৩০২৩ পরিচ্ছেদঃ নিদ্রিত মুশরিককে হত্যা করা।

রাসূল সা একটি দলকে আবূ রাফি নামক ইয়াহূদীকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। তখন আবদুল্লাহ (রা.) রাত্রিকালে তার ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করে যখন সে ঘুমিয়ে ছিল।

৪০৩৮ ইবনু আযিব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. দশ জনের কম একটি দলকে আবু রাফির উদ্দেশে পাঠালেন। তাদের একজন আবদুল্লাহ (রাঃ) রাতের বেলা আবু রাফির ঘরে ঢুকে **ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে খুন করেন।**

৩০৩২ পরিচ্ছেদঃ গোপনে হত্যা করা।

নবী সা বলেন, কাব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে?' তখন ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' রাসূল সা বললেন, হ্যাঁ।

৪০৩৭ একদা রাসূলুল্লাহ্ সা বললেন, **কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ?** ইবনু মাসলামাহ (রা) দাঁড়ালেন, এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! **আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? নবী সা বললেন, হ্যাঁ।** তখন ইবনু মাসলামাহ (রা) বললেন, **তাহলে আমাকে কিছু প্রতারণাময় কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ্ সা বললেন- "হ্যাঁ বোলো"**।......................।। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা) **কা'ব ইবনু আশরাফকে** বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী সা এর নিকট এসে এ খবর দিলেন।

২৫১০ রাসূলুল্লাহ সা বললেন, কাব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিতে পারবে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সে তো (কবিতা লেখার মাধ্যমে) কষ্ট দিয়েছে।
ইবনু মাসলামাহ রাঃ তখন বললেন, আমি। পরে তিনি কাব ইবনু আশরাফের কাছে গিয়ে বললেন, আমরা তোমার কাছে বেশ কিছু খাদ্য ধার চাচ্ছি। এর জন্য আমরা তোমার কাছে আমাদের অস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। তারপর তিনি তাকে পরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং পরে এসে তাঁরা তাকে হত্যা করলেন।

২৫৩৭ পরিচ্ছেদ: কোন ব্যক্তির মুশরিক ভাই বা চাচা যুদ্ধে বন্দী হলেও তাদের পক্ষ হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে।
মদ্বীনার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সা এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের বোনের ছেলে আব্বাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিব। কিন্তু নবী সা বললেন, তোমরা তার মুক্তিপণের একটি দিরহামও ছাড়তে পার না।
২৫৪৩ আয়িশাহ (রা.)-এর হাতে এক বন্দিনী ছিল। তা দেখে নবী সা বললেন, একে মুক্ত করে দাও। কেননা, সে ইসমাঈলের বংশধর।

২৮৪৬ খন্দকের যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল সা বললেন, কে আমাকে শত্রু পক্ষের খবরাখবর এনে দিবে? যুবাইর (রা.) বললেন, 'আমি আনব।'

৩০৫১ নবী সা এর এক সফরে মুশরিকদের জনৈক গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন নবী সা বললেন, 'তাকে খুঁজে আন এবং হত্যা কর। তারপর একজন তাকে হত্যা করল। নবী সা তার মালপত্র হত্যাকারীকে প্রদান করলেন।

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)
পরিচ্ছেদঃ যুদ্ধে মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি আছে
১৬৭৫। **রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ** যুদ্ধ হল ধোঁকা।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)
পরিচ্ছেদঃ যুদ্ধের মধ্যে শত্রুকে ধোঁকা দেয়ার বৈধতা
৪৪৩১। রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **যুদ্ধ - কৌশল ও ছলনারই নাম**।

সহজ নসরুল বারী শরহে সহীহ বুখারী (৭) ❖ ২২৮

১৯০১. পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে কথা ঘুরিয়ে বলা

বাবে আসছে যে, ائذن لى فاقول অর্থাৎ আপনি আমাকে অনুমতি দিয়ে দিন যে, আমি যা চাইব তাই বলব (সত্য, মিথ্যা সবি বলব) তখন রাসূল ﷺ বললেন -قد فعلت আমি তোমাকে অনুমতি দিয়েছে।
তাছাড়া তিরমিযি শরীফে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি : হাদীসটি এখানে বুখারী শরীফ : ৪২৫ পৃঃ।
উদ্দেশ্য : কাফেরদের সাথে লড়াই ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে ধোকা ও প্রতারণা জায়েয।

↥

১২৮৮ রাসূল সা বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের আযাব বাড়িয়ে দেন তার পরিজনের কান্নার কারণে।

লাশের সাথেও বর্বরতা !

৩৯৭৬ বদরের যুদ্ধের পর নবী সা-এর নির্দেশে **চব্বিশজন কুরাইশ সর্দারের লাশ বদর প্রান্তরের একটি নোংরা আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হল**।

তিন দিন পর নবী সা তিনি ঐ কূপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ? উমার (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা! আপনি আত্মাহীন দেহগুলোর সঙ্গে কী কথা বলছেন? নবী সা বললেন, আমি যা বলছি তা তাদের চেয়ে তোমরা অধিক শুনতে পাচ্ছ না।

(৭০৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে নিহত লোকদেরকে তিন দিন পর্যন্ত এইভাবেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদের লাশের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং তাহাদেরকে আওয়াজ দিয়া বলিলেন, হে হিশামের পুত্র আবূ জাহল, হে উমায়্যা বিন খালফ, হে উতবা বিন রাবী'আ, হে শায়বা বিন রাবী'আ! তোমাদের

....

উমর (রাযি.) শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহারা তো মৃত। কিভাবে তাহারা শ্রবণ করিবে এবং কিভাবে তাহারা উত্তর দিবে? তিনি বলিলেন, আমি তাহাদেরকে যাহা বলিতেছি এই কথা তাহাদের হইতে তোমরা অধিক শ্রবণ করিতেছ না। তবে তাহারা জবাব দিতে সক্ষম নয়। অতঃপর তিনি তাহাদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাহাদেরকে হেঁচড়াইয়া নিয়া বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হইল।

(৭০৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউসুফ বিন হাম্মাদ (রহ.) তিনি ... আবূ তালহা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফিরদের উপর জয়লাভ করিলেন, তখন তিনি বিশের অধিক কুরায়শ নেতৃবৃন্দ– রাওহ (রাযি.) বলেন, চব্বিশ জন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাহাদের লাশ বদর প্রান্তরে এক নোংরা আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হইল। অতঃপর তিনি আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত সাবিতের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

৯২ সীরাতুল মুস্তফা (সা)

বদর যুদ্ধে নিহতদের লাশ কূপে নিক্ষেপকরণ

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হযরত আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) চব্বিশজন[1] কুরায়শ সর্দারের লাশ অপবিত্র,[2] নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত কূপে নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। যেসব লাশ কূপে নিক্ষেপ করা হয়, সেগুলো ছিল কুরায়শ সর্দারদের লাশ। এছাড়া অন্যান্য নিহতের লাশ অন্যত্র ফেলা হয়।

১. লাশ ছিল সত্তরটি, তন্মধ্যে চব্বিশটি ঐ কূপে নিক্ষেপ করা হয়। বাকীগুলো অন্য কোথাও নিক্ষেপ করা হয়েছিল। –ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩২, আবূ জাহল হত্যা অধ্যায়।

২ ঈমান হলো পবিত্রতা আর কুফর হলো নাপাকী। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : انما المشركون نجس "নিশ্চয়ই মুশরিকগণ অপবিত্র।" শিরককারীদের জন্য এরূপ কূপই ছিল উপযুক্ত।

৩০৮১,৩৯৮৩ পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করলে **প্রয়োজনে তাদেরকে বিবস্ত্র করা অথবা জিম্মী করা।**

আলী (রা.) বলেন,- 'রাসূলুল্লাহ সা আমাকে ও যুবাইর (রা)-কে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা খাক বাগানের দিকে চলে যাও, সেখানে তোমরা একজন মহিলাকে পাবে, হাতিব তাকে একটি পত্র দিয়েছে।'

আমরা সে বাগানে পৌঁছলাম এবং মহিলাটিকে বললাম, পত্রখানি দাও, সে বলল, আমাকে কোন পত্র দেয়নি। তখন আমরা বললাম, '**হয় তুমি পত্র বের করে দাও, নচেৎ আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করব**।' তখন সে মহিলা পত্রখানা বের করে দিল।

রাসূলুল্লাহ সা বললেন, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আহলে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমরা যেমন ইচ্ছা কাজ কর।' একথাই আলী (রাঃ) কে দুঃসাহসী করেছে।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

৬২৫৯। আলী (রা.) বলেন,.............................. ঐ স্ত্রী লোকটি তার এক উটের উপর সওয়ার ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তোমার কাছে যে পত্রখানি আছে তা কোথায়? সে বললঃ আমার সাথে কোন পত্র নেই। তখন আমরা তার উটসহ তার সাওয়ারীর আসবাবপত্রের তল্লাশি করলাম। কিন্তু আমরা কিছুই খুঁজে পেলাম না। আমার দুজন সাথী বললেনঃ পত্রখানা তো পাওয়া গেল না। তখন **আলী (রা.) স্ত্রীলোকটিকে ধমক দিয়ে বললেনঃ তোমাকে অবশ্যই চিঠিটা বের করে দিতে হবে, নইলে আমি তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশি চালাব**। এরপর সে যখন আমার দৃঢ়তা লক্ষ্য করল, তখন সে বাধ্য হয়ে তার কোমরে পেঁচানো চাদরে হাত দিয়ে ঐ পত্রখানা বের করে দিল।

৭১৯২ সাহল ইবনু হাসমা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা মুহাইয়াসা (রা.) জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ(রা.) নিহত হয়েছে । তখন তিনি ইয়াহূদীদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে তোমরাই তাকে মেরে ফেলেছ। তারা বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা তাকে হত্যা করিনি।

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সা কে এ ঘটনা জানালেন। রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ হয় তারা তোমাদের মৃত সাথীর রক্তপণ আদায় করবে, না হয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সা তাদের কাছে এ ব্যাপারে পত্র লিখলেন। জবাবে লেখা হল যে, আমরা তাকে হত্যা করিনি।

তখন রাসূলুল্লাহ সা সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা কি কসম করে বলতে পারবে(যে ইয়াহূদীরাই আবদুল্লাহ কে হত্যা করেছে)? তাহলে তোমরা তোমাদের সঙ্গীর রক্তপণের অধিকারী হবে। তারা বলল, না।

তিনি বললেন, **তাহলে ইয়াহূদীরা কি তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে? সাহাবীরা বলল, এরা তো মুসলিম না।**

তখন রাসূলুল্লাহ্ সা নিজের পক্ষ হতে একশ' উট রক্তপণ বাবদ আদায় করে দিলেন। অবশেষে উটগুলোকে ঘরে ঢুকানো হল।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭০

দশম পরিচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের সাক্ষ্য প্রসংগ

১. মাসআলা ঃ মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আল-মুহীত ঃ আস-সারাখসী)।

৬৭৬৪ নবী সা বলেছেনঃ কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।

তাফসীরে মাযহারী/৪৫১

বিধর্মীকে জাকাত প্রদান নাজায়েয। বিধানটি ঐকমত্যসম্মত।

https://www.islamweb.net/en/fatwa/87316/giving-zakah-to-non-muslims- Zakah should not be paid to a Kafir (non-Muslims) unless he/she is from “those inclined to become Muslims

আল ইরশাদ-ছহীহ আক্বীদার দিশারী ৪৩৩

মুশরিকদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে। এটি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার সাথীদের দীনের অন্তর্ভুক্ত। আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমতাহানার ৪নং আয়াতে বলেন,

তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে"।

মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের কথাও তাই।

সমস্ত কাফেরদেরকে বন্ধু বানানো হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

আল্লাহ মুমিনদের উপর কাফেরদেরকে বন্ধু বানানো হারাম করেছেন। যদিও তারা তার বংশের সর্বাধিক নিকটবর্তী লোক হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা কুফরকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দেয়। তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, তারাই হবে যালেম"। (সূরা তাওবা: ২৩)

এ বিরাট মূলনীতিটি সম্পর্কে অনেক মানুষ অজ্ঞ রয়েছে। আমি আরবী ভাষায় প্রচারিত একটি রেডিও অনুষ্ঠানে একজন আলেম ও দাঈকে খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খৃষ্টানরা আমাদের ভাই। এ রকম ভয়ঙ্কর কথা খুবই দুঃখজনক।

প্রখ্যাত সালাফি স্কলারদের দ্বারা পরিচালিত islamqa.info তে একটি উত্তর প্রাসঙ্গিক আলোচনা (বাংলা অনুবাদ)

প্রশ্ন: ইসলামে বিধর্মীদের উৎসব উপলক্ষে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর বিধান কি?

উত্তরঃ কোন বিধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কাফেরদের শুভেচ্ছা জানানো আলেমদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম। ইবনুল কাইয়্যেম (র) তাঁর লিখিত "আহকামু আহলিয যিম্মাহ" গ্রন্থে এ বিধানটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "কোন কুফরী আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন- তাদের উৎসব ও উপবাস পালন উপলক্ষে বলা যে, **'তোমাদের উৎসব শুভ হোক' কিংবা 'তোমার উৎসব উপভোগ্য হোক'** কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন **কথা। যদি এ শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করা কুফরীর পর্যায়ে নাও পৌঁছে; তবে এটি হারামের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কাছে এটি জঘন্য গুনাহ।** অনেকে এ গুনাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে; অথচ তারা এ গুনাহের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে না। এটি মদ্যপান, হত্যা ও যিনা ইত্যাদির মত অপরাধের জন্য কাউকে অভিনন্দন জানানোর চেয়ে মারাত্মক। যে ব্যক্তি কোন গুনার কাজ কিংবা কিংবা কুফরী কর্মের প্রেক্ষিতে কাউকে অভিনন্দন জানায় সে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন করে। কাফেরদের উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো হারাম ও এত জঘন্য গুনাহ হওয়ার কারণ হলো- এ শুভেচ্ছা জানানোর মধ্যে কুফরী আচারানুষ্ঠানের প্রতি স্বীকৃতি ও অন্য ব্যক্তির পালনকৃত কুফরীর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। **যদিও ব্যক্তি নিজে এ কুফরী করতে রাজী না হয়। কোন মুসলিমের জন্য কুফরী আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে অন্যকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হারাম**। কেননা আল্লাহ তাআলা কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট নন। অতএব, **কুফরী উৎসব উপলক্ষে বিধর্মীদেরকে শুভেচ্ছা জানানো হারাম; তারা সহকর্মী হোক কিংবা অন্য কিছু হোক**।

আর বিধর্মীরা যদি আমাদেরকে তাদের উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানায় আমরা এর উত্তর দিব না। কারণ সেটা আমাদের উৎসব নয়। আর যেহেতু এসব উৎসবের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সা কে সমস্ত মানবজাতির কাছে ইসলাম ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন।

কোনো মুসলমানের এমন উৎসবের দাওয়াত কবুল করা হারাম। কেননা এটি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর চেয়ে জঘন্য। কারণ এতে করে দাওয়াতকৃত কুফরী অনুষ্ঠানে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে **এ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে কাফেরদের মত অনুষ্ঠান করা, উপহার বিনিময় করা, মিষ্টান্ন বিতরণ করা, খাবার আদান-প্রদান করা, ছুটি ভোগ করা ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য হারাম।** যেহেতু নবী সা বলেছেন: "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের-ই দলভুক্ত"। যে ব্যক্তি বিধর্মীদের এমন কোন কিছুতে অংশগ্রহণ করবে সে গুনাহগার হবে। এ অংশগ্রহণের কারণ সৌজন্য, হৃদ্যতা বা লজ্জাবোধ ইত্যাদি যেটাই হোক না কেন। কেননা এটি আল্লাহর ধর্মের ক্ষেত্রে আপোষকামিতার শামিল। এবং এটি বিধর্মীদের মনোবল শক্ত করা ও তাদের নিজ ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ তৈরী করার কারণের অন্তর্ভুক্ত।

৪২৬৯ উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা আমাদেরকে হুরকা **গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমরা খুব ভোরে গোত্রটির উপর আক্রমণ করি।**

৪৩৬১ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, **রাসূলুল্লাহ সা আমাদের তিনশ সাওয়ারীর একটি সৈন্যবাহিনীকে কুরাইশদের একটি কাফেলার উপর সুযোগ মতো আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন।**

১৮৪৬ মক্কা বিজয়ের বছর আল্লাহর রাসূল সা লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কা প্রবেশ করেছিলেন। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন, ইবনু খাতাল কাবার গিলাফ ধরে আছে। রাসূল বললেনঃ তাকে তোমরা হত্যা কর।

সীরাতুন নবী (সা.) ২য় খন্ড- ইবনে হিশাম (র.), পৃষ্ঠা ৩২৭

বদর যুদ্ধ ৩২৭

নাযর ও উক্‌বার হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাফরা নামক স্থানে ছিলেন, তখন নাযর ইব্‌ন হারিস নিহত হয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাকে হত্যা করেন। এরপর তিনি (সা) সেখান থেকে বের হয়ে যখন আরকু যাবিয়াতে পৌছেন, তখন উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুয়াইত নিহত হয়। তাকে বনূ আজলানের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা (রা) বন্দী করেছিলেন। হত্যার নির্দেশ দেয়ার পর উকবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ! আমার ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্য কে রইল? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আগুন। এরপর বনূ আমর ইব্‌ন আওফের আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবূ আফলাহ আনসারী (রা) উকবাকে হত্যা করলেন। এ

বনু কুরাইযার গণহত্যা (Genocide)

৪০২৮ (সূরাহ হাশর ৫৯/২) আল্লাহর বাণীঃ- "তিনিই(নবী সা) ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা ইসলাম অগ্রহণকারী, তাদেরকে প্রথম তাদের নিবাস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।"

ইবনু উমার (রা.) বলেন, বনু নাযীর ও **বনু কুরাইযা** গোত্রের ইয়াহূদী সম্প্রদায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে রাসূলুল্লাহ সা বনু নাযীর গোত্রকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন এবং বনু কুরাইযা গোত্রের প্রতি দয়া করে তাদেরকে থাকতে দেন। কিন্তু পরে বনূ কুরাইযা গোত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে **অমুসলিম সব পুরুষলোক(৪শর অধিক)কে শিরচ্ছেদ করা হয়** এবং **মহিলা সন্তান-সন্ততি ও মালামাল মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়**। **নবী সা মদিনার সব ইয়াহুদীকে দেশান্তর করলেন**। বনু কায়নুকা ও বনু হারিসাসহ অন্যান্য ইয়াহূদী গোষ্ঠীকেও তিনি দেশান্তর করেন।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

৩০০৫। ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সা বনূ নাযীরকে উচ্ছেদ করলেন এবং **বনূ কুরাইযার পুরুষদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের স্ত্রী লোক, সন্তানাদি ও সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করলেন**। কিন্তু তাদের কিছু লোক ইসলাম কবূল করে রাসূলুল্লাহ সা এর সাথে মিলিত হলে তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন। **রাসূলুল্লাহ সা মদীনায় বসবাসকারী সমস্ত ইয়াহুদী গোত্রকে উচ্ছেদ করলেন। যেমন মদীনায় বসবাসকারী অন্যান্য ইয়াহুদীদেরকে তিনি মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন।**

সীরাতে ইবনে হিশাম ২২৭

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার ধন-সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করেন। তারপর সা'দ ইবনে যায়িদ আনসারীকে বনু কুরাইযার কিছুসংখ্যক দাসদাসীকে দিয়ে নাজদ পাঠিয়ে দেন। তাদের বিনিময়ে তিনি সেখান থেকে মুসলমানদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া খরিদ করে আনেন।

৬২৬২, ৩৮০৪ কুরাইযা গোত্রের লোকেরা সাদ (রা.) এর ফায়সালার উপর আত্মসমর্পণ করলো। নবী সা তাঁকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তারপর তিনি এলে নবী সা সাহাবীদের বললেনঃ তোমরা তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াও। তারপর সা'দ (রাঃ) এসে নবী সা এর পাশে বসলেন। তখন নবী সা তাঁকে বললেনঃ **কুরাইযা গোত্রের লোকেরা তোমার ফায়সালার উপর আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি বললেনঃ তা হলে আমি ফায়সালা দিচ্ছি যে, এদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার যোগ্য তাদের হত্যা করা হোক এবং শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করে রাখা হোক।**

তখন নবী সা বললেনঃ এদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ীই ফায়সালা দিয়েছ।

৩০৪৩ .... সাদ (রা.) বলেন, 'আমি এই রায় ঘোষণা করছি যে, **ইয়াহূদীদের মধ্য হতে যারা যুদ্ধ করতে পারে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা হবে**।' রাসূল সা বললেন, 'তুমি তাদের সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালার মত ফয়সালাই করেছ।

সহীহ বুখারী(তাওহীদ)

পরিচ্ছেদঃ আহযাব যুদ্ধ থেকে নাবী সা-এর প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর বনূ কুরাইযা অভিযান ও তাদেরকে অবরোধ।

৪১২২। রাসূলুল্লাহ সা বনু কুরাইযার মহল্লায় এলেন। অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ সা এর এর নির্দেশে দূর্গ থেকে নিচে নেমে এল। কিন্তু তিনি ফয়সালার ভার সাদ (রা)-এর উপর ন্যস্ত করলেন। তখন সাদ (রা) বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এই ফায়সালা দিচ্ছি যে, **তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে** এবং **তাদের ধন-সম্পদ (মুসলিমদের মাঝে) বণ্টন করা।** সাদ (রা) আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ৪৪৮৯।

সহীহ বুখারী (ইফা), পরিচ্ছদঃ সাদ ইবন মুআয (রা) এর মর্যাদা

৩৫৩১। জাবির (রা) বলেন, আমি নবী সা কে বলতে শুনেছি সাদ ইবনু মুআয (রা) এর মৃত্যুতে আল্লাহ্ তাআলার আরশ কেঁপে উঠেছিল।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) ৪৪০৪, সূনান তিরমিজী (ইফা)

১৫৯০। কুরাযী (রাঃ) বলেন, কুরাইজা যুদ্ধের সময় আমাদেরকে **রাসূলুল্লাহ সা এর সামনে পেশ করা হল**। তিনি **যাদের যৌন লোম উদগত হয়েছিল তিনি তাদের হত্যা করলেন** আর যাদের যৌন লোম উদগত হয়নি তাদের ছেড়ে দিলেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যাদের যৌন লোম উদগম হয়নি। সুতরাং আমার আমাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), পরিচ্ছেদঃ নাবালকের অপরাধের শাস্তি

৪৪০৫। আতিয়্যাহ (রা) বলেন, মুসলিমরা আমার নাভীর নীচ অনাবৃত করে দেখলো যে, চুল উঠেনি। সুতরাং তারা আমাকে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করলো।

সুনানে ইবনে মাজাহ

২৫৪১। আতিয়্যা (রা) বলেন, **বনূ কুরায়জাকে হত্যার দিন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সা এর সামনে উপস্থিত করা হলো। যার লজ্জাস্থানের লোম গজিয়েছিল, তাকে হত্যা করা হলো।**

সূনান আবু দাউদ (ইফা)

৪৩৫২। কুরাযী (রা) তিনি বলেনঃ আমি কুরায়যা গোত্রের বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল এবং **যাদের নাভীর নীচে চুল উঠেছিল, তাদের হত্যা করা হচ্ছিল**।

↥

বনূ কুরায়যার ঘটনা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ উবায়দা (রা) আবূ আমর মাদানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার উপর বিজয় লাভ করেন, তখন তিনি তাদের প্রায় চারশো ইয়াহূদী পুরুষকে গ্রেফতার করেন। এরা বনূ খাযরাজের বিপক্ষে বনূ আওসের মিত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদের শিরচ্ছেদের নির্দেশ দেন, তখন বনূ খাযরাজ তাদের শিরচ্ছেদ করতে থাকে এবং এতে তারা বেশ আনন্দবোধ করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লক্ষ্য করলেন, খাযরাজের লোকদের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত, আর বনূ আওসের প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, তাদের মাঝে এর কোন চিহ্ন নেই। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, আওস ও বনূ কুরায়যার মাঝে বিদ্যমান মিত্রতাই এর কারণ। তখন বনূ কুরায়যার মাত্র বারো জন অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাদেরকে আওসের হাতে সমর্পণ করলেন। তিনি দুই দুই ব্যক্তিকে বনূ কুরায়যার এক একজনকে দিয়ে বললেন :

لِيَضْرِبْ فُلاَنٌ وَلْيُذَنِّفْ فُلاَنٌ

"তার হত্যাকার্য অমুকে আরম্ভ করবে, আর অমুকে শেষ করবে।"

রাসুলের (সা.) হুকুম ছিল, ওদের প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকে যেন হত্যা করা হয়।

বনু আদি ইবনে আল-নাজ্জারের ভাই আইউব ইবনে আবদুর রহমান আমাকে বলেছেন, সালমার আশ্রিত রিফা ইবনে সামাওয়াল প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। তিনি রাসুলের (সা.) কাছে তাঁর প্রাণ ভিক্ষা চান। তিনি বলেন, সেই লোক কসম খেয়েছে, সে নামাজ পড়বে, উটের মাংস খাবে। রাসুল (সা.) তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

বনু কুরাইজার সম্পত্তি ও স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের রাসুল (সা.) মুসলমানদের মধ্যে ভাগবণ্টন করে দেন। উট ও মানুষের অংশ সেদিনই স্থির হয়। তিনি গ্রহণ করেন এক-পঞ্চমাংশ। একজন ঘোড়াওয়ালা তিন অংশ পেয়েছিল, ঘোড়ার জন্য দুই আর আরোহীর জন্য এক। বনু কুরাইজার দিকে মোট ঘোড়ার সংখ্যা ছিল ছত্রিশ। এই প্রথম যুদ্ধ-সম্পদের ওপর লটারি হয় এবং এক-পঞ্চমাংশ আলাদা রাখা হয়। এই নজির পরবর্তী সময়ের অন্যান্য যুদ্ধে অনুসরণ করা হয়।

রাসুল (সা.) নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন বনু আমর ইবনে কুরাইজার এক নারীকে। তার নাম রায়হানা বিনতে আমর ইবনে খুনাফা। তিনি আমৃত্যু তাঁর কর্তৃত্বের অধীন ছিলেন। রাসুল (সা.) তাঁকে বিয়ে করে পর্দানশিন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রায়হানা বলেছিলেন, 'তার চেয়ে বরং আপনি আমাকে আপনার কর্তৃত্বের আওতায় রাখুন। সেটা আপনার-আমার উভয়ের জন্য সহজ হবে।'

বন্দী হওয়ার সময় তিনি ইসলামের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং ইহুদি ধর্ম আঁকড়ে থাকেন। এতে রাসুল (সা.) নারাজ হন এবং তাঁকে আলাদা করে রাখেন। একদিন সাহাবিদের সঙ্গে বসে ছিলেন তিনি,

↥

এদের অন্যতম হচ্ছেন, রায়হানা বিনত যায়দ –বনূ নাযীর গোত্রীয়া এবং মতান্তরে মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ওয়াকিদী (র) বলেন, রায়হানা বিনত যায়দ ছিলেন বনূ নাযীর গোত্রের। তবে কেউ কেউ বলেছেন বনূ কুরায়জার। ওয়াকিদী (র) আরো বলেন, রায়হানা বিনত যায়দ ছিলেন বনূ নাযীর গোত্রের এবং তিনি এ গোত্রেই বিবাহিতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুন্দরী মহিলা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি ইয়াহুদী ধর্ম পরিত্যাগে অস্বীকৃত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে পরিত্যাগ করে রাখলেন এবং মনে মনে তাঁর আচরণে ব্যথা পেলেন পরে ইব্‌ন শু'বা (ছা'লাব)-কে ডেকে পাঠিয়ে তার সংগে নবী করীম (সা) বিষয়টি আলোচনা করলেন। ইব্‌ন শু'বা বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! সে ইসলাম গ্রহণ করবেই। তিনি তখন বের হয়ে গিয়ে রায়হানার কাছে পৌছলেন এবং তাকে বলতে লাগলেন, তুমি তোমার স্বগোত্রের অনুগামী হয়ে থেক না। তুমি তো দেখছই, (সর্দার) হুয়ায় ইব্‌ন আখতাব তাদের কি পরিণতিই না ঘটিয়েছে। তাই, (আমার পরামর্শ হচ্ছে) তুমি মুসলমান হয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে তাঁর 'একান্ত ব্যক্তিগত' করে নেবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের মাঝে ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি এক জোড়া চপ্পলের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, ان هاتين لنعلا ابن شعبة يبشرنى باسلام ريحانة 'এ অবশ্যই ইব্‌ন শু'বার চপ্পলদ্বয়। সে আমাকে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিতে আসছে।' তখনই ইব্‌ন শু'বা এসে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রায়হানা ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে নবী করীম (সা) আনন্দিত হলেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ কুরায়জাকে পরাজিত করার পরে রায়হানা বিনত আমর ইব্‌ন খিনাফাকে নিজের জন্য একান্ত করে নিলেন। নবী করীম (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত তিনি তার নিকটে তাঁরই মালিকানাধীন ছিলেন। তিনি তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার এবং পরে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি ইয়াহুদী ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপরে ইব্‌ন ইসহাক তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত পূর্বোক্ত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে উম্মুল মুনযির সালমা বিনত কায়স (রা)-এর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে অবস্থান কালে তার ঋতুস্রাব দেখা দেয় এবং এক বারের স্রাবের পরে তিনি পবিত্রা হলে উম্মুল মুনযির (রা) এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তা অবহিত করলেন। নবী করীম (সা) উম্মুল মুনযিরের বাড়িতে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন,

ان احببت ان اعتقك وانزوجك فعلت - وان احببت ان تكونى فى ملكى اطأك بالملك-

"তোমার যদি পসন্দ হয় তবে তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে আমি তোমাকে বিয়ে করি। তবে আমি তাই করব। আর যদি আমার মালিকানায় থাকা তোমার কাছে ভাল লাগে তবে মালিকানা সূত্রে আমি তোমাকে ব্যবহার করব।" সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিতে আপনার জন্য এবং আমারও জন্য আপনার মালিকানাধীন থাকা অধিক নির্ঝঞ্ঝাট ও সহজ। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মালিকানাধীন ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত ছিল।

....

তিনি তার স্বামীর কাছে ছিলেন এবং স্বামী তাঁকে ভালবাসত এবং তাঁর যথাযোগ্য কদর করত। তাই তিনি বলেছিলেন, তার পরে কোন দিন আর কাউকে আমি তার স্থানে গ্রহণ করব না। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের অধিকারিণী। পরে বনূ কুরায়জার নারীদের বন্দী করা হলে বন্দিনীদের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উপস্থিত করা হল। রায়হানা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে যাদেরকে উপস্থিত করা হয় তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তার আদেশে আমাকে পৃথক করে রাখা হল।

আর যে কোন গণীমতে তাঁর একান্ত কিছু অধিকার (صفى) থাকত, আমাকে পৃথক করে রাখা হলে তিনি আমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট 'ইসতিখারা' (কল্যাণবহ সিদ্ধান্ত কামনা) করলেন।

পরে কিছু দিনের জন্য আমাকে উম্মুল মুনযির বিনত কায়স (রা)-এর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। ইত্যবসরে তিনি পুরুষ বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন এবং নারী বন্দীদের বাটোয়ারা করে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাছে আগমন করলে আমি লজ্জায় পাশে সরে রইলাম। তিনি আমাকে ডেকে তাঁর সামনে বসালেন। এবং বললেন, ان اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه- "তুমি আল্লাহ এবং রাসূলকে গ্রহণ করলে আল্লাহর রাসূল তাঁর নিজের জন্য তোমাকে গ্রহণ করবেন।" আমি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে মুক্ত করে দিলেন এবং আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। তিনি আমাকে বারো উকিয়ার' কিছু অধিক (সাড়ে বারো উকিয়া =৫০০ দিরহাম) মহর দিলেন। যেমন তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের দিতেন। তিনি উম্মুল মুনযির (রা)-এর বাড়িতে আমাকে নিয়ে বাসর উদযাপন করলেন। তিনি নিজের স্ত্রীদের জন্য রাত্রি যাপনের 'পালা' নির্ধারণ করতেন। আমার জন্য পর্দার বিধান সাব্যস্ত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি বিমুগ্ধ ছিলেন এবং তিনি কোন কিছুর জন্য আবদার করলে নবী করীম (সা) তা তাঁকে দিয়ে দিতেন। তাই তাঁকে বলা হয়, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বনূ কুরায়জার ব্যাপারে আবদার করলে তিনি অবশ্যই তাদের মুক্ত করে দিতেন। এর জবাবে তিনি বলতেন, বন্দিনীদের বন্টন (এবং পুরুষ বন্দীদের হত্যা) করার পরই তিনি আমার সংগে নিভৃতে মিলিত হয়েছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁর সংগে নিভৃত বাস করতেন এবং প্রায়শ তা করতেন।

স্বজনশোকে পাগল এক নারী

মুহাম্মদ সা যখন বনু কুরাইযা গোত্রের শত শত মানুষকে লাইন ধরে দাড় করিয়ে জবাই করছিলেন, সেই সময়ে একজন নারী চোখের সামনে স্বজন জবাই হবার বেদনাতে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলেন আর নবীকে গালি দিচ্ছিল। সে জানতো, এই কারণে তাকেও হত্যা করা হবে, কিন্তু হাসতে হাসতেই তিনি মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন। যা দেখে আয়িশা রা নিতান্তই অবাক হয়ে যায়।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

২৬৭১। আয়িশাহ (রা) বলেন, বনী কুরাইযার কোনো মহিলাকে হত্যা করা হয়নি। তবে এক মহিলাকে হত্যা করা হয়। সে আমার পাশে বসে কথা বলছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সা বাজারে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করছিলেন। সে নবী সা কে অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়েছিলো। আয়িশা (রা) বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হলো। আমি ঘটনাটি আজও ভুলতে পারিনি। আমি তার আচরণে অবাক হয়েছিলাম যে, তাকে হত্যা করা হবে একথা জেনেও সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিলো। সূনান আবু দাউদ (ইফা)২৬৬২ .... তার শিরচ্ছেদ করা হলো।

৬২৪ খ্রিস্টাব্দে নবী মুহাম্মদ ইহুদি গোত্র বানী কাইনুকার উপরে ১৫ দিন ব্যাপী একটি অবরোধ চালিয়েছিলেন। উপায় না দেখে বনু কাইনুকা গোত্রটি নিঃশর্তভাবে মুহাম্মদের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। মুহাম্মদ সেই গোত্রের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের শিরশ্ছেদ করে তাদের নারী ও শিশুদের দাস বানাতে চেয়েছিলেন, যেন সমস্ত আরব উপদ্বীপে ত্রাস সৃষ্টি করা যায়। বনু কায়নুকার ঘটনার সময় মদিনার শক্তিশালী স্থানীয় নেতা ছিলেন খাজরাজ বংশের প্রধান আবদুল্লাহ বিন উবাই(রা)। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং মুহাম্মদের হিজরতের সময় মদিনার নেতা। বনু কায়নুকার অবরোধের সময় আবদুল্লাহ বিন উবাই মুহাম্মদের গণহত্যার ইচ্ছেটি বুঝতে পারেন, এবং নবীকে এই গণহত্যা থেকে নিবৃত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। মুহাম্মদ সা রেগে লাল হয়ে যান, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই জোর করে মুহাম্মদ সা কে বাধ্য করেন, যেন বনু কায়নুকাকে মুহাম্মদ নৃশংসভাবে জবাই করতে না পারে। এর থেকে বোঝা যায়, নবী সা এর ইচ্ছে ছিল, বনু কায়নুকার সমস্ত পুরুষকে হত্যা করা এবং মেয়ে ও শিশুদের গনিমতের মাল বানানো।

মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনু কাইনুকাই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করে অনুকূল শর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। এভাবে আল্লাহর সাহায্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নতজানু করলে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল তাঁর কাছে এসে বললো, "হে মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের প্রতি সহৃদয় আচরণ করুন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার বললো, "হে মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের সাথে সদয় আচরণ করুন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবার সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলে তিনি বললেন, "আমাকে ছাড়।" এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে যায়। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, "আরে। আমাকে ছাড় তো!" সে বললো, "না, আমার মিত্রদের সাথে সদয় আচরণের নিশ্চয়তা আগে দিন, তারপর ছাড়বো। বিশ্বাস করুন, চারশো নাঙ্গামাথা যোদ্ধা এবং তিনশো বর্মধারী যোদ্ধা আমাকে সারা দুনিয়ার মানুষ থেকে নিরাপদ করে দিয়েছে। আর আপনি কিনা একদিনেই তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছেন। আমি তাদের ছাড়া এক মুহূর্তও নিরাপদ নই"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আচ্ছা, বেশ। ওদেরকে তোমার মর্জির ওপর ছেড়ে দিলাম।"

৫৭৪ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ প্রথম ইয়াহূদীদের বনূ কাইনুকা গোত্র তাহাদের এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা বলিয়াছেন যে, সেই গোত্রের বহু লোককে তাহাদের বিচারের ব্যাপারে নির্দেশ নাযিল না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (রা) বন্দী করিয়া রাখেন। যখন তাহাদের শাস্তি নির্ধারিত হয়, তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সলূল তাহাদের পক্ষে সুপারিশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। ইহারা খাযরাজদের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। সে আবারো বলিল, হে মুহাম্মদ! ইহাদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। সে আবারো বলিল, হে মুহাম্মদ! ইহাদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া নিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জামার এক প্রান্ত টানিয়া ধরে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ছাড়িয়া দাও। এই ধরনের আচরণের ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলেন, তোমার অমঙ্গল হউক, আমাকে রেহাই দাও। সে বলিল, না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বন্ধুদের ব্যাপারে অনুগ্রহ না করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হইব না। তাহারা দলে বৃহৎ এবং এই পর্যন্ত তাহারা আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। আজ একদিনে এই বৃহৎ দলটি ধ্বংস হইয়া যাইবে শুনিয়া আমি ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভীষণভাবে শঙ্কিত। পরিশেষে হুযূর (সা) বলেন ঃ যাও, সব কিছু তোমার জন্যই হইল।

সুনান আবূ দাউদ (ইফা)

২৯৯৪। কা’ব ইবন মালিক (রা) বলেন, ...**বনূ নযীরের ইয়াহুদীরা নবী সা কে এ মর্মে অবহিত করে যে, আপনি আপনার সাথীদের থেকে ত্রিশজন নিয়ে আমাদের কাছে আসুন এবং আমাদের ত্রিশজন আলিম আপনার সংগে এক আলাদা স্থানে দেখা করবে। তারা আপনার কথা শুনবে, যদি তারা আপনার উপর ঈমান আনে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনব।**

পরদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সা একদল সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের উপর হামলা করেন এবং তাদের অবরোধ করে বলেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যতক্ষণ অঙ্গীকার না করবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তখন ইয়াহুদীরা অঙ্গীকার করতে অস্বীকার করে। ফলে তিনি সেদিন তাদের সাথে দিনভর যুদ্ধে রত থাকেন। পরদিন তিনি বনূ নযীরকে বাদ দিয়ে বনূ কুরাইযার উপর আক্রমণ করেন এবং তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ হতে বলেন। ফলে তারা তাঁর সংগে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। তখন তিনি তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় বনূ নযীরকে অবরোধ করেন এবং তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করেন, যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

বনূ নযীরের লোকেরা তাদের উটের পিঠে ঘরের দরজা, চৌকাঠ ইত্যাদি যে পরিমাণ মালামাল নেওয়া সম্ভব ছিল, তা নিয়ে যায়। এবার বনূ নযীরের খেজুরের বাগান রাসূলুল্লাহ সা -এর অধিকারে আসে।

সুনান আবূ দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
পরিচ্ছেদঃ ১৬১. বনূ নযীরের ঘটনা সম্পর্কে।

২৯৯৪. মুহাম্মদ ইবন দাউদ ইবন সুফইয়ান (রহঃ) ...... আবদুর রহমান ইবন কা’ব ইবন মালিক (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শ কাফিররা আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং তার মূর্তি-পূজক সাথীদের, যারা আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক, এ মর্মে পত্র লেখে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধের আগে মদীনায় অবস্থান করছিলেনঃ তোমরা আমাদের সাথী (মুহাম্মদ) কে জায়গা দিয়েছ। এ জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, হয়তো তাঁর সাথে যুদ্ধ কর, নয়তো তাঁকে বের করে দাও। অন্যথায় আমরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব এবং তোমাদের স্ত্রীদের আমাদের দখলে আনব।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং তার মূর্তিপূজারী সাথীরা এ খবর পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংগে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌছবার পর তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বলেনঃ তোমরা কুরায়শদের নিকট হতে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী চিঠি পেয়েছ, কিন্তু তা তোমাদের জন্য এত মারাত্মক নয়, যত না ক্ষতি তোমরা নিজেরা নিজেদের করবে। কেননা, তোমরা তো তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করছ।

তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ কথা শুনলো, তখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। এ খবর কুরায়শ কাফিরদের কাছে পৌছলে তারা বদর যুদ্ধের পর ইয়াহুদীদের নিকট লিখলোঃ তোমরা ঘরবাড়ী ও দুর্গের অধিকারী। কাজেই তোমাদের উচিত আমাদের সাথী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ করা। অন্যথায় আমরা তোমাদের সাথে এরূপ করব, সেরূপ করব। আর আমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না।

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা এরূপ চিঠি পেল, তখন বনূ নযীরের ইয়াহুদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে অবহিত করে যে, আপনি আপনার সাথীদের থেকে ত্রিশজন নিয়ে আমাদের কাছে আসুন এবং আমাদের ত্রিশজন আলিম আপনার সংগে এক আলাদা স্থানে দেখা করবে। তারা আপনার কথা শুনবে, যদি তারা আপনার উপর ঈমান আনে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনব।

পরদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের উপর হামলা করেন এবং তাদের অবরোধ করে বলেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যতক্ষণ অঙ্গীকার না করবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তখন তারা (ইয়াহুদীরা) অঙ্গীকার করতে অস্বীকার করে। ফলে তিনি সেদিন তাদের সাথে দিনভর যুদ্ধে রত থাকেন। পরদিন তিনি বনূ নযীরকে বাদ দিয়ে বনূ কুরাইযার উপর আক্রমণ করেন এবং তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ হতে বলেন। ফলে তারা তাঁর সংগে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। তখন তিনি তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় বনূ নযীরকে অবরোধ করেন এবং তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করেন, যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

বনূ নযীরের লোকেরা তাদের উটের পিঠে ঘরের দরজা, চৌকাঠ ইত্যাদি যে পরিমাণ মালামাল নেওয়া সম্ভব ছিল, তা নিয়ে যায়। এবার বনূ নযীরের খেজুরের বাগান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারে আসে, যা আল্লাহ্ তা’আলা বিশেষভাবে প্রদান করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ কাফিরদের মাল হতে যে সম্পদ তাঁর রাসূলকে প্রদান করেন, তা হাসিলের জন্য তোমরা তোমাদের ঘোড়া অথবা উট হাঁকাও নি, অর্থাৎ ঐ সম্পদ বিনা যুদ্ধে হাসিল হয়।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মালের অধিকাংশই মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন এবং অভাবগ্রস্ত দু’জন আনসারকে তা হতে অংশ প্রদান করেন। এ দু’জন ছাড়া অন্য আনসার সাহাবীদের মাঝে এ মাল বিতরণ করা হয়নি। অবশিষ্ট মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সাদকা স্বরূপ ছিল, যা বনূ ফাতিমার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

হাদিস থেকে জানা যায়, মুহাম্মদ সা কে বনূ নযীর গোত্র নিমন্ত্রণ জানায়, তার নবুয়তের প্রমাণ দিয়ে যেতে। তারা মুহাম্মদ সা কে এ মর্মে অবহিত করে যে, আপনি আপনার সাথীদের থেকে ত্রিশজন নিয়ে আমাদের কাছে আসুন এবং আমাদের ত্রিশজন আলিম আপনার সংগে এক আলাদা স্থানে দেখা করবে। তারা আপনার কথা শুনবে, যদি তারা আপনার উপর ঈমান আনে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। এরপরেই মুহাম্মদ সা বনূ নযীর বা বানু নাদির গোত্রকে আক্রমণ করেন। তাদের সাথে যখন মুহাম্মদ সা এর সৈন্যরা পারছিল না, সেই সময়ে তারা আচানক কোন কারণ ছাড়াই পরদিন বনু কুরাইজাকেও আক্রমণ করে বসে। বনু কুরাইজা গোত্র এই আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য অঙ্গীকার করে যে, মুহাম্মদের সৈন্যদের তারা আক্রমণ করবে না।

বনু কুরাইজা গোত্রের সাথে সাথে নবী সা এর কী করার পরিকল্পনা, সেটি নবী সা এর এক অনুসারী আবূ লূবাবা (রা) ফাঁস করে দিয়েছিলেন। বনু কুরাইজা গোত্রকে ২৫ দিন অবরোধ করে রাখার পরে আবূ লূবাবা (রা) কে তিনি পাঠিয়েছিলেন বনু কুরাইজার দূর্গে। সেখানে ঢোকার পরেই বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তারা আবূ লূবাবা (রা) এর কাছে নিজেদের অসহায়ত্বের কথা জানাতে থাকে। নবী সা এর অনুসারী হওয়ার পরেও নারী শিশুদের সেই কান্না দেখে মন গলে যায় আবূ লূবাবা (রা) এর। তিনি ইঙ্গিতে তাদের জানিয়ে দেন, আত্মসমর্পন করলে তাদের হত্যা করা হবে। নবী সা সেই পরিকল্পনা করেই এসেছেন।

বনূ কুরায়যা অভিযান ২৩৩

আবূ লুবাবার তাওবা প্রসংগে

এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুরোধ জানিয়ে পাঠাল যে, বনূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুনযিরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। তার সাথে আমরা পরামর্শ করব। উল্লেখ্য বনূ আমর গোত্র ছিল আওস গোত্রের মিত্র।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ লুবাবাকে তাদের কাছে পাঠালেন। তাকে দেখামাত্র পুরুষগণ তাকে অভিবাদন জানাতে ছুটে আসল, আর নারী ও শিশুরা তার সামনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানাল। তাদের সে বুকফাটা কান্না দেখে তাঁর অন্তর গলে গেল। তারা বলল : হে আবূ লুবাবা। আপনি কি বলেন, আমরা কি মুহাম্মদের নির্দেশমত দুর্গ হতে নেমে আসব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, সে সাথে গলদেশের দিকেও ইঙ্গিত করলেন, অর্থাৎ পরিণাম যবাই।

আবূ লুবাবা বলেন : আল্লাহ্র কসম! সেস্থান হতে আমি এক কদমও নড়িনি, এর মধ্যেই আমার উপলব্ধি হল—আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।

আবূ লুবাবা সেই অবস্থাতেই সোজা মসজিদে নব্বীতে চলে গেলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে দেখা করলেন না। তিনি মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেকে শক্ত করে বাঁধলেন।

সীরাতুন নবী (সা) (৩য় খণ্ড)—৩০

মুয়াত্তা মালিক

রেওয়ায়ত ১৬।

আবু লুবাবা (রা) মদীনার ইহুদী বসতি বনু কুরায়যায় বসবাস করিতেন। ইহাদের সহিত মুসলিমদের যুদ্ধ শুরু হইলে ইনি মুসলিমদের তরফ হইতে আলোচনা করিতে যান এবং **তাদের প্রতি সহানুভূতির জন্য ইশারায় তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা -এর গোপন সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেন**। পরে এই জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং মসজিদে নববীর একটি স্তম্ভের সহিত নিজেকে বাঁধিয়া রাখেন ও বলেনঃ যতদিন আল্লাহ আমার এই গুনাহ্ মাফ না করিবেন ততদিন এই অবস্থায়ই আমি থাকিব। শুধু প্রশ্রাব-পায়খানার সময় তাহার স্ত্রী বাঁধন খুলিয়া দিতেন, পরে আবার বাঁধিয়া রাখিতেন। শেষে আল্লাহ তা'আলা তাহার ক্ষমার ঘোষণা করেন।

সূরা মায়িদা ৫৭৩

ইকরিমা (রা) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি আবূ লুবাবা ইব্ন মুনযির সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে পাঠাইয়া বনী কুরায়যাদেরকে ডাকিয়াছিলেন, তখন বনী কুরায়যারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন ? তিনি তখন স্বীয় হস্তদ্বারা গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাদেরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তোমাদিগকে তিনি হত্যা করিবেন। ইব্ন জারীর (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুরা তওবা, তরবারীর আয়াত, এবং এর তাফসীর (সাহাবী, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনের বর্ণনা)

তাফসীরে জালালাইন দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৬১৯,

সূরা তওবা প্রসঙ্গে : আবূ আতীয়া হামদানী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) একটি ফরমানে লিখেছিলেন, "তোমরা নিজেরা সূরা তওবা শিখ আর তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও।" এর কারণ, সূরা তওবাতে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, আর সূরা নূরে পর্দা প্রথা প্রচলনের তাগিদ করা হয়েছে। প্রথমে পুরুষদের, পরে স্ত্রীলোকদের কর্তব্য পালনের নির্দেশ রয়েছে।

- মাদানি সুরা তওবার প্রথম অংশ নাজিল হয় যখন নবি তাবুক যুদ্ধের অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন।
- ইমাম বুখারির মতে এটি নবির উপর নাজিলকৃত সর্বশেষ সুরা

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৮,৯,১০,১১ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৩

- কোরানের একমাত্র সুরা যার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: বিসমিল্লাতে রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা, আর এই সুরাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারি ব্যাবহারের আদেশ রয়েছে এজন্য বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ হয়নি যেন আল্লাহপাকের গজবের নিদর্শন প্রতিভাত হয়।
- সুরা তাওবার অন্য প্রচলিত নাম বারাআত বা সম্পর্কছেদ, মোকাশকাশা বা ঘৃণা সৃষ্টিকারী ইত্যাদি।

তাবুকের যুদ্ধ

অষ্টম হিজরিতে নবি সা মক্কা বিজয়ের পর অত্র ও আশেপাশের এলাকায় মুসলিম বাহিনীর আধিপত্য নিশ্চিত হয় ও হুনায়ুনের যুদ্ধ ও অন্যান্য ছোট ছোট যুদ্ধের মাধ্যমে পুরা অঞ্চল মুসলিম বাহিনীর করায়াত্ত হয়ে যায়। এর বেশ আগে থেকেই নবি মোহাম্মাদ (দঃ) বিভিন্ন দেশে দুত পাঠিয়ে উনার নবুয়ত ও আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান, এই সব দেশের মধ্যে বাইজেনটাইন বা রোমান সম্রাট হেরাক্লিস, পারশ্য সম্রাট, মিসরের মুকাওকিস, হাবাসা সম্রাট, বাহারাইনের গভর্নর অন্যতম। বলা বাহুল্য **ইনারা কেও নবি মোহাম্মাদ সা এর এই দাবি মেনে নেন নি**। তবে নবি ও তার সাহাবীরা রোমান সম্রাজ্য থেকে হামলার ভয়ে ভীত থাকত। এর পূর্বে জর্ডানের নিকট মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী রোমানদের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছিল যেই যুদ্ধে মোহাম্মাদ সা এর পালক পুত্র ও নবিপত্নি জয়নাব বিনতে জাহাশের প্রাক্তন স্বামী- জায়েদ, নবির চাচাত ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব সহ বহু সাহাবী নিহত হয়, পরিশেষে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী প্রাণ রক্ষা করে মদিনায় ফিরে যায় এবং ফিরে আসা সেনারা বিদ্রুপের মুখে পড়ে।

এক সময় মদিনায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে রোমানরা মদিনা আক্রমন করতে পারে। এইসব মাথায় রেখে নবি সা সকল মুসলিমকে জান-মাল কোরবানি করে তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন এবং নবি জীবনে সর্ববৃহৎ ৩০,০০০ সেনা নিয়ে তাবুক যাত্রা করেছিলেন। তবে বিবিধ অজুহাতে মুসলিমরা এই যুদ্ধে না যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সুরা তওবার বিভিন্ন আয়াতে তাই এই জিহাদে সামিল হওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি, লোভ,ভয়, হুমকি সবই ফুটে উঠেছে।

"আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।" (সুরা তাওবা ৯:৪৯)

নবি যখন তাবুকের যুদ্ধের জন্য সকলকে জান মাল কোরবান করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন, এরই অংশ হিসাবে নবি জাদ ইবনে কাইসকে বলেন "ওহে আবু ওয়াহাব (জাদ ইবনে কাইস এর নাম) তুমি কি কিছু রোমান নারিকে যৌন দাসী ও পুরুষদের দাস হিসাবে লাভ করতে চাও?" উত্তরে জাদ ইবনে কাইস বলেন, **হে আল্লাহর রাসুল, আমার লোকজন নারিদের প্রতি আমার বিশেষ আসক্তির কথা জানে। আমি আশঙ্কা করছি যে শ্বেতাঙ্গ রোমান রমণীদের দেখে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারব না। কাজেই আমাকে আর লোভ দেখাবেন না, বরং আমাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে অবহৃতি দিন, আমি আমার সম্পদ দিয়ে আপনার জিহাদে সাহায্য করব।**

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।" (সুরা তাওবা ৯:৩৮)

"যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (সুরা তাওবা ৯:৩৯)

পেছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে; আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচন্ডতম। যদি তাদের বিবেচনা শক্তি থাকত।" (সুরা তাওবা ৯:৮১)

নবি সা তাবুকে পৌছিয়ে সেখানে কোন রোমান সৈন্য সমাবেশ দেখতে পাননি এবং বুঝতে পারেন যে রোমান আক্রমনের গুজবটি অতিরঞ্জিত। নবি তাবুকে ১০ দিনের কম অবস্থান করেন এবং উমরের সাথে পরামর্শ করে কোন যুদ্ধ না করেই মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন, তবে পথে বেশ কিছু গোত্রকে জিজিয়া করের আওতায় নিয়ে আসেন।
[বর্তমান যুগে বানানো নবির জীবনী, এছাড়া বিভিন্ন ইসলামি বক্তা দাবী করেন যে রোমান বাহিনী নবির বাহিনী দেখে পালিয়ে গিয়েছিল, এটা পুরোটাই গাঁজাখুরি ধাপ্পাবাজি, এর কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। প্রদত্ত রেফারেন্স ছাড়াও ইবনে ইসহাক বা আল তাবারির লেখায় তাবুকে বাইজেনটাইনদের সাথে যুদ্ধের অথবা রোমান সেনাদল পালিয়ে যাওয়ার কোন বর্ণনা নাই, আধুনাকালের সিরাত লেখক আর অনেক ইসলামিক ওয়েবসাইট সমুহ সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাবুক অভিযানকে ইসলামের গৌরবগাঁথা হিসাবে বর্ণনা করেন।]

নবির মদিনায় ফিরে আসার খবরে তাবুক যুদ্ধে না যাওয়া সাহাবীগণ নবি সা এর রোষানলে পড়ার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন এবং নবির কাছে নানা অজুহাত পেশ করতে থাকেন। ইসলামে ও নবির কাছে জিহাদ যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এই অজুহাতকারিদের প্রতি নাজিলকৃত আয়াতগুলো লক্ষ্য করলে বুঝা যায়।

"তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলো, ছল কারো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহই দেখবেন এবং তাঁর রসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও আগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। "(সুরা তাওবা ৯:৯৪)

"এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর-নিঃসন্দে হে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ।" (সুরা তাওবা ৯:৯৫)

নবি অবশ্য তিন জন মুমিন সাহাবী কাব বিন মালিক, মোরারা বিন রাবি ও হেলাল বিন উমাইয়ার তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার তওবা গ্রহন করেন, তবে এর আগে তাদেরকে ৫০ দিনের জন্য নিজ বিবি, পরিবার-পরিজন ও সমাজ থেকে বয়কট মানসিক শাস্তি দেওয়া হয়। **সুরা তওবা নামকরনের এটাই শানে নাজুল**। কাজেই নবি জেহাদকে কতোটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন এ থেকেই অনুধাবন করা যায়।

তরবারির আয়াত (The sword verse) বা সুরা তওবা আয়াত নং ৫ এর প্রেক্ষাপট ও তাফসীর বিশ্লেষণ

সুরা তওবার আয়াত ১ থেকে ৪:

১। সম্পর্কচ্ছেদ করা হল **আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে** সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।

২। অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।

৩। আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।

৪। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি বদ্ধ, অতপরঃ যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, **তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর**। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

সুরা তাওবার প্রথম ৫ টি আয়াতে বর্ণিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও বাক্যের বিশ্লেষণঃ

"সম্পর্কচ্ছেদ"
সুরা তওবা শুরু হয়েছে নবি তথা আল্লাহর তরফ থেকে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার মাধ্যমে এবং ৫ নং তরবারির আয়াতে কতল করার হুমকির পূর্বে ৪ মাসের আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ও নবির সাথে এই সম্পর্কচ্ছেদের আওতায় চুক্তিভুক্ত(হুদাইবিয়ার) বা অচুক্তিভুক্ত সকল বিধর্মীই অন্তরভুক্ত, যেমনটি বলা হয়েছে তাফসীরে।

তাফসীরে মাযহারী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৪,

আমি বলি, বারাআতুম মিনাল্লাহি ওয়া রসুলিহি (এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে) এবং আন্নাল্লহা বারিউম মিনাল মুশরিকীনা ওয়া রসুলুহু (আল্লাহর সঙ্গে অংশীবাদীদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রসুলের সঙ্গেও নয়) — এ আয়াত দু'টো কেবল যুদ্ধের চুক্তিভঙ্গকারী বিধর্মীদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে, এ রকম বলা যায় না। বরং চুক্তিভূত এবং চুক্তিবহির্ভূত সকল বিধর্মীই ঘোষণা দু'টোর লক্ষ্যস্থল। তাদের সকলকে লক্ষ্য করেই চার মাস নির্বিঘ্নে চলাফেরা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ ওই চারমাস আল্লাহ্তায়ালা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছেন । তাই, একস্থানে এরশাদ করা হয়েছে— 'ফা ইজানসালাখাল আশহুরুল হুরুম (যখন সম্মানিত মাসগুলো অতীত হয়ে যায়) অন্য এক স্থানে এসেছে— মিনহা আরবাআতুন হুরুমুন (তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত)।

এবার আসলো তরবারির আয়াত তথা সুরা তওবার ৫ নং আয়াত

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। তবে যদি তারা তওবা করে, ইসলাম কবুল করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও"।

মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও – এই বাক্যের "যেখানে পাও" এই অর্থ নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে। কারন মক্কার হারাম শরিফের সীমানার ভিতরে রক্তপাত প্রাক-ইসলামি যুগ থেকেই নিষিদ্ধ, যে কারনেই এর নাম হারাম শরিফ কারন এর সীমানার ভিতর রক্তপাত হারাম। **তবে নবি সা বিশেষ ক্ষমতাবলে নিজেই এই হারাম শরিফে রক্তপাত ঘটিয়ে এই নিয়মের ব্যাতিক্রম করেছেন।** নীচে তাফসীরে এর বিবরন দেওয়া আছে।

তাফসীরে মাযহারী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২

'হাইছু' অর্থ যেখানে। অধিকাংশ তাফসীরকার লিখেছেন, এ কথার অর্থ— মুশরিকদেরকে হেরেম শরীফের সীমানার ভিতরে অথবা সীমানার বাইরে যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করবে। কিন্তু তাঁদের তাফসীর বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীত। কেননা রসুল স. বলেছেন, জমিন ও আসমানের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আল্লাহ্পাক এই শহর (মক্কা) কে হারাম ঘোষণা করেছেন। হারামের এই বিধান বলবৎ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমার পূর্বে এখানে কারো জন্য যুদ্ধ বৈধ করা হয়নি। কেবল আমার জন্য বৈধ করা হয়েছিলো অল্প কিছুক্ষণের জন্য। রসুল স. এ কথা বলেছিলেন মক্কাবিজয়ের পর। বিজয়ের পরক্ষণে তিনি তখন ইসলামের কয়েকজন কুখ্যাত শত্রুকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর এ কথার উপর ভিত্তি করে কেউ যদি বলে অন্যদের জন্যেও হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যে মুশরিক বধ বৈধ, তবে তা হবে নিতান্ত ভুল। কারণ রসুল স. স্পষ্ট করে বলেছেন, কেবল আমার জন্য এখানে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। এরপর ওই অনুমতি রহিত হয়ে যায়। সুতরাং অন্যদের জন্য এখানে যুদ্ধ করা বৈধ হতে পারে কীভাবে? বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতি' (কিয়ামত দিবস পর্যন্ত)। সুতরাং হেরেম শরীফের হুরমত (নিষিদ্ধতা) রহিত হতে পারে না। তাই এখানে 'হাইছু' শব্দের অর্থ হবে হেরেম শরীফের বাইরে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে, বধ করবে।

↥

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন কাফেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করলেন–

اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة

"তাদের ক্বাবার চাদর জাপটে ধরা অবস্থায় পেলেও হত্যা করবে।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের মাঝে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আবিস সারহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল। সাহাবায়ে কেরাম আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে ক্বাবার চাদর জাপটে ধরা অবস্থায় পেয়ে সেখানেই হত্যা করলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আবিস সারহ ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর দুধভাই। তিনি তার হাত ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার তওবা কবুল করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন। কোন কথা বললেন না। এভাবে তিনবার হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, আর তিনবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত বাড়িয়ে তার তওবা কবুল করলেন। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে আবিস সারহ চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে, তোমরা তার তরবারীটি নিয়ে তাকে হত্যা করবে। তাই আমি দেরি করছিলাম। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি একটিবার চোখের ইঙ্গিতে বলতেন, তাহলেই তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতাম।

মক্কা বিজয়ের পর নবি বেশ কিছু কাফের পুরুষ ও অন্তত একজন নবিকে বিদ্রুপ করে কাব্য ও সঙ্গীত করা রমণীকে হত্যা করান। এদের মধ্যে ইবনে খাতাল ভেবে ছিলেন কাবার চাদর ধরে থাকলে পবিত্র ভুমিতে উনি রক্ষা পাবেন।

হজ্জের মৌসুমের ৪ মাস হজ্জ পালনের জন্য ও সফররত হাজিদের নিরাপত্তার জন্য প্রাক-ইসলামি সময় থেকে রক্তপাত ও হত্যা নিষিদ্ধ ছিল, যা সকল গোত্রই সন্মান করত ও মেনে চলত। **তবে নবি সা এই নিয়মের তোয়াক্কা করেননি আর এই নিষিদ্ধ মাসেও যুদ্ধ ও হত্যা করে এই প্রথাটি ভঙ্গ করেন।** তাই তাফসিরকারকগন নবির বেঁধে দেওয়া ৪ মাস সময়কে প্রাক – ইসলামিক পবিত্র নিষিদ্ধ মাস থেকে ভিন্ন করে নিয়েছেন। এই বিষয়টিও আমরা তাফসীরে দেখতে পাই।

তাফসীরে মাযহারী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৫,

এখানে চারমাস যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ঘোষণা করা হলেও অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কাতিলুল মুশরিকীনা কাফ্‌ফাতান' (মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো)। সুতরাং বুঝতে হবে এ হুকুমটির মাধ্যমে চারমাস যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম হওয়ার নির্দেশনাটি রহিত হয়েছে। এ রকম বলেছেন কাতাদা, আতা খোরাসানী, জুহুরী এবং সুফিয়ান সওরী। তারা তাদের অভিমতের দলিল পেশ করেছেন এভাবে— রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধের সময় হাওয়াজেনদের বিরুদ্ধে এবং তায়েফে সাক্বিফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অবরোধ করেছিলেন শাওয়াল মাসে এবং জিলক্বদের কিছু অংশে। অথচ জিলক্বদ ছিলো নিষিদ্ধ ঘোষিত চার মাসের অর্ন্তভূত।

বিশুদ্ধ মত এই যে, এখানে যে নিষিদ্ধ মাসের উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রচলিত পরিভাষার নিষিদ্ধ মাস নয়। এ মাসগুলো নিষিদ্ধ বলার কারণ শুধু এই যে, এই চার মাসে মোশরেকদের আরবের যেখানে ইচ্ছা নিরাপদে ভ্রমণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

'অতএব তোমরা দেশে চার মাস ভ্রমণ করে নাও' এই ঘোষণা নাযিল হবার দিন থেকেই তার শুরু।

এই চার মাস উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সকল মোশরেককে হত্যা করা, বন্দী করা ও নিরাপদ স্থানে লুকালে অবরোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ওৎ পেতে থেকে তাকে পাহারা দিয়ে কোথাও পালাতে বা চলে যেতে না দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, চাই তাকে যেখানেই পাওয়া যাক না কেন। তার সাথে আর কোনো পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এখন যদি তাদেরকে হত্যা করা হয়, তবে সেটা অতর্কিত হত্যা করা হবে না এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হত্যা করা হবে না। তাদের চুক্তিগুলো বাতিল করা হয়েছে এবং তাদের জন্যে কী পরিণাম অপেক্ষা করছে, তা তারা আগে থেকেই জানে। তবে মেয়াদী চুক্তিধারীদের কথা ভিন্ন। তাদের সাথে তাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

হজরত জায়েদ বিন তয়েস বর্ণনা করেছেন, আমি তখন হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে কোন কথা প্রচারের জন্যে পাঠানো হয়েছিলো? তিনি বলেছিলেন,

যারা রসুল স. এর সঙ্গে চুক্তি করেছিলো তাদের চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। আর যাদের সঙ্গে চুক্তি নেই তাদেরকে সময় দেয়া হবে চারমাস মাত্র।

তাফসীর ইবনে কাসীর, ৮,৯,১০,১১ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৫

না এবং ঐ বছর আবূ বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তাঁরা যিল মাজাযের বাজারসমূহে প্রত্যেক অলিতে-গলিতে, প্রত্যেক তাঁবুতে এবং মাঠে ময়দানে ঘোষণা করে দেন যে, চার মাস পর্যন্ত মুশরিকদেরকে অবকাশ দেয়া হলো, এর পরেই মুসলিমদের তরবারী তাদের উপর আঘাত হানবে। ঐ চার মাস হচ্ছে যিলহজ্ব মাসের বিশ দিন, মুহররম, সফর ও রবিউল আওয়াল এই তিন মাস পুরো এবং রবিউল আখির মাসের ১০ দিন। যুহরী (রঃ) বলেন যে,

ফী যীলালিল কোরাআন, নবম খণ্ডে, পৃষ্ঠা নং ৫৭।

সুরা তাওবার এই সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণার সাথে সাথে মুলত মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের যে কোন চুক্তি করার ধারণাই বাতিল হয়ে গেছে।

Translation of Ishaq's Sirat Rasul Allah, Page 288,

মক্কা বিজয়ের আগেও নবি সা এর পাঠানো সাহাবীরা নাখালায় মক্কার বাণিজ্য কাফেলায় লুট করে হামলা চালিয়ে কুরাইশ আমর বিন আল হাদ্রামিকে নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করে। মক্কার কুরাইশদের বোকা বানিয়ে হত্যা করার জন্য নবির সাহাবি মাথা কামিয়ে হজ্জ যাত্রীর বেশ ধরেন, যার ফলে মক্কার কাফেলা এই মুসলিম সাহাবিদের কাছ থেকে হামলা প্রত্যাশা করেন নি। নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করে নবি সা শুধু মক্কার কুরাইশ নয় এমনকি মদিনার মুসলিমদেরও সমালোচনায় পড়েন আর মদিনার ইয়াহুদিরা এই হত্যাকে অশুভ ইঙ্গিত বলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

"তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক।"

এই বাক্যের ব্যাখ্যা তাফসীরে ইবনে কাসিরে উল্লেখ রয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসির চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৭

وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ অর্থাৎ 'তোমরা বিনা চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় তাহাদিগকে নিজেদের সামনে পাইবার ভরসায় নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিও না; বরং তাহাদিগকে ধরিবার জন্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিও এবং ওঁৎ পাতিবার স্থানসমূহে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিও। এইরূপ বিশাল পৃথিবীকে তাহাদের জন্যে সংকীর্ণ করিয়া দিও। ফলে তাহারা হয় নিহত হইবে, আর না হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে।'

হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মক্কার কাফের- মুশরিকরা নবি সা সহ তার দলের সকল মুসলিমের হজ্জ করার অধিকার বজায় রাখলেও, নবি, কাফের- মুশরিকদের যুগ যুগ ধরে পালন করা হজ্জ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। এর কারণটি অবশ্য সুরা তওবার ২৮ নং আয়াতে বলা পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছেঃ

হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সুরা তাওবা ৯:২৮

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুশরিকেরা কুকুরের মতো অপবিত্র। কুকুরের দেহ যেমন নাপাক, তেমনি মুশরিকদের শরীরও নাপাক। হজরত ইবনে আব্বাস

তাফসীরে মাযহারী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮

আল্লাহ তা'আলা যখন মুশরিকদেরকে বাইতুল হারামের হজ্জ করতে নিষেধ করে দিলেন, তখন মু'মিনের অন্তরে হয়তো এ ধারণা উঁকি দিতে পারে যে, তাহলে তো হজ্জে লোক সমাগম কম হবে, ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিবে, ফলে তাদের মাঝে চরম অর্থ সংকট সৃষ্টি হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের বললেন, তোমাদের অর্থ সংকট দূর করার আরেকটি পথ খুলে দেয়া হল। তা হল জিযিয়া। তোমরা যে পরিমাণ সম্পদ হ্রাসের ভয় পাচ্ছ, তার চেয়ে বেশি আসবে এই জিযিয়ার মাধ্যমে।

জিযিয়া হল মুসলমানদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের একটি নতুন পন্থা ও পদ্ধতি। কারণ, বাইতুল মাল অর্থাৎ ইসলামী খিলাফতের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থের উৎস হল জিযিয়া। জিযিয়ার মাঝে ফাইও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশও বাইতুল মালে নেয়া হবে।

আর গনীমতের মাল হল, যা যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের থেকে অর্জন করা হয়। আর ফাই হল, যা যুদ্ধ ছাড়া সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে কাফিরদের থেকে গ্রহণ করা হয়।

তাই মুসলমানরা যদি কোন দুর্গ জয় করতে চায় আর দুর্গের অধিবাসীরা যদি অর্থের বিনিময়ে সন্ধি করে; যেমন, আমরা তাশাউনী দুর্গ অবরোধ করলাম; তখন দুর্গের প্রধান ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলল, আপনারা চলে যান আমরা আপনাদেরকে একশ' মিলিয়ন আফগানী মুদ্রা প্রদান করব। তাহলে এই একশ' মিলিয়ন আফগানী মুদ্রা ফিকাহ বিশারদদের পরিভাষায় ফাই। চাষাবাদের জমিনের খেরাজও ফাই-এর অন্তর্ভুক্ত এবং জিযিয়াও ফাই-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, জিযিয়া হল মানুষের কর, খেরাজ হল ফসলি জমিনের কর।

যেমন আমরা যদি যুদ্ধ করে বুখারা দখল করে নেই। ইতোমধ্যে যদি সমরকন্দের অধিবাসীরা পালিয়ে যায় বা তাদের প্রতিনিধিদল এসে বলে, আমরা যুদ্ধ ছাড়া শহর আপনাদের হাতে সমর্পন করছি, তাহলে বুখারার অধিবাসীদের ধনসম্পদ হবে গনীমতের মাল আর সমরকন্দের অধিবাসীদের ধন-সম্পদ হবে ফাই-এর মাল। তাই ফসলি জমিনের উপর যে কর আরোপ করা হয়, তার নাম খেরাজ। আর যুদ্ধ-সক্ষম ব্যক্তিদের উপর যে কর আরোপ করা হয় তার নাম জিযিয়া। ইনশাআল্লাহ আমরা তা পদানত করতে পারব। গনীমত আর ফাই-এর মাল আমরা হস্তগত করতে পারব। আর পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট উপার্জন হল গনীমতের মাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

جعل رزقي تحت ظلال رمحي —

"আমার রিযিক আমার বর্শার নীচে রাখা হয়েছে।"

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে, মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন, তোমরা ভয় কর না। কারণ, শীঘ্রই তোমাদের উপর ধনসম্পদ বন্যার পানির ন্যায় উপচে পড়বে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফতকালে শুধুমাত্র ইরাক থেকেই ১২০ মিলিয়ন দিরহাম খেরাজ আসত। সুবহানাল্লাহ, ১২০ মিলিয়ন দিরহাম! সেই যুগে!

আধুনিক ইসলামি জিহাদের জনক ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম সুরা তাওবার এই ২৮ নং আয়াতের তাফসির করতে যেয়ে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন যে কাফের- **মুশরিককদের হজ্জ নিষিদ্ধ করাতে মুসলিম উম্মা যে বাণিজ্য হারানোর আশংকা করেছিল, নবি সা জিজিয়া, মালে গনিমত ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই সব সাহাবিদের আস্বস্ত করেন।** ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম আল কায়েদার একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান রূপকার। উনি **কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জিজিয়াকে মুসলমানদের আয়ের অন্যতম উৎস বলেছেন এবং অমুসলিমদের করজোড়ে লাঞ্ছনার মাধ্যমে জিজিয়া নিতে উৎসাহ দিয়েছেন আর গনিমতের মালকে বলেছেন পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট উপার্জন** ।

সুরা তওবা আয়াত নং ৫ বা তরবারির আয়াতে কাফের- **মুশরিকদের হত্যার বিধান ছাড়াও আহলে কিতাব তথা ইহুদি – নাসারা ও মুনাফিকদের কতল করার বিধান সংবলিত আরও তরবারির আয়াতের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল** (সুত্র তাফসীর ইবনে কাসীর, ৮,৯,১০,১১ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪৪-৬৪৫)

যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে তরবারীর আয়াত যা মুশরিকদের সাথে কৃত সমস্ত সন্ধি-চুক্তিকে কর্তন করে দিয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, সূরায়ে বারাআত অবতীর্ণ হওয়ার চার মাস পরে কোন সন্ধি ও চুক্তি অবশিষ্ট থাকেনি। পূর্বশর্তগুলো সমতার ভিত্তিতে ভেঙ্গে দেয়া হয়। এখন বাকী শুধু ইসলাম ও জিহাদ। আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে তরবারীসহ পাঠিয়েছেন। প্রথম তরবারী আরবের মুশরিকদের মধ্যে প্রয়োগের জন্যে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

অর্থাৎ "তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর।" এ রিওয়ায়াতটি এভাবে সংক্ষিপ্ত আকারেই আছে। (আলী রাঃ বলেনঃ) আমার ধারণা এই যে, দ্বিতীয় তরবারী হচ্ছে আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধের জন্যে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ "আহলে কিতাবদের ঐ লোকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো, যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং দ্বীন কবূল করে না, যে পর্যন্ত না তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হয়।" (৯ঃ ২৯)

Surat at Tawba Tafsir. Ibn Juzayy: at-Tashil fi 'ulum al-Qur'an

অনুবাদঃ "মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও" এই আয়াত কুরানের পূর্বের সকল শান্তি চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। এবং এই তরবারির আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী সুরা মুহাম্মাদের ৪ নং আয়াতের "অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও" এই অংশটি রহিত বা মানসুখ করে দিয়েছে।

"অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। (সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:৪)"

Surat at Tawba Tafsir. As-Suyuti: al-Iklil fi Istinabat at-Tanzil

অনুবাদঃ এই তরবারির আয়াত কোরানের পূর্ববর্তী ক্ষমা করার, সন্ধি করার আয়াত বাতিল করে দিয়েছে। এই আয়াত বন্দি নেওয়া, অবরোধ করে রাতের অন্ধকারে আক্রমন চালানর পক্ষে দালিলিক প্রমান। মুশরিকরা শুধু মাত্র তাদের শিরক থেকে তাওবা করলেই তাদের ক্ষমা করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নামায কায়েম করে ও জাকাত প্রদান করে।

এই একই আয়াতের উপর ভিত্তি করে প্রথম খলিফা আবু বকর নবি মৃত্যুর পর যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

চুক্তি, চুক্তি ভঙ্গ, সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদির প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও" এই তরবাবির আয়াতের পূর্বের আয়াত সমূহ বিশেষত সুরা তওবার এক ও চার নং আয়াতে কাফের মুশরিকদের সাথে চুক্তি বাতিল, সম্পর্কচ্ছেদ, ভবিষ্যতে যেকোন চুক্তি হবেনা ইত্যাদি বলা হয়েছে, যেমনটি পুনরায় উল্লেখ করা হলঃ

১। সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে।

৪। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি বদ্ধ, অতপরঃ যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

গোত্র ভিত্তিক তৎকালীন আরব সমাজে গোত্র বিরোধ, গোত্রে গোত্রে যেমন শত্রুতা থাকত তেমনি গোত্ররা নিজেদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করে চুক্তিবদ্ধ হতেন এবং এই চুক্তি সর্বতভাবে সবাই মেনে চলত। নবি সা আরবের এই প্রথা বেশ ভালভাবেই জানতেন। তিনি এও জানতেন যে কাফের মুশরিকদের তিনি যতই ঘৃণা করুন না কেন, চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় আরবরীতির বরখেলাপ করে তাদের কতল করা তৎকালীন মুসলমানরাও মেনে নিতে দ্বিধা করবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র জাজিরাতুল আরবে শুধুমাত্র

ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিজের নবুওতকে পাকাপোক্ত করতে কাফের মুশরিকদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করা উনার জন্য আবশ্যক ছিল। মক্কা বিজয়ের পর আর সকল ইয়াহুদিদের হত্যা, উচ্ছেদ আর জিজিয়া করের আওতায় আনার পর নবি সা এর আধিপত্য চ্যালেঞ্জ করার মত কোন শক্তি আর আরবে অবশিষ্ট ছিলনা, কাজেই পূর্বের সকল চুক্তি বাতিল করার প্রকৃষ্ট সময় ছিল সেটা।

চুক্তির ভিত্তিতে কাফের মুশরিকদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়ঃ

প্রথমত, যাদের সাথে মুসলমানদের নির্দিষ্ট মেয়াদে চুক্তি আছে, যেমন কুরায়েশদের সাথে ১০ বছর মেয়াদি হুদাইবিয়ার চুক্তি। দ্বিতীয়ত, যাদের সাথে মেয়াদ উল্লেখ না করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তি আছে। তৃতীয়ত, যাদের সাথে কোন চুক্তি নাই।

এই তিন শ্রেনির কাফেরদের মধ্যে কুরায়েশদের সাথে ১০ বছর মেয়াদি হুদাইবিয়ার চুক্তি নবি বাতিল করেন চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে ও তাদের হয় ইসলাম গ্রহন অথবা আরবভুমি ত্যাগের জন্য ৪ মাস সময় দেওয়া হয় নতুবা তরবারির আয়াত কার্যকর করা হবে। যাদের সাথে চুক্তি নাই বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তি আছে তাদেরও অনুরূপ শর্তে ৪ মাস সময় দেওয়া হয়।

মোদ্দা কথা হল যে কোন মেয়াদেই হোক পরিশেষে সকল কাফের মুশরিকদের সাথে সকল চুক্তিই বাতিল করা হয় ও সকলকে তরবারির আয়াতের আইনের আওতায় আনা হয়। **ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন প্রকৃত পক্ষে সুরা বারাআত(তওবা) নাজিল হওয়ার ৪ মাস পরে আর কোন চুক্তিই বহাল থাকেনি**, এখন বহাল শুধু ইসলাম ও জিহাদ (ইবনে কাসিরের তাফসীর থেকে "নবি সা এর পক্ষ হতে কাফের- মুশরিকদের প্রতি ঘোষণা")

তাফসিরে জালালাইনেও কাফের- মুশরিকদের প্রতি একই সিদ্ধান্তর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ চুক্তি মেনে চলুক বা ভঙ্গ করুক নির্দিষ্ট মেয়াদের পর মক্কায় আর কোন কাফের বা মুশরিক থাকতে পারবে না।

তাফসীরে জালালাইন দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৬২৫

এ সাধারণ ঘোষণার পর প্রথম শ্রেণিভুক্ত মক্কার মুশরিকদের পক্ষে নিষিদ্ধ মাসগুলোর শেষ অর্থাৎ দশম হিজরির মহররম মাস, দ্বিতীয় শ্রেণির পক্ষে একই হিজরির রমজান মাস এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পক্ষে উক্ত হিজরির রবিউস্‌সানী গত হলে আরবভূমি ত্যাগ করার বিধান ছিল। নতুবা তারা যুদ্ধের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ আদেশ অনুযায়ী হজের আগামী মৌসুমে আরবের সীমানায় কোনো কাফের মুশরিকের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। এ কথাটি সূরা তওবার ২৮ তম আয়াতে ব্যক্ত করা হয় এরূপে فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا অর্থাৎ চলতি মাসের পর এরা মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ "এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ্ব করবে না" এর মর্মার্থও তাই। এ পর্যন্ত সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতের তাফসীর ঘটনাবলির আলোকে বর্ণিত হলো।

তাফসীরে ইবনে কাছীর চতুর্থ খণ্ড,

৫৩০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন— 'যে সকল মুশরিকের সহিত তোমাদের সন্ধি চুক্তি রহিয়াছে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করিলে 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' অতিবাহিত হইবার পর তাহাদিগকে হত্যা কর।' উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে মুশরিকদের সহিত মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় সন্ধিচুক্তিকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্বে যে বিষয়টিকে তিনি চুক্তি পালনের শর্ত হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা উহাকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণনায় এটা অতি পরিষ্কার যে চুক্তি মেয়াদ যাই হোক না কেন, নবির দেয়া আল্টিমেটামের সময় পার হয়ে গেলে যদি কাফির- মুশরিকরা ইসলাম ধর্ম গ্রহন না করে, তবে তাদের হত্যা করতে হবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত দিক ইবনে আব্বাস (রা) এর উক্তিতে পরিস্কার হয়েছে যে, পূর্বে যে বিষয়টিকে চুক্তি পালনের শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (অর্থাৎ ৪ নং আয়াতের "তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি বদ্ধ, অতপরঃ যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর।") তরবারির আয়াতদিয়ে তাও রহিত করা হয়েছে, এর অর্থ এই নয় যে তাদেরকে চুক্তিতে বহাল থাকা অবস্থায় হত্যা করার কথা বলা হয়েছে, বরং চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে ও ইসলাম গ্রহন না করলে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করতে বলা হয়েছে।

[[**ইসলামের যে কোন কিছুর ব্যাখ্যা নবির সময়কালিন ও পরবর্তী তিন প্রজন্ম যে ভাবে বুঝেছিলেন ঠিক সে ভাবেই বুঝতে হবে, এই ক্ষেত্রে এমনকি পরবর্তী ইসলামি পণ্ডিতদের ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।** তারা শুধুমাত্র নতুন কোনো বিষয় উদ্ভূত হলে বর্তমান সব দায়ীদের ঐক্যমত্য অনুসারে সে বিষয়ে কিয়াস/ইজতিহাদভিত্তিক মাসাআলা বা ফতোয়া দিতে পারে।]]

তাফসীর ফী যীলালিল কোরআন, নবম খণ্ড

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

৯ সূরা আত্ তাওবা (৩৭) পারা ১০ মনযিল ২

তাফসীর

আয়াত ১-২৮

সূরার এ পর্বটা শুরুতে থাকলেও এটা সূরার অন্যান্য অংশের পরে নাযিল হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, কোন সূরার ভেতরে কোন আয়াত কোন আয়াতের আগে বা পরে বসবে, সেটা স্বয়ং রসূলই (স.) স্থির করতেন এবং তিনিই আদেশ দিয়ে সেইভাবে লেখাতেন।

এই সময় পর্যন্ত মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের যে সব চুক্তি ছিলো, সেগুলো বাতিল করার ঘোষণা এ অংশে দেয়া হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের চুক্তিধারী অথবা চুক্তি লংঘনকারীদের বেলায় চার মাস পর চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। আর যাদের সাথে নির্দিষ্ট চুক্তি ছিলো কিন্তু তারা তা ভংগও করেনি এবং মুসলমানদের ওপর কোনো শত্রুকে আক্রমণ চালাতে প্ররোচনাও দেয়নি, তাদের ক্ষেত্রে ওই মেয়াদ শেষে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে।

মোট কথা, চূড়ান্ত পরিণতি এই দাঁড়িয়েছিলো যে, সমগ্র আরব উপদ্বীপের সকল মোশরেকের সাথে সকল চুক্তির অবসান ঘটানো হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে মোশরেকদের সাথে সর্বতোভাবে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে, মোশরেকদের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকাকে অবাঞ্ছিত বলে ব্যক্ত করার মাধ্যমে এরূপ মনোভাবও প্রকাশ করা হয়েছে যে, মূলত মোশরেকদের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদনের নীতি ও ধারণাই পরিত্যক্ত ও বাতিল হয়ে গেছে।

'সূরা তাওবায় মোশরেকদের সাথে করা সকল মেয়াদবিহীন চুক্তি বাতিলকরণ ও মেয়াদী চুক্তি যারা লংঘন করেনি তাদের ক্ষেত্রে মেয়াদ পূর্ণ করণের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই হলো তার আইনগত ভিত্তি। যে মহৎ উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাহলো আরব উপদ্বীপ থেকে শেরেককে সর্বশক্তি দিয়ে নির্মূল করা ও ওই দেশটাকে সর্বতোভাবে মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট করা। তবে সূরা বাকারার ১৯০ নং আয়াতে ('যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো') এবং সূরা আনফালের ৬১ নং আয়াতে ('যদি তারা শান্তির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে তোমরাও তার প্রতি আগ্রহী হও') বর্ণিত মূলনীতি সর্বাবস্থায় যথাসাধ্য মেনে চলতে হবে, যদিও অধিকাংশ ফেকাহবিদ আনফালের এ আয়াত তাওবার আয়াতে যুদ্ধ ঘোষণা ও মোশরেকদের চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে বলে মত পোষণ করে থাকেন।'

সুরা তাওবার এই সম্পর্কচ্ছেদের বিষয় ও অমুসলিমদের সাথে কোন চুক্তি না করার এই ফরমান ইসলামি জিহাদি শাসকেরা যারা কোন কাফের রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাদের কাফির ফাতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার বৈধতা হিসাবে ব্যবহার করেছে।

উপরের বর্ণনাগুলো ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সুরা তাওবার বিধান অনুযায়ী জিহাদের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির উপর ইসলামী শাসন বাবস্থা কায়েম করার কথা বলা হয়েছে এবং ইসলাম ব্যাতীত কোন ভিন্ন মত বা বাবস্থা বরদাস্ত করা হবে না, এই ক্ষেত্রে কোন পরমত সহিষ্ণুতা বা উদারনীতি গ্রহন করা হবে না। ঠিক এই ইসলামী আকিদার ভিত্তিতেই সকল ইসলামি জিহাদি দল গুলো যে কোন রাষ্ট্র, গোত্র, স্থাপনা,ভিন্ন মতের মসজিদ, মন্দির, গির্জা, সিনেমা হল, রমনা বটমুল, হলি আর্টিসান রেস্টুরেন্টে মানবজীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভুতি না দেখিয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে হামলা চালায়।

নীচের তাফসিরে অন্যান্য তাফসিরের মতই বক্তব্য পাওয়া যায়, তবে "আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসলামের জন্য গুপ্তহত্যার কোরান ভিত্তিক বৈধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা। নবম হিজরীর রজব মাসে গাযওয়ায়ে তাবুকের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে অবতীর্ণ হয়েছে এই সূরা। তাই এ সূরা থেকেই জিহাদ সংক্রান্ত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক বিধি-বিধান গ্রহণ করতে হবে। যে বিধি-বিধান কিয়ামত পর্যন্ত আর পরিবর্তন হবে না।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সূরাটি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তাতে মৌলিকভাবে ছয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম বিষয় ঃ শুরুর আটাশটি আয়াতে আরব উপদ্বীপের সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, মেয়াদ পর্যন্ত তাদের চুক্তি রক্ষার হুকুম দেয়া হয়েছে। নতুন চুক্তি নিষেধ করা হয়েছে। আর যুদ্ধ ঘোষণায় এতটুকু অনুকম্পা করা হয়েছে যে, তাদের চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছে। এ চার মাসের মধ্যে তারা হয় ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করে ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যথায় যেখানে খুশি চলে যাবে। কারণ, তখন পর্যন্ত দুর্বল-ঈমান মুসলমানদের সাথে কাফেরদের বিভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ প্রদান করেন।

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم۔

অর্থ : নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হলে যেখানেই মুশরিকদের পাবে হত্যা করবে।

অর্থাৎ আরব উপদ্বীপ মুশরিক, ইহুদী ও খ্রিস্টান থেকে মুক্ত করতে হবে। মুশরিকদের চার মাসের চূড়ান্ত সুযোগ প্রদান করা হল। এ চার মাস তারা নিরাপদে যথা ইচ্ছা যেতে পারবে। তারপরই তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ। যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করা হবে।

তবে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত আরব উপদ্বীপেই ছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব উপদ্বীপকে অন্যান্য ধর্মমুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। বললেন–

لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ـــ

"আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম একত্রিত হবে না।"

আরো বললেন–

أخرجوا اليهود و النصارى من جزيرة العرب ـــ

"তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের বের করে দাও।"

হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি ইহুদীদের খায়বর থেকে উচ্ছেদ করে তাইমা নামক স্থানে তাড়িয়ে দেন। তাইমা সিরিয়ার অঞ্চল– আরব উপদ্বীপের নয়। তাই হযরত উমর (রাঃ) ইহুদীদের খায়বর থেকে উচ্ছেদ করে তাইমায় পাঠিয়ে দেন।

কীভাবে হত্যা করবে? আমি আগেই বলেছি, যেভাবে পার হত্যা কর। তরবারীর আঘাতে, ছুরি দিয়ে, যবেহ করে বা গুলী করে যেভাবে পার হত্যা করো। তবে হত্যার ক্ষেত্রে সদাচরণ করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ـــ

"যখন তোমরা হত্যা করবে, উত্তমভাবে হত্যা করবে। আর যখন যবেহ করবে, তখন উত্তমভাবে যবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং জবাইকৃত প্রাণীকে শান্তি প্রদান করে।"

উল্লেখ্য, কারো দেহ বিকৃত করা হারাম। কান কাটা, চোখ উপড়ে ফেলা ইত্যাদি জীবিত বা মৃত কারো বেলায় জায়েয নেই। আরে, তুমি তো তাকে হত্যা করতে চাও, তাহলে হত্যা করে ফেল। তার রূহকে দেহমুক্ত করে দাও, সে জাহান্নামে চলে যাক। জাহান্নামে যাওয়ার থেকে বড় বিপদ আর কী হতে পারে। তুমি তার কান, নাক কাটায় ব্যস্ত আর সে মুনকির-নাকীর ফেরেস্তার মুখোমুখি। তারা লোহার গুর্জ দ্বারা এমন আঘাত করছে যে, তার বিকট চীৎকারের আওয়াজ মানুষ ও জ্বিন ছাড়া আকাশ ও জমিনের সকলে শুনতে পাচ্ছে।

واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد۔

"তাদের অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকো।" অর্থাৎ তাদেরকে তাদের দেশে, তাদের কেল্লায় বন্দী কর এবং তাদের সন্ধানে ওঁৎপেতে থাক। যখনই নাগালে পাবে, তখনই আক্রমণ করবে।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে গুপ্ত হত্যা জায়েয।

↥

প্রশ্নঃ তরবারির আয়াত (The sword verse) বা সুরা তওবার নং ৫ আয়াত কি যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধের নিয়ম সংক্রান্ত আয়াত ?
উত্তরঃ না, এটি মোটেও যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধের নিয়ম সংক্রান্ত আয়াত নয়। তরবারির আয়াতটি নাজিল হয় নবম হিজরিতে ও নবি যখন তাবুকের যুদ্ধ হতে মদিনায় ফিরছিলেন। এই আয়াতটিতে "মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও" বলতে নবি মক্কা ও এর আশেপাশের কাফিরদের বুঝিয়েছেন। এর আগের বছর অর্থাৎ অষ্টম হিজরিতেই প্রায় বিনা যুদ্ধে নবি মক্কা বিজয় করেছেন আর সেখানকার কাফির- মুশরিকরা বিনা শর্তে মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং মক্কায় নবির হুকুমতই জারি ছিল, নবির পক্ষ থেকে আত্তাব ইবনে আসিদ ছিলেন মক্কার দায়িত্বপ্রাপ্ত। কাজেই এই তরবারির আয়াতটি নবির সাথে সম্পূর্ণ শান্তি অবস্থায় থাকা কাফিরদের বিরুদ্ধে একতরফা হত্যার হুমকি। এই আয়াতটি মোটেও তাবুক যুদ্ধের নিয়ম সংক্রান্ত আয়াত নয়, উপরুন্ত তাবুক যুদ্ধে বাস্তবিক কোন যুদ্ধ হয়নি।

The Life of Muhammad: Al-Waqidi's Kitab Al-Maghazi (Routledge Studies in Classical Islam)

ধর্ম পরিবর্তন

৮৬৬ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

মুহাম্মদ আমাদিগকে ভীষণ ব্যথা দিয়াছে এবং আমাদের উপাস্যদিগকে কষ্ট দিতেছে। আমাদের দাবি হইল, আপনি তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিন যে, সে যেন কখনো আমাদের উপাস্যদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ না করে। অন্যথায় আমরাও তাহাকে এবং তাহার আল্লাহকে ক্ষমা করিব না।

এই কথা শুনিয়া আবূ তালিব হযরত নবী (সা)-কে ডাকিলেন এবং বলিলেন, উহারা তোমারই কওমের লোক এবং তোমারই চাচার আওলাদ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আপনার এই কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই এবং এই লোকদের আগমনের উদ্দেশ্যই বা কি?

তখন তাহারা বলিল, আমাদের উদ্দেশ্য হইল, তুমি আমাদের সহিত এবং আমাদের উপাস্যদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। তাহা হইলে আমরাও তোমার সহিত এবং তোমার আল্লাহর সহিত সদ্ব্যবহার করিব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিবে। তুমি আমাদের উপাস্যদিগকে গালি দেওয়া হইতে বিরত না হইলে আমরাও তোমার আল্লাহকে গালি দিব। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ 'তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।'

এখানে বিরাট অপকারিতা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য সামান্য উপকারিতা পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, যখন এই আয়াত— 'ইন্নাকুম ওয়ামা তা'বুদুনা মিন্‌দুনিল্লাহি হাসবু জাহান্নাম' (নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করো— সকলে জাহান্নামের ইন্ধন) অবতীর্ণ হলো, তখন মুশরিকেরা বললো, হে মোহাম্মদ! আমাদের প্রভু প্রতিমাগুলোর দোষ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকো। নইলে আমরাও তোমার প্রভুর দোষ বর্ণনা করবো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি।

কুরায়েশ নেতারা নতুন করে প্রস্তাব দিলো, তুমি আমাদের প্রতিমাগুলোকে গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকো। না হলে আমরা তোমাকে ও তোমার নির্দেশদাতাকে গালি দিবো। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, কেননা, তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে।

ওয়াক্কাস এই সময় একটা মরা উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হেনে মুশরিকদের একজনের মাথা ফাটিয়ে দেন। ইসলামের জন্য এটাই ছিল রক্তপাতের প্রথম ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক প্রকাশ্য দাওয়াত দিলেও যতক্ষণ তাদের দেব-দেবীর নামোল্লেখ বা সমালোচনা করেননি ততক্ষণ তারা তাঁর থেকে দূরে সরে যায়নি কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখরও হয়নি। কিন্তু যখন তিনি তাদের দেব-দেবীর সমালোচনা করলেন তখনই তারা তাঁর আন্দোলনকে একটা ভয়ংকর ও মারাত্মক জিনিস বলে মনে করলো।

তখন একদিন কুরাইশদের গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সদলবলে আবু তালিবের কাছে গিয়ে বললো, "হে আবু তালিব, আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীকে গালি-গালাজ করেছে, আমাদের ধর্মের নিন্দা করেছে, আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে বোকামী ঠাউরিয়েছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছে। এমতাবস্থায় হয় আপনি তাকে এসব থেকে বিরত রাখুন নতুবা তাকে শায়েস্তা করার জন্য আমাদেরকে সুযোগ দিন।"

আমরা বলেছিলাম, আপনার ভাতিজাকে নিষেধ করুন কিন্তু আপনি তা করলেন না। আল্লাহর কসম, আমরা এভাবে আর চলতে দিতে পারি না। সে আমাদের সমালোচনা, দেব-দেবীর নিন্দা ও আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে বোকামী ঠাওরানোর যে ধৃষ্টতা দেখিয়ে যাচ্ছে তা আমরা আর সহ্য করতে পারি না। এখন হয় আপনি তাকে নিবৃত্ত করবেন নচেৎ আমরা আপনাকে সহ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো

সেই কিশোর বয়সে ফাতিমা পিতার হাত ধরে একদিন গেছেন কা'বার আঙ্গিনায়। তিনি দেখলেন, পিতা যেই না হাজারে আসওয়াদের কাছাকাছি গেছেন অমনি একদল পৌত্তলিক একযোগে তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে লাগলো : আপনি কি সেই ব্যক্তি নন যিনি এমন এমন কথা বলে থাকেন? তারপর তারা একটা একটা করে গুনে বলতে থাকে : আমাদের বাপ-দাদাদের গালি দেন, উপাস্যদের দোষের কথা বলেন, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদেরকে নির্বোধ ও বোকা মনে করেন।

তিনি বলেন : হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।

↥

অপরকে) বিবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং 'যুন-নূরাইন' উপাধিতে আখ্যায়িত হন। যত দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) জনগণকে শুধু ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরায়শ তাঁর কোন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু যখনই প্রকাশ্য ঘোষণা, মূর্তিপূজার অসারতা ও খারাবী বর্ণনা করতে শুরু করলেন এবং কুফর ও শিরক থেকে লোকজনকে বারণ করতে লাগলেন, তখনই কুরায়শগণ নবী (সা)-এর প্রচণ্ড বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করে। কিন্তু আবূ তালিব তাঁর সহায় ও সাহায্যকারী হিসেবে থেকে যান।

একবার কুরায়শের কয়েক ব্যক্তি একত্র হয়ে আবূ তালিবের কাছে এসে বলল, আপনার ভাইপো আমাদের প্রতিমাগুলোকে মন্দ বলে, এগুলোর সমালোচনা করে, আমাদের ধর্মকে খারাপ আর আমাদেরকে আহমক, মূর্খ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। আপনি হয় তাকে নিষেধ করুন অথবা তার ও আমাদের মধ্যে কিছু হলে আপনি আসবেন না, আমরা নিজেরাই বোঝাপড়া করব। আবূ তালিব তাদেরকে

ঐসব লোকের একটি দল দ্বিতীয়বার আবূ তালিবের নিকট এলো এবং বলল, আপনার শরাফত ও মর্যাদা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য, কিন্তু নিজেদের প্রভুদের প্রতি অভিসম্পাত আর পূর্বপুরুষদেরকে আহমক ও মূর্খ বলার বিষয়টি আমরা সহ্য করতে পারি না। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারণ করুন, অন্যথায় লড়াই করে আমাদের কোন এক পক্ষ শেষ হয়ে যাবে। এ কথা বলেই তারা চলে গেল। পুরো খান্দান ও

বড়ই কাজের কথা

হযরত (সা)-এর কুফর ও শিরক বিরোধী প্রকাশ্য ঘোষণা এবং মূর্তি ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘৃণার দরুন তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের তীব্র শত্রুতা ও বিরোধিতার মুখে অটল থাকা এ বিষয়েরই প্রকাশ্য প্রমাণ যে, ঈমান এবং ইসলামের জন্য কেবল অন্তরে সত্যায়ন অথবা মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং কুফর ও কাফিরী এবং শিরকের বৈশিষ্ট্য ও আনুসঙ্গিকতার বিরোধিতা জরুরী এবং সেগুলো অপসন্দ করাও অত্যাবশ্যক।

৩৮৬৪ **উমর (রা) যখন ইসলামে ধর্মান্তরিত হল তখন মক্কার লোকেরা বলল- উমার ইবনুল খাত্তাব নিজ(বাপ দাদার) ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গেছে।** [তবে তারা তাকে এর জন্য হত্যা করেনি।]

ইবনে মাজাহ ২৫৩৫, সূনান আবু দাউদ (ইফা) ৪৩০১।

রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **যে মুসলমান** ব্যক্তি নিজের **ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে তোমরা হত্যা করো**।

২৯৫৪ আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল সা আমাদেরকে এক অভিযানে পাঠালেন। কুরাইশদের দু'জন লোকের নাম উল্লেখ করে বললেন, তোমরা যদি তাদের সাক্ষাৎ পাও তবে তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। অতঃপর আমরা রওয়ানা করার আগে বিদায় গ্রহণ করার জন্য রাসূল সা-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু আগুনের শাস্তি দান করার অধিকার আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো নেই। তাই তোমরা যদি তাদেরকে ধরে ফেলতে সক্ষম হও, তবে তাদের উভয়কে হত্যা করবে।

৩০১৭,৬৯২২ সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ) ৪৩০০

আলী (রা.) এক সম্প্রদায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন, যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিল। এ সংবাদ ইবনু আব্বাস (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, 'যদি আমি হতাম, তবে আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলতাম না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। নবী সা বলেছেন-**যে ইসলাম ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, তাকে হত্যা করে ফেল**।

↥

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
৬৮৭৮। রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেনঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। যথা- জানের বদলে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী, আর নিজের দ্বীন ত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তি। অর্থাৎ মুরতাদ হওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় অথবা মুসলমানদের ছেড়ে দেয়।

সুনান আবু দাউদ (ইফা), অধ্যায়ঃ শাস্তির বিধান
৪৩০০। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **যদি কেউ দ্বীন(ইসলাম ধর্ম) পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করবে**।

৪৩৪১,৪৩৪৪ রাসূল সা আবূ মূসা এবং মুআয ইবনু জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে বলে দিলেন, তোমরা কোমল হবে, কঠোর হবে না। এরপর তাঁরা দু'জনে নিজ নিজ কর্ম এলাকায় চলে গেলেন। মু'আয (রা.) একবার খচ্চরের পিঠে চড়ে আবূ মূসার এলাকায় পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, আবূ মূসা (রা.) বসে আছেন আর তাঁর চারপাশে অনেক লোক জমায়েত হয়ে আছে। আরো দেখলেন, পাশে এক লোককে তার গলার সঙ্গে উভয় হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। মুআয (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ মূসা। এ লোকটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, এ লোকটি **ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ(ধর্মত্যাগ করেছে) হয়ে গেছে**। **মু'আয (রা.) বললেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সাওয়ারী থেকে নামব না**। আবূ মূসা (রা.) বললেন, এ উদ্দেশ্যেই তাকে আনা হয়েছে, কাজেই আপনি নামুন। তিনি বললেন, না তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামব না। ফলে আবূ মূসা (রা.) হুকুম করলেন এবং লোকটিকে হত্যা করা হল। এরপর মুআয (রা.) নামলেন।

৭১৫৭ আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, **এক লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার ইয়াহূদী হয়ে যায়**। মুআয (রা.) বললেন, **একে হত্যা না করে আমি বসব না**। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের এটাই বিধান।

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)
৪৬১২। মু'আয (রা) যখন আবূ মূসা(রা) এর নিকট গিয়ে পৌছলেন, তখন তার নিকট হাত পা বাঁধা অবস্থায় একটি লোক ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এ লোকটি কে? আবূ মূসা(রা) বললেন, **লোকটি প্রথমে ইয়াহুদী ছিল, তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সে আবার তার আগের ধর্মে ফিরে যায় অর্থাৎ ইয়াহুদী হয়ে যায়**। মু'আয (রা) বললেন, যতক্ষণ আল্লাহ ও তার রসূল সা এর বিধান অনুসারে তাকে হত্যা করা না হবে, ততক্ষণ আমি বসবো না। এরূপ তারা তিনবার কথোপকথন করলেন। এরপর তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো।

৪০৬ মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)

(১৮) باب القضاء فيمن ارتد عن الا سلام

পরিচ্ছেদ ১৮ : ইসলাম ত্যাগ করিলে তাহার ফয়সালা

রেওয়ায়ত ১৫

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ দীন (ধর্ম)-কে পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। মালিক (র) বলেন যে, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্-এর কথা-যে দীন পরিবর্তন করিয়া ফেলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও"- এর অর্থ এই যে, কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া দেয় ও ধর্মত্যাগী (যিনদীক) বা এই ধরনের কিছু হইয়া যায় তবে তাহাদের উপর মুসলমানগণ বিজয়ী হইলে তাহাদিগকে কতল করিয়া দেওয়ার হুকুম। তাহাদিগকে তওবা করারও সময় দেওয়া হইবে না কারণ তাহাদের তওবার কোন মূল্য নাই। যেহেতু তাহাদের অন্তরে কুফরী অংকিত হইয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করিবে এবং অন্তরে কুফরী করিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি কোন কারণে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যায় তবে তাহাকে তওবা করাইবে। আর যদি তওবা করিতে অস্বীকার করে তবে হত্যা করিয়া দিবে। আর যদি কোন কাফের অন্য কোন কুফরী ধর্ম গ্রহণ করে যেমন ইহুদী হইতে নাসারা হইয়া গেল তবে সে তাহার দীন পরিবর্তন করিয়াছে বলিয়া এই হাদীস বোঝা যায় না। এই হাদীস দ্বারা একমাত্র ইসলাম হইতে বহিষ্কার হওয়ার হুকুম প্রকাশ পায়।

↥

রেওয়ায়ত ১৬

মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট হইতে এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট আসিল। উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেখানের লোকের কি অবস্থা? সে সেখানের অবস্থা বর্ণনা করিল। অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, সেখানে কোন নূতন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার কাফের হইয়া গেলে তোমরা তাহাকে কি করিয়াছ? সে বলিল, তাহাকে বন্দী করিয়া শিরোশ্ছেদ করিয়াছি। উমর (রা) বলিলেন, তোমরা যদি তাহাকে তিন দিন পর্যন্ত বন্দী করিয়া রাখিতে আর খাইতে শুধু ১টি রুটি দিতে এবং তওবা করাইতে তবে হয়ত সে তওবা করিত এবং আল্লাহর দীনের দিকে আসিয়া যাইত।

ইযাহুল মুসলিম ৪০৩

মুরতাদের হুকুম

মুরতাদের হুকুম হলো তাকে হত্যা করা। চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় তাকে হত্যা করা ওয়াজিব এবং তার রক্ত মূল্যহীন হয়ে যায়। মুরতাদকে হত্যা করার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যথা ঃ

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

"যে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলামকে ত্যাগ করলো তাকে হত্যা করো।"

আর যার কাছে আগে থেকেই দাওয়াত পৌছেছে তাকে নতুন করে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। কুরআনের আয়াত فاقتلوا المشركين এবং হাদীস من بدل دينه فاقتلوه-এ অবকাশ দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া মুরতাদ হলো হরবী কাফিরের মত যাকে অবকাশ দেয়া জরুরী নয়। আর সে যিম্মিত নয় কেননা তার থেকে জিযিয়া (কর) আদায় করা হয় না। সুতরাং অবকাশ না দিয়েই তাকে হত্যা করা যাবে।

"উম্মে রুমান নামী এক মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে রাসূল (সা.) তাকে তিনদিনের অবকাশ দেয়ার নির্দেশ দেন। এ সময়ে ইসলাম কবুল না করলে হত্যা করার আদেশ দেন। এমনিভাবে من بدل دينه فاقتلوه হাদীসে ব্যাপকভাবে নারী-পুরুষ সকল মুরতাদকে হত্যা করতে বলা হয়েছে।

(٥) عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ اِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ . ابوداود

"যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয় তার রক্ত হালাল হয়ে যায়।"

৫৪৬ বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন

ধারা-৪৪৪

মুরতাদের (ইসলাম ধর্মত্যাগীর) মীরাস

(ক) মুরতাদ তাহার মুসলিম আত্মীয়দের ওয়ারিশ হইতে পারে না।

(খ) মুরতাদ মুসলমান অবস্থায় যে সম্পদ উপার্জন করিয়াছে উহা তাহার মুসলিম ওয়ারিশগণ পাইবে এবং ধর্মত্যাগের পরে অর্জিত মাল "বাইতুল মাল"-এ জমা হইবে; কিন্তু

(গ) মুরতাদ নারীর সমস্ত সম্পত্তি তাহার মুসলিম ওয়ারিশগণ লাভ করিবে।

১৫

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, যদি মুরতাদ্ (ধর্মত্যাগী-কাফির) পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করে, তা হলে কোরআন অনুসারে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (কতল) ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুরতাদ্দকে কতলের শাস্তি প্রদান করার প্রসঙ্গে বহু হাদীস শরীফও বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটা হলো - مَنْ بَدَّلَ دِيْنَـهُ فَاقْتُلُوْهُ অর্থাৎ যে (মুসলমান) আপন দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তাকে কতল করে দাও![2]

Islamqa থেকে একটি প্রশ্নোত্তরঃ

প্রশ্ন: মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) ব্যক্তির বিধান কী? এই বিষয়টি বুঝা কঠিন যে, এক ব্যক্তি একটা কথা বলল, আর সে কথাটার কারণে তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হবে...?!

উত্তর: প্রিয় প্রশ্নকারী, মুরতাদকে হত্যা করার বিষয়টি আল্লাহর আদেশেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যেহেতু আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর"। রাসূল সা মুরতাদকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সারকথা হচ্ছে- **আল্লাহ তাআলা এই ধর্ম নাযিল করেছেন এবং তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করা অপরিহার্য করেছেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলাম ত্যাগকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। এই শাস্তি মুসলমানদের চিন্তাপ্রসূত নয়, পরামর্শভিত্তিক নয়, ইজতিহাদনির্ভর নয়।** বিষয়টি যেহেতু এমন তাই আমরা যাঁকে ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়েছি তাঁর হুকুমের অনুসরণ করতেই হবে। ---- শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

ইদানিংকালে জাকির নায়েক সহ অনেক দাইয়ী দাবী করেন যে, আমভাবে মুরতাদদের কতল করার বিধান ইসলামে নেই, বরঞ্চ শুধুমাত্র বিদ্রোহী মুরতাদদের হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছে। অথচ হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো পরিষ্কারভাবেই বলা আছে যে, এইসব দাবী একেবারেই মিথ্যা। মুরতাদক সে বিদ্রোহী হোক কিংবা না হোক, তাকে হত্যা করতে হবে-

দরসে তিরমিযী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬

মুরতাদের সাজা মৃত্যুদণ্ড

বর্তমান যুগে অনেক আধুনিক লোক মুরতাদের মৃত্যুদণ্ডকে অস্বীকার করেছে। বলেছে যে, মুরতাদকে কতল করার আদেশ শরিয়তে নেই। তাঁরা কোরআনে কারিমের নিম্নেযুক্ত আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করে- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৬)

'দীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।'

সুতরাং যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তাকে কতল করা হবে না। তারা এ অনুচ্ছেদের হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করতে গিয়ে বলে যে, এই হাদিসে শব্দটি اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ এর কয়েদ। হাদিসের অর্থ শুধু মুরতাদ হয়ে যাওয়া মৃত্যুদণ্ডের কারণ না, যতোক্ষণ পর্যন্ত এর সঙ্গে جماعة বা দল হতে বিচ্ছেদ তথা বিদ্রোহ না পাওয়া যাবে। সুতরাং যখন কেউ মুরতাদ হয়ে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়, তখন সেটা মৃত্যুদণ্ডের কারণ হবে। শুধু মুরতাদ হওয়া মৃত্যুদণ্ডের কারণ না।

তাহলে এই দলিল সঠিক না। কেনোনা, অন্যান্য বর্ণনায় ব্যাপক আকারে বলা হয়েছে- مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ তথা যে তার দীন পরিবর্তন করবে তাকে কতল করো। তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগের অনেক ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে যেগুলোতে বিদ্রোহ না হওয়া সত্ত্বেও মুরতাদকে কতল করা হয়েছে। বস্তুত اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ-اَلتَّارِكُ لِدِيْنِهِ এর বিশদ বিবরণ দাতা, স্বতন্ত্র কয়েদ না। সুতরাং এ

↥

জিযিয়া

৩১৫৬ আল্লাহর বাণীঃ তোমরা যুদ্ধ করতে থাক **ইহুদী-খ্রিষ্টানদের** ঐ লোকদের বিরুদ্ধে, যারা ঈমান আনে না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, যে পর্যন্ত না তারা **বশ্যতা স্বীকার করে(করজোড়ে)** স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে। ......until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued. (সূরা তওবা: ২৯)

*__জিযিয়ার তাৎপর্যঃ__ কুফর ও শির্ক হল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কিন্তু আল্লাহ নিজের অসীম রাহমাত গুণে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে নিয়ে থাকতে চায় তবে তাদের থেকে জিযইয়াহ কর নিয়ে মৃত্যুদন্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে জিযিয়া(কর) বলে।

সুরা আনফাল ঃ আয়াত ৩৯, ৪০

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কথার অর্থ—মুশরিকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত শিরিক পরিত্যাগ না করবে, অথবা মুসলমানদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে জিযিয়া দিতে সম্মত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে। আলোচ্য নির্দেশনাটি দাঁড়াচ্ছে এ রকম—অবিশ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণ অনুগত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হবে শক্তি, বিজয় এবং একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ওই সময় পর্যন্ত সংগ্রাম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে—যতক্ষণ না তারা বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ' প্রতিষ্ঠা করে নামাজ এবং প্রদান করে জাকাত। যে এ রকম করবে আমার পক্ষ থেকে তার জীবন ও সম্পদ হয়ে যাবে সুরক্ষিত। আল্লাহ্ই তাদের অভ্যন্তরীণ হিসাব গ্রহণ করবেন (তিনি বিচার করবেন, তারা তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্যে, না অন্তরের তাগিদে ইসলাম গ্রহণ করেছে)। বোখারী ও মুসলিম।

করো। ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যাও (যতক্ষণ না তারা শুভ বুদ্ধিকে মান্য করে ইসলামের পথে আসে অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে স্বীকার করে তোমাদের বশ্যতাকে)।

যেহেতু তারা জিযিয়া দিয়ে তোমাদের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেছে, সেহেতু তোমরা আর তাদের প্রতি কোনো অত্যাচার কোরো না।

তাফসীরে মাযহারী/১১৭

সুরা তওবাঃ আয়াত ২৯

❒ যাহাদিগের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

↥

এখানে আঁইয়্যাদিঁউ অর্থ আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ। 'ইয়াদ' অর্থ হাত। এখানে অর্থ আনুগত্যের হাত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে, নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করতে হবে। অন্যের মাধ্যমে নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জিম্মীরা (কর প্রদাতা অবিশ্বাসীরা) নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করবে। অন্য কাউকে মাধ্যম নিযুক্ত করতে পারবে না। এ রকমও হতে

'জিযিয়া' হচ্ছে অপদস্থতার নিদর্শন। 'আন ইয়াদিন' কথাটির অর্থ এখানে— অপদস্থতার সঙ্গে জিযিয়া পরিশোধ করা। আবু উবায়দা বলেছেন, কাফেরদেরকে জিযিয়া দিতে হবে বাধ্যতার বিস্বাদ ও ভয়ের অনুভূতির সঙ্গে। এভাবে বাধ্যতামূলক দেয়কে আরববাসীরা প্রকাশ করে এভাবে— ফুলানুন আয়্'তা আন ইয়াদিন। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে— কৃতজ্ঞচিত্ততার নিদর্শনরূপে জিযিয়া দেয়া। অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান করতে হবে এ রকম মনোভাব নিয়ে যে 'মুসলমানেরা অতি মহৎ— তাই দয়া করে জিযিয়া গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

'সগিরুন' অর্থ নত হয়ে, অপমানিত ও পরাজিত হয়ে। হজরত ইকরামা বলেছেন, এখানে কথাটির উদ্দেশ্য হবে— জিযিয়া গ্রহণকারী থাকবে উপবিষ্ট অবস্থায়। আর প্রদানকারী দাঁড়িয়ে থাকবে তার সামনে। এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁদের স্কন্ধদেশ পদদলিত করে আদায় করতে হবে জিযিয়া। কালাবী বলেছেন, জিযিয়া গ্রহণকালে তাদের ঘাড়ে মুষ্টাঘাত করে প্রাপ্তি স্বীকারের কথা জানিয়ে দেয়া যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, জিযিয়া গ্রহণের সময় তাদের দাড়ি ধরে তাদেরকে চড় থাপ্পড়ও মারা যাবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তাদের জামার গলার কাছে ধরে বলপূর্বক তাদেরকে তাদের সঞ্চয়স্থলের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিধর্মীদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করার অর্থই তাদেরকে অপদস্থ করা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জিম্মীদেরকে ইসলামের বিধানের আওতায় আনার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে পরাভূত করা।

তাফসীরে মাযহারী/২৯১

আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে অগ্নিপূজকদের মতো মূর্তিপূজকদেরকেও ক্রীত-দাস ও ক্রীতদাসী বানানো যাবে। তাই অগ্নিপূজকদের মতো মূর্তিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়াও আদায় করা যাবে। সুতরাং গোলাম অথবা স্বাধীন উভয় অবস্থায় তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা বৈধ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুসলিমের মাধ্যমে ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আরবের অংশীবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল দু'টি— ইসলাম অথবা যুদ্ধ। মূর্তিপূজক ও মুরতাদেরা বন্দী হয়ে গেলে তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করা যাবে। রসুল স. আওতাস ও হাওয়াজেনদের পরিবার পরিজনদেরকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করেছিলেন। তারা ছিলো আরবী ও অংশীবাদী। বনী মুস্তালিকের পরিবার পরিজনদেরকেও এ রকম করা হয়েছিলো। আবু বনী হানিফা মুরতাদ হয়ে গেলে হজরত আবু বকর তাদের পরিবার পরিজনকে বানিয়েছিলেন গোলাম ও বাঁদী। আর ওই গোলাম বাঁদীদেরকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন মুজাহিদদের মধ্যে। মোহাম্মদ বিন আলী বিন আবু তালেবের আম্মা এবং জায়েদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমরের আম্মাও ছিলো তাদের মধ্যে।

বন্দী করে পূর্ণ কর্তৃত্বে নিয়ে আসার পর মুরতাদদের স্ত্রী-পুত্রকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে। কিন্তু অংশীবাদীদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অংশীবাদী আরবীদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে বন্দী করে ক্রীতদাস বানানো যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তিনটি উপদেশ প্রদান করেছিলেন— ১. আরব উপদ্বীপ থেকে অংশীবাদীদেরকে বিতাড়িত কোরো। ২. অন্যান্য দেশের কাফেরদেরকে কোরো বন্দী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করবোই। এই আরবে মুসলমান ছাড়া অন্য কারো বসবাসের অধিকার নেই। মুসলিম।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় জুহুরী থেকে একটি বর্ণনা এনেছেন। অনুরূপ বর্ণনা হজরত আবু হোরায়রা থেকে সালেহ্ বিন আখদারের মাধ্যমেও জুহুরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি এই— জাজিরাতুল আরবে দুই ধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সবশেষে ইসহাক বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন স্বসূত্রে।

হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর শেষ উপদেশ ছিলো— ইহুদীদেরকে হেজাজ থেকে এবং নাসারাদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও। আহমদ, বায়হাকী।

জিযিয়ার পরিমাণঃ ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— জিযিয়ার নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। জিযিয়া আদায়কারী এবং জিযিয়া প্রদাতা পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করবে। রসুল স. দুই হাজার জোড়া কাপড় পরিশোধের শর্তে ইয়ামেনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. দুই হাজার জোড়া বস্ত্রের বিনিময়ে নাজরানবাসীদের সঙ্গে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করেছিলেন। ওই চুক্তি অনুসারে নাজরানবাসীদেরকে সফর মাসের মধ্যে এক হাজার জোড়া এবং রজব মাসের মধ্যে এক হাজার জোড়া কাপড় দিতে হতো। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. নাজরানবাসীদেরকে একটি লিখিত ফরমান দিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিলো— তারা বছরে দুই হাজার জোড়া কাপড় দিবে। প্রতি জোড়ার মূল্য হতে হবে এক আউকিয়া। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, কিতাবুল আমওয়ালের বিবরণ অনুসারে প্রতি জোড়া কাপড়ের দাম চল্লিশ দিরহাম হয়— পঞ্চাশ দিরহাম নয় (যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন)।

এক জোড়া কাপড় অর্থ দু'টি কাপড়— তহবন্দ ও চাদর। ব্যক্তি ও ভূমি উভয়ের জন্য জিযিয়া হিসাবে কাপড় প্রদান করতে হতো। ইমাম আবু ইউসুফ

তাফসীরে মাযহারী/৩০১

৫৬২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

আদেশ দিতেছেন : আহ্‌লে কিতাব জাতিসমূহ লাঞ্ছিত অবস্থায় তোমাদিগকে জিযয়া কর না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

তা'আলা সর্বপ্রথম আহলে কিতাব জাতিসমূহের (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান জাতিদ্বয়ের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মুসলমানদের আদেশ দিয়াছেন।

উক্ত আদেশ অনুসারে হিজরী নবম সনে নবী করীম (সা) রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন। হিজরী নবম সনে এই আয়াত নাযিল হইবার পর সেই বৎসরই নবী করীম (সা) মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মুসলিম গোত্রসমূহের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তিনি এই বৎসরই রোমক সাম্রাজ্যের অধীনে সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইবেন। ঘোষণা অনুসারে ন্যূনাধিক ত্রিশ সহস্র মুসলিম যোদ্ধা নবী করীম (সা)-এর সহিত অভিযানে

তাফসীরে মাযহারী, পঞ্চম খণ্ড,

১৪৮ তাফসীরে সূরা তওবা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

حَتّٰى يُعۡطُوا الۡجِزۡيَةَ عَنۡ يَّدٍ وَّهُمۡ صٰغِرُوۡنَ ۝

অর্থ : লাঞ্ছিত অবস্থায় করজোড়ে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, প্রদানকারী হবে লাঞ্ছিত, অপদস্থ, অপমানিত।

ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন– জিযিয়া গ্রহণকারী বসে বসে গ্রহণ করবে আর প্রদানকারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা পরিশোধ করবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মাযহাবের ফকীহগণ বলেছেন– মুসলিম বালক বাম হাতে ইহুদী বা খ্রিস্টানদের দাড়ি ধরে টানবে আর তারা নতশিরে জিযিয়া আদায় করবে। কুরআনে বর্ণিত–

'عن يد و هم صاغرون' এর এই হল ব্যাখ্যা।

ফিকাহ বিশারদ আলেমগণ বলেছেন– জিযিয়ার টাকা চেক বানিয়ে বাইতুল মালের নামে পাঠিয়ে দিলে চলবে না। বরং জিযিয়া গ্রহণকারীর নিকট গিয়ে স্বহস্তে আদায় করতে হবে। তাহলেই কুরআনে যে লাঞ্ছনার কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হবে।

৫৬৪ তাফসীরে ইব্ন কাছীর

আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

যাহারা আল্লাহ্র প্রতিও ঈমান আনে না আর আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাকে হারাম করিয়াছেন, তাহাকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করে না এবং সত্য দীনকে মানিয়া চলে না, সেই সকল কিতাবধারীর বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের লাঞ্ছিত অবস্থায় এবং তোমাদের বিজয়ী অবস্থায় জিযিয়া কর প্রদান করে।

৫৬৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ অর্থাৎ যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে তাহারা যতক্ষণ না মুসলমানদের বিজয়ী অবস্থায় এবং নিজেদের লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবদমিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করিবে ... ...। উক্ত কারণেই কোন যিম্মীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বা তাহাকে কোন ভাবে মুসলমানের উর্ধ্বে রাখা মুসলমানের জন্যে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। তাহারা সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় থাকিবে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের লোকদিগকে আগ বাড়িয়া সালাম দিও না; আর তাহাদের কাহারো সহিত রাস্তায় তোমাদের সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে রাস্তার সংকীর্ণতম অংশ দিয়া চলিতে বাধ্য করিও।

উপরোক্ত কারণেই উমর (রা) শাম (বর্তমান সিরিয়া ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ) দেশের খ্রিস্টানদের সহিত সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে খ্রিস্টানদের পক্ষে লাঞ্ছনাকর শর্তাবলী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। একাধিক হাফিজে হাদীস ইমামগণ আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আশআরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : শাম দেশের খ্রিস্টানদের সহিত উমর (রা) যখন সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন আমি তাঁহার পক্ষ হইতে এই চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম :

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্ নামে আরম্ভ করিতেছি

ইহা হইতেছে শাম দেশের অমুক অমুক নগরের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে আল্লাহ্র বান্দা আমীরুল-মু'মিনীন উমরকে প্রদত্ত লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহ—'আপনারা যখন আমাদের নিকট আগমন করিলেন, তখন আমরা আমাদের নিজেদের জন্যে, আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্যে, আমাদের ধন-সম্পত্তির জন্যে এবং আমাদের সব ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্যে আপনাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলাম। উক্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা আমাদের নগরে বা উহার চতুষ্পার্শ্বে কোথাও কোন নূতন গীর্জা ইবাদতখানা নির্মাণ করিব না; কোন পুরাতন গির্জা বা ইবাদত খানা মেরামত করিব না; ইতিপূর্বে যে সকল গীর্জা ও ইবাদতখানা মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, উহাদিগকে গির্জা ও ইবাদত খানা রূপে পুনঃপ্রচলিত করিব না; আমাদের কোন গির্জায় রাত্রিতে বা দিনে কোন মুসলমান অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দিব না; আমাদের গির্জাগুলির দ্বারসমূহ পথিক ও মুসাফিরদের জন্যে উন্মুক্ত রাখিব; কোন পথিক মুসলমান আমাদের আবাসস্থলের কাছ দিয়া গেলে তিনদিন তাহাকে মেহমান রাখিয়া আপ্যায়ন করিব; আমাদের গির্জায় বা বাসস্থানে কোন গুপ্তচরকে আশ্রয় দিব না; মুসলমানদের সহিত কোনরূপ প্রতারণামূলক আচরণ করিব না; আমাদের সন্তানদিগকে কুরআন শিখাইব না; কোন প্রকারের 'শিরক'-এর কথা প্রকাশ করিব না; কাহাকেও 'শিরক'-এর প্রতি আহ্বান জানাইব না; আমাদের কোন আত্মীয় ইসলাম গ্রহণ করিতে চাইলে তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিব না; মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব; কোন মুসলমান আমাদের মজলিসে বসিতে চাহিলে সরিয়া গিয়া তাহার জন্যে জায়গা করিয়া দিব; মুসলমানদের লেবাস-পোশাকের ন্যায় আমরা কোন লেবাস-পোশাক পরিধান করিব না; টুপি পরিধান করিব না; পাগড়ী ব্যবহার করিব না; জুতা পরিধান করিব না এবং মাথায় সিঁথি কাটিব না; মুসলমানদের ভাষার ন্যায় ভাষা ব্যবহার করিব না; মুসলমানদের উপনামের ন্যায় উপনাম গ্রহণ করিব না; অশ্বাদি বাহনে গদি ব্যবহার করিব না; গলায় তরবারি ঝুলাইয়া চলাফেরা করিব না; কোন প্রকারের অস্ত্র রাখিব না; কোন প্রকারের অস্ত্র বহন করিব না; আংটিতে আরবী ভাষায় কোন কিছু খোদাই করিব না; মদের বেচা-কেনা করিব না; মস্তকের সম্মুখভাগের চুল ছাটিয়া ফেলিব; যেখানেই থাকি না কেন সর্বত্র ও সর্বদা টিকি রাখিব; দেহে পৈতাধারণ করিব; গির্জায় প্রকাশ্য স্থানে ক্রুশ রাখিব না; মুসলামানদের রাস্তায় বা তাহাদের বাজারে ক্রুশ বা নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করিব না; গির্জায় উচ্চ শব্দে ঘণ্টা বাজাইব না; মুসলমানের উপস্থিতিতে গির্জায় উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করিব না; ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কোনরূপ মিছিল বাহির করিব না; মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিব না; মুসলমানদের রাস্তা বা বাজারের মধ্য দিয়া মৃতদেহকে বহন করিয়া লইয়া যাইব না; কোন মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত দাসকে ব্যবহার করিব না; পথিক মুসলমানের প্রয়োজনে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিব এবং কোন মুসলমানের ঘরে উঁকি মারিব না। আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আশআরী বলেন : উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া আমি উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছাইলে তিনি উহাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি সংযোজিত করিয়া দিলেন : আর আমরা কোন মুসলমানকে প্রহার করিব না। উক্ত শর্তসমূহকে মানিয়া লইয়া আমরা নিরাপত্তা লাভ করিলাম। আমরা উক্ত শর্তসমূহের মধ্য হইতে কোন শর্তকে ভঙ্গ করিলে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাদের (মুসলমানদের) উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। এমতাবস্থায় আমাদের সহিত শত্রুর ন্যায় আচরণ করা আপনাদের জন্যে বৈধ ও জায়েয হইয়া যাইবে।'

↥

জিযিয়া কর প্রদান কুফরী ও লাঞ্ছিত হওয়ার নামান্তর

আবদুর রাহমান ইব্ন গানাম আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি নিজের হাতে চুক্তিনামা লিখে উমারের (রাঃ) নিকট পাঠিয়েছিলাম। চুক্তিপত্রের বিষয় বস্তু হচ্ছে ঃ 'আল্লাহর নামে শুরু করছি। সিরিয়ার অমুক অমুক শহরের খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দা ও আমীরুল মু'মিনীন উমারের (রাঃ) প্রতি। যখন আপনারা আমাদের উপর এসে পড়লেন, আমরা আপনাদের নিকট আমাদের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততি ও আমাদের ধর্মের লোকজনদের জন্য নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমরা এ নিরাপত্তা চাচ্ছি এ শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যে, আমরা এই শহরগুলিতে এবং এগুলির আশে পাশে নতুন কোন মন্দির, গীর্জা এবং খানকা নির্মাণ করবনা। এরূপ কোন নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘরের মেরামত ও সংস্কারও করবনা। এসব ঘরে যদি কোন মুসলিম মুসাফির অবস্থানের ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা তাকে বাধা দিবনা, তাঁরা রাতেই অবস্থান করুন অথবা দিনেই অবস্থান করুন। আমরা পথিক ও মুসাফিরদের জন্য ওগুলির দরজা (ইবাদাতের জন্য) সব সময় খুলে রাখব। যেসব মুসলিম আগমন করবেন আমরা তিন দিন পর্যন্ত তাঁদের মেহমানদারী করব। আমরা ঐসব ঘরে বা বাসভূমিতে কোন গুপ্তচর লুকিয়ে রাখবনা। মুসলিমদের সাথে কোন প্রতারণা করবনা। নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবনা। নিজেরা শির্ক করবনা এবং অন্য কেহকেও শির্কের দিকে আহ্বান করবনা। আমাদের মধ্যে কেহ যদি ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তাহলে আমরা তাকে মোটেই বাধা দিবনা। মুসলিমদেরকে আমরা সম্মান করব। যদি তাঁরা আমাদের কাছে বসার ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা তাঁদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিব। কোন কিছুতেই আমরা নিজেদেরকে মুসলিমদের পোশাক-পরিচ্ছদ, টুপি-পাগড়ী, স্যান্ডেল, চুলের ষ্টাইল, বক্তৃতা, উপনাম ইত্যাদির অনুকরণ করবনা। আমরা তাঁদের কথার উপর কথা বলবনা। আমরা তাঁদের পিতৃপদবী যুক্ত নামে নামকরণ করবনা। জিন্ বিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আমরা সাওয়ার হবনা। আমরা কাঁধে তরবারী লটকাবনা এবং নিজেদের সাথেও তরবারী রাখবনা। অঙ্গুরীর উপর আরাবী নক্শা অংকন করাবনা, মদ বিক্রি করবনা এবং মাথার অগ্রভাগের চুল কেটে ফেলবনা। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা আমাদের প্রথাযুক্ত পোশাক পরিধান করব। আমাদের গির্জাসমূহের উপর ক্রুশচিহ্ন প্রকাশ করবনা, আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলি মুসলিমদের যাতায়াত স্থানে এবং বাজারসমূহে প্রকাশিত হতে দিবনা। গীর্জায় উচ্চৈঃস্বরে ঘন্টাধ্বনি বাজাবনা, মুসলিমদের উপস্থিতিতে আমাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলি জোরে জোরে পাঠ করবনা, রাস্তাঘাটে নিজেদের চাল চলন ও রীতি নীতি প্রকাশ করবনা, নিজেদের মৃতদের উপর হায়! হায়!! করে উচ্চৈঃস্বরে শোক প্রকাশ করবনা এবং মুসলিমদের চলার পথে মৃতদেহের সাথে চলার সময় বাতি নিয়ে চলবনা। মুসলিমদের কাবরের কাছে আমাদের মৃতদের কাবর দিবনা, যে সমস্ত গোলাম মুসলিমদের হাতে বন্দী হবে তাদেরকে আমরা ক্রয় করবনা। আমরা অবশ্যই মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকব। মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে গোয়েন্দাগিরী করবনা।' যখন এই চুক্তি পত্র উমারের (রাঃ) সামনে পেশ করা হল তখন তিনি তাতে আরও একটি শর্ত বাড়িয়ে নিলেন। তা হচ্ছে, 'আমরা কখনও কোন মুসলিমকে প্রহার করবনা।' অতঃপর তারা বলল ঃ 'এসব শর্ত আমরা মেনে নিলাম। আমাদের ধর্মাবলম্বী সমস্ত লোকই এসব শর্তের উপর নিরাপত্তা লাভ করল। এগুলির কোন একটি যদি আমরা ভঙ্গ করি তাহলে আমাদেরকে নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব থাকবেনা এবং আপনি আপনার শত্রুদের সাথে যা কিছু করেন, আমরাও ওরই যোগ্য ও উপযুক্ত হয়ে যাব।' (আল মুহাল্লা ৭/৩৪৬)

↥

আহ্কামুল কুরআন ৩৫৭

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম সম্বলিত আরও বহু আয়াত রয়েছে। তাই উক্ত আয়াতের আয়াতের প্রয়োগ কেবলমাত্র আহলি কিতাবের সাথে থেকে গেল আর আহলি কিতাবদেরকেও নিষ্কৃতি দেয়া হবে তখন, যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিতে রাজী হয়। তখন তারা মুসলমানদের যিম্মী হয়ে থাকবে।

৫০২ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

প্রথম শ্রেণী ঃ ঐ সমস্ত লোক যাদের থেকে জিযিয়া নেওয়া (সর্বসম্মতিক্রমে) জাইয নেই। তারা হলো, আরবের ঐ সমস্ত মুশরিক যারা আসমানী কোন কিতাবেরই অনুসারী নয়। অতএব মুসলমানগণ যখন তাদের উপর বিজয়ী হবে, হয় তারা পুরুষদের ইসলাম কবুল করবে, নতুবা তাদের হত্যা করা হবে। অবশ্য তাদের নারী ও শিশুরা মালে গনীমত হিসাবে গণ্য হবে।

৩. মাসআলা ঃ যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ছাড়া লড়াই শুরু করা জাইয নেই (হিদায়া)। মুসলমানগণ ইসলামের দাওয়াত পৌছানো ব্যতীত যদি তাদের সাথে লড়াই করে তারা গুনাহ্গার হবে। তবে তাদের জানমাল ক্ষতি করার দায় মুসলমানদের উপর আরোপিত হবে না। যেরূপ তাদের নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে তাদেরকে দায়বদ্ধ করা হয় না (মাবসূত)। যাদের কাছে ইতোপূর্বে দাওয়াত পৌছেছে অতিরিক্ত সতর্কীকরণ হিসাবে তাদেরকেও (পুনরায়) দাওয়াত দেওয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়[২] (হিদায়া)।

১. কেননা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) ইসলামের প্রতি দাওয়াত না দিয়ে কোন কাউমের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি।

২. কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত যে, নবী (সা) অসতর্ক অবস্থায় বনী মুসতালিকের উপর হামলা করেছিলেন এবং উসামা (রা)-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন উবনা বস্তিতে খুব জোরে হামলা চালানোর এবং বস্তি জ্বালিয়ে দেয়ার আর অসতর্ক হানা কখনো দাওয়াত দিয়ে হয় না।

অধ্যায় ঃ জিহাদ ৫০৩

দ্বিতীয় শর্তটি হলো ঃ পুনঃদাওয়াত দ্বারা তাদের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকা। যদি সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তাদেরকে দাওয়াত দিবে না (মুহীত)। কাজেই যে ভূখণ্ডের কাফিরদের নিকট একবার ইসলামের দাওয়াত পৌছেছে তাদের উপর রাত্রে অথবা দিনে অতর্কিত হামলা চালালে অন্যায় হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

যদি তারা (ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখান করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখ্তার)। তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক (কামান) মোতায়েন করবে, জ্বালাও পোড়াও চালাবে, (বাঁধ ভেঙ্গে বা অন্য উপায়ে) তাদের উপর পানি ছেড়ে দিবে এবং তাদের বৃক্ষ নিধন করবে এবং তাদের শষ্য, ফসলাদি নষ্ট করবে (হিদায়া)। তাদের দুর্গসমূহ ভেঙ্গে বিরান করে দিবে ও পানি বহিয়ে তা ডুবিয়ে দিবে এবং তাদের দালান প্রাসাদ বিধ্বস্ত করে ফেলবে।

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, দ্বিতীয় খণ্ড [দশম পারা] ৬৫৩

জিযিয়া ও খেরাজ : জিযিয়া বলা হয় সে করকে, যা কাফেরদের জীবনের বদলে আদায় করা হয়। যিজিয়া শব্দটি "জাযা" থেকে নিষ্পন্ন অর্থাৎ তুমি মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধী ব্যক্তি। কিন্তু তোমাকে এ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমার উপর এ দণ্ড জারি হচ্ছে না এবং দারুল ইসলামে নিরাপত্তার সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তোমাকে হত্যাও করা হয়নি এবং তোমাকে গোলামও বানানো হয়নি। যেভাবে মুক্তিপণ আদায় করলে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে জিযিয়া আদায় করলেও হত্যার বিধান কার্যকর হয় না।

আর খেরাজ হলো সে কর যা অমুসলিম প্রজাদের জমিনের উপর ধার্য করা হয়।

قَوْلُهُ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ : অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান আনে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত তারা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া বা অমুসলিম কর আদায় করে। আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَّدٍ "আন্ ইয়াদীন" শব্দ দ্বারা আনুগত্য বুঝানো হয়েছে অথবা এর অর্থ হলো অমুসলিমরা এ জিযিয়া স্বহস্তে আদায় করবে অন্য কারো হাতে নয়।

৬৫৪ তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, দ্বিতীয় খণ্ড [দশম পারা]

صٰغِرُوْنَ -এর অর্থ হলো অপমানিত এবং পরাজিত অবস্থায় জিযিয়া আদায় করা। এজন্য তাফসীরকার ইকরিমা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো যে জিযিয়ার অর্থ গ্রহণ করবে সে উপবিষ্ট থাকবে, আর যে প্রদান করবে সে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামি বিধান কার্যকর করাই তাদের জন্য অবমাননা।

আশরাফুল হিদায়া ৪৭৮ চতুর্থ খণ্ড

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো, জিজিয়া ওয়াজিব হয় হত্যার পরিবর্তে। অর্থাৎ জিজিয়া প্রদানের কারণে জিম্মি ব্যক্তি মুসলমানের হাতে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এ কারণে যেসব কাফের হত্যা করা বৈধ নয়, তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করা যায় না। যেমন– কাফের শিশু এবং কাফের মহিলা। এরা কাফের হওয়া সত্ত্বেও এদেরকে হত্যা করা যায় না। ফলে এদের উপর জিজিয়াও আরোপ করা হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায়, জিজিয়া হলো হত্যার বদলা স্বরূপ।

আমাদের দলিল হলো, যেহেতু তাদেরকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ হবে, সেহেতু তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করাও বৈধ হবে। কেননা উভয়ের প্রতিটি দেহসত্তার স্বত্ব হরণ করার অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে এভাবে যে, সে উপার্জন করে মুসলমানদেরকে প্রদান করে অথচ তার ভরণপোষণ নিজের উপার্জনের উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আরবের মুশরিকদের উপর জিজিয়া আরোপ করা হয় না। তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হবে।

অনারবী মুশরিকদের উপরও জিযিয়া আরোপ করা যাবে না। তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হবে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন তোমরা তাদের (বিধর্মীদের) সাথে লড়াই কর। এ নির্দেশ সকল বিধর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করে। পরে আমরা কুরআনের আয়াত দ্বারা জানতে পেরেছি আহলে কিতাবীদের উপর জিজিয়া আরোপ করা যায় এবং তাদেরকে নিজেদের ধর্মের উপর থাকতে দেওয়া যায়। তদ্রূপ হাদীস দ্বারা জানতে পেরেছি মাজূসীদের উপরও জিজিয়া আরোপ করে তাদেরকে তাদের ধর্মের উপর থাকতে দেওয়া যায়। অতএব, যুদ্ধ করার বিধান থেকে আহলে কিতাব ও মাজূসীরা আওতামুক্ত হবে। এছাড়া অন্য সব বিধর্মী قَاتِلُوْهُمْ (তাদের সাথে যুদ্ধ কর) এ বিধানের আওতাভুক্ত থাকবে। অতএব, অনারবী মুশরিককরা যেহেতু আহলে কিতাব বা মাজূসী নয়, সেহেতু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করে, নিজ ধর্মের উপর থাকতে দেওয়া যাবে না।

আহনাফের দলিল হলো, অনারবী মুশরিকদের গোলাম বানানো সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ আছে। তাই তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করাও জায়েজ হবে। কারণ গোলাম বানানো এবং জিজিয়া আরোপ একই ধরনের বিষয়। কেননা গোলাম বানানোর মাধ্যমে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হরণ করা হয়, তেমনি জিজিয়া আরোপের দ্বারাও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হরণ করা হয়। গোলাম বানানোর দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হরণ করা হয়। এভাবে যে, গোলাম যা উপার্জন করে তার মালিক সে হতে পারে না; বরং তার উপার্জনের মালিক হয় তার মনিব। এ হিসাবে গোলাম হয়ে যায় পশুর মতো। তার কোনো ব্যক্তিত্ব থাকে না। তেমনি জিযিয়া আরোপ করা হলেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হারায়। তা এভাবে যে, জিযিয়া আরোপকৃত ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ মুসলমানদেরকে দিয়ে দিতে হয়। সাথে সাথে তার নিজের ভরণপোষণও থাকে তার নিজ দায়িত্বে। এ হিসাবে জিযিয়া আরোপিত ব্যক্তি আর গোলাম ব্যক্তি এক সমান। অতএব, কাউকে গোলাম বানানো এবং কারো উপর জিজিয়া আরোপ করা একই কথা। সুতরাং অনারবী মুশরিককে যদি গোলাম বানানো বৈধ হয়, তাহলে তার উপর জিজিয়া আরোপ করাও বৈধ হবে। আর গোলাম বানানো তো সর্ব সম্মতিক্রমে বৈধ, তাই জিজিয়া আরোপ করাও বৈধ। এটাই আহনাফের মাযহাব

আহলে কিতাব, মাজুসী এবং অনারবী মুশরিকদের উপর যদি জিজিয়া আরোপ করার পূর্বে মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পুরুষ, নারী, শিশু সবই গনিমতের মালে পরিণত হবে। তখন ইমামের এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে দাস-দাসী বানাতে পারবেন। আবার ইচ্ছা করলে তাদের উপর জিজিয়াও আরোপ করতে পারবেন।

قوله ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب الخ : মুরতাদ এবং আরবি মুশরিকদের উপর জিজিয়া আরোপ করে তাদেরকে নিজ ধর্মের উপর থাকতে দেওয়া হবে না। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো এই তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আরব মুশরিকদেরকে গোলাম বানানো জায়েজ আছে। ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এ কথাই বলেন; তাদের যুক্তি হলো, গোলাম বানানো আর হত্যা করা একই কথা। কেননা হত্যা করলে প্রকৃত অর্থে ধ্বংস করা হয়, আর গোলাম বানালে গুণগতভাবে ধ্বংস করা হয়। অতএব, যেমন হত্যা করা জায়েজ, তেমনি গোলাম বানানোও জায়েজ। তাদের জবাবে আহনাফ সে কথাই বলেন যা ইতঃপূর্বে বলেছেন। অর্থাৎ তাদের অপরাধ গুরুতর। তাই তারা হয়তো অপরাধ ত্যাগ করবে তথা কুফরি ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যাথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। দ্বিতীয় কোনো পথ তাদের জন্য খোলা নেই।

যদি আরব মুশরিক ও মুরতাদদের উপর মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করতে পারে, তাহলে তাদের যুবক শ্রেণিকে হত্যা করা হবে এবং তাদের স্ত্রীলোক ও সন্তানদেরকে গনিমত হিসাবে মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। কেননা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বনী হানীফা গোত্রের মুরতাদদের স্ত্রী ও শিশুদেরকে মুজাহিদদের মাঝে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

২. জিম্মির উপর জিজিয়া ওয়াজিব হয়, তার কুফরির শাস্তি হিসাবে। এ কারণেই অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার সাথে জিজিয়া পরিশোধ করতে হয়। অতএব, ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে কুফরি ত্যাগ করল, তখন আর তার উপর

যায় না। তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও যদি কোনো জিম্মির কাছে গড়ে কয়েক বৎসরের জিজিয়া একত্র হয়ে যায়, তাহলেও সেগুলো উসুল করা সম্ভব বিধায় সবগুলো জিজিয়া পৃথক পৃথকভাবে উসুল করা হবে। দুই বা ততোধিক জিজিয়া একীভূত হবে না। পক্ষান্তরে যদি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে তাহলে তার থেকে জিজিয়া উসুল করা সম্ভব নয়। কেননা জিজিয়া ওয়াজিব হয় ব্যক্তির অপমানের জন্য, তাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে। আর মুসলমান ব্যক্তি নিজের ঈমানের বদৌলতে সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য হয়ে যায়। তাই মুসলমান থেকে জিজিয়া আদায় করা যায় না।

قوله (رح) ولأبي حنيفة -এখান থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল শুরু। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, জিজিয়া একটি শাস্তি, যা কুফরির উপর হঠকারিতা করার কারণে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। শাস্তি হওয়ার বিষয়টি এভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জিজিয়া জিম্মির নিজ হাতে পরিশোধ করতে হয়। জিম্মি যদি নিজের কর্মচারীর মাধ্যমে জিজিয়া পাঠায় তাহলে তা গ্রহণ করা হয় না। জিজিয়া দাঁড়ানো অবস্থায় প্রদান করতে হয় এবং গ্রহণকারী ব্যক্তি তা বসে বসে গ্রহণ করে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, জিম্মি যখন জিজিয়া প্রদান করতে আসবে, তখন জিজিয়া উসুলকারী ব্যক্তি জিম্মির জামার বুকে ধরে ঝাকুনি দিবে এবং বলবে, এই আল্লাহর দুশমন, জিজিয়া দাও। এসব কথা ও আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিজিয়া একটি শাস্তি।

তা ছাড়া আরেকটি বিষয় হলো এই যে, জিম্মিকে ভবিষ্যতের যে কোনো সময় হত্যা করা যেত, সে হত্যার বিনিময়ে জিজিয়া ওয়াজিব হয় এবং ভবিষ্যতের কোনো যুদ্ধে আমাদেরকে যে সহযোগিতা করার বাধ্যবাধকতা ছিল তার বিনিময়ে। কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, জিম্মিদের থেকে যে জিজিয়া উসুল করা হয়, তার সম্পদ সঞ্চয় করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য হলো জিম্মিদেরকে লাঞ্ছিত করা। আর এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য দুটি জিজিয়া উসুল করার

মারেফুল কোরআন ,পাতা - ৫৬৬

যেমন, নাজরান গোত্রের সাথে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) –এর চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয়। অর্থাৎ, এক উকিয়া রূপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ।

অনুরূপ তাগ্‌লিব গোত্রীয় খ্রীষ্টানদের সাথে হযরত ওমর (রাঃ)–এর চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিযিয়াকর প্রদান করবে।

আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَّدٍ শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ অর্থ এখানে কারণ, يد অর্থ শক্তি ও বিজয়। তাই জিযিয়া যেন খয়রাতি চাঁদা প্রদানের মত না হয়; বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসেবে। — রূহুল মা'আনী)। এরপরের বাক্য হল— وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হল— তারা যেন ইসলামের সাধারণ আইন-কানুনের আনুগত্যকে নিজেদের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয়।— (রূহুল-মা'আনী, তফসীরে মাযহারী)।

জিজিয়ার পরিমাণ:

মুহাম্মদ ইয়েমেনের অন্ত্যন্ত গরীব এবং হতদরিদ্র একটি অমুসলিম জনগোষ্ঠীর উপরে ১ দিনার (তখনকার সময়ের ১০-১২ দিরহাম) হারে জিজিয়া আরোপ করেছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক সাবালক পুরুষের মাথার জন্য ১ দিনার জিজিয়া কর আদায় করত মোহাম্মদ । উল্লেখ্য , তখনকার সময়ে ১০ দিরহাম মানে ছিল এভারেজ লোকসংখ্যার একটা নিম্নবিত্ত পরিবারের ১০-১২ দিনের সংসার খরচ। এখানে একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে আমাদের বর্তমানের পরিবারের ধারনা তখনকার সময় থেকে অনেক ভিন্ন, এখন গড়ে পরিবারে লোক থাকে ৪-৫ জন কারণ এখন আমরা একক পরিবারের ধারনা অনুসরণ করি। কিন্তু তখন বহুবিবাহ এবং একান্নবর্তী ধারনার কারণে পরিবারে বর্তমান সময়ের ৪ থেকে ৫ গুন লোক বাস করত । এই পরিমাণ কর চাপানো হয়েছিল ইয়েমেনের অমুসলিমদের উপরে যারা ছিল অত্যন্ত গরীব । এটা ছিল সকল অমুসলিমদের জন্য জিজিয়া করের নুন্যতম হার (১ দিনার) । অর্থাৎ, সমাজের যারা সবথেকে গরীব এবং কর্মক্ষম(বর্তমান প্রেক্ষাপটে কুলি, দিন মজুর) তাদের এই হারে কর দিতে হত যা তাদের সংসারের ১০ দিনের খরচ ছিল। যদি কারও ২ দিনার প্রদান করার সামর্থ্য থাকত তবে তার উপর দুই দিনার জিজিয়া আরোপ হত, যদি কারও ৪ দিনার দেবার সামর্থ্য হত তবে তার উপর ৪ দিনার জিজিয়া আরোপ হত।

উপমহাদেশের বিখ্যাত মুসলিম শাসক আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে জিজিয়ার পরিমাণ ছিল ৫০-৭৫ শতাংশ।

----------------------------- ---------------------------

(দাস-দাসী) গনীমত, অসহায় নিরপরাধ যুদ্ধবন্দী নারী

৩৩৫ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পুর্বে কাউকেও দান করা হয়নি। **আমার জন্য গানীমাতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি**।

৯৪৭ রাসূল সা একদিন ফজরের সালাত **অন্ধকার থাকতে** আদায় করলেন। অতঃপর সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বললেনঃ আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক! তখন তারা (ইয়াহূদীরা) বের হয়ে গলির মধ্যে দৌঁড়াতে লাগল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মাদ ও তাঁর সৈন্য-সামন্ত এসে গেছে। পরে নবী সা তাদের উপর জয়লাভ করেন। তিনি যোদ্ধাদের হত্যা করলেন এবং নারী-শিশুদের বন্দী করলেন।

৪২০০ নাবী সা খাইবারের নিকটে সকালে কিছু অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খাইবার ধ্বংস হয়েছে। **এ সময়ে খাইবারের অধিবাসীরা অলি-গলিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল। নাবী সা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদেরকে হত্যা করলেন। আর শিশু ও নারীদেরকে বন্দী করলেন**। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সফিয়্যাহ। প্রথমে তিনি দাহ্ইয়াতুল কালবীর অংশে এবং পরে নাবী সা-এর অংশে বণ্টিত হন।

৩৭১ আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেনঃ যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করলাম। তখন যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হলো। **দিহয়া (রা.) এসে বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! বন্দীদের হতে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন যাও, তুমি একটি দাসী নিয়ে যাও। সে সাফিয়্যাহ বিনত হুয়াই কে নিল। তখন এক ব্যক্তি রাসূল সা এর নিকট এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীরের অন্যতম নেত্রী সাফিয়্যাহ বিনত হুয়াইকে আপনি দিহয়াকে দিচ্ছেন?! তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। সেটা শুনে রাসূল সা বললেনঃ দিহয়াকে সাফিয়্যাহসহ ডেকে আন। তিনি সাফিয়্যাহসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী সা. সাফিয়্যাহ কে দেখলেন তখন দিহয়াকে বললেনঃ তুমি বন্দীদের হতে অন্য একটি দাসী দেখে নাও**। তারপর রাসূল সাঃ সাফিয়্যাহ (রা.)-কে আযাদ করে দিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন। রাবী জিজ্ঞেস করলেনঃ **নবী কি তাঁকে মাহর দিলেন? আনাস (রা.) জওয়াব দিলেনঃ তাঁকে আযাদ করাই তাঁর মাহর। এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন**।

অতঃপর **পথে উম্মু সুলায়ম (রা.) সাফিয়্যাহ (রা.)-কে সাজিয়ে রাতে রাসূল সা. এর খিদমতে পেশ করলেন**। রাসূল সা বাসর রাত যাপন করে ভোরে উঠলেন। **তিনি ঘোষণা দিলেনঃ যার নিকট খাবার কিছু আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। অতঃপর এসব মিশিয়ে খাবার তৈরি করা হল। এ ই ছিল রাসূল সা. এর ওয়ালীমাহ**।

৪২১১

খাইবার দূর্গ বিজয়ের পর **নবী সা এর কাছে ইয়াহূদী দলপতির কন্যা সফিয়্যাহ এর সৌন্দর্যের ব্যাপারে আলোচনা করা হল। তার স্বামী এ যুদ্ধে নিহত হয়। সে ছিল নববধূ। নবী সা তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাকে সঙ্গে করে খাইবার থেকে যাত্রা করেন। এরপর আমরা যখন সাদ্দুস সাহবা নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলাম তখন সফিয়্যাহ (রা.) তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত হলে রাসূলুল্লাহ সা তাঁর সঙ্গে বাসর করলেন**।

২৮৯৩ যখন নবী সা খায়বার যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন, (তখন কাফেরদের নারীদেরকে গণীমতের মাল হিসেবে বন্দী করা হল) এবং নবী সা এর নিকট সাফিয়্যা বিনতু হুয়াই এর সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, **যিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা; তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাসূল সা তাঁকে নিজের গণীমতের মাল হিসেবে মনোনীত করলেন**। অতঃপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। **আমরা যখন সাদ্দুস নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন সাফিয়্যাহ ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হন। রাসূল সা সেখানেই তাঁর সঙ্গে বাসর রাত যাপন করেন**।

৪২১২ আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সা খাইবার থেকে ফেরার পথে **সফিয়্যাহ-এর কাছে তিনদিন অবস্থান করে তার সঙ্গে বাসর যাপন করেছেন**।

সহীহ মুসলিম (ইফা) ।

৩০৯৭। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, **কোন পুরুষ স্ত্রীর সাথে সাধারণত যা করার ইচ্ছা করে, রাসুলুল্লাহ (স)ও সাফিয়্যা (রা) এর সাথে তাই করার ইচ্ছা করলেন**। তারা বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি ঋতুমতী হয়েছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফ- ১২তম খণ্ড ২১৯

(৩১১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাকাম বিন মুসা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সহিত সাধারণত যাহা করার ইচ্ছা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও (তাঁহার স্ত্রী) সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর সহিত উহা করার ইচ্ছা করিলেন। তখন তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ঋতুমতী। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তো সে আমাদেরকে আটকাইয়া রাখিবে। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি কুরবানীর দিন তাওয়াফে

৫৪২৫ আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা আবূ ত্বলহা (রা.)কে বললেনঃ "তোমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খিদমত করবে"। আবূ ত্বলহা আমাকেই তাঁর সাওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে আসলেন। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সা এর খিদমত করতে থাকলাম। আমি সর্বদা তাঁর খিদমতে নিয়োজিত ছিলাম।

একসময় **আমরা খাইবার যুদ্ধজয় করে ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। রাসূল সা তার নিজের গনীমত হিসাবে প্রাপ্ত সফিয়্যা বিন্ত হুয়ায়কে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন**।

সুরা আনফাল, আয়াত ৬৯- সুতরাং তোমরা যে গনীমত লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর। enjoy what ye took in war (booty), lawful and good

হুনায়েনের যুদ্ধে এক বৃদ্ধাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, কারণ তার মুখমন্ডল ছিল শীতল, বক্ষদেশ সমতল, সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা ছিল না তার এবং বুকে দুধের ধারা শুকিয়ে গেছে। সুতরাং ছয়টি উটের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হলো

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সূত্রে তাঁর মক্কেল নাফি আমাকে বলেছেন, বনু জুমাহর আমার খালাদের কাছে তাকে রেখেছিলাম আমি। ইচ্ছা ছিল, কাবা তওয়াফ করার পর তার কাছে যাব। মসজিদ থেকে ফিরে এসে দেখলাম, সবখানে দৌড়াদৌড়ি। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, রাসুল (সা.) তাদের সব স্ত্রী ও শিশুদের ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। আমি ওদের বললাম, তাদের একটা মেয়ে আছে বনু জুমায়, ওখান থেকে তাকে তারা নিয়ে যেতে পারে। হাওয়াজিন এক বৃদ্ধা নারীকে নেওয়ার সময় উইয়ায়না ইবনে হিসন বলেন, 'দেখতে পাচ্ছি, এই মহিলা গোত্রের মধ্যে বেশ মানী লোক, এর মুক্তিপণ নিশ্চয়ই বেশি হবে।' রাসুল (সা.) যখন প্রত্যেক বন্দীর জন্য ছয়টি করে উট দিতে গেলেন, তিনি সম্মত হলেন না। জুহায়ের আবু সুরাদ তাঁকে ছেড়ে দিতে বললেন, কারণ ওর মুখ শীতল, বুক সমান, ওর সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই, না দিতে চাইলে ওর স্বামী গরজ করবে না। আর তার দুধও খুব একটা ভালো নয়। এ কথা শুনে তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। অনেকে দাবি করেন, আল-আকরা ইবনে হাবিসের সঙ্গে দেখা হলে উইয়ায়না তার কাছে অভিযোগ করেন। তখন আল-আকরা বলে, 'কী যে বলো, ও তো আর ভর-বয়সী কুমারী ছিল না, মধ্যবয়সী যৌবনবতীও নয়!'

৬৩৬ ● সিরাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)

গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
উলঙ্গ হওয়া সম্পর্কে
৪০১৭। ইবনু হাকীম থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা -কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ঢেকে রাখার অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখবো এবং কার সামনে অনাবৃত করবো? তিনি বলেনঃ তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখো।

↥

সূনান আবু দাউদ (ইফা)

পরিচ্ছেদঃ **বন্দী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা।**

২১৫২। রাসূলুল্লাহ সা হুনায়নের যুদ্ধের সময় আওতাস নামক স্থানে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা তাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়। আর এই সময় তারা কয়েদী হিসাবে হাওয়াযেন গোত্রের কিছু মহিলাকে বন্দী করে। তখন রাসূলুল্লাহ সা এর কিছু সাহাবী **তাদের সাথে অনধিকারভাবে সহবাস করা গুনাহ মনে করে, কেননা তাদের মুশরিক স্বামীরা তখন বন্দী ছিল**। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আযাত নাযিল করেনঃ যেসব মহিলা যুদ্ধবন্দী হিসাবে তোমাদের আয়ত্বে আসবে তারা ইদ্দত (হায়েযের) পূর্ণ করার পর তোমাদের জন্য হালাল।

২১৬ সুনান আবূ দাউদ

٤٥ – بَاب فِي وَطْءِ السَّبَايَا

অনুচ্ছেদ– ৪৫ ঃ বন্দী দাসীদের সাথে সঙ্গম করা

২১৫৫। আবূ সাঈদ আল–খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। হুনাইনের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আওতাসের দিকে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে বন্দী করে আনেন। কিন্তু সেই বন্দী নারীদের মুশরিক স্বামীরা বর্তমান থাকায় রাসূলুল্লাহর কতিপয় সাহাবী তাদের সাথে সঙ্গম করাকে গুনাহ মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন ঃ "যে মহিলাদের স্বামী আছে তারা তোমাদের জন্য হারাম। তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত" (সূরাহ আন-নিসা ঃ ২৪)। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী দাসী যখন তাদের ইদ্দাতকাল সমাপ্ত করবে তখন তারা তোমাদের জন্য বৈধ।[২১৫৫]

সহীহ।

সহীহ মুসলিম (ইফা)

৩৪৭৭। রাসুলুল্লাহ সা হুনায়নের যুদ্ধের সময় মুসলিমদের একটি বাহিনী শত্রুদলের মুখোমুখী হয় এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে এবং তাদের অনেক কয়েদী তাদের হস্তগত হয়। এদের মধ্য থেকে **যুদ্ধবন্দীনারীদের** সাথে সহবাস করা রাসুলুল্লাহ সা এর কয়েকজন সাহাবী যেন নাজায়েজ মনে করলেন, **তাদের মুশরিক স্বামী জীবিত** থাকার কারণে। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ অর্থাৎ **তারা তোমাদের জন্য হালাল, যখন তাদের ইদ্দতকাল** (গর্ভবতী হলে প্রসব, অন্যথায় এক মাসিক অতিবাহিত হওয়া যাতে সে গর্ভবতী কি না যাচাই করা যায়) **পূর্ণ হবে**।

সহীহ মুসলিম ১০৭

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ইসতিবরা পালন করার পর যুদ্ধবন্দিনীর সাথে সহবাস করা জায়েয। যদি তার স্বামী থেকে থাকে তাহলে বন্দীত্বের কারণে তার বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

৩৪৭২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। হুনাইন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাসের দিকে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা শত্রুর মুখোমুখি হলো এবং শত্রুর সাথে লড়াই করে বিজয়ী হলো। কিছু লোক তাদের হাতে বন্দী হলো। বন্দিনীদের মুশরিক স্বামীরা বর্তমান থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবা তাদের (বন্দী স্ত্রীলোক) সাথে মিলিত হতে দ্বিধা-সংকোচ করছিলো। তাই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ বিষয়ে আয়াত নাযিল করলেন ঃ "বিবাহিত স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য হারাম তবে তোমরা যাদের অধিকারী হয়েছো (ক্রীতদাসী) 'ইদ্দত' পূরণ হওয়ার পর তারা তোমাদের জন্য হালাল।"

কোরআন- সূরা নিসা, আয়াত ২৪: নারীদের মধ্যে **তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া** সব সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, আল্লাহ এসব ব্যবস্থা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন।

সূরা মাআরিজ, ২৯-৩০: যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা **মালিকানাভূক্ত দাসী**দের বেলায় তিরস্কৃত হবে না।

হে নবী! আমি(আল্লাহ) আপনার জন্য দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন। (সুরা আহযাব আয়াত ৫০) **হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসিগণকে যাদেরকে আমি যুদ্ধবন্দিনীরূপে দান করেছি।**

بِالسَّبْيِ فَلَكُمْ وَطْؤُهُنَّ وَاِنْ كَانَ لَهُنَّ
اَزْوَاجٌ فِىْ دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْاِسْتِبْرَاءِ
كِتٰبَ اللّٰهِ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ اَىْ كُتِبَ
ذٰلِكَ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ
وَالْمَفْعُوْلِ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَىْ سِوٰى

স্বাধীন মুসলিম নারী হোক বা নাই হোক। তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে গেছে বাঁদিদের থেকে, যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের অধীনে এসে গেছে, তোমাদের জন্য তাদের সঙ্গে ইস্তেবরায়ে রেহেমের [পূর্বস্বামীর পানি থেকে জরায়ু মুক্ত হওয়ার] পর সহবাস করা জায়েজ আছে, যদিও তাদের স্বামীগণ দারুল হরবে বিদ্যমান থাকে না কেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিধানটি তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন।

স্বামী ওয়ালী নারীদেরকে অন্য ব্যক্তির বিবাহ করা জায়েজ নয়, তবে কোনো নারী যদি মালিকানাধীন দাসী হয়ে আসে তাহলে এই বিধান নয়। মুসলমানরা যদি দারুল হরবের কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং সেখান থেকে কিছু নারী বন্দী করে আসে তবে তাদের দারুল হরবে অবস্থানরত স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়। আর আমীরুল মু'মিনীন যদি তাকে দাসী করে কোনো সিপাহীকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে বণ্টন করে দেন তবুও তাকে ভোগ করা জায়েজ হবে। এই ভোগ করা এক হায়েজ আসার পরে কিংবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করার পর জায়েজ হবে।

তাফসীর ইবনে কাসীর

অর্থাৎ যেসব নারীর স্বামী রয়েছে তারাও তোমাদের জন্যে হারাম। তবে হ্যাঁ, কাফিরদের যেসব স্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দিনী হয়ে তোমাদের অধিকারে আসবে, এক ঋতুকাল অতিক্রান্ত হবার পর তারা তোমাদের জন্যে বৈধ হবে। মুসনাদ-ই-আহমাদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আওতাসের যুদ্ধে কতগুলো সধবা স্ত্রীলোক বন্দিনী হয়ে আসে। আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাদের সাথে মিলিত হওয়াকে বৈধ করা হয়'। জামেউত্ তিরমিযী, সুনান-ই-ইবনে মাজা, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থেও এ হাদীসটি রয়েছে।

তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এভাবে— এই আয়াত নাজিল হয়েছে হুনাইন যুদ্ধের সময়। যুদ্ধজয়ের পর আহলে কিতাবদের কতিপয় রমণী মুসলমানদের অধিকারাধীনা হয়। তারা ছিলো সধবা। মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা তাদেরকে পেয়েছিলেন, তাঁরা তাদেরকে সম্ভোগ করতে চাইলে তারা বলে উঠলো, আমাদের তো স্বামী আছে। একথা রসুল স. কে জানানো হলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যুদ্ধবন্দিনীদের সঙ্গে তাদের মালিকেরা সহবাস করতে পারবে। তাদের স্বামী থাকলেও তারা বিবাহবিচ্যুতা বলে গণ্য হবে। স্বামী না থাকলেতো হবেই। তবে জরায়ু ভ্রূণমুক্ত থাকা অপরিহার্য।

↥

https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=517

৪ সূরাঃ আন-নিসা | An-Nisa | سورة النساء - আয়াতঃ ২৪

কোন কোন যুদ্ধে কাফেরদের মহিলারা মুসলিমদের হাতে বন্দিনী হল, তখন ঐ সকল মহিলারা বিবাহিতা হওয়ার কারণে মুসলিমরা তাদের সাথে সহবাস করার ব্যাপারে ঘৃণা অনুভব করল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ)-কে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-গণ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে এই আয়াত অবতীর্ণ হল। (ইবনে কাসীর) এ থেকে জানা গেল যে, যুদ্ধলব্ধ কাফের মহিলারা মুসলিমদের হাতে বন্দিনী হয়ে এলে, তাদের সাথে সহবাস করা জায়েয, যদিও তারা বিবাহিতা হয়। তবে গর্ভমুক্ত কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। অর্থাৎ, এক মাসিক দেখার পর অথবা গর্ভবতী হলে প্রসবের পর (নিফাস বন্ধ হলে তবেই) তার সাথে সহবাস করা যাবে।

মহিলাদেরকে বিবাহ করা যেমন হারাম, তেমনি সধবা কাফের মহিলারাদেরকেও বিবাহ করা হারাম, তবে যদি তারা মুসলিমদের অধিকারে এসে যায়, তাহলে তারা গর্ভমুক্ত কি না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁদের জন্য (যৌন-সংসর্গ) হালাল হবে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

১. আযল হল স্ত্রী সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী যোনি থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটান

২২২৯ সাহাবীরা বললেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ! **আমরা বন্দী দাসীর সাথে সঙ্গম করি। কিন্তু আমরা তাদের বিক্রয় করে মূল্য হাসিল করতে চাই।** এমতাবস্থায় আযল(নিরুদ্ধ সঙ্গম করা_বীর্য বাইরে ফেলা যাতে গর্ভবতী না হয়) সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, আর তোমরা কি এরূপ করে থাক? তোমরা যদি আযল না কর তাতেও তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।

৫২১০ আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালীন সময়ে গানীমাত হিসাবে কিছু দাসী পেয়েছিলাম। আমরা তাদের সঙ্গে আযল করতাম।

৪১৩৮ আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা-এর সঙ্গে বানূ মুসতালিকের যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। এ **যুদ্ধে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে আসক্তি জাগে** এবং বিবাহ-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রীহীন অবস্থা আমাদের জন্য কষ্টকর অনুভূত হয়। তাই আমরা আযল করা পছন্দ করলাম এবং তা করতে মনস্থ করলাম। তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম, রাসূলুল্লাহ সা আমাদের মাঝে আছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আযল করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওটা না করলে তোমাদের কী ক্ষতি? কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন ঘটবেই।

৭৪০৯ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, মুসলিমগণ বনী মুসতালিক যুদ্ধে কতকগুলো বন্দিনী লাভ করলেন। এরপর **তাঁরা এদেরকে ভোগ করতে চাইলেন। আবার তারা যেন গর্ভবতী হয়ে না পড়ে সে ইচ্ছাও তারা করছিলেন। তাই তারা নবী সা কে আযল(যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত) বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন।** নবী সা বললেনঃ এতে তোমাদের কোন লাভ নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা যত জীবন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অবশ্যই তা সৃষ্টি করবেনই।

قوله : إنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ... كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ : অর্থাৎ আমরা যদি বাঁদীর সাথে আযল না করি, তাহলে বাঁদী উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ আমাদের মালের প্রতি মহব্বত আছে। আমরা তাকে বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে চাই। কিন্তু উম্মে ওয়ালাদ হয়ে গেলে তাকে বিক্রয় করতে পারব না। এজন্য আমরা বাঁদীর সাথে আযল করতে চাই। যাতে বাঁদীর গর্ভ সঞ্চার না হয়। সুতরাং এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ।

৩৪৩৬। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সা এর সাথে বানু মুসতালিক এর যুদ্ধ করেছি। **সে যুদ্ধে আমরা আরবের সবচেয়ে সুন্দরী বাঁদীদের বন্দী করলাম**। এদিকে আমরা দীর্ঘকাল স্ত্রী সাহচর্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। **অন্যদিকে আমরা ছিলাম সম্পদের প্রতি অনুরাগী। এমতাবস্থায় আমরা বাঁদীদের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল করার এবং আযল করার ইচ্ছা করলাম**। কিন্তু আমরা এ কথাও আলোচনা করলাম যে, আমরা কি এ কাজ করতে যাব, অথচ নবী সা আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন, তার নিকট আমরা কি এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করব না? তাই আমরা রসূলুল্লাহ সা কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ আযল না করাতেও তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।

সহীহ মুসলিম

৩৪১০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু যুদ্ধবন্দিনী স্ত্রীলোক লাভ করলাম। আমরা তাদের সাথে আযল করতে চাইলাম। অতঃপর আমরা এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার। কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো আত্মা জন্মগ্রহণ করবে (সিদ্ধান্ত হয়ে আছে) তা অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে।

৮২ সহীহ মুসলিম

৩৪২০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমার একটি ক্রীতদাসী আছে। সে আমাদের খেদমত করে এবং পানি এনে দেয়। আমি তার সাথে মিলিত হয়ে থাকি। তবে সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তার সাথে (সহবাসের সময়) 'আযল' করো। তবে তার তাকদীরে যা নির্দিষ্ট আছে তা অবশ্যই ঘটবে। কিছুদিন পর লোকটি পুনরায় এসে বললো, ক্রীতদাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে, তাকদীরে তার জন্য যা নির্দিষ্ট হয়ে আছে তা অবশ্যই ঘটবে।

মুয়াত্তা মালিক, অধ্যায় ২৯.

রেওয়ায়ত ৯৯। হাজ্জাজ ইবন আমর (রা) বলেন, তিনি যায়দ ইবন সাবিত (রা)-এর নিকট বসা ছিলেন। ইতিমধ্যে ইয়ামানের বাসিন্দা ইবন ফাহদ তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, হে আবূ সাঈদ, **আমার নিকট কয়েকটি বাদী এমন রহিয়াছে যে, আমার স্ত্রীগণ উহাদের তুলনায় আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় নহে**। **আমার দ্বারা উহাদের প্রত্যেকে অন্তঃসত্ত্বা হউক ইহা আমি পছন্দ করি না। তবে আমি আযল করিতে পারি কি?** যায়দ বলিলেন, হে হাজ্জাজ; ফতোয়া বলিয়া দাও। হাজ্জাজ বলিলেনঃ তারপর আমি বলিলাম- উহা তোমার ইচ্ছা, তুমি উহাতে পানি সিঞ্চন কর অথবা উহাকে পিপাসিত ও শুষ্ক করিয়া রাখ। অতঃপর যায়দ(রা)- বলিলেন, হাজ্জাজ সত্য বলিয়াছে।

↥

আদাবুয যিফাফ বা বাসর রাতের আদর্শ ৫৭

আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করল এবং বলল আমার এক দাসী আছে, আর আমি তার সাথে আযল করি, আর পুরুষ যা ইচ্ছা করে আমি তা করি, আর ইয়াহুদীরা ধারণা করে যে, ছোট জীবন্ত দাফনকৃত হল আযল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলেছে, আল্লাহ যদি কিছু সৃষ্টি করতে চান তাহলে তুমি তাকে তা হতে বাধা দিতে পারবে না।(২)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল এবং বলল, আমার এক দাসী আছে যে, আমাদের সেবিকা ও আমাদের খেজুর বাগানে পানি দেয়। আর আমি তার সঙ্গে সহবাস করি এবং সে গর্ভবতী হবে এটা আমি অপছন্দ করি। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তুমি ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে আযল কর। কেননা তার ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে তা তার গর্ভে আসবে)। লোকটি কিছুকাল অবস্থান করল। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসল এবং বলল, নিশ্চয় দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (আমি অবশ্যই তোমাকে সংবাদ দিয়েছিলাম যে, সে অচিরেই গর্ভধারণ করবে যা তার ভাগ্যে আছে।)(৩)

২। নাসাঈ ইশরাতুন নিসা (৮১/১-২) পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ (১/২৩৮ পৃষ্ঠা), ত্বহাবী আল-মুশকিল-এর (২/৩৭১ পৃষ্ঠা), তিরমিযী (২/১৯৩) পৃষ্ঠা, আহমাদ (৩/৩৩ ও ৫১ ও ৫৩) পৃষ্ঠা সহীহ সনদে।

আর আবূ হুরাইরা এর হাদীস থেকে তার প্রমাণ রয়েছে, যা আবূ ইয়ালা (২৮৪/১) পৃষ্ঠা এবং বায়হাকী (৭/২৩০) পৃষ্ঠা হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন।

৩। মুসলিম (৪/১৬০) পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ (১/৩৩৯) পৃষ্ঠা, বায়হাকী (৭/২২৯) পৃষ্ঠা এবং আহমাদ (৩/৩১২/৩৮৬) পৃষ্ঠা।

কিতাবুল কারাহিয়াহ ৬২৫

সহবাসে দাসীর কোনো হক নেই।

[অমুসলিম যুদ্ধবন্দী নারীদের মাসিক হলেই মুসলিমদের জন্য সহবাস বৈধ।

মাসিক কোনো যুদ্ধবন্দী নারীর তার বন্দী হওয়ার দিনে বা পরদিনেও শেষ হতে পারে।

তাই শোক পালনের জন্য তাদের সময় দেয়া হতো, এই নিকৃষ্ট দাবীটিরও সত্যতা প্রমাণ হয় না। বরঞ্চ প্রমাণ হয়- অমুসলিম কতৃক গর্ভজাত সন্তান যেন মুসলিমদের সন্তান বলে গণ্য না হয়, সেটি। অমুসলিম কতৃক গর্ভজাত সন্তান হলে সেই সন্তানটি দাস বলেই গণ্য হবে।]

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত), পরিচ্ছেদঃ জরায়ু মুক্তকরণ
৩৩৩৮। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন- নবী সা আওত্বাস যুদ্ধেলব্ধ বন্দীনীদের ব্যাপারে ঘোষণা করেন, গর্ভবতীর সাথে সন্তান প্রসব না পর্যন্ত এবং ঋতুবতীর সাথে ঋতুস্রাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সহবাস না করে।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)। পরিচ্ছেদঃ জরায়ু মুক্তকরণ বা পবিত্রকরণ ।
৩৩৪১। ইবনু উমার (রা) বলেন, যে বাঁদীর সাথে সহবাস করা হয় ঐ বাঁদী দান, বিক্রয় করা হলে এক ঋতুস্রাব দ্বারা তার 'ইসতিবরা' (জরায়ুমুক্ত বা পবিত্রকরণ) করতে হবে। তবে **কুমারী- জরায়ুমুক্ত কিনা, তা নিস্প্রয়োজন**।

সুনান আদ-দারেমী (হাদিসবিডি)
পরিচ্ছেদঃ দাসীর ইসতিবরা
১২১২। আওযাঈ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, একটি লোক একটি দাসী ক্রয় করলো **যে এখনো হায়েযে উপনীত হয়নি আর গর্ভধারণের মতো (বয়সও তার) হয়নি**। এমতাবস্থায় সেই লোকটি কতদিন তার থেকে সম্পর্কহীন থাকবে? তিনি বললেনঃ তিন মাস।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৯
করা। (গায়াতুল বয়ান) কোন নাবালিগ দাসীকে যদি সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়, তবে তার ইদ্দত দেড় মাস হবে। যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটে পৌঁছে তার হায়িয এসে যায়, তবে তার ইদ্দত পরিবর্তিত হয়ে তা হায়িযের ইদ্দতে পরিণত হয়ে যাবে।

৬৩৮ আশরাফুল হিদায়া ✪ ৯ম খণ্ড

قَوْلُهُ وَفِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেসব দাসী মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালন করতে হয় অর্থাৎ বয়সের স্বল্পতার কারণে এখনো যাদের হায়েয শুরু হয়নি কিংবা অধিক বয়সের কারণে হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে এমন দাসী যদি কারো অধিকারে আসে তাহলে সে দাসীর গর্ভাশয় পবিত্র বলে সাব্যস্ত হবে এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা। কেননা এসব মহিলার ক্ষেত্রে একমাসকে এক হায়েযের স্থলবর্তী এবং তিন মাসকে তিন হায়েযের স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুনান ইবনু মাজাহ
পরিচ্ছেদঃ **উম্মু ওয়ালাদ (যে দাসীর গর্ভে মনিবের সন্তান জন্ম নেয়)** সম্পর্কে
২৫১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **নবী সা আমাদের মাঝে জীবিত থাকা অবস্থায় আমরা আমাদের যুদ্ধবন্দিনী ক্রীতদাসী ও উম্মু ওয়ালাদ বিক্রয় করতাম**। আমরা এটিকে দূষণীয় মনে করতাম না।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৩৯৫৪। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সা ও আবূ বাকরের যুগে উম্মু ওয়ালাদ দাসীদেরকে বিক্রি করেছি।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত), পরিচ্ছেদঃ সদকার মর্যাদা ।
১৮৯৮। আবূ যার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ প্রত্যেক তাকবীর অর্থাৎ আল্লহু আকবার বলা সদকা, প্রত্যেক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লহ' বলা সদকা। নেককাজের নির্দেশ দেয়া, খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা সদকা। নিজের স্ত্রী অথবা **দাসীর সাথে সহবাস করাও** সদকা। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ যদি নিজের কামভাব চরিতার্থ করে তাতেও কি সে সাওয়াব পাবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ সা বললেনঃ হালাল উপায়ে স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে কামভাব চরিতার্থকারী সাওয়াব পাবে। (মুসলিম)

সহীহ মুসলিম (ইফা)

৪৪২১। সালামা (রা) বলেন, আমরা ফাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করেছিলাম। আমাদের আমীর ছিলেন আবূ বকর (রা)। রাসুলুল্লাহ সা তাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন যখন আমাদের এবং ঐ গোত্রের পানির স্থানের মাঝে এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান ছিল। **এরপর বিভিন্ন দিক দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালালেন এবং পানি পর্যন্ত পৌছলেন। আর যাদের পেলেন হত্যা করলেন এবং বন্দী করলেন**। **আমি লোকদের একটি দলের দিকে দেখছিলাম যাদের মধ্যে শিশু ও নারী রয়েছে। তখন আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম**। তাদের মাঝে চামড়ার পোশাক পরিহিত বনী ফযরার একজন মহিলাও ছিল এবং তার সঙ্গে ছিল তার এক কন্যা। সে ছিল সব চাইতে সুন্দরী কন্যা। আমি সকলকেই হাকিয়ে আবূ বকর (রা) এর কাছে নিকট এলাম। **আবূ বকর (রা) কন্যাটিকে আমাকে নফল হিসাবে প্রদান করলেন। এরপর আমি মদিনায় ফিরে এলাম। আমি তখনও তার বস্ত্র উন্মোচন করিনি। পরে বাজারে আমার সাথে রাসুলুল্লাহ সা এর সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেনঃ হে সালামা! তুমি মহিলাটি আমাকে দিয়ে দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এবং এখনও আমি তার বস্ত্র উন্মোচন করিনি। পরের দিন আবারও বাজারে আমার সাথে রাসুলুল্লাহ সা এর সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেনঃ হে সালামা! তুমি মহিলাটি আমাকে দিয়ে দাও।** তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে আপনার জন্যই। আল্লাহর কসম! আমি তার বস্ত্র উন্মোচন করিনি।

٤٥ - باب فِي وَطْءِ السَّبَايَا

অনুচ্ছেদ- ৪৫ ঃ বন্দী দাসীদের সাথে সঙ্গম করা

আবু দাউদ

২১৫৫। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। হুনাইনের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আওতাসের দিকে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে বন্দী করে আনেন। কিন্তু সেই বন্দী নারীদের মুশরিক স্বামীরা বর্তমান থাকায় রাসূলুল্লাহর কতিপয় সাহাবী তাদের সাথে সঙ্গম করাকে গুনাহ মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন ঃ "যে মহিলাদের স্বামী আছে তারা তোমাদের জন্য হারাম। তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত" (সূরাহ আন-নিসা ঃ ২৪)। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী দাসী যখন তাদের ইদ্দাতকাল সমাপ্ত করবে তখন তারা তোমাদের জন্য বৈধ।[২১৫৫]

সহীহ।

সহীহ বুখারী (ইফা) পরিচ্ছেদঃ ১৩৮৬. ইসতিবরা অর্থাৎ জরায়ু গর্ভমুক্ত কি-না তা জানার পূর্বে বাঁদীকে নিয়ে সফর করা। হাসান বসরী (র) তাকে চুম্বন করা বা তার সাথে মিলামিশা করায় কোন দোষ মনে করেননা। ইবন উমর (রা) বলেন, সহবাসকৃত দাসীকে দান বা বিক্রি বা আযাদ করলে এক হায়য পর্যন্ত তার জরায়ু মুক্ত কি-না দেখতে হবে। কুমারীর বেলায় তার প্রয়োজন নেই। আতা (র) বলেন, **(অপর কর্তৃক) গর্ভবতী নিজ দাসীকে যৌনাঙ্গ ব্যতীত ভোগ করতে পারবে**। মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত বাঁদী ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা......(২৩:৬)।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ) পরিচ্ছেদঃ ৬৭/২৫ ।

আনাস (রাঃ) বলেন, সধবা স্বাধীনা-মহিলাদেরকে বিয়ে করা হারাম; কিন্তু **ক্রীতদাসীকে ব্যবহার করা হারাম নয়। যদি কোন ব্যক্তি বাঁদীকে তার স্বামী থেকে তালাক নিয়ে পরে ব্যবহার করে, তাহলে দোষ নেই**।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অংশীবাদী আরবীদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে বন্দী করে ক্রীতদাস বানানো যাবে।

তাফসীরে মাযহারী/৩০০

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩

১৪. মাসআলা ঃ দুই মুনীবের কোন একজন যদি দাসীকে কারো নিকট বিবাহ দেয় এবং স্বামী তার সাথে সহবাসও করে, তবে অপর মালিক তা ভঙ্গ করে দিতে পারবে।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ২৬৩৫

পরিচ্ছেদঃ যদি কেউ বলে এই দাসীটি তোমার খিদমাতের জন্য দিলাম, এটি বৈধ।

তাফসীরে মাযহারী, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪১

উল্লেখ্য, ক্রীতদাসী বিনিময় দোষের নয়।

ফিক্‌হে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৮১

[৩.১] বাঁদীর সাথে সহবাস করলে হুরমতে মুসাহারাত (বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম) প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেমন আমরা ওপরে ইমাম শু'রানী সংকলিত রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছি। যেখানে বলা হয়েছে, হযরত ওসমান (রা)-কে মা ও মেয়ে যদি একই মালিকের অধীনে বাঁদী হিসেবে থাকে এবং মালিক যদি উভয়ের সাথে সহবাস করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে হযরত ওসমান বলেছিলেন—তাদের দুজনকে হারাম করা আমি পছন্দ করি না।

জন্মসূত্রে দাসদাসীঃ

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪

(যে দাসী থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তাকে উম্মে ওয়ালাদ বলে)। এর অর্থ সন্তানের মা) এর পুত্র সকলেই সমান। (কিফায়া) একজন আযাদ ব্যক্তি যত ইচ্ছা দাসী নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। এর সংখ্যা যত বেশী হোক তাতে কনো অসুবিধা নেই। গোলামের জন্য তার নিয়ন্ত্রণে কোন দাসী রাখা জায়েয নেই। মুনিব অনুমতি দিলেও তা জায়েয হবে না। (হাভী) একজন আযাদ পুরুষ চারজন আযাদ নারী এবং একাধিক দাসী

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭

বাঁদী উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার বিবরণ

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করা, তার থেকে খিদমত নেওয়া, তাকে উপার্জনে লাগানো, বিনিয়োগ করা, উপভোগ করা এবং তার সাথে সহবাস করা ইত্যাদি। পারিশ্রমিক, আয়-উপার্জন, মোহর ইত্যাদির হকদার মনিব হবে।

আল হিদায়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫-

ইমাম কুদূরী বলেন, মানব তাকে সম্ভোগ করতে পারবে, তার খিদমত করতে পারবে, পরিশ্রমের বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করতে পারবে এবং বিবাহদান করতে পারবে।

কেননা তার মাঝে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং সে মুদারব্বার দাসীর সদৃশ হয়ে গেলো।

মনিবের স্বীকৃতি ছাড়া তার সাথে দাসীর সন্তানটির বংশ সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, দাসীর সাথে সহবাসের উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন নয়, বরং যৌন চাহিদা পূরণ। কেননা সন্তান উৎপাদনের প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রয়েছে। (আর তা হলো দাসীর অর্থমূল্য রহিত হওয়া কিংবা হ্রাস পাওয়া) সুতরাং মনিবের পক্ষ থেকে দাবী আবশ্যক

কেননা উম্মে ওয়ালাদের 'শয্যা সম্পর্ক' দুর্বল, এ কারণেই মনিব অন্যত্র বিবাহদানের মাধ্যমে তার শয্যা হস্তান্তর করতে পারে।

অধ্যায় ঃ দাসীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়া

আর মনিব যদি তাকে বিবাহ দেয় এবং সে সন্তান প্রসব করে তাহলে সে সন্তান তার মায়ের অনুবর্তী হবে।

কেননা স্বাধীনতার অধিকার সন্তানের মাঝেও সংক্রমিত হয়। যেমন, মোদাব্বার ঘোষণার ক্ষেত্রে। এ কারণেই তো স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান স্বাধীন হয় এবং দাসীর সন্তান দাস হয়।

যদি আপন পুত্রের দাসীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর দাসী সন্তান প্রসব করে আর সহবাসকারী সন্তানটির পিতৃত্ব দাবী করে, তাহলে তার সাথে সন্তানটির বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। আর সে সহবাসকারীর উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর দাসীটির মূল্য ওয়াজিব হবে। তবে দাসীর মাহর এবং দাসীর সন্তানের মূল্য তার উপর সাব্যস্ত হবে না।

পিতার পিতা (দাদা) যদি বান্দীর সাথে পিতার বর্তমানে সহবাস করে তাহলে তার সঙ্গে বংশ সাব্যস্ত হবে না।

↥

আর দাসী যদি দুইজনের শরীকানাধীন হয় আর সে সন্তান প্রসব করে এবং দু'জনের একজন পিতৃ সন্তানটির পিতৃত্ব দাবী করে তাহলে তার থেকে বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।

আর এ দাসী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে।

কেননা সাহেবায়নের মতে উম্মে ওয়ালাদ হওয়া বিভাজিত হয় না।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে দাবীকারীর অংশটি উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। অতঃপর শরীকদারের অংশটির সে মালিক হয়ে যাবে। কেননা সেটা মালিকানার উপযুক্ত। আর দাবীকারী দাসীর অর্ধেক মাহরের জন্য দায়ী হবে। কেননা সে শরীকানাভুক্ত দাসীর সাথে সহবাস করেছে। ফলে সন্তান উৎপাদনের অনিবার্য হুকুম রূপে মালিকানা সাব্যস্ত হবে। এবং সহবাসের পর বর্তাবে। অপর শরীকদারের অংশের মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে পিতা যদি তার পুত্রের দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা, সেখানে সন্তান উৎপাদনের অনিবার্য শর্তরূপে মালিকানা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং মালিকানা সন্তান উৎপাদন থেকে অগ্রবর্তী হবে। এভাবে পিতা নিজস্ব মালিকানায় সহবাসকারী হবে।

আর দাবীকারী দাসীর সন্তানের মূল্যের যামীন হবে না।

কেননা গর্ভসঞ্চারের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় সন্তানের বংশ সম্পর্ক দাবীকারী থেকে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং সন্তানের গর্ভসঞ্চার কোন ভাবেই শরীকদারের মালিকানায় সম্পন্ন হয়নি। আর উভয়ে একসাথে যদি সন্তানের দাবী করে তাহলে উভয়ের সাথেই বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে।

অর্থাৎ দাসী যদি উভয়ের মালিকানায় গর্ভবতী হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, পিতৃ সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের শরণাপন্ন হতে হবে। কেননা আমরা যেহেতু নিশ্চিত জানি যে, দুই বীর্য দ্বারা সন্তানের সৃষ্টি হয় না। সেহেতু দুই ব্যক্তি থেকে বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবো। এ ঘটনা সত্য যে, উসামা (রা) এর পিতৃ সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্তব্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়েছিলেন।

কারণ এই যে, কাফিররা হযরত উসমান (রা)-এর বংশ সম্পর্কে অভিযোগ করতো। পিতৃ সম্পর্ক নির্ধারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্তব্য ছিলো তাদের অভিযোগ খন্ডনকারী, তাই তিনি তার মন্তব্যে আনন্দিত হয়েছিলেন।

আমাদের দলীল হলো, এই ধরণের ঘটনায় কাযী শোরাইহের উদ্দেশ্যে লিখিত হযরত ওমর (রা) এর ফরমান। (তিনি বলেছেন) এরা দু'জন বিষয়টিকে ঘুলিয়ে ফেলেছে। তাই তুমিও উভয়ের ব্যাপারে বিষয়টিকে ঘুলিয়ে দাও। তারা যদি বিষয়টাকে পরিষ্কার করতো তাহলে তাদের জন্যও তা পরিষ্কার করে দেয়া হতো। সে উভয়ের পুত্র হবে এবং উভয়ের ওয়ারিছ হবে। আর উভয়ে তার ওয়ারিছ হবে। পরবর্তীতে দু'জনের যে জীবদ্দশায় থাকবে, সে তারই পুত্র হবে,

لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لها وهو ابنهما يرثهما
ويرثانه وهو للباقى منهما -

এ সিদ্ধান্ত ছাহাবা কেরামের উপস্থিতিতে হয়েছিলো। হযরত আলী (রা) থেকেও এরূপ সিদ্ধান্ত বর্ণিত আছে।

যদি দুই শরীকের একজন অপরজনের পিতা হয় তাহলে পিতা অগ্রাধিকার লাভ করবে
আর পিতার পক্ষে অগ্রাধিকারের কারণ রূপে পুত্রের অংশের পিতার স্বীকৃত অধিকার বিদ্যমান রয়েছে।

আর দাসীটি উভয়ের উম্মে ওয়ালাদ হবে। কেননা সন্তানের নিজ নিজ অংশে উভয় শরীকদারের দাবী সঠিক। সুতরাং প্রত্যেকের শরীকানাভুক্ত দাসীর অংশটি তার সন্তানের অনুবর্তী হিসাবে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে।

↥

ফিক্‌হে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ২২৯

[২.২] মুদাব্বার ঃ এমন গোলাম বা বাঁদীকে মুদাব্বার বলা হয় যার মুক্তি মনিবের মৃত্যু পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়। যেমন, মনিব বললেন—'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।' এ ধরনের গোলাম বাঁদী মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে মুক্ত বলে গণ্য হয়।

যদি মুদাব্বার বিবাহিত বাঁদী হয় এবং তাকে মুদাব্বার ঘোষণার পূর্বে তার সন্তানাদি থাকে তারা মালিকের গোলাম বাঁদী হিসেবেই গণ্য হবে। তবে মুদাব্বার ঘোষণার পর যদি ঐ বাঁদীর সন্তানাদি হয় তারাও তার সাথে মুক্ত হয়ে যাবে। আবদুর রহমান ইবনু ইয়াকুব যিনি বানু যুহাইনা গোত্রের এক শাখা বানু হিরকার মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন—বর্ণনা করেন, আমার দাদীর মনিব তার এক গোলামের সাথে আমার দাদীকে বিয়ে দেন। অতপর তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করেন। মুদাব্বার ঘোষণার পর তার গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তার কিছুদিন পর আমার দাদীর মনিব ইন্তিকাল করেন। যার ফলে তিনি মুক্ত হয়ে যান। তিনি মুক্ত হয়ে তার সন্তানকে মুক্ত ঘোষণা করার দাবীতে হযরত ওসমান (রা)-এর দরবারে মামলা দায়ের করেন। এ মামলার রায়ে হযরত ওসমান (রা) ঘোষণা করেন—'যে সন্তান তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করার পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে তারা গোলাম বাঁদী হিসেবেই পরিচিত হবে। আর মুদাব্বার ঘোষণার পর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে সে মায়ের সাথে সাথে মুক্ত হয়ে যাবে।'[৫]

৫. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩১৫ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ–৩৯।

ফিকাহুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, শতাব্দী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৮৪, ৮৫

কুরতুবি বলেন : "দাসী বিয়ে করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করে অবিবাহিত থাকা উত্তম। কেননা দাসী বিয়ে করলে তার গর্ভজাত সন্তানও দাস হিসেবে জন্ম নেবে। এ ধরনের বদান্যতার চেয়ে আত্মসংযম ও মহৎ চরিত্র নিয়ে ধৈর্যধারণ করা উত্তম। উমর রা. বলেছেন : কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কোনো দাসীকে বিয়ে করলে তার অর্ধেক অর্থাৎ তার সন্তান পরাধীন দাসে পরিণত হয়। দাহহাক বিন মুযাহিম বলেছেন : আনাস বিন মালেক রা. কে বলতে শুনেছি, রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি পবিত্র ও পবিত্রকৃত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করা উচিত। - (ইবনে মাজাহ)।

তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন

সূরা আন্-নিসা ৩৫১

হযরত ইমাম আবু হানীফা (র)-র মাযহাব তাই। তিনি বলেনঃ স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইহুদী-খৃস্টান দাসীকে বিয়ে করা মকরূহ।

মোট কথা, দাসীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকা স্বাধীন পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় উত্তম। যদি অগত্যা করতেই হয়, তবে ঈমানদার দাসীকে করবে। কারণ, দাসীর গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে ঐ ব্যক্তির গোলাম হয়, যে দাসীর মালিক। অমুসলমান

তাফসীরে জালালাইন : আরবি–বাংলা, প্রথম খণ্ড [পঞ্চম পারা] ৮০৩

خَيْرٌ لَّكُمْ لِئَلَّا يَصِيْرَ الْوَلَدُ رَقِيْقًا وَاللّٰهُ

আশঙ্কা হয়। আর যদি তোমরা সবর কর বাঁদীদেরকে বিয়ে করা হতে, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে করে সন্তান গোলাম না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় এ

১৬৮ সুনানু ইবনে মাজাহ্

১৮৬২ হিশাম ইবন 'আম্মার (র) .... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সে যেন আযাদ মহিলা বিয়ে করে।

১৮০ কিতাবুন নিকাহ্

স্বাধীন মহিলাদের জন্য পর্দা জরুরী, ক্রীতদাসীদের জন্য নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

তাফসীরে ইবনে কাসীর থেকে ৩৩ নম্বর সূরার ৫৯ নম্বর আয়াত

শানে নুযুল হইল এই যে, মদীনায় কিছু ফাসেক লোক বাস করিত; রাত্রের অন্ধকার হইতেই তাহারা মদীনার পথে বাহির হইয়া পড়িত এবং মহিলাদের পিছু করিত। মদীনার বাড়ীঘর ছিল সংকীর্ণ, রাত্র হইলেই মহিলারা প্রয়োজন সারিতে পথে বাহির হইত। ফাসিকও স্বীয় কামনা পূর্ণ করিত। কিন্তু যখন তাহারা কোন মহিলাকে চাদর আবৃত দেখিত তাহারা এই কথা মনে করিত সে আযাদ মহিলা তাহার পিছু করিতে বিরত থাকিত। কিন্তু কোন মহিলাকে চাদর আবৃত না দেখিলে তাহারা তাহাকে বান্দী বলিয়া তাহার উপর কুদিয়া পড়িত। قوله وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ্ বড়ই

২২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড

দুষ্ট লোকেরা স্বাধীন নারীদেরকে তাদের পারিবারিক প্রতিপত্তি ও শক্তির কারণে উত্যক্ত করার সাহস করত না। তারা কেবল দাসীদেরকেই উত্যক্ত করত। মাঝে মাঝে দাসী ভ্রমে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করা হত। তাই আলোচ্য আয়াত স্বাধীন নারীদেরকে দাসীদের থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য এবং তাদের মাথা ও ঘাড় সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও নবী-পত্নী, কন্যা ও সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে আদেশ দিয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদরে আবৃত হয়ে বের হয়। চাদরটি মাথার কিছু নিচে মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে নেবে;

সূরা আহজাব, আয়াত ৫৯

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

আশরাফুল হিদায়া, নবম খণ্ড

কিতাবুল কারাহিয়াহ ৬১৫

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পর পুরুষের জন্য অন্যের দাসীর দেহের এতটুকু অংশই দেখা জায়েজ যতটুকু তার মাহরাম মহিলার মধ্যে জায়েজ। কেননা দাসীকে কাজের পোশাক পরিধান করে তার নিজ মনিবের প্রয়োজনে বাহিরে যেতে হয় এবং তার মেহমানের সেবা করতে হয়। সুতরাং ঘরের ভিতর নিকটাত্মীয় মাহরাম পুরুষের সামনে মহিলার যে অবস্থা ঘরের বাইরে পরপুরুষের সামনে দাসীর সেই অবস্থাই হলো। হযরত ওমর (রা.) কোনো দাসীকে [দেহ ও মাথা] আবৃত অবস্থায় দেখলে দুররা মারতেন এবং বলতেন, হে দাফার! তোমরা ওড়না ফেল, তুমি কি স্বাধীনা মেয়েদের মতো হতে চাও?

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক ক্রীতদাসী স্বাধীনাগণের মতো পর্দা করে হজরত ওমরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। হজরত ওমর তার পর্দা উন্মোচন করলেন। বললেন, হতভাগিনী! মুক্ত রমণীদের মতো পর্দা করেছো কেনো? একথা বলে তিনি তার আবরণী ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে।

তাফসীরে মাযহারী/৫৬৭

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত), ৪৬/ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবীগণের মর্যাদা

পরিচ্ছেদঃ মু'আবিয়া (রা)-এর মর্যাদা

৩৮৪২। রাসুলুল্লাহ সা মু'আবিয়া (রা)-এর জন্য দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ! তুমি তাকে পথপ্রদর্শক ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানাও এবং তার মাধ্যমে মানুষকে সৎপথ দেখাও।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন), ৬২/ সাহাবীগণ [রাযিয়াল্লাহ 'আনহুম]-এর মর্যাদা

পরিচ্ছেদঃ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর উল্লেখ।

৩৭৬৫। ইবন আব্বাস (রা)-কে বলা হল, আপনি আমীরুল মুমিনীন মু'আবিয়া (রা) এর সঙ্গে আলাপ করবেন কি? তিনি বিতর সালাত এক রাকআত আদায় করেছেন। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি ঠিকই করেছেন, কারণ মু'আবিয়া (রা) নিজেই একজন ফকীহ(ইসলামের আইনশাস্ত্রে পন্ডিত)।

২৬৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইমাম শা'বী ও অন্যরা বলেন, শেষ বয়সে মু'আবিয়ার (রা) সামনের দুই দাঁত পড়ে গিয়েছিল।[১] ইব্‌ন আসাকির হযরত মু'আবিয়ার আযাদকৃত গোলাম খোঁজা খাদীজের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন, (একবার) মু'আবিয়া (রা) একটি সুন্দরী ও ফর্সা বাঁদী খরিদ করলেন, এরপর আমি তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় তাঁর সামনে পেশ করলাম, এ সময় তাঁর হাতে একটি দণ্ড ছিল। তিনি তা দ্বারা তার বিশেষ অঙ্গের প্রতি নির্দেশ করে বলেন, এই সম্ভোগ অঙ্গ যদি আমার হত ! তুমি তাকে ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়ার কাছে নিয়ে যাও। তারপর বলেন, না ! তুমি আমার কাছে রাবী'আ বিন আমর আল জুরাশীকে ডেকে আন, উল্লেখ্য যে, ইনি বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন। রাবী'আ যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তিনি তাঁকে বলেন, এই বাঁদীকে বিবস্ত্র অবস্থায় আমার সামনে আনা হয়েছে এবং আমি তার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ দেখেছি, এখন আমি তাকে ইয়াযীদের কাছে পাঠাতে চাই। তিনি বললেন, না। আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি তা করবেন না। কেননা, সে তার জন্য আর হালাল হবে না। তিনি বলেন, তুমি অতি উত্তম রায় প্রদান করেছ। রাবী বলেন, এরপর তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ্ বিন মাসআদা আল ফাযারীকে বাঁদীটি দান করেন। আর সে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ, তাই তিনি তাকে বলেন, এর মাধ্যমে তোমার সন্তানাদিকে ফর্সা করে নাও।' এ ঘটনা হযরত মু'আবিয়ার ধর্মীয় বিচক্ষণতা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। যেহেতু তিনি কামভাবের সাথে বাঁদীটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তার ব্যাপারে নিজেকে দুর্বল গণ্য করেন (এবং তাকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন) তাই তিনি নিম্নের আয়াতের কারণে বাঁদীটি তার পুত্র ইয়াযীদকে দান করা থেকে বিরত থেকেছেন। وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যে সকল নারীকে বিবাহ করেছেন তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না- (আন্ নিসা-২২)। আর ফকীহ রাবী'আ বিন আমর আল-জুরাশী আদ-দিমাশকী এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একমত হয়েছেন।

↥

হযরত উমর (রা) এর পুত্র এবং নবী সা এর অন্যতম সাহাবী আবদুল্লাহ-ইবনে-উমর (রা) হাদিস ও ফিকহের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। উনার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপুর্ণ হাদিস পাওয়া যায় মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থে, যেটি খুবই প্রাচীন একটি হাদিস গ্রন্থ। হাদিসটিতে বলা হচ্ছে, উনি বাজার থেকে দাসী কিনতেন, কেনার সময় ভালভাবে দাসীদের শরীর দেখে নিতেন। স্তন্যের মাঝখানে তিনি হাত দিয়ে দুলিয়ে দেখতেন, দাসীদের স্তন কেমন। খুবই গুরুত্বপুর্ণ হাদিস গ্রন্থের এই হাদিসটি পাওয়া যাবে islamweb.net ওয়েবসাইটে(https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=12627&bk_no=73&flag=1)। হাদিস সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ, তারা এই হাদিসটি সম্পর্কে জানেন।

হাদিসটি সরাসরি আরবি থেকেঃ

إسلام ويب
https://islamweb.net/ar/library/content/73/12627/باب-الرجل-يكشف-الأمة... ▾
... إسلام ويب - مصنف عبد الرزاق - كتاب الطلاق - باب الرجل يكشف الأمة حين
باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها 13198 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال قلت له الرجل يشتري الأمة ، أينظر WEB
... إلى ساقيها ، وقد حاضت ، أو إلى بطنها ؟ قال " نعم " ، قال عطاء كان ابن عمر " يضع يده بين

مصنف عبد الرزاق » كتاب الطلاق »13198 باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال قلت له الرجل يشتري الأمة ، أينظر إلى ساقيها ، وقد حاضت ، أو إلى بطنها ؟ قال " نعم " ، **قال عطاء كان ابن عمر " يضع يده بين ثدييها ، وينظر إلى بطنها ، وينظر إلى ساقيها ، أو يأمر به**

13204 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة قال : وأخبرني ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : " وضع ابن عمر يده بين ثدييها ، ثم هزها "

হাদিসের মূল অংশের বাংলা অনুবাদঃ

ইবনে উমর (রা) তাঁর স্তনগুলির মাঝে হাত রাখতেন, পেটের দিকে তাকাতেন, তার পা দেখতেন বা আদেশ দিতেন।

ইবনে উমর (রা) তাঁর স্তনগুলির মাঝে হাত রাখলেন, তারপর তা ঝাঁকালেন।

৬১৮ আশরাফুল হিদায়া ○ ৯ম খণ্ড

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِانْ يَمَسَّ ذٰلِكَ اِذَا اَرَادَ الشِّرَاءَ وَاِنْ خَافَ اَنْ يَشْتَهِىَ كَذَا ذُكِرَ فِى الْمُخْتَصَرِ وَاَطْلَقَ اَيْضًا فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَلَمْ يَفْصِلْ قَالَ مَشَائِخُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ يُبَاحُ النَّظَرُ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ وَاِنِ اشْتَهٰى لِلضَّرُوْرَةِ وَلَا يُبَاحُ الْمَسُّ اِذَا اشْتَهٰى اَوْ كَانَ اَكْبَرُ رَأْيِهٖ ذٰلِكَ لِاَنَّهٗ نَوْعُ اِسْتِمْتَاعٍ وَفِىْ غَيْرِ حَالَةِ الشِّرَاءِ يُبَاحُ النَّظَرُ وَالْمَسُّ بِشَرْطِ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ দাসী ক্রয় করার ইচ্ছা করে তাহলে সেসব স্থান স্পর্শ করাতে কোনো সমস্যা নেই [যেসব স্থান দেখা বৈধ] যদিও এতে উত্তেজিত বা কামভাব জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা হয়। এভাবেই মুখতাসারুল কুদূরীতে মাসআলাটি বর্ণিত হয়েছে। জামেউস সাগীর গ্রন্থেও মাসআলা এরূপ নিঃশর্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। আমাদের মাশায়েখ বলেছেন, এ অবস্থায় প্রয়োজনের স্বার্থে দৃষ্টিপাত করা বৈধ যদিও উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করা হয়। তবে কামভাব জাগ্রত হলে কিংবা কামভাব জাগ্রত হওয়ার প্রবল ধারণা হলে স্পর্শ করা বৈধ হবে না। কেননা এটা একপ্রকারের ভোগ বলে বা স্বাধ আস্বাদন গণ্য। আর ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা অবস্থায় কামভাব না থাকলে দৃষ্টিপাত ও স্পর্শ করা বৈধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَّمَسَّ الخ : উপরের ইবারতে দাসী ক্রয়ের সময় শরিয়ত নির্ধারিত দর্শনীয় অঙ্গসমূহ স্পর্শ করা যাবে কিনা তা আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) তাঁর মুখতাসারুল কুদূরীতে বলেন, যদি কেউ দাসী ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করে তার জন্য দাসীর ঐ সকল অঙ্গসমূহ স্পর্শ করা জায়েজ, যা দেখা জায়েজ। এমনকি যদি স্পর্শ করার দ্বারা ক্রেতার মধ্যে কামভাব জাগ্রত হয় তবুও।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর জামিউস সাগীরের মধ্যে এভাবেই মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন। জামিউস সাগীরের ইবারত এই–

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الرَّجُلِ يُرِيْدُ شِرَاءَ جَارِيَةٍ فَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَّمَسَّ سَاقَيْهَا وَصَدْرَهَا وَ ذِرَاعَيْهَا وَيَنْظُرَ اِلَى ذٰلِكَ كُلِّهٖ مَكْشُوْفًا .

অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোনো দাসী ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করেছে তার জন্য সে দাসীর পায়ের নলি, বুক ও হাত স্পর্শ করাতে কোনো ক্ষতি বা দোষ নেই এবং এসব অঙ্গ অনাবৃত অবস্থায় দেখাতেও কোনো সমস্যা নেই।

আল- মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদুরী, প্রথম খণ্ড, ইসলামিয়া কুতুবখানা, পৃষ্ঠা ২৩০

وَالْبَخَرُ وَالذَّفَرُ عَيْبٌ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ কোন দাসী ক্রয় করার পর যদি তার মুখে বা বগলে দুর্গন্ধ অনুভূত হয় অথবা সে ব্যভিচারিণী বা জারজ বলে প্রমাণিত হয়; তবে তাকে ফেরত দেয়া যাবে। কারণ অনেক সময় দাসী যৌন সম্ভোগের উদ্দেশ্যেও ক্রয় করা হয়। আর শারীরিক ও চারিত্রিক এ সব দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা তখন মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দাসীর ক্ষেত্রে এগুলো দোষ। পক্ষান্তরে গোলাম দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে গৃহস্থালীর কাজকর্ম সম্পন্ন করা। আর এ সকল ত্রুটি সাধারণত গৃহস্থালীর কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

৫৯৬ আশরাফুল হিদায়া ✪ ৯ম খণ্ড

৬. অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো দাসীকে কুমারী হিসেবে ক্রয় করে। অতঃপর দেখে যে, উক্ত দাসীর কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু বিক্রেতা কুমারীত্ব নষ্ট হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে এরূপ অবস্থায় বিষয়টি যাচাই করার জন্য এক পর্যায়ে দাসীর লজ্জাস্থান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দেখা বৈধ।

↥

ইসলামে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করতে- বলা হয়েছে? লাকুম দীনিকুম অলিয়াদীন/ যার যার ধর্ম তার তার/ ইসলামে কোন জোর জবরদস্তি নেই ?

অনেকেই দাবী করেন যে, ইসলামে যার যার ধর্ম তার তার- এরকম কথা বলা রয়েছে, অথবা ইসলামে কোন জোর জবরদস্তি নেই এরকম আদেশ দেয়া হয়েছে! এরূপ বিবরণ সংবলিত আয়াতটি হচ্ছে সূরা বাকারার ২৫৬ নাম্বার আয়াত, যা কোরআনেরই সূরা তাওবার ৫ নং ও ৭৩ নং আয়াত দ্বারা **মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে**।

আহ্‌কামুল কুরআন ৩৫৫

ইসলামের প্রথম দিকে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত কাফিরদের প্রতি ইসলাম পেশ করার কাজটি যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল, নবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হল, তারপরও যখন তারা শত্রুতা করতে থাকল, তখন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হল তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে। তখন 'দ্বীনের জোর প্রয়োগ করার অবকাশ নেই' কথাটি আরবের মুশরিকদের বেলায় মনসূখ হয়ে গেল। আয়াত নাযিল হল :

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ –

মুশরিকদের যেখানেই পাবে, হত্যা করবে। (সূরা আত্-তওবা : ৫)

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম সম্বলিত আরও বহু আয়াত রয়েছে। তাই উক্ত আল্লাহ্‌র কথা :

لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ –

দ্বীনে কোন জোর প্রয়োগ নেই। হেদায়েতের পথ গুমরাহী থেকে আলাদা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

এই আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে এ আয়াতটি দ্বারা :

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ –

হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। (সূরা তওবা : ৭৩)

এবং এ আয়াতটি দ্বারা :

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ –

অতএব তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর। (সূরা আত্-তওবা : ৫)

এ কথার হাদীসী প্রমাণ হচ্ছে, নবী করীম (স) নিজে আরবের মুশরিকদের নিকট থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন নি। তা নাহলে তাদের উপর তরবারি চালিয়েছেন। আর উক্ত আয়াতটির হুকুম সমস্ত কাফিরের উপরও প্রয়োগযোগ্য হতে পারে।

কেউ যদি প্রশ্ন তোলেন, তাহলে আরবের যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রাসূলে করীম (স) আদেশ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে ইসলাম অথবা তরবারি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না বলে ঘোষণা করেছেন, তার অর্থ তো এই যে, তাদেরকে দ্বীন গ্রহণে ব্যাধ্য করাই হল। আর জানা-ই আছে যে, দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করতে যে লোক বাধ্য হবে, সে প্রকৃত মুসলিম নয়। তাহলে আরবের মুশরিকদের সে জন্যে বাধ্য করার কারণটা কি ?

জবাবে বলা যাবে, তাদেরকে ইসলাম প্রকাশ করতে বাধ্য করা হবে, আকীদা হিসেবে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী বানানো নয়। কেননা জোর করে কারোর মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না। এই জন্যে নবী করীম (স) বলেছেন :

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهُ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ –

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে। তা যদি তারা বলে তা হলে তারা তাদের রক্ত ও ধন-মালকে আমাদের থেকে রক্ষা করতে পারল।

নবী করীম (স) জানিয়ে দিলেন যে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেবলমাত্র ইসলামের প্রকাশের জন্যে। তারা অন্তঃমুখে জাহির করুক যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত। কিন্তু প্রকৃত হৃদয়গত বিশ্বাস, তা সৃষ্টি করা একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষেই সম্ভব, তা তাঁরই নিকট সোপর্দ।

যিম্মীদের মধ্যে কাউকে ঈমান গ্রহণের জন্যে জোরপূর্বক বাধ্য করা হলে বাহ্যিকভাবে তারা মুসলিম হবে এবং তাদেরকে তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে যেতে দেয়া হবে না। তবে তারা যদি সে দিকে ফিরে যায়, তা হলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। হত্যা ছাড়াই তাদেরকে মুসলিম থাকতে বাধ্য করা হবে। কেননা তারা ইসলাম কবুল করলে জোর প্রয়োগের কারণে ইসলামের হুকুম তাদের থেকে দূর হবে না, যদিও তারা ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে বলে তাদের অন্তরে বিশ্বাস নেই বলে বোঝা যায়। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, যুদ্ধের কারণে মুশরিকদের মধ্য থেকে যদি কেউ ইসলাম কবুল করে, তবে সে মুসলিম গণ্য হবে।

রাসূল (স)-এর উপরোদ্ধৃত হাদীসটিতে যুদ্ধকালে ইসলাম প্রকাশ করলে তাকে মোটামুটি ইসলাম ও মুসলিম মেনে নিয়েছেন। যিম্মীদের মধ্যে যাকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হবে, তাকেও। সেও কার্যত মুসলিম হবে, সন্দেহের কারণে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। যুধ্যমান লোকদের মধ্য থেকে কোন বন্দী যদি হত্যা করতে চাওয়া হয় এবং তখনই সে ইসলাম কবুল করে, সেও মুসলিম গণ্য হবে। সে ভয়ের কারণে ইসলাম কবুল করেছে এ কারণে ইসলামের হুকুমটা তার থেকে দূর করে দেবে না। এ ধরনের জোর প্রয়োগও যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তার মুসলিম না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক না হওয়ারই কথা। এক্ষেত্রে যিম্মীর অবস্থা যুধ্যমানের অবস্থার মত হবে না। কেননা যুধ্যমান ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যেতে পারে। কেননা তার বাপ-চাচা যিম্মী হয়ে আছে। আর যে

আয়াতের বিধান দ্বারা কাফেরদেরকে ইসলামের প্রথম যুগে ধর্ম পালনের যেটুকু অবকাশের কথা ভাবা যায়, তা জিহাদের বিধান দ্বারা রহিত করা হয়েছে। মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য লড়াইগুলোই এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام نزل وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه الذين يقاتلونكم من الكفار ولا تعتدوا

অনুবাদ :

পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে। হেরেম শরীফে ইহরামে থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ মাসে তাদের সাথে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া মুসলিমগণ পছন্দ করছিলেন না। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাঁর দীনকে সমুচ্চ করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু প্রথম আক্রমণ শুরু করে তাদের উপর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ

١٩١. وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح والفتنة الشرك منهم أشد أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام التي استعظمتموه ولا تقاتلوهم عند

১৯১. [প্রথম আক্রমণ না করার] এ হুকুমটি সূরা বারাআতের আয়াত এবং তা পরবর্তী এই বাক্য وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ [তাদের যেখানে পাও, হত্যা কর] দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। যেখানে তাদের ধরতে পারবে অর্থাৎ তাদেরকে পাবে হত্যা কর। যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে অর্থাৎ মক্কা নগরী তোমরাও সেই স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কৃত কর। মক্কা বিজয়ের বৎসর তাদের সাথে এই [হত্যা ও বহিষ্কার করার] আচরণ করা হয়েছিল। হেরেম শরীফে ইহরামরত অবস্থায় হত্যা করা যাকে তোমরা গুরুতর পাপ বলে ধারণা করছ, তা হতে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ এদের এই শিরক বা অংশীবাদে বিশ্বাস নিকৃষ্টতর। অধিক গুরুতর।

↥

তাফসীরে মাযহারী/১১৮

নির্দেশনাটি দাঁড়াচ্ছে এ রকম—অবিশ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণ অনুগত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সহীহ মুসলিম শরীফ- ১৭তম খণ্ড ১৩

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর এক জামাআত অনুসারীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে নিয়ামত প্রদান করিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা বেশ সংখ্যক সাহাবা দ্বারা সাহায্য করিলেন এবং শক্তি দান করিলেন। তখন জিহাদকে ফরয করিয়া দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ (তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইল –সূরা বাকারা ২১৬) (আহকামুল কুরআন

১২ কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার

চতুর্থ ধাপ ঃ মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ না করিলেও সকল ধর্ম ও বর্ণের কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথমেই জিহাদ শুরু করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জিযিয়া (ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর) প্রদান না করে। আর ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কালেমা সমুন্নত করা, দ্বীন ইসলামের মর্যাদা দান এবং কুফরের দাপট ধ্বংস করা উদ্দেশ্য। আর এই ধাপের কার্যক্রম হিজরী ৯ম সনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর যবানীতে এই ধাপের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সূরা তাওবায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (অনন্তর যখন হারাম মাসসমূহ অতীত হইয়া যাইবে তখন ঐ মুশরিকদেরকে তোমরা যেইখানেই পাও হত্যা কর এবং ধৃত কর আর অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাটির অবস্থানসমূহে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বসিয়া যাও। অতঃপর তাহারা যদি (কুফরী হইতে) তাওবা করিয়া লয় এবং নামায আদায় করিতে থাকে এবং যাকাত দিতে থাকে, তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। –সূরা তাওবা ৫)

সূরা তাওবার অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (তোমরা যুদ্ধ কর ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে যাহারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁহার রসূল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন তাহা হারাম করে না আর গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম যতক্ষণ না তাহারা বশ্যতা স্বীকার করতঃ জিযিয়া (কর) প্রদানে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। –(সূরা তাওবা ২৯)

সূরায়ে আনফালে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (আর তোমরা তাহাদের সহিত লড়িতে থাক যদ্যাবধি তাহাদের মধ্য হইতে ফিতনা (শিরক) বিলুপ্ত হইয়া না যায় এবং দ্বীন যেন কেবল আল্লাহর জন্যই হয়। –সূরা আনফাল ৩৯)

৪৭৮ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 478

৭. ওমানের সম্রাটের নিকটে পত্র (الكتاب إلى ملك عُمَان) : ৮ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে ওমানের খ্রিষ্টান সম্রাট জায়ফার ও তার ভাই আব্দ-এর নামে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) পত্র লেখেন। পত্রবাহক ছিলেন হযরত আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

'... আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে জুলান্দা আযদীর দুই পুত্র জায়ফার ও আব্দের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হৌক ঐ ব্যক্তির উপরে যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। অতঃপর আমি আপনাদের দু'জনকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা ইসলাম কবুল করুন, নিরাপদ থাকুন। আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, যাতে আমি জীবিতদের সতর্ক করি এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতঃপর যদি আপনারা ইসলাম কবুল করেন, তবে আপনাদেরকেই আমি গবর্ণর নিযুক্ত করে দেব। আর যদি ইসলাম কবুলে অস্বীকার করেন, তাহ'লে আপনাদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। আমার ঘোড়া আপনাদের এলাকায় প্রবেশ করবে ও আমার নবুঅত আপনাদের রাজ্যে বিজয়ী হবে'।

ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের অন্যতম পণ্ডিত ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত বই- বাংলাদেশে প্রচলিত শির্ক বিদ'আত ও কুসংস্কার পর্যালোচনা গ্রন্থে পরিষ্কারভাবেই বলা আছে যে, শিকর হচ্ছে হত্যাযোগ্য অপরাধ। যারা শিরক করে, তাদের রক্ত মুসলিমদের জন্য হালাল।

যারা শির্ক চর্চা করে, তাদের রক্ত মুসলিমদের জন্য হালাল, হত্যাযোগ্য। আল্লাহর ভাষায়-

﴿ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۝٥ ﴾ [التوبة: ٥]

"অতঃপর শির্ককারীদের যেখানে পাবে তাদেরকে হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর ও অবরুদ্ধ কর। আর তাদের ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎপেতে বসে থাকো।"[10]

[10]. সূরা আত তাওবাহ: ০৫।

সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ পারা ২৬ 921 محمد ٤٧ حم ٢٦

৪. অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মিলিত হও তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বেড়িতে বাঁধবে; অতঃপর তখন হয় অনুকম্পা; নয় মুক্তিপণ। (তোমরা জিহাদ চালাবে) যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্রের বোঝা নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে (নিজেই) শাস্তি দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝٤

৭. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের (অবস্থান) সুদৃঢ় করবেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝٧

নিম্নোক্ত আয়াতে খুব পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয় যে, যুদ্ধের পরে কাফের যুদ্ধবন্দীদের ওপর যথেষ্ট পরিমাণ হত্যাকাণ্ড এবং রক্তপাত ঘটানো না পর্যন্ত তাদেরকে মুক্তিপণের জন্য বন্দী করা নবীর জন্য জায়েজ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ খুব পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন, যুদ্ধে যেসকল কাফের পরাজিত এবং বন্দী হবে, তাদের যথেষ্ট পরিমাণ রক্তপাত ঘটানো জরুরি!

সূরা আনফাল ৬৭ “**কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে** (এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) **যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন**। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত”।

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, দ্বিতীয় খণ্ড [দশম পারা] ৬০১

٦٧. وَنَزَلَ لَمَّا اَخَذُوا الْفِدَاءَ مِنْ اَسْرٰى بَدْرٍ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ تَكُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ط يُبَالِغَ فِىْ قَتْلِ الْكُفَّارِ تُرِيْدُوْنَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا حُطَامَهَا بِاَخْذِ الْفِدَاءِ.

৬৭. বদর যুদ্ধে বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করলে এই আয়াত নাজিল হয় যে, পৃথিবীতে ভালোভাবে রক্ত প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কাফের-বধ না হওয়া পর্যন্ত تَكُوْنَ -এটা ى [প্রথমপুরুষ, পুংলিঙ্গ] ও ت [প্রথমপুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সঙ্গত নয়। হে মুমিনগণ! মুক্তিপণ গ্রহণ করে তোমরা পার্থিব সম্পদ তার তুচ্ছ সামগ্রী কামনা কর,

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬৭

'মা কানা লিনাবিয়্যিন আঁয়্যাকুনা লাহু আস্‌রা হাত্তা ইউছ্‌খিনা ফিল আরদ্ব' অর্থ— দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সংগত নয়।

'ইউছ্‌খিনা' অর্থ নিপাত করা, নিশ্চিহ্ন করা, পরাভূত করা, হত্যা করা অথবা পরাস্ত করা। এখানে মূল কর্ম বা হত্যা করার কথাটি রয়েছে অনুক্ত। এভাবে আয়াতে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে— শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া যাবে না। হত্যা করতে হবে তাদেরকে। এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন— 'আছখানা ফলানা' অর্থ অমুক ব্যক্তিকে নিপাত করা হয়েছে, 'আছখানা ফিল আদুবি' অর্থ শত্রুকে যথেষ্ট পরিমাণে আঘাত করা হয়েছে ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে 'তুরিদুনা আরদ্বাদ্ দুন্‌ইয়া' (তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ)। এ কথার অর্থ— হে মুসলমানেরা! তোমরা চাও ধ্বংসশীল পার্থিব বৈভব।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো বদর যুদ্ধের সময়। তখন মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিলো অল্প। পরবর্তী সময়ে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলো তখন অবতীর্ণ হলো— 'ফাইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইন্না ফিদাআন্' (এরপর হয় অনুগ্রহ করবে নয়তোবা রক্তপণ নেবে)। এই আয়াতের মাধ্যমে রসুল স. কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়া হলো। যুদ্ধবন্দীকে হত্যা, অথবা তাদেরকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করা কিংবা মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া— যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তখন থেকে রসুল স. কে এবং মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ বন্দীদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করা সিদ্ধ। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। এর মাধ্যমে অংশীবাদীতা নিপাত করা হয় এবং সম্মানিত করা হয় ইসলামকে।

কেবল শাসকই যুদ্ধবন্দীকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারেন। তবে কেউ যদি অতর্কিতে কোনো যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করে ফেলে তবে এর জন্য তাকে রক্তপণ দিতে হবে না।

তাফসীরে মাযহারী/২০০

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আবুল ফজল আয়ায তাঁর আশ্‌শিফা গ্রন্থে লিখেছেন, হত্যা ও মুক্তিপণ গ্রহণ— দু'টোই ছিলো বৈধ। তবে হত্যা ছিলো উত্তম এবং মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে বন্দী মুক্তির ব্যাপারটি ছিলো অনুত্তম। রূপকার্থে তাই মুক্তিপণ গ্রহণ করাকে অন্যায় বলা হয়েছে। নির্দেশনাটি ছিলো এ রকম— উত্তম আমল গ্রহণ করাই সমীচীন। তিবরানীও এ রকম বলেছেন। হজরত ওমর এবং হজরত সা'দ গ্রহণ করেছিলেন উত্তম আমলটি। তাই রসুল স. বলেছিলেন, আযাব এলে ওমর ও সা'দ ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারতো না। কিন্তু তকদীরের নির্ধারণ ছিলো আযাব আসবে না। তাই আযাব আসেনি।

তাফসীরে মাযহারী/২০৭

সাধারণ, সেহেতু কাফিররা সূচনা না করলেও (প্রয়াজন হওয়া মাত্র) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরয।

মুসলিম বাহিনী যখন দারুল হরবে প্রবেশ করে কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করবে তখন তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে।

যদি তারা দাওয়াতে সাড়া দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকবে। কেননা উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

আর যদি তারা সাড়া দানে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে জিযয়া প্রদানের আহ্বান জানাবে। প্রেরিত বিভিন্ন বাহিনীর অধিনায়কদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই আদেশ করেছেন।

এটা হলো তাদের বেলায়, যাদের থেকে জিযয়া গ্রহণের বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে মোরতাদ ও আরবের মূর্তিপূজক যাদের থেকে জিযয়া গ্রহণের বিধান নেই, তাদের থেকে জিযয়া গ্রহণের আহ্বান জানানোতে কোন ফায়দা নেই। কেননা তাদের থেকে তো ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ্ বলেছেন تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ (ইসলাম গ্রহণকরা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।)

↥

যদি দাওয়াতের পূর্বেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে তাহলে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে গোনাহ্গার হবে। তবে কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা প্রাণরক্ষাকারী এখানে অনুপস্থিত, আর তা হলো দীন গ্রহণ কিংবা দারুল ইসলামে আশ্রয় গ্রহণ। সুতরাং অমুসলিম নারী বা শিশুদের হত্যার মত হলো।

আর যাদের কাছে ইতিপূর্বে দাওয়াত পৌছেছে, তাদেরও দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। অতিরিক্ত সতর্কীকরণ হিসেবে; তবে তা ওয়াজিব নয়। কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসতর্ক অবস্থায় বনী মুস্তালিকের উপর হামলা করেছিলেন এবং উসামা (রা) কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন উবনা বস্তিতে খুব জোরে হামলা চালানোর এবং বস্তি জ্বালিয়ে দেয়ার। আর অসতর্ক হানা দাওয়াত দিয়ে হয় না।

যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের বিরুদ্ধে করেছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জ্বালাও পোড়াও চালাবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোয়াইরা অঞ্চল (প্রয়োজনে) জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, (বাঁধ ভেংগে বা অন্য উপায়ে) তাদের উপর পানি ছেড়ে দেবে এবং তাদের বৃক্ষ নিধন করবে এবং তাদের ফসল নষ্ট করবে।

কেননা এসব দ্বারা তাদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করা হয়, তাদের প্রতিপত্তি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং তাদের সংহতি বিচ্ছিন্ন করা হয়। সুতরাং তা বৈধ হবে।

নারীদের প্রতি ইসলাম

সুরা নিসা আয়াত ৩৪। **পুরুষরা নারীদের কর্তৃত্বশীল**, এ কারণে যে, **আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে**। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত থাকে
আর যদি স্ত্রীদের মধ্যে কোন অবাধ্যতা খুঁজে পাও(বা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর) তবে- তাদের সদুপদেশ দাও, **তাদের শয্যা ত্যাগ কর** এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়(আনুগত্য করে), তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। (**Men are in charge of women** by right of what Allah has given)

তাফসীরঃ পুরুষ নারীর কর্তা। ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বানিয়েছে। নারীর উপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তাকে তার স্বামীর যা আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা।

আবু দাউদ , বই নং ১১, হাদিস- ২১৪২
স্ত্রীকে কেন প্রহার করা হলো সে বিষয়ে শেষ বিচারের দিন তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না।

আবু দাউদ , বই নং ১১, হাদিস- ২১৪৪

১৫৮ আবূ দাউদ শরীফ

২১৪৪। যুহায়র ইব্ন হারব ..... উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তিকে (দুনিয়াতে) তার স্ত্রীকে মারধর করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

Abu Daud Vol-2, Hadith no 2147

2147. 'Umar bin Al-Khattâb narrated that the Prophet ﷺ said: "No man should be asked regarding why he hit his wife." (*Hasan*)

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيِّ، عَن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
৪৯৪২। নবী সা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে; কিন্তু ঐ দিনের শেষেই সে আবার তার সঙ্গে এক বিছানায় মিলিত হয়।

৫২০৪ নবী সা বলেছেন, **তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদেরকে গোলামের মত প্রহার করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সঙ্গে তো সহবাস করবে।**

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত), পরিচ্ছেদঃ স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার
৩২৪২। আব্দুল্লাহ ইবনু যামআহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন **ক্রীতদাসীর ন্যায় স্ত্রীকে না মারে (অত্যাচার না করা হয়), অথচ দিনের শেষেই তার সাথে সহবাস করে।**
অপর বর্ণনায় আছে- **তোমাদের কেউ যেন ইচ্ছা করে স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর ন্যায় মারমুখো না হয়**, হয়তো দিন শেষে তার সাথে সহবাস করতে চাইবে; আর এতে সে অনাগ্রহ প্রকাশ করবে।

Muhammad ibn Saad. Kitab al-Tabaqat al-Kabir Volume 8। Page: 163

Maymun said, "Umm Kulthum bint 'Uqba ibn Abi Mu'ayt was married to az-Zubayr ibn al-'Awwam. He had some harshness towards women and she disliked him. So she asked him for a divorce. He refused her until he divorced her unwittingly. Once she

Muhammad ibn Saad. Kitab al-Tabaqat al-Kabir Volume 8। Page: 163

It is related from 'Ikrima that Asma' bint Abi Bakr was married to az-Zubayr ibn al-'Awwam. He was hard on her and she went to her father and complained about that to him. He said, "My daughter, be patient. When a woman has a righteous husband and he dies and she

[[সেই বউ পেটানো, মারধর করা সাহাবী যুবায়রকে নবী বিনা হিসাবে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে ! নিচেই প্রমান পাবেন-
সুনান আবূ দাউদ (ইফা)
৪৫৭৭। সাঈদ ইবন যায়দ (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সা কে বলতে শুনেছি যে, দশ ব্যক্তি বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। তাঁরা হলেনঃ ১। নবী সা, আবূ বকর (রা), ৩। উমার (রা), ...,,,...............

সুনান ইবনু মাজাহ
পরিচ্ছেদঃ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা (রা)-দের সম্মান
১৩৩। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ আবূ বাকর, উমর, উসমান, আলী, ত্বলহা, যুবায়র, সা'দ, সাঈদ, আবদুর রহমান ইবনু আওফ জান্নাতী।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
৬১০৮। উমার (রা) বলেন, খিলাফতের ব্যাপারে এ কয়েকজন ছাড়া আমি অন্য আর কাউকেও যোগ্যতম মনে করি না, যাঁদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুর সময় খুশি থেকে গেছেন। অতঃপর তিনি আলী রা, উসমান রা, **যুবায়র রা** , ত্বলহা রা, সাদ রা (এর নাম উল্লেখ করেন।]]

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
২১৪২। রাসুল সা বলেছেন, স্ত্রীকে পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে। তার মুখমন্ডলে মারবে না।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
পরিচ্ছেদঃ স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং স্বামী-স্ত্রীর অধিকার
৩২৫৯। ইবন হাকীম ইবনু মুআবিয়াহ্ কুশায়রী (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! স্ত্রীগণ আমাদের ওপর কি অধিকার রাখে? রাসুলুল্লাহ সা বললেন, তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খাওয়াও; তুমি পরলে তাকেও পরিধান করাও, (প্রয়োজনে মারতে হলে) মুখমন্ডলে আঘাত করো না।

স্ত্রী কি স্বামীর দাসী সেক্স বিষয়ে আপত্তি করতে পারে?

মুয়াত্তা মালিক, হাদিস নম্বরঃ 1280
পরিচ্ছদঃ বয়স্ক হওয়ার পর দুধ পান করা
রেওয়ায়ত ১৩। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেনঃ এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আমার এক দাসী ছিল। আমি উহার সহিত সঙ্গম করিতাম। আমার স্ত্রী ইচ্ছাপূর্বক উহাকে দুধ খাওয়াইয়া দেয়, তারপর আমি সেই দাসীর নিকট সঙ্গমের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার স্ত্রী বলিল থাম। উহার সাথে সংগত হইও না আল্লাহর কসম, আমি উহাকে দুধ পান করাইয়াছি। **উমর (রা) বলিলেন তোমার স্ত্রীকে শাস্তি দাও, তারপর দাসীর সাথে সহবাস কর, দুধ পান করানো ছোটদের বেলায় গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে।**

৫৮২৫ রিফাআ তার স্ত্রীকে ত্বালাক দেয়। পরে আবদুর রহমান কুরাযী রা. তাকে বিবাহ করে।
স্ত্রীলোকটি আয়িশাহ (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করল তার বর্তমান স্বামীর প্রহারের কারণে স্বীয় গাত্রের চামড়ার সবুজ বর্ণ দেখালো। আয়িশাহ বললেনঃ কোন মুমিন মহিলাকে এমনভাবে প্রহার করতে আমি কখনও দেখিনি। মহিলাটির চামড়া তার কাপড়ের চেয়ে বেশি সবুজ হয়ে গেছে।
নারীটি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ **রিফা'আ তোমার জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না আবদুর রহমান তোমার সুধা আস্বাদন করবে**।

৫২৬১ আয়িশাহ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করল। পরে দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিল। নবী সা-কে জিজ্ঞেস করা হল মহিলাটি কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেনঃ না, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী তার স্বাদ গ্রহণ করবে, **যেমন স্বাদ গ্রহণ করেছিল প্রথম স্বামী**।

৫২১৩। নবী সা এর সুন্নত এই যে, যদি কেউ কুমারী মেয়ে বিয়ে করে, তবে তার সঙ্গে সাত দিনরাত্রি যাপন করতে হবে আর যদি কেউ কোন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে, তাহলে তার সঙ্গে তিন দিন যাপন করতে হবে।

৫২১৪। নবী সা-এর সুন্নাত হচ্ছে, যদি কেউ বিধবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী বিয়ে করে তবে সে যেন তার সঙ্গে সাত দিনরাত্রি অতিবাহিত করে এবং এরপর পালা অনুসারে এবং কেউ যদি কোন বিধবাকে বিয়ে করে এবং তার ঘরে পূর্ব থেকেই কুমারী স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তার সঙ্গে তিন দিন কাটায় এবং তারপর পালাক্রমে।

সুনানে ইবনে মাজাহ

১৮৭৯। রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **যে নারীকে তার অভিভাবক বিবাহ দেয়নি তার বিবাহ বাতিল। স্বামী তার সাথে সহবাস করলে তাতে সে মোহরানার অধিকারী হবে।**

সুনানে ইবনে মাজাহ।

১৮৮২। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকে বিবাহ দিবে না** এবং কোন মহিলা নিজেকেও বিবাহ দিবে না। কেননা **যে নারী স্বউদ্যোগে বিবাহ করে সে ব্যাভিচারী।**

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

৬৯৭০। রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেনঃ বিধবাকে তার মতামত ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারীকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না। তারা বললেন, **তার অনুমতি কেমন হবে? তিনি বললেনঃ তার চুপচাপ থাকা।**

১০৮৮ নবী সা বলেছেনঃ **কোন নারীর জন্য কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে একদিন ও এক রাত্রির পথও সফর করা জায়েজ নয়।**

হাদীস সম্ভার

২৬৫৯। নবী সা বলেছেন, রমণী যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে কোন পুরুষের মজলিসের পাশ দিয়ে পার হয়ে যায় তাহলে সে এক বেশ্যা।

সুনানে ইবনে মাজাহ

৩০৭৩। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা সাফিয়্যা (রাঃ) সম্পর্কে জানতে চাইলে আমরা বললাম, **সে ঋতুবতী হয়েছে**। নবী সা বলেনঃ **বন্ধ্যা, ন্যাড়া, সে তো আমাদের আটকে ফেলেছে।**

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)

৩০৯৮। নবী সা যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন সাফিয়্যাকে তাঁর তাঁবুর দরজায় চিন্তিত ও অবসাদগ্রস্ত দেখতে পেলেন। **নবী সা বললেনঃ বন্ধ্যা, নেড়ি !** তুমি আমাদের এখানে আটকে রাখবে?

সুনানে নাসায়ী (ইফা)

৩৯৬৬। আয়িশা (রাঃ) বলেন- **নবী সা আমাকে বুকের ওপর মুষ্ঠাঘাত করলেন যা আমাকে ব্যথা দিল।**

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ২১৪৬। .... আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা আমার বুকে একটা থাপ্পড় মারলেন যাতে আমি ব্যথা পেলাম।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত),

৫২৭১। মদীনাতে এক মহিলা খাতনা করতো। নবী সা তাকে বললেনঃ তুমি গভীর করে কাটবে না। কারণ তা মেয়েলোকের জন্য অধিকতর আরামদায়ক এবং স্বামীর জন্য অতি পছন্দনীয়।

আবূ দাউদ ইফা ৫১৮১। ....নবী সা তাকে বললেনঃ তুমি মেয়েদের লিংগাংগ্র বেশী গভীর করে কাটবে না। কেননা, এটা মেয়েদের শরীরের এমন একটা অংশ, যা পুরুষদের কাছে খুবই প্রিয়।

Ahmad Ibn Hanbal 5:75; Abu Dawud, Adab 167

Abu al- Malih ibn `Usama's father relates that the Prophet said: "Circumcision is a law for men and a preservation of honour for women." "খাতনা পুরুষের জন্য সুন্নাত ও নারীর জন্য সম্মান।"

٥٩٦- بَابُ الْخِتَانِ

৫৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ খাত্না

১২৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম আশি বৎসর বয়সে খাত্না (ত্বকচ্ছেদ) করেন এবং তাঁহার এই খাত্না হয় কুদূম নামক স্থানে।

٥٩٧- بَابُ خَفْضِ الْمَرْأَةِ

৫৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী লোকের খাত্না

১২৬২. হযরত আবদুল ওয়াহিদ বর্ণনা করেন যে, আমাকে কূফার জনৈকা বৃদ্ধা আলী ইব্‌ন গুরাবের দাদী বলিয়াছেন, আমার কাছে বিবি উম্মুল মুহাজির বলিয়াছেন, রূমের যুদ্ধে আমি অন্যান্য কতিপয় দাসীর সাথে বন্দিনী অবস্থায় আসি। হযরত উসমান (রা) আমাদিগকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। আমিও অপর একজন দাসী ব্যতিরেকে আর কেহই কিন্তু এই দাওয়াতে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল না। তখন উসমান (রা) বলিলেনঃ উহাদিগকে লইয়া যাও, উহাদের খাত্নার ব্যবস্থা কর এবং উহাদিগকে পবিত্র কর!

সুনানে ইবনে মাজাহ

৪/৬১১। The Messenger of Allah said: '**When the two circumcised parts meet**, and the tip of the penis disappears, then bath is obligatory.

সূনান তিরমিজী (ইফা)

১০৮। আয়িশা রা থেকে বর্ণনা করেন যে, মিলনকালে **স্বামী-স্ত্রীর খাতনা করার স্থানটুকু** অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়। আমার ও রাসূল সা এর মাঝে এরূপ হয়েছে। তখন আমরা গোসল করেছি।

আল-আদাবুল মুফরাদ

অধ্যায়ঃ খতনা অনুষ্ঠান

১২৫৯। উম্মু আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) এর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের খতনা করানো হলো। ....

Umdat as-Salik,

Hanbalis hold that circumcision of women is not obligatory but sunna, while Hanafis consider it a mere courtesy to the husband.)

আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

২১৬৪। ইবনু আব্বাস (রাযি.) বলেন, আনসাররা(মদিনার লোকেরা) মূর্তিপূজারী ছিলো। তারা আহলে কিতাব ইয়াহুদীদের সাথে বসবাস করতো। ইয়াহুদীদের নিয়ম ছিলো, তারা স্ত্রীদেরকে কেবল চিৎ করে শুইয়ে সঙ্গম করতো এবং বলতো, মহিলাদের সতর(লজ্জা) এ নিয়মে অধিক সংরক্ষিত। আনসার সম্প্রদায়ও তাদের এ কাজে আহলে কিতাবদের নিয়ম অনুসরণ করতো।

কিন্তু কুরাইশরা নারীদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সঙ্গম করতো এবং তাদেরকে সামনাসামনি, পেছনের দিকে এবং চিৎ করে শুইয়ে বিভিন্নভাবে সঙ্গম করতো।

অতঃপর যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আসলেন তখন তাদের এক ব্যক্তি জনৈক আনাসারী নারীকে বিয়ে করে তার সাথে ঐভাবে সঙ্গম করতে চাইলো যেভাবে তারা মক্কার নারীদের সাথে করতো। কিন্তু মহিলাটি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো, আমরা শুধু এক অবস্থায়ই সঙ্গম করি। সুতরাং তোমাকেও সেভাবেই সঙ্গম করতে হবে অন্যথায় আমার থেকে দূরে থাকো। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ সুরা আল বাকারা আয়াত ২২৩- তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য **শস্যক্ষেত**। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। (অর্থাৎ সামনের দিক

↥

থেকে, পিছনের দিক থেকে বা চিৎ করে শুইয়ে তার লজ্জাস্থানেই সঙ্গম করো।)

সূনান আবু দাউদ (ইফা)
পরিচ্ছদঃ **বন্দী স্ত্রীলোকের সাথে সঙ্গম করা**।
২১৫৫। হুনায়নের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ ঈমানদার ব্যক্তি যেন **অন্যের ক্ষেতে পানি সেচ না করে অর্থাৎ অন্যের গর্ভবতী কোন নারীর সাথে সহবাস না করে**। যতক্ষণ সে সন্তান প্রসব করে পবিত্র না হয়।

হাদীস সম্ভার
২৫৫৮। একাধিক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা বলেছেন, তোমরা কুমারী বিবাহ কর। কারণ **কুমারীদের** মুখ অধিক মিষ্টি, তাদের গর্ভাশয় অধিক সন্তানধারী, তাদের **যোনীপথ অধিক উষ্ণ**, তারা স্বল্পে অধিক সন্তুষ্ট থাকে।

সহীহ মুসলিম (হাদিস একাডেমী)
পরিচ্ছদঃ মুতআহ বিবাহ বৈধ ছিল, পরে তা বাতিল করা হয়, অতঃপর বৈধ করা হয়, আবার বাতিল করা হয়।
৩৩০৯। রসূলুল্লাহ সা আওত্বাস যুদ্ধের বছর- তিন দিনের জন্য মুত'আ(সাময়িক ভোগের) বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তা নিষিদ্ধ করেন।

সুনান ইবনু মাজাহ
১৯৬২। সাবরাহ্ (র) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সা এর সাথে বিদায় হাজ্জে রওয়ানা হলাম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! স্ত্রীহীন অবস্থায় থাকা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন : তাহলে তোমরা এসব মহিলাদের সাথে মুত'আ করো (সাময়িকভাবে উপকৃত হও)।

সহীহ মুসলিম (ইফা)
৩২৯৪। ইবনু সাবরা জুহানী (র) থেকে পর্যায়ক্রমে সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, **মক্কা বিজয়ের বছর আমাদের মক্কায় প্রবেশকালে রাসুলুল্লাহ সা আমাদের মুত'আ বিবাহের অনুমতি দান করেন। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত (নারী সঙ্গ ত্যাগ করে) বের হয়ে আসি নি**।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)
পরিচ্ছেদঃ মুত্'আহ বিবাহ বৈধ ছিল, পরে তা বাতিল করা হয়, অতঃপর বৈধ করা হয়, আবার বাতিল করা হয় এবং তা কিয়ামাত পর্যন্ত স্থির থাকবে।
৩৩০৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা এক মুঠো খেজুর অথবা ময়দার বিনিময়ে রসূলুল্লাহ সা এর যুগে এবং আবূ বাকর (রা) এর যুগে মুত'আহ বিবাহ করতাম। শেষ পর্যন্ত উমর (রা) আমর ইবনু হুরায়স এর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তা নিষিদ্ধ করেন।*
* 'আমর ইবন হুরায়স কুফায় তার মুক্তদাসীকে মুত'আহ বিবাহ করেন। এর ফলে সে গর্ভবতী হলে তাকে নিয়ে আমর ইবন হুরায়স উমার ফারুক (রাযিঃ) এর কাছে উপস্থিত হন, এ সময় তিনি মুত'আহ বিবাহকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন।

[খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে। এরপরে মক্কা বিজয়ের সময় আবারো মুহাম্মদ মুতা বিবাহের অনুমতি দেন, যেটি হয়েছিল ১১ জানুয়ারী, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ। এর আরো পরে আবার হুনায়নের যুদ্ধের পরে ঘটা আওতাসের যুদ্ধের সময় আবারো মুতাহ বিবাহের অনুমতি দেন। হুনায়নের যুদ্ধ হয়েছিল ৬৩০ সালে, মক্কা বিজয়ের পরে। এরও পরে আওতাসের যুদ্ধ হয়েছিল, তার রেফারেন্স পাবেন ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৮৪ তে। তখন আবারো মুতাহ বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।]
If any confusion then clear it- https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=12898

কোরআন ৩:১৪। মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা- **নারী**, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্র। **এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ সামগ্রী**।

কোরআন ৪:২৪

নারীদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে ভোগ করেছ তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও।

সূরা নিসা ২৫

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً.

'তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে, তাহাকে তাহার নির্ধারিত হক দান করিবে।' অর্থাৎ যাহাদিগকে ভোগ করিবে, তাহাদিগকে ভোগের বিনিময়ে মাহর দান করিবে।

এই আয়াতের সাধারণ অর্থ দ্বারা মুত'আ বিবাহের সমর্থনে দলীল গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগে ইহা জায়েয ছিল ও পরে ইহা রহিত করা হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ

'তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি মাহর নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও।'

এই আয়াত দ্বারা যাহারা মুত'আ বিবাহ উদ্দেশ্য নেন তাহারা অর্থ করেন যে, যখন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবে, তখন পুনরায় বিনিময় বৃদ্ধি করিয়া মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া লওয়ায় কোন পাপ নাই।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইচ্ছা করিলে পূর্ব নির্ধারিত মাহরের পর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সে বলিবে—আমি এত সময়ের জন্যে পুনরায় মুত'আ করিতেছি। আর গর্ভাশয়ের পবিত্রতার পূর্বে যদি বিনিময়ের সেই বেশি অংশটা নির্ধারিত করে নেয়, তবে সে মেয়াদও বৃদ্ধি করিয়া নিতে পারিবে।

২২৮ তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস

আরো বলা হয়, তোমরা ক্রয় করবে তোমাদের অর্থ ব্যয়ে যেসব বাদী। আরো বলা হয়, তোমরা চাইবে তোমাদের অর্থ ব্যয়ে তাদের লজ্জাস্থান।

সূরাঃ আন-নিসা, আয়াতঃ ২৪

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

[3] এখানে এ ব্যাপারে তাকীদ করা হচ্ছে যে, যে মহিলাদের সাথে তোমরা বৈধ বিবাহের মাধ্যমে যৌনসুখ ও স্বাদ গ্রহণ কর, তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট মোহর অবশ্যই আদায় করে দাও।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেন, সকল শর্তের চেয়ে বিয়ের শর্ত(দেনমোহর বা মোহরানার অর্থ প্রদান) পালন করা তোমাদের অধিক কর্তব্য এজন্য যে, **এর মাধ্যমেই তোমাদেরকে স্ত্রী অঙ্গ ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।**

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

৩১৩১। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ স্বামীকে **মোহরানা(অর্থ/মাল) দিতে হবে স্ত্রীর লজ্জাস্থান- উপভোগ হালাল করার জন্যে।**

সহীহ বুখারী (ইফাঃ)

৪৯২৯। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **দেনমোহরের বিনিময়ে তুমি তার(স্ত্রীর) লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছিলে।** সহীহ মুসলিম (ইফা) ৩৬১০।

সূনান নাসাঈ (ইফাঃ)

৩২৮৪। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **বিয়ের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় শর্ত হলো তোমরা যা দ্বারা মহিলার লজ্জাস্থান হালাল করবে, তা আদায় করা অর্থাৎ মোহরানার টাকা আদায় করা।**

মুসনাদে আহমাদ, সনদ হাসান

নবী সা বলেছেন, “সে নারী বরকতের মাঝে আছে যাকে প্রস্তাব দেয়া সহজ ও যার দেনমোহর অল্প।”

আহ্‌কামুল কুরআন ৪২

বিয়ে দেয়ার পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) বলেছিলেন : قَدْ مَلَّكْتُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ‘তোমার যতটুকু কুরআনী ইলম আছে, তার বিনিময়ে আমি এই মহিলাকে তোমার মালিকানায় দিয়ে দিলাম।’ এই কথা প্রমাণ করে যে, স্বামী স্ত্রীর যৌন অঙ্গের মালিক পর্যায়ের। আক্‌দের পর যে মহরানার নির্দিষ্ট করা হয় তা সঙ্গমের আগে তালাক দিলে সে মহরানা প্রত্যাহৃত হয়ে যায়, তার

তাহাবী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,

অধ্যায় : বিবাহ ৪৯

স্বামী স্ত্রীর ‘সম্ভোগ অঙ্গের’ মালিক

আদ-দুরুল মানসুর শরহে আবু দাউদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা ২০৭

শরীয়তের পরিভাষায় মোহর বলা হয়-

“স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগ করার বিনিময়ে তাকে প্রদত্ত নগদ বা বাকি অর্থ-সম্পদকে মোহর বলে।”
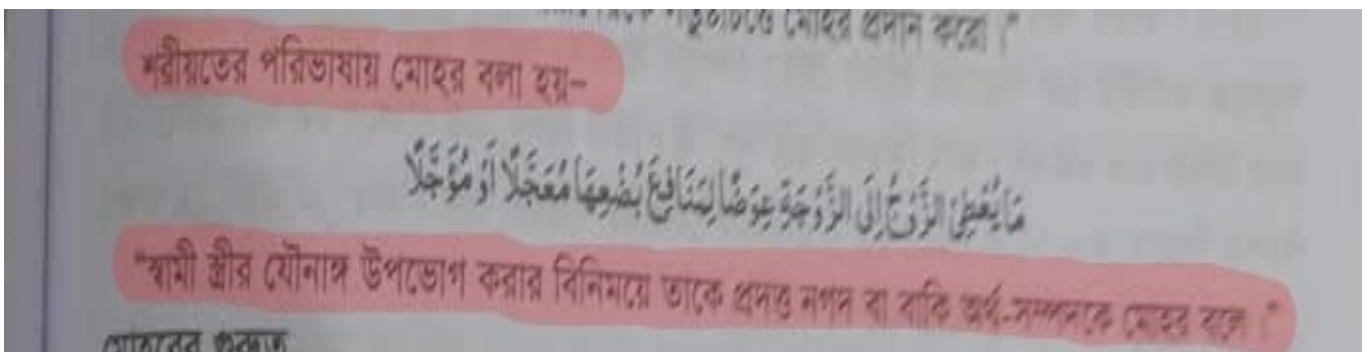
উপরের হাদিসগুলো থেকে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, **ইসলামে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে দেনমোহর দেয় সেই নারীর লজ্জাস্থান ভোগের মূল্য হিসেবে**। ইসলামে দেনমোহর= স্বামীর ঐ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আগ পর্যন্ত তার নারীর লজ্জাস্থান ভোগের মূল্য। পতিতালয়ে যেটা নির্দিষ্ট সময়ের বিনিময়ে পরিশোধ করা হয়, ইসলামের বিয়ের মাধ্যমে সেটা সেটা অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য।

মুয়াত্তা মালিক (ইফা)

পরিচ্ছদঃ ১৬. কোন স্ত্রীলোকের সাথে **জবরদস্তি যিনা(ধর্ষণ)** করলে তার ফয়সালা

রেওয়ায়ত ১৪। ইবন যুহরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, ব্যভিচার যে করিয়াছে সে ঐ স্ত্রীলোকটিকে মোহর দান করিবে। ইমাম মালিক (রহ) বলেনঃ আমাদের নিকট এই ফয়সালা যে, যদি কেউ কোন স্ত্রীলোকের উপর জবরদস্তি করে, চাই সে কুমারী হোক বা অকুমারী, যদি সে স্বাধীন হয় তবে তাকে মাহর দেওয়া আবশ্যক। আর যদি যে দাসী হয় তবে যিনার দ্বারা যে মূল্য কম হয়েছে তা আদায় করতে হবে এবং যিনাকারীর শাস্তিও হবে ।

সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ)

৫১৮২। রাসূলুল্লাহ সা মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখতে পান যে, পুরুষেরা রাস্তার মাঝে মহিলাদের সাথে মিশে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ সা মহিলাদের বলেনঃ তোমরা অপেক্ষা কর! তোমাদের রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করা উচিত নয়, বরং তোমরা রাস্তার এক পাশ দিয়ে যাবে। **এরপর মহিলারা দেয়াল ঘেষে চলাচল করার ফলে অধিকাংশ সময় তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে আটকে যেত।**

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)

৩৫১২। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ দুনিয়া উপভোগের উপকরণ এবং **দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ পুণ্যবতী নারী**।

আবু দাউদ (ইফাঃ)

২৯৮৪. **সাফিয়্যা ছিলেন** রাসূলুল্লাহ সা-**এর পছন্দ করা (গণীমতের)মালের অংশ**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) হাদিস একাডেমি

৩২৭৯। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ যে রমণী বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক চায়, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

ব্যাখ্যা: **তালাক স্বামীর অধিকার, স্ত্রীর নয়**। কোনো মহিলা একান্ত কারণ ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক প্রার্থনা করবে না।

৬৫০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড

اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ—এর তফসীর রসূল (সা) নিজে বর্ণনা করেছেন ঃ وَلِىُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছে স্বামী। এ হাদীসটি দারুকুতনী গ্রন্থে আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আলী (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) হতেও উদ্ধৃত করেছেন। —(কুরতুবী)

এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে সমাধা হওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী। সে-ই তালাক দিতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে তালাক দেওয়ার সুযোগ সীমিত।

মুসলিম আইনে নারীদের হাতে তালাকের বিধান হলোঃ খুলা তালাক,

হানাফি মাজহাব অনুযায়ী, একজন মুসলিম নারী শুধু খোলা তালাকের মাধ্যমে বিয়ে বিচ্ছেদ করতে পারেন। যেটি সম্পূর্ণ স্বামীর পক্ষেই থাকে। অন্যান্য ইসলামিক শরীয়া আইনে পুরুষই তালাক দেয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। নারীর তালাক প্রদানের ক্ষমতা নেই, **দুটি ক্ষেত্র ছাড়া যেমন- স্বামী যৌনঅক্ষম হলে কিংবা পাগল হলে, স্ত্রী তালাকের জন্য আবেদন করতে পারে বিচারকের কাছে।** বিচারকের মর্জি হলে তালাক পাওয়া যাবে। তবে স্বামী যেকোন অবস্থাতেই তালাক দিতে পারেন। তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকারই মূখ্য, কারণ স্বামীই হচ্ছে মালিক।

১৭৬ ফিক্‌হে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু

[৪.১] সরীহ্ তালাক (স্পষ্ট ভাষায় তালাক দেয়া) ঃ যদি স্পষ্ট ভাষায় তালাক দেয়া হয় তাহলে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তালাকদাতার নিয়্যত কী ছিলো। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—তালাকের ইচ্ছে মনের মধ্যে গোপন রাখা পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হয় না। বরং মুখে ভাষায় প্রকাশ করলেই তা কার্যকর হয়।[২৬]

এ প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—তালাক মহিলাদের ওপর কার্যকর হয় কোনো পুরুষের ওপর হয় না। এজন্য ততক্ষণ তা কার্যকরী হয় না যতক্ষণ তা নির্দিষ্ট করে দেয়া না হয়। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে— اَنَا مِنْكَ طَالِقٌ "আমি তোমার থেকে তালাক গ্রহণ করলাম।"

অথবা তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীকে প্রদানের পর বললো– اَنْتَ طَالِقٌ "তোমাকে তালাক।"

তো একথার প্রেক্ষিতে তালাক সংঘটিত হবে না। আবার যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো পুরুষকে তালাক দেয় তবু তালাক হবে না। কারণ তালাক কার্যকর হয় মহিলাদের ওপর।[২৭]

হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ের ঘটনা। মুহাম্মদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবু বকর (রা) তার স্ত্রী রমীসা ফারাসিয়াকে তালাক দানের ক্ষমতা অর্পণ করে রেখেছিলেন। তিনি তাকে বললেন– اَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "তোমাকে তিনবার তালাক দেয়া হলো।"

এ মামলার রায়ে হযরত ওসমান (রা) বললেন—মহিলা এরূপ বলে ভুল করেছে। কারণ মহিলাতো তালাক দিতে পারে না (বরং তালাক গ্রহণ করতে পারে)।[২৮]

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

৩৬০০। নবী সা বলেন, তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য (তার স্বামীর থেকে) বাসস্থান ও খাদ্য কোনটাই নেই।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
৫৩২৩। তালাকপ্রাপ্তা নারী তার স্বামীর থেকে খাদ্য ও বাসস্থান কিছুই পাবে না।

সুনান আন-নাসায়ী (ইফা)
পরিচ্ছেদঃ বন্ধ্যা নারীকে বিবাহ করা অনুচিত
৩২৩০। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সা এর খেদমতে আরয করলোঃ আমি এমন এক মহিলার সন্ধান পেয়েছি, যে বংশ গৌরবের অধিকারিণী ও **মর্যাদাবান, কিন্তু সে বন্ধ্যা, আমি কি তাকে বিবাহ করবো? নবী সা তাকে নিষেধ করলেন**। দ্বিতীয় দিন তাঁর নিকট আসলে তিনি নিষেধ করলেন। এরপর তৃতীয় দিন তাঁর খেদমতে আসলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেনঃ **তোমরা অধিক সন্তান প্রসবা নারীকে বিবাহ করবে। কেননা, আমি তোমাদের দ্বারা সংখ্যাধিক্য লাভ করবো**।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
পরিচ্ছেদঃ **যে মহিলা সন্তান দিতে অক্ষম তাকে বিয়ে করা নিষেধ সম্পর্কে**
২০৫০। ইবনু ইয়াসার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সা এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এক সুন্দরী ও মর্যাদা সম্পন্ন নারীর সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? তিনি বললেনঃ না। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বার তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে বললেনঃ এমন নারীকে বিয়ে করে যে, অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করবো।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
৩২৫৮। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ যখন কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে দুনিয়াতে অশ্রদ্ধা, অবাধ্যতা ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেয়, তখন উক্ত স্বামীর জান্নাতের রমণীগণ (হূরেরা) বলতে থাকে, তুমি তাকে কষ্ট দিও না, যদি কর তবে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করবেন। তিনি তোমার নিকট কিছু দিনের মেহমান, শীঘ্রই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে।

ইবনে মাজাহ (তাওহীদ)
১৮৫৩। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। আল্লাহর শপথ! স্ত্রী তার স্বামীর প্রাপ্য অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। **স্ত্রী উটের পিঠে আরোহণরত থাকা অবস্থায়ও যদি স্বামী তার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চাইলে স্ত্রীর তা প্রত্যাখ্যান করা অন্যায়**।

(ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, ইবনে হিব্বান , আদাবুয যিফাফ ২৮৪পৃঃ)
নবী সা বলেন, "তাঁর শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। **সওয়ারীর পিঠে থাকলেও যদি স্বামী তার মিলন চায় তবে সে বাধা দিতে পারবে না**।"

রাস্তাঘাটে অফিস আদালতে কাউকে দেখে যৌন কামনা জাগ্রত হওয়া খুব অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে একজন সভ্য ভদ্র মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, বেসামাল হয়ে যান, পরিমরি করে বিবির কাছে ছুটে যাওয়া লাগে, তাদের আমরা খুব একটা সভ্য মানুষ বলে বিবেচনা করি না। এই যে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখাটা, এ থেকেই একজন মানুষকে আপনি চিনতে পারবেন।

সহীহ মুসলিম (হাদিস একাডেমী)
৩৩০০। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নবী সা কে বলতে শুনেছিঃ **তোমাদের কারো যদি কোন স্ত্রীলোক দেখে মনে কিছু উদয় হয় তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে যৌনমিলিত হয়**। এতে তার মনে যা আছে তা দূর করে।

সহীহ মুসলিম (হাদিস একাডেমী)
পরিচ্ছেদঃ **কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হলে সে যেন তার স্ত্রীর সাথে অথবা ক্রীতদাসীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়**।
৩২৯৮। জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। **রসূলুল্লাহ সা এক মহিলাকে দেখলেন। তখন তিনি তার স্ত্রী যায়নাব এর নিকট আসলেন**। তিনি তখন তার একটি চামড়া পাকা করায় ব্যস্ত ছিলেন এবং **রাসূলুল্লাহ সা নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন**। অতঃপর বের হয়ে সাহাবীগণের নিকট এসে তিনি বললেনঃ **স্ত্রীলোক সামনে আসে শয়তানের বেশে এবং ফিরে যায় শয়তানের বেশে**।

অতএব তোমাদের কেউ কোন স্ত্রীলোক দেখতে পেলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে। কারণ তা তার মনের ভেতর যা রয়েছে তা দূর করে দেয়।

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

পরিচ্ছদঃ ২. কোন মহিলাকে দেখে কোন পুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হলে সে যেন তার স্ত্রীর সাথে অথবা ক্রীতদাসীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়

৩৩০০। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **তোমাদের কারো যদি কোন স্ত্রীলোক দেখে মনে কিছু উদয় হয় তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট আসে এবং তার সাথে মিলিত করে। এতে তার মনে যা আছে তা দূর করে।**

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও স্বামীর যৌনচাহিদা মেটাতে হবেঃ

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

অধ্যায়ঃ বিবাহ

স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ

৩৪৩৩। রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে এবং সে না আসায় তার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে, সে স্ত্রীর প্রতি ফেরেশতাগণ ভোর হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।

গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

৩৪৩২। রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ কসম সে সত্তার যার হাতে আমার জীবন। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যখন বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্টি না হয়, ততক্ষণ আসমানবাসী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

৩২৫৭। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ কোনো স্বামী নিজ প্রয়োজনে স্বীয় স্ত্রীকে ডাকলে, সে যেন তৎক্ষণাৎ তার ডাকে সাড়া দেয়, যদিও সে চুলার পাশে কাজে ব্যস্ত থাকে। **ব্যাখ্যা:** স্বামী তার স্ত্রীর পরিচালক এবং অভিভাবক, সে যে কোনো কাজে তাকে আহবান করে সে আহবানে তাকে সাড়া দেয়া আবশ্যক, **বিশেষ করে তার জৈবিক চাহিদা পূরণের আহবানে তাকে অবশ্যই সাড়া দিতে হবে**। অত্র হাদীস সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ

হাদীস নং ৬৫০। **রাত্রে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামী ডাকলে যে স্ত্রী তাতে অসম্মত হয়, সেই স্ত্রীলোকের নামাজ কবুল হয় না**।

হাদীসগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে কোন অবস্থাতেই স্ত্রী তার স্বামীর বিছানা পরিহার করতে পারবেনা। বিছানা পরিহার করলে সে সারা রাত ফেরেশতাদের দ্বারা অভিশপ্ত হতে থাকবে। দৈব অভিশাপের ভয় দেখিয়ে স্ত্রীকে তার স্বামীর শয্যা গ্রহন করতে বাধ্য করা হয়। আবার কোরানে অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহারের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

৫১৯৫ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেন: **যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে, তখন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলার জন্য রোযা পালন বৈধ নয়** ।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

২৪৫৯। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমরা নবী সা-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তাঁর কাছে এক মহিলা এসে বললো, "আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল- **যখন আমি সালাত আদায় করি তখন আমাকে প্রহার করে। আমি রোযা রাখলে সে আমাকে রোযা ভঙ্গ করায়**"। সেখানে সাফওয়ান(রা) ও উপস্থিত ছিলেন। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করেছে সে সম্পর্কে নবী সা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কারণ হচ্ছে, **সে এমন দুটি দীর্ঘ সূরা দিয়ে সালাত আদায় করে যা পাঠ করতে আমি তাকে নিষেধ করি**। তখন নবী সা বললেনঃ সূরা ফাতিহার পর সংক্ষিপ্ত একটি সূরাই লোকদের জন্য যথেষ্ট। তারপর সাফওয়ান(রা) পরের অভিযোগ ('আমাকে সওম ভাঙ্গতে বাধ্য করে') উল্লেখ করে বললেন- ব্যাপার এই যে, সে প্রায়ই **রোযা** রাখে। **আমি একজন যুবক, ধৈর্য ধারণ করতে পারি না**। **রাসূলুল্লাহ সা এই দিনই বললেনঃ কোনো নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া (নফল)রোযা রাখবে না**।

৩৩৩১ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নাসীহত করতে থাক।

৪১৮ মুসলিম শরীফ

৩৫১৩. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নারী পাঁজরের হাড়ের ন্যায় (বাঁকা)। যখন তুমি তাকে সোজা করতে যাবে, তখন তা ভেংগে ফেলবে আর তার মাঝে বক্রতা রেখে দিয়েই তা দিয়ে তুমি উপকার হাসিল করবে।

৩৫১৪. আমরুন্ নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে। সে কখনো তোমার জন্য কোন নিয়মতান্ত্রিকতায় স্থির থাকবে না। সুতরাং তুমি যদি তাকে দিয়ে উপকৃত হতে চাও তবে তার বক্রতা অবশিষ্ট রেখেই তাকে দিয়ে উপকৃত হতে হবে। আর তাকে সোজা করতে গেলে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে– আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা অর্থ হল তাকে তালাক দেওয়া।

২৯ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেনঃ আমাকে **জাহান্নাম** দেখানো হয়। আমি দেখি, তার **অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারীজাতি**; কারণ তারা **কুফরী করে**। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে? তিনি বললেনঃ তারা **স্বামীর অবাধ্য হয়** এবং অকৃতজ্ঞ হয়। তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, আমি কক্ষনো তোমার নিকট হতে ভালো ব্যবহার পাইনি।

৭১৬ আয়িশা (রা.) বলেন, তখন আমি হাফসা (রা.)-কে বললাম, তুমি তাঁকে বল যে, আবূ বকর (রা.) যখন দাঁড়াবেন, তখন কান্নার কারণে সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমার (রা.)-কে বলুন তিনি যেন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসা (রা.) তাই করলেন। তখন রাসূল সা বললেনঃ থামো! তোমরা ইউসুফের সাথী মহিলাদেরই মতো। আবূ বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। এতে হাফসা (রা.)- আয়িশা (রা.)কে বললেন, তোমার কাছ হতে আমি কখনো ভাল কিছু পাইনি।

৩০৪ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেন- হে মহিলা সমাজ! জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। আর তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটি রয়েছে । **তারা বললেনঃ আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়,** হে আল্লাহ্‌র রাসূল? **তিনি বললেনঃ একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটির প্রমাণ।**

৩৪১১ রাসূল সা বলেছেন, **পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করেছেন**। কিন্তু **মহিলাদের মধ্যে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি**।

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

১০২৬। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ সালাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে নারী, গাধা এবং কুকুরের চলাচল সালাত নষ্ট করে দেয়।

২৮৫৮ নবী সা বলেছেন- তিনটি জিনিসে অকল্যাণ আছেঃ ঘোড়ায়, নারীতে ও বাড়িতে।

২৮৫৯ নবী সা বলেছেন- যদি কোন কিছুতে অকল্যাণ থেকে থাকে, তবে তা আছে নারী, ঘোড়া ও বাড়িতে।

৫০৯৫ উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা এর নিকট লোকেরা অশুভ সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বলেন, **কোন কিছুর মধ্যে যদি অশুভ থাকে**, তা হলোঃ স্ত্রীলোক এবং ঘোড়া।

৫০৯৩ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেনঃ স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ায় অশুভ আছে।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

১৪৬৩। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সা বলেছেনঃ মুসলিমের উপর তার **ঘোড়া ও গোলামের কোন যাকাত নেই।**

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

২১৬০। নবী সা বলেছেনঃ **যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ে করে অথবা কোনো দাসী ক্রয় করে তখন সে তার কপালের চুল ধরে বলবেঃ** "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই এবং তার মধ্যে

নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই।" **আর যখন কোনো উট কিনবে তখন যেন সেটির কুঁজের উপরিভাগ ধরে অনুরূপ দু'আ করে**।

৩৭৮১ যখন নবী সা এর সাহাবীরা মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সা আবদুর রাহমান ইবনু আউফ ও সাদ (রা.) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। তখন সাদ (রা.) আবদুর রাহমান (রা.) কে বললেন, আপনি আমার সম্পদকে দুভাগ করে নিন। আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে, আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইদ্দত শেষে(তিন মাস অপেক্ষা করে সে গর্ভবতী কি না যাচাই করে) আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন। অতঃপর তিনি বিয়ে করে নিলেন।

৫৩৪১ উম্মু আতিয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো(স্বামী বাদে বাবা/মা/ভাই/বোন/সন্তান/যেকারো) মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হতে আমাদেরকে নিষেধ করা হত। তবে আদেশ ছিলো স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে এবং আমরা যেন সুরমা, সুগন্ধি ব্যবহার না করি আর রঙিন কাপড় যেন না পরি তবে হালকা রঙের ছাড়া।

৫৩৩৬,৫৩৩৮,৫৭০৬ **পরিচ্ছেদ: বিধবা/যার স্বামী মারা গেছে মহিলা চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে।**
এক নারী রাসূলুল্লাহ সা এর কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। তার চোখে অসুখ এবং তার চোখ সংকটাপন্ন বলে জানাল। তার চোখে কি সুরমা লাগাতে পারবে উপশমের জন্য? তখন রাসূলুল্লাহ সা দুবার বললেন, না। তিনি আরও বললেনঃ এতো মাত্র চার মাস দশ দিনের ব্যাপার।
চার মাস দশ দিন পার না হওয়া পর্যন্ত সুরমা ব্যবহার করতে পারবে না।

৫৩৪৫ উম্মু হাবীবাহ (রা.) এর কাছে তার পিতার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল। তিনি বলেন: আমি নবী সা কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল হবে না। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে।

কোরআন 2:234
আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে। সহবাসের পূর্বেই স্বামী যদি নারীকে তালাক দিয়ে দেয় তবে সেই তালাকপ্রাপ্তা নারী যদি অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে সাথে সাথে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু যদি সঙ্গমের পূর্বে স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে তাকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন(অপেক্ষা) করতেই হবে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ফাতহুল ক্বাদীর)

৫১৫২ নবী সা বলেছেন, **বিয়ের সময় কোন নারীর জন্য এরূপ শর্তারোপ করা বৈধ নয় যে, তার আগের স্ত্রীর তালাক দাবি করবে**।

৫০৬৯ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে বললেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, বিয়ে কর। কারণ, **এই উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অধিক সংখ্যক স্ত্রী ছিল**।

৫২০৫ এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। এরপর সে নবী সা এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল, তার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করাই। তখন নবী সা বললেন, না তা করো না, কারণ আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের মহিলাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করেন, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে।
৫৯৩৪ এক আনসারী নারী বিয়ে করে। এরপর সে রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে তার সব চুল পড়ে যায়। লোকজন তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তারা নবী সা এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেনঃ আল্লাহ লানত করেছেন ঐসব নারীকে যারা নিজেরা পরচুলা লাগায় এবং যারা অন্যদেরকে তা লাগিয়ে দেয়।

২০৯৭ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক যুদ্ধে আমি নবী সা এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল বরং চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নবী সা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কী? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে। ফলে আমি পিছনে পড়ে গেছি। তখন তিনি নেমে চাবুক দিয়ে উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর বললেন, এবার আরোহণ কর।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। তিনি বললেন, তরুণী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে হাসি-তামাসা এবং সে তোমার সাথে পূর্ণভাবে হাঁসি-তামাসা করত। আমি বললাম, আমার কয়েকটি বোন রয়েছে, ফলে আমি এমন এক মহিলাকে বিবাহ করতে পছন্দ করলাম, যে তাদেরকে মিল-মহববতে রাখতে, তাদের পরিচর্যা করতে সক্ষম হয়।
২৯৬৭ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) বলেন,........ আল্লাহর রাসূল সা আমাকে প্রশ্ন করছিলেন, তুমি কি কুমারী বিবাহ করেছ, না এমন মহিলাকে বিবাহ করেছ যার পূর্বে বিবাহ হয়েছিল? আমি বললাম, এমন মহিলাকে বিবাহ করেছি যার পূর্বে বিবাহ হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে খেলা করতে এবং সেও তোমার সঙ্গে খেলা করত।

২৬৫৮ নবী সা বলেন, **নারীদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? উপস্থিত সাহাবীরা বলল, অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন, এটা নারীদের জ্ঞানের ত্রুটির কারণেই**।

কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮২-- দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা।

৪৫৭৮ "আর তোমরা পাবে অর্ধেক তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির।" (৪/১২)
মৃত ব্যক্তির সম্পদ লাভ করত সন্তানরা, আর ওয়াসীয়াত ছিল পিতামাতার জন্য। অতঃপর তাথেকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় পছন্দ অনুযায়ী কিছু রহিত করলেন এবং পুরুষদের জন্য মহিলার দ্বিগুণ নির্দিষ্ট করলেন। **স্ত্রীদের জন্য অষ্টমাংশ** নির্ধারণ করলেন এবং **স্বামীর জন্য অর্ধাংশ** নির্ধারণ করলেন।

ইসলাম পূর্ব আরবে ছেলে মেয়ে সব সন্তানেরই সমান সম্পত্তির অধিকার ছিল।
সহীহ বুখারী (ইফা)
আল্লাহর বাণীঃ **তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য** (৪:১২)
৪২২৩। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, মৃত ব্যাক্তির সম্পদ ছিল সন্তানের জন্য। এরপর **তা থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর পছন্দ অনুযায়ী কিছু রহিত করলেন এবং পুরুষদের জন্য মহিলার দ্বিগুন নির্ধারণ করলেন**। [আল্লাহর বাণীঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ **একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান, এক পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের তুল্য**। সূরা নিসা আয়াত ১১]

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)
উত্তরাধিকারীদের জন্য ওয়াসিয়াত করার বৈধতা নেই
২১২১। নবী সা বলেন, সকল হকদারের হক আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, উত্তরাধিকারীদের জন্য ওয়াসিয়াত করা বৈধ নয়।

৪৪২৫ নবী সা-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা কন্যাকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কক্ষনো সফল হবে না স্ত্রীলোক যাদের প্রশাসক হয়।
৭০৯৯ নবী সা-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেনঃ সে জাতি কক্ষনো সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে।
সহিহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড ৭

৪০৮৩ উসমান ইবন হায়সাম (র) .... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শ্রুত একটি বাণী আমাকে জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন মহা উপকার করেছে, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শরিক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবূ বাকরা (রা) বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নবী (সা)-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা তনয়াকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, কখনই সে জাতি সফলতার মুখ দেখবে না যারা স্ত্রীলোককে তাদের প্রশাসক নির্বাচন করে।

↥

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)

২২৬২। রাসূলুল্লাহ সা পারস্য সম্রাট কিসরা নিহত হওয়ার পর প্রশ্ন করেনঃ তারা কাকে শাসক হিসাবে নিয়োগ করেছে? সাহাবীগণ বলেন, তার কন্যাকে। রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ যে জাতি নিজেদের শাসক হিসাবে নারীকে নিয়োগ করে **সে জাতির কখনো কল্যাণ হতে পারে না।**

২৮১৯ রাসূল সা বলেনঃ সুলায়মান (আ.) বলেছিলেন, **আজ রাতে আমি নিরানব্বই জন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করব**। আর তাদের প্রত্যেকেই প্রসব করবে। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলেননি। ফলে একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউই গর্ভবতী হলেন না।
রাসূল সা বললেন- যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হত।

৫১০৫ আবদুল্লাহ্ ইবনু জাফর (রহ.) একসঙ্গে আলী (রা)-এর স্ত্রী(তালাকপ্রাপ্ত) ও কন্যাকে বিয়ে করেন (তারা উভয়েই সৎ-মা ও সৎ-কন্যা ছিল)। হাসান বসরী (র) বলেন, এতে দোষের কিছুই নেই। **হাসান** ইবনু আলী(রা) **একই রাতে দুই চাচাত বোনকে একই সঙ্গে বিয়ে করেন**।

৮২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত হাসান (রা) বহু বিবাহকারী লোক ছিলেন। সব সময় চারজন স্বাধীন মহিলা তাঁর স্ত্রী হিসেবে থাকতেনই। তিনি বহু স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছেন। কথিত আছে যে, তিনি সর্বমোট ৭০ জন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন।[১] তাঁরা আরো বলেছেন যে, একদিন তিনি তাঁর দু'জন স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেছিলেন। একজন ছিল বানূ আসাদ গোত্রের অন্যজন বানূ ফাযারা গোত্রের। তারপর তিনি ওদের প্রত্যেককে ১০ হাজার দিরহাম ও কয়েক বোতল মধু প্রদান করেছিলেন। তিনি তাঁর সেবককে বলেছিলেন, ওরা কি মন্তব্য করে তা তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনবে। বস্তুত বানূ ফাযারা গোত্রের মহিলাটি উপহার পেয়ে বলেছিল, 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হাসান (রা)-কে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।' সে হযরত হাসান (রা)-এর জন্যে আরো দু'আ ও কল্যাণ কামনা করেছিল। অন্যদিকে বানূ আসাদ গোত্রের মহিলাটি বলেছিল, 'একজন ভালবাসার মানুষের সাথে বিচ্ছেদের মোকাবেলায় নিতান্তই তুচ্ছ।' তাঁর সেবক ফিরে এসে উভয়ের বক্তব্য জানায়। পরবর্তীতে হযরত হাসান (রা) বানূ আসাদ গোত্রের মহিলাটিকে দাম্পত্য জীবনে ফিরিয়ে নিলেন এবং বানূ ফাযারা গোত্রের মহিলাটিকে ত্যাগ করলেন। হযরত আলী (রা) কুফার অধিবাসী লোকদেরকে বলতেন, 'তোমাদের মহিলাদেরকে হযরত হাসান (রা)-এর নিকট বিয়ে দিও না। কারণ সে একজন অতিশয় তালাক দানকারী পুরুষ।' উত্তরে তারা বলত, 'আমীরুল মু'মিনীন ! আল্লাহ্র কসম ! হযরত হাসান (রা) যদি প্রতিদিন আমাদের মহিলাদেরকে বিয়ে করতে চাইতেন তবে তাদের সকলকে আমরা তাঁর নিকট বিয়ে দিয়ে দিব আর তা শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের সাথে যেন আমরা বিবাহ সূত্রে আত্মীয় হতে পারি।

আবূ বকর খারাইতী তাঁর "মাকারিমু আখলাক" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবরাহীম ইব্ন মুনযির মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার হাসান ইব্ন আলী (রা) একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর তাঁকে ১০০ টি দাসী দিয়েছিলেন। প্রত্যেক দাসীর সাথে ১০০০ দিরহাম করে দিয়ে দিলেন।

আবদুর রায্যাক হাসান ইব্ন সা'দের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) তাঁর তালাক দেয়া দু'জন স্ত্রীকে দশ হাজার দশ হাজার করে বিশ হাজার দিরহাম ও বহু বোতল মধু উপহার দিয়েছিলেন। ওদের একজন বলেছিল, রাবী বলেন, আমার মনে হয় সে ছিল হানাফিয়া, 'একজন অকৃত্রিম বন্ধুর বিচ্ছেদের বিপরীতে এ তো একেবারেই নগণ্য।'

ওয়াকিদী বলেছেন, আলী ইব্ন উমর আলী ইব্ন হুসায়ন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'হযরত হাসান (রা) স্ত্রীদেরকে অধিকহারে তালাক দিতেন। যত স্ত্রীকেই তিনি তালাক

২০৬ হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

হযরত আলী (রাঃ)এর নিজ মেয়ে উম্মে কুলসূম (রাঃ)কে বিবাহ দান

হযরত আবু জা'ফর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট তাঁহার মেয়ের জন্য প্রস্তাব দিলেন। তিনি বলিলেন, সে তো ছোট। কেহ হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল যে, হযরত আলী (রাঃ) বিবাহ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি পুনরায় তাহার সহিত কথা বলিলে হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। যদি সে রাজী হয় তবে আপনার স্ত্রী হইবে। তিনি মেয়েকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (তাহাকে যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে) তাহার পায়ের কাপড় উত্তোলন করিলেন। মেয়ে বলিল, ছাড়ুন। যদি আপনি আমীরুল মুমিনীন না হইতেন তবে আপনার চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিতাম। (কানয)

আল-আদাবুল মুফরাদ ৯৫

১৪০. আস্‌মা ইব্‌ন উবায়দ বলেন, আমি ইব্‌ন সীরীনকে বলিলাম, আমার কাছে একটি ইয়াতীম আছে। তিনি বলিলেন, তুমি উহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিবে, যেমনটি তুমি তোমার পুত্রের সহিত করিয়া থাক। তুমি তাহাকে প্রহার করিবে, যেরূপ প্রহার তুমি তোমার পুত্রকে করিয়া থাক।

৭৯– بَابُ أَدَبِ الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমকে শাসন

১৪২. শুমায়সা আতকিয়া (র) বলেন : একদা হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট ইয়াতীমের শাসন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। তিনি বলিলেন : ইয়াতীমকে আমি অবশ্যই (শাসনস্থলে) প্রহার করি।

সুনান আবু দাউদ (ইফা)

৪৯৫। রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেনঃ যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে মারপিট কর।

রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

৩০৬। রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেন, ‘‘তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের যখন দশ বছর হবে, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর।

↥

৫১৯৪ নবী সা বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে তাহলে যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে।

সহীহ বুখারী (ইফা)
৬২৭০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা এর রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব চাওয়ার জন্য একদা ফাতিমা ও আব্বাস (রা) - আবূ বকর (রাঃ) এর কাছে আসলেন। তাঁরা ঐ সময় ফাদাক ভূখণ্ডের এবং খায়বারের অংশ দাবি করছিলেন। তখন আবূ বকর (রা) তাদের উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা থেকে শুনেছি। আমাদের কোন উত্তরাধিকারী হবে না, আমরা যা রেখে যাব তা সবই হবে সাদাকা। এ মাল থেকে মুহাম্মাদ সা এর পরিবার ভোগ করবেন। আবূ বকর (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা কে আমি এতে যেভাবে করতে দেখেছি, তা সেভাবেই বাস্তবায়িত করব। আয়িশা(রা) বলেন, **এরপর থেকে ফাতিমা (রা)- আবূ বকর (রা)কে পরিহার করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেন নাই।**

৬৭২৬ ....অতঃপর থেকে ফাতিমাহ (রা.) তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলেন নি। no kind of talks, certified- https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=62698

সহীহ বুখারী (ইফা)
২৮৭৪। আয়িশা (রা) বলেন, ফাতিমা(রা) আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) এর নিকট রাসূলুল্লাহ সা এর ইন্তেকালের পর তাঁর মিরাস বন্টনের দাবী করেন যা রাসূলুল্লাহ সা ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে রেখে গেছেন। তখন আবূ বাকর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, 'আমাদের পরিত্যাক্ত সম্পদ বন্টিত হবে না আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সাদকা রূপে গণ্য হয়।' **এতে ফাতিমা(রা) অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবূ বকর (রা) এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল।**
আয়িশা (রা) বলেন, ফাতিমা (রা) আবূ বাকর (রা) এর নিকট খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মদিনার সাদকাতে তাঁর অংশ দাবী করেছিলেন। উমর (রা) এ প্রসঙ্গে বলেন, এ সম্পত্তি দুটিকে রাসূলুল্লাহ সা জরুরী প্রয়োজন পূরণ ও বিপথকালীন সময়ে ব্যায়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দুটি তারই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, যিনি মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার অধিকারী খলিফা হবেন।

সহীহ বুখারী (ইফা)
পরিচ্ছেদ ২০৯১. ফাতিমা (রা) এর মর্যাদা। নবী সা বলেছেন, **ফাতিমা (রা) জান্নাতবাসী মহিলাগণের সর্দার।**
৩৪৪৭। মুহাম্মাদ সা এর পরিবারবর্গের প্রতি তোমরা অধিক সম্মান দেখাবে।

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)
৩৭৬৮। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ হাসান ও হুসাইন (রা) প্রত্যেকেই জান্নাতী যুবকদের সর্দার(নেতা)।

মুসনাদে আহমাদ
৯৫০। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ "হে আল্লাহ, আমি যার আপনজন, আলীও তার আপনজন। হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি আলীর বন্ধু হয়, তুমি তার বন্ধু হও। আর যে ব্যক্তি আলীর শত্রু হয়, তুমি তার শত্রু হও।"

মুসনাদে আহমাদ
১৩১১। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আমি যার অভিভাবক, আলী তার অভিভাবক।

৬১৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

পিতাদের চেয়ে আপন নই ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি কি নই, আমি কি নই, আমি কি নই ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক। হে আল্লাহ্! আপনি অভিভাবক হন তার যে তাকে অভিভাবক মানে এবং আপনি বিরোধিতা করেন তার যে তার বিরোধিতা করে। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব আলী (রা)-কে বললেন, সৌভাগ্য তোমার হে আবূ তালিবের নন্দন! আজ হতে তুমি সমস্ত মু'মিনের অভিভাবক হয়ে গেলে। ইব্ন মাজাহ্ এ হাদীস হাম্মাদ ইব্ন সালমার সূত্রে

↥

রাসূলুল্লাহ্ﷺ আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের হাত ধারণ করে লোকদের বলেছিলেন, আমি কি মু'মিনগণের অভিভাবক নই! সাহাবাগণ বললেন হ্যাঁ-ইয়া রাসূলুল্লাহ্ﷺ! তিনি তখন বললেন, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব আলীকে বললেন, বাহ্ঃ বাহ্ঃ হে আবূ তালিবের নন্দন! তুমি তো আমার অভিভাবক ও সকল মুসলমানের অভিভাবক হয়ে গেলে। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর যে ব্যক্তি রজব মাসের

৩৭৭২ আবূ ওয়াইল (রা.) বলেন, আলী (রা.) তাঁর স্বপক্ষে জিহাদে সাহায্য করার জন্য লোক সংগ্রহের জন্য আম্মার ও হাসান (রা.)-কে কুফায় পাঠান। আম্মার (রা.) তাঁর ভাষণে একদা বললেন, এ কথা আমি ভালভাবেই জানি যে, **আয়িশা (রা.)- রাসূল সা এর দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানিতা স্ত্রী। কিন্তু এখন আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন যে তোমরা কি আলী (রা.)-এর আনুগত্য করবে, না আয়িশা (রা.)-এর আনুগত্য করবে**?

৬৭৮৫ রাসূলুল্লাহ্ সা বিদায় হাজ্জে বললেনঃ তোমাদের জন্য আফসোস অথবা ধ্বংস! তোমরা আমার(মৃত্যুর) পরে একে অপরের গর্দান মেরে কাফির হয়ে পেছনের দিকে ফিরে যেও না।

৭০৭৬ নবী সা বলেছেন: **কোন মুসলিমকে হত্যা করা কুফরী**।

৬৮৭৪ রাসূলুল্লাহ সা বলেন- যখন দু'জন মুসলিম তলোয়ার নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অবস্থান হবে জাহান্নাম।

৬৯৪২ সাঈদ ইবনু যায়দ (রা.) বলেন, তোমরা উসমান (রা.)-এর সঙ্গে যা করেছ তাতে যদি উহুদ পর্বত ফেটে যেত তা হলে ফেটে যাওয়া ন্যায়সঙ্গতই হত। [মুসলমানদের একটি দল চরম অন্যায়ভাবে ইসলামের মহান খলীফা উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করেছিল।]

নবি মৃত্যুর পর মুসলমান কর্তৃক মুসলমান হত্যা:

নবি মৃত্যুর খবরে আরব রাজ্যে দলে দলে বহু গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে আবার বহু গোত্র মুসলিম থাকলেও মদিনা তথা আবু বকরের আনুগত্য অস্বীকার করে এবং কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়, এ ছাড়ও নবির অনুকরনে অন্তত তিন জন নবুয়তের দাবি নিয়ে হাজির হয়। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর তার দুই বছরের শাসন কালে এই সকল গোত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাস্ত ছিলেন । যদিও এই বিদ্রোহীদের একটি বড় অংশ ইসলাম ত্যাগ করেনি তবুও এই যুদ্ধকে রিদা যুদ্ধ বা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ***মুসলমান কর্তৃক মুসলমান হত্যা-***

- *মুসলমান বিদ্রোহীদের হাতে খলিফা উসমান নিহত।*
- *হযরত আলির সাথে বিবি আয়েশার জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধে : হতাহতের মোট সংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। সাহাবি তালহা, জুবায়ের দুজনেই মৃত্যু বরন করেন।*
- *হযরত আলি ও ময়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত হয় সিফফিনের যুদ্ধ। দুই পক্ষ মিলিয়ে হতাহতের সংখ্যা (২৫,০০০+৪০,০০০) ৬৫,০০০*
- *হযরত আলি ও খারেজীদের মধ্যে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে পরাজিত হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০*
- *৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে কুফা মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ার সময়, আবদুল্লা ইবনে মুলজাম নামের এক খারেজী বিষ মাখা ছুরির আঘাতে হযরত আলিকে হত্যা করে।*
- *কারবালা হত্যাকাণ্ড : ইমাম হোসেনের পক্ষে নিহতের সংখ্যা ৭২ । এই হত্যাকাণ্ডের পর ইমাম হোসেনের শিরচ্ছেদ করা মরদেহটি ঘোড়া দিয়ে পদদলিত করা হয় ও কুকুর শেয়ালের জন্য দাফন না করে ফেলে রেখে ছিল।*

নবীদের কাহিনী-১, ড মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, পৃষ্ঠা ১৯

১৯ ভূমিকা 19

নারী জাতি পুরুষেরই অংশ এবং তার অনুগত :

এতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণের সিজদা কেবল আদমের জন্য ছিল, হাওয়ার জন্য নয়। দ্বিতীয়তঃ সিজদা অনুষ্ঠানের পরে আদমের অবয়ব থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়, পূর্বে নয়। তিনি পৃথক কোন সৃষ্টি ছিলেন না। এতে পুরুষের প্রতি নারীর অনুগামী হওয়া প্রমাণিত হয়। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৪/৩৪)*। অতঃপর বহিস্কৃত ইবলীস তার

২৯৬ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ দ্বিতীয় খণ্ড

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ঃ এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা, বিবাহ প্রকারান্তরে বাঁদী হওয়ার নামান্তর বিধায় স্ত্রী যেন স্বামীর বাঁদী হয়ে যায়। সুতরাং স্বামীর আনুগত্য করা সর্বাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব। স্ত্রীর উপর স্বামীর হক যে বেশী, এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ايما امراة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ـ

অর্থাৎ, যে স্ত্রী এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কোন এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে গেল ঃ উপর তলার কক্ষ থেকে নীচে নামবে না। নীচে তার পিতা বসবাস করত। ঘটনাক্রমে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্ত্রী নীচে পিতার কাছে নামার অনুমতি চেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন ঃ স্বামীর আদেশ পালন কর। শেষ পর্যন্ত পিতা মারা গেলে সে আবার অনুমতি প্রার্থনা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার বললেন ঃ স্বামীর আদেশ পালন কর। ফলে পিতা সমাধিস্থও হয়ে গেল; কিন্তু সে নীচে নামল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহিলাকে বলে পাঠালেন ঃ তুমি যে স্বামীর আদেশ পালন করেছ, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার মাগফেরাত করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

اذا صلت المراة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها

واطاعت زوجها دخلت جنة ربها ـ

অর্থাৎ, যখন স্ত্রী পাঞ্জেগানা নামায পড়ে, রমযান মাসের রোযা রাখে, আপন গুপ্ত অঙ্গের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তখন সে তার পালনকর্তার জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ হাদীসে স্বামীর আনুগত্যকে ইসলামের রোকনসমূহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদের আলোচনা

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তাতে পুরুষ জান্নাতীদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা খুব নগণ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ মহিলারা কোথায়? উত্তর হল ঃ দু'টি লাল বস্তু তাদের জান্নাতে আসার পথে বাধা হয়েছে। একটি স্বর্ণ ও অপরটি জাফরান। অর্থাৎ, অলংকার ও রঙ্গিন পোশাক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ কোন এক যুবতী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমি যুবতী। এখন জানতে চাই, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কি? তিনি বললেন ঃ ধরে নেয়া যাক, স্বামীর আপাদমস্তক পুঁজে ভর্তি। যদি স্ত্রী এই পুঁজ চেটে নেয়, তবুও তার শোকর আদায় করতে পারবে না। মহিলা বলল ঃ আমি বিবাহ করব কি? তিনি বললেন ঃ করে নাও। বিবাহ করা উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ খাসআম গোত্রের জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমি স্বামীহীনা, বিবাহ করতে চাই। এখন স্বামীর হক কি, জানতে চাই। তিনি বললেন ঃ স্বামীর এক হক, সে যদি উটের পিঠে থেকেও সহবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে স্ত্রী অস্বীকার করতে পারবে না। আরেক হক, কোন বস্তু তার গৃহ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে দেবে না। দিলে তুমি রোযা রেখে কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তই থাকবে। তোমার রোযা কবুল হবে না। যদি তুমি স্বামীর আদেশ ছাড়া ঘর থেকে বের হও, তবে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তোমার প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। এক হাদীসে আছে—

لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها -

অর্থাৎ, যদি আমি কাউকে সেজদা করার নির্দেশ করতাম, তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ করতাম যেন সে তার স্বামীকে সেজদা করে।

স্বামীর ধনসম্পদ অযথা ব্যয় না করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য; বরং সে স্বামীর ধনসম্পদের হেফাযত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ স্ত্রীর জন্যে হালাল নয় যে, সে স্বামীর গৃহ থেকে তার অনুমতি ছাড়া কোন খাদ্যবস্তু অন্যকে দেবে। তবে খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে কাঁচা খাদ্য সামগ্রী দিতে পারে। যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে খাওয়ায়, তবে সওয়াব স্বামী নেবে এবং গোনাহ স্ত্রীর উপর থাকবে। পিতামাতার উপর কন্যা সন্তানের হক তাদেরকে অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং স্বামীর সাথে সদ্ভাবে বসবাস করার শিক্ষা দেবে।

স্ত্রীর আদবসমূহের মধ্যে একশ' কথার এক কথা, স্ত্রী আপন গৃহে বসে চরকায় সূতা কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকবে। ছাদে আরোহণ করে এদিক ওদিক তাকাবে না। প্রতিবেশীদের সাথে কথা কম বলবে এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাদের গৃহে যাবে না। স্বামীর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার সম্মান করবে। প্রত্যেক কাজে তার সন্তুষ্টি কামনা করবে। নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা

↥

এদিক ওদিক তাকাবে না। প্রতিবেশীদের সাথে কথা কম বলবে এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাদের গৃহে যাবে না। স্বামীর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার সম্মান করবে। প্রত্যেক কাজে তার সন্তুষ্টি কামনা করবে। নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। স্বামীর অনুমতিক্রমে গৃহ থেকে বের হলেও পুরাতন কাপড়-চোপড়ে আবৃতা হয়ে বের হবে। সড়কের মধ্যস্থলে ও বাজার থেকে বেঁচে চলবে। সর্বপ্রযত্নে নিজের অবস্থার উন্নতি ও ঘর-কন্নায় নিয়োজিত থাকবে এবং নামায-রোযার সাথে সম্বন্ধ রাখবে। স্বামীর কোন বন্ধু দরজায় আওয়াজ দিলে যদি স্বামী গৃহে না থাকে, তবে তার সাথে কোন কথা না বলাই নিজের স্বামীর আত্মমর্যাদার দাবী। স্বামীকে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। খুব সেজেগুজে থাকবে এবং স্বামী সম্ভোগ করতে চাইলে তজ্জন্যে সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকবে। সন্তানদের প্রতি স্নেহমমতা করবে। স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর দেবে না। এক

সূরা আহজাব, আয়াত ৩২

তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সঙ্গত কথা বলবে।

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে কোনো জিনিস ব্যয় করা নিষিদ্ধ

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)

২১২০। রাসূল সা বলেছেনঃ **স্ত্রী তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার ঘর হতে কোন কিছু ব্যয় করবে না। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল। খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বললেনঃ এটাতো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ।**

মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্যও একজন স্ত্রীর তার স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

মাসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিকট মহিলার সম্মতি চাওয়া।

৮৭৩। নবী সা বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (সলাতের জন্য মসজিদে যাবার অনুমতি চায় তাহলে তার স্বামী তাকে যেন বাধা না দেয়।

ইবনে হিব্বান, ইবনে আবী শাইবাহ , সহীহুল জামে ৩১৪৮ নং হাদিস

রাসূল সা বলেছেন, স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন অধিকার আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেঁটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না।

ইবনে আবী শাইবাহ, নাসাঈ, তাবারানী, আদাবুয যিফাফ ২৮৫পৃঃ

নবী সা বলেন, স্ত্রীর জন্য স্বামী তার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

আস-সিলসিলাতুস সহীহা হাদিস নং ১৮৩৮

নবী সা বলেন, শ্রেষ্ঠ রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃকপাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।

ত্বাবারানী, সহীহ আল-জামিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ৫২৫৯

নবী সা বলেন, নারী যদি নিজ স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানতো, তাহলে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো।

ত্বাবারানী, আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ হাদিস নং ২৮৮

রাসূল সা বলেছেন, যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না।

মিশকাত হাদিস নং ৩০৮৬, মুসলিম বাংলা ৬ষ্ঠ খন্ড বিবাহ অধ্যায় হাদিস ২৯৫২

রাসূল সা বলেছেন, ... তোমরা দুনিয়া এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক। কারণ নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলের প্রথম দুর্ঘটনা নারীদের মধ্যেই ঘটে।

৫২০ তাফসীরে ইবন কাছীর

ইব্ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... ... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একটি স্ত্রীলোক একজন গোলামকে তাহার যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য স্থির করিল এবং أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ দ্বারা ইহা জায়িয বলিয়া মনে করিল। অতঃপর তাহাকে হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত করা হইল। কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম হযরত উমর (রা) কে বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটি আল্লাহ্‌র কিতাবের অপব্যাখ্যা করিয়াছে। রাবী বলেন, হযরত উমর (র) ঐ গোলামকে প্রহার করিলেন এবং তাহারা মাথা মুড়াইয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, ইহার পর তুমি সকল মুসলমানের উপর হারাম। রিওয়ায়েতটি গরীব ও মুনকাতী। ইব্ন জরীর (র) রিওয়ায়েতটিকে সূরা মায়িদা-এর শুরুতে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার উপযুক্ত স্থান ইহাই। হযরত উমর (রা) ঐ স্ত্রীলোকটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সকল পুরুষের উপর তাহাকে হারাম করিলেন।

৫৩৫১ নবী সা বলেছেনঃ সওয়াবের আশায় **কোন মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করে, তা তার সাদাকা(দান) হিসাবে গণ্য হয়**।

তাফসীর ইবনে কাসীর

সূরাঃ নিসা ৪ ৩৮৫ পারাঃ ৫

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীর নেতা। সে স্ত্রীকে সোজা ও ঠিক-ঠাককারী। কেননা, পুরুষ স্ত্রীর উপর মর্যাদাবান। এ কারণেই নবুওয়াত পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে খলীফা একমাত্র পুরুষই হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'ঐ সব লোক কখনও মুক্তি পেতে পারেন না যারা কোন নারীকে তাদের শাসনকর্ত্রী বানিয়ে নেয়'। (সহীহ বুখারী) এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যেও শুধু পুরুষেরাই যোগ্য। নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা লাভের দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুরুষেরা নারীদের উপর তাদের মাল খরচ করে থাকে, যে খরচের দায়িত্ব কিতাব ও সুন্নাহ্ তাদের প্রতি অর্পণ করেছে। যেমন মোহরের খরচ, খাওয়া পরার খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ। সুতরাং জন্মগতভাবেও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম এবং উপকারের দিক দিয়েও পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীর উপরে। এ জন্যেই স্ত্রীর উপর পুরুষকে নেতা বানানো হয়েছে।

অন্য জায়গা রয়েছে وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ 'তাদের উপর (স্ত্রীদের) পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে।' (২ঃ ২২৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'এ আয়াতের ভাবার্থ এই যে, নারীদেরকে পুরুষদের আনুগত্য (স্বীকার) করতে হবে এবং তাদের কাজ হচ্ছে সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্বামীর মালের হিফাযত করা ইত্যাদি।'

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, 'একটি স্ত্রীলোক নবী (সঃ)-এর সামনে স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তার স্বামী থাকে থাপ্পড় মেরেছে।

↥

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, একজন আনসারী (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার স্বামী আমাকে চড় মেরেছে। ওর চিহ্ন এখনও আমার চেহারায় বিদ্যমান রয়েছে"। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "তার এ অধিকার ছিল না।" সেখানেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি চেয়েছিলাম এক রকম এবং আল্লাহ তা'আলা চাইলেন অন্য রকম।"

হযরত শা'বী (রাঃ) বলেন যে, মাল খরচ করার ভাবার্থ হচ্ছে মোহর আদায় করা। দেখা যায় যে, পুরুষ যদি স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তবে লে'আনের (একের অপরকে অভিশাপ দেয়াকে 'লে'আন' বলে) হুকুম রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী স্বামীর সম্পর্কে একথা বলে এবং প্রমাণ করতে না পারে তবে স্ত্রীকে চাবুক মারা হয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—যেসব নারীর দুষ্টামিকে তোমরা ভয় কর, অর্থাৎ যারা তোমাদের উপরে হতে চায়, তোমাদের অবাধ্যাচরণ করে, তোমাদেরকে কোন গুরুত্ব দেয় না এবং তোমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে তোমরা প্রথমে মুখে উপদেশ প্রদান কর, নানা প্রকারে তাদের অন্তরে তাক্ওয়া সৃষ্টি কর, স্বামীর অধিকারের কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দাও। তাদেকে বল—দেখ, স্বামীর এত অধিকার রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'যদি কাউকে আমি এ নির্দেশ দিতে পারতাম যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করবে তবে নারীকে নির্দেশ দিতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। কেননা, তার উপর সবচেয়ে বড় হক তারই রয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "স্ত্রীর তার স্বামীর উপর কি হক রয়েছে?" তিনি বলেনঃ "যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরাবে, তার মুখে মেরো না, গালি দিও না, ঘর হতে পৃথক করো না, ক্রোধের সময় যদি শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে কথা বন্ধ কর তথাপি তাকে ঘর হতে বের করো না।" অতঃপর বলেনঃ "তাতেও যদি ঠিক না হয় তবে তাকে শাসন-গর্জন করে এবং মেরে-পিটেও সরল পথে আনয়ন কর।"

সহীহ মুসলিমে নবী (সঃ)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণে রয়েছেঃ 'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের সেবিকা ও অধীনস্থা। তাদের উপর তোমাদের হক এই যে, যাদের যাতায়াতে তোমরা অসন্তুষ্ট তাদেরকে তারা আসতে দেবে না। তোমাদের উপর তাদের হক এই যে, তোমরা তাদেরকে খাওয়াবে ও পরাবে এবং এমন প্রহার করা উচিত নয় যার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, কোন অঙ্গ ভেঙ্গে যায় কিংবা কোন অঙ্গ আহত হয়।'

বলেছেনঃ 'আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করো না।' এরপর একদা হযরত উমার ফারূক (রাঃ) এসে আরয করেনঃ 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নারীরা আপনার এ নির্দেশ শুনে তাদের স্বামীদের উপর বীরত্বপনা দেখানো আরম্ভ করেছে।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে মারার অনুমতি দেন। তখন পুরুষদের পক্ষ হতে বেদম মারপিট শুরু হয়ে যায় এবং বহু নারী অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'জেনে রেখ যে, আমার নিকট নারীদের অভিযোগ পৌঁছেছে। মনে রেখ যে, যারা স্ত্রীদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে তারা ভাল মানুষ নয়।' (সুনান-ই-আবি দাউদ)

↥

হযরত আশআস (রঃ) বলেন, একদা আমি হযরত উমার (রাঃ)-এর আতিথ্য গ্রহণ করি। ঘটনাক্রমে সে দিন তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়। হযরত উমার (রাঃ) স্বীয় পত্নীকে প্রহার করেন, অতঃপর আমাকে বলেন, 'হে আশআস (রাঃ)! তিনটি কথা স্মরণ রেখ, যা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে স্মরণ রেখেছি। এক তো এই যে, স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে হবে না যে, তিনি স্বীয় স্ত্রীকে কেন মেরেছেন। (সুনান-ই-নাসাঈ)

সহীহ মুসলিম (ইফা)

৩৫৫৭। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) এসে রাসুলুল্লাহ সা এর নিকটে প্রবেশে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তার দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তবে তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নি। এরপর আবূ বকর (রা) কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমর (রা) এলেন এবং তাকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হল। তিনি নবী সা কে চিন্তিত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন আর তখন তার চতুষ্পার্শ্বে তাঁর সহধর্মিনীগণ উপবিষ্টা ছিলেন।

উমর (রা) বললেনঃ **নিশ্চয়ই আমি নবী সা এর নিকটে এমন কথা বলব যা তাঁকে হাসাবে**। এপর তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! **আপনি যদি দেখতেন আমার স্ত্রী আমার কাছে ভরণপোষণ তলব করছিল। আমি তার দিকে উঠে গেলাম এবং তার ঘাড়ে ঘুষি মারলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সা** হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমার চতুষ্পার্শ্বে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ তারা আমার কাছে ভরণপোষণ দাবী করছে।

অমনি আবূ বকর (রা)- আয়িশা (রা) এর দিকে ছুটলেন এবং **তাঁর গর্দানে ঘুষি মারলেন। উমর (রা)ও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফসা (রা) এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘাড়ে ঘুষি মারলেন**। তাঁরা উভয়ে বললেন, তোমরা রাসুলুল্লাহ সা এর নিকট এমন জিনিস দাবী করছে যা তাঁর কাছে নেই। **তখন তাঁরা (নবী সা এর সহধর্মিনীগণ) বললেন, আমরা আর কখনো রাসুলুল্লাহ সা এর কাছে এমন জিনিস চাইব না যা তাঁর কাছে নেই**।

এরপর তাঁর প্রতি এই আয়াত নাযিল হলঃ (অর্থ) "হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিনীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসে ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও পরকালকে কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (আহযাবঃ ২৮ ২৯)

সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৩৫৫৮। উমর (রা) বলেন, যখন নবী সা তার সহধর্মিনীগন থেকে সাময়িকভাবে পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। লোকেরা তাঁরা বলাবলি করছিল যে, সা তাঁর সহধর্মিনীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনা ছিল তাঁদের উপর পর্দার নির্দেশ আসার পূর্বেকার। আমি ভেবেছিলাম যে, রাসুলুল্লাহ সা হয়ত ধারণা করছেন আমি আমার কন্যা হাফসার কারণেই এখানে এসেছি। আল্লাহ কসম! যদি রাসুলুল্লাহ সা তার(হাফসার) গর্দান উড়িয়ে দিবার নির্দেশ দিতেন তাহলে আমি অবশ্যই তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এ সব কথা আমি উচ্চস্বরেই বলছিলাম।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

পরিচ্ছেদঃ শাসক ব্যতীত অন্য কেউ নিজ পরিবারকে শাসন করতে পারে।

৬৮৪৪। আয়িশা (রা) বলেন, একবার আবূ বকর (রা) এলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সা স্বীয় মাথা আমার ঊরুর ওপর রেখে আছেন। তখন তিনি বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ সা ও লোকদেরকে আটকে রেখেছ, এদিকে তাদের পানির কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন ও **নিজ হাত দ্বারা আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন**।

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৪২৫৩। আয়িশা (রা) বলেছেন, মদিনায় প্রবেশের পথে বায়দা নামক স্থানে আমার গলার হারটি পড়ে গেল। এরপর নবী সা সেখানে উট বসিয়ে অবস্থান করলেন। তিনি আমার উরুর ওপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন। **আবূ বকর (রা) এসে আমাকে কঠোরভাবে থাপ্পড় লাগালেন** এবং বললেন একটি হার হারিয়ে তুমি সকল লোককে আটকে রেখেছ। এদিকে তিনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন, অপর দিকে রাসূল সা এ অবস্থায় আছেন, **এতে আমি মৃত্যু যাতনা ভোগ করছিলাম**।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

পরিচ্ছেদঃ শাসক ব্যতীত অন্য কেউ নিজ পরিবারকে শাসন করতে পারে।

৬৮৪৫। আয়িশা (রা) বলেন, একবার **আবূ বকর (রা) এলেন এবং আমাকে খুব জোরে ঘুষি মারলেন** আর বললেন, তুমি লোকজনকে একটি হারের জন্য আটকে রেখেছ। **আমি রাসূলুল্লাহ্ সা এর অবস্থানের দরুন মরার মত ছিলাম। তা আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছে।**

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

পরিচ্ছেদঃ ঈদের দিনগুলোতে আল্লাহর নাফরমানী হয় না এমন ক্রীড়া-কৌতুক করার অবকাশ প্রদান

১৯৪৮। আয়িশাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বাকর (রা) আইয়্যামে তাশরীকের দিনে আয়িশাহ (রা) এর নিকট গিয়ে দেখেন যে, তার কাছে দুটি বালিকা গান করছে এবং দফ বাজাচ্ছে। **আবূ বকর (রা) এটা দেখে বালিকাদ্বয়কে খুব শাসলেন, ধমক দিলেন**। তখন রসূলুল্লাহ সা বলেন, হে আবূ বকর! এদেরকে ছেড়ে দাও। এ দিনগুলো হ'ল ঈদের দিন। আয়িশাহ (রা) বলেন, তখন আমি সবেমাত্র বালিকা।

সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৩৪৯৭। ....আয়িশা (রা) ও যয়নাব (রা) কথা কটিাকাটি করতে লাগলেন। এমনকি তাদের গোসসার আওয়াজ চড়ে গেল। ঐ অবস্থায় আবূ বকর (রা) সেখান দিয়ে সালাতে যাচ্ছিলেন। তিনি ঐ দুজনের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি বের হয়ে আসুন এবং **ওদের মুখে ধুলা-মাটি ছুঁড়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন**।

ইসলাম ধর্ম কি নারীদের জন্য?

ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্ম গ্রন্থ হচ্ছে কোরান। এই গ্রন্থই একজন মুসলমান নারী বা পুরুষের প্রধান পথ প্রদর্শক। এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে সহজেই বুঝা যাবে যে কোরান শুধু পুরুষদের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে। নারীদের জন্য কোরান পাঠানো হয় নাই। নারীদের কোরান পড়ার প্রয়োজন নেই, শুধু মুমিন পুরুষরা নারীদের যা করতে বলবে তাই নারীদের করতে হবে, তাই নারীদের ধর্ম।

যেমন–

সূরা বাকারা এর ২৫ নং আয়াত:

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে,তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, তাদের জন্য তাতে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ।"

উপরের আয়াতটি আমরা একটু ভালো করে পড়ি। এখানে হযরত নবী কে বলা হয়েছ তাদের সুসংবাদ দিতে যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা পরকালে জান্নাত, আর পবিত্র স্ত্রীগণ পাবে।

*স্ত্রী কাদের থাকে? পুরুষদের। তাহলে ঈমান কারা আনবে? পুরুষরা। কারা নেক কাজ করবে? পুরুষরা। অতএব নারীদের ঈমান আনার দরকার আছে কি? নারীদের নেক কাজ করার দরকার আছে কি? **যদি নারী পুরুষ সবার কথা বুঝাতো তাহলে লেখা হত, -"তাদের জন্য তাতে থাকবে পবিত্র স্বামী ও স্ত্রীগণ"।***

সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াত নং ১৪:

"**মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে** প্রবৃত্তির ভালোবাসা- **নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্র। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী**। আর আল্লাহ, তার নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।"

*উপরের আয়াতটিতে আল্লাহ মানুষকে বলছেন, মানুষের জন্য কী কী সুশোভিত মানে সুন্দর করা হয়েছে। **এর মধ্যে নারী একটি**। কী চমৎকার! **আর মানুষ বলতে শুধু পুরুষদের বোঝানো হয়েছে**। কারণ নারীকে তো আর নারীদের জন্য সুন্দর করা হবেনা **এবং নারীকে ঘোড়া, গবাদিপশু কাতারে নিয়ে গিয়েছে**। আর নারীর কি প্রবৃত্তির ভালোবাসা নেই?*

যদি নারীদের জন্যও কোরান লেখা হত তবে আয়াতটি হত এমন, "মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা নারী পুরুষ একে অপরকে, সন্তানাদি,রাশি রাশি সোনারূপা, চিহ্নিত ঘোড়া,গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্র"। অর্থাৎ নারীর সাথে পুরুষ শব্দটিও থাকতো।

সূরা ৪ নিসা, আয়াত নং ৩:

"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুটি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা জুলুম করবে না।"

*এখানেও "তোমরা" পুরুষদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। ইয়াতীম কি শুধু মেয়েরাই ছিল? ছেলেরা কি এয়াতিম ছিল না? ইয়াতীম মেয়েদের ইনসাফ করতে হলে তাদের বিয়ে করতে হবে? বিয়ে না করে ইয়াতীম মেয়েদের কি ইনসাফ দেয়া যেতো না? আরো বলা হয়েছে, **নারীদের মধ্যে যাকে তোমার ভালো লাগে। দুটি, তিনটি, চারটি। মানে নারী একেবারে দোকানের পণ্য।** আবার যদি সমান আচরণ করতে না পারে তবে একজনকে অথবা বিয়ে না করলে ক্রীত দাসী বা যুদ্ধবন্দিনীকে ব্যবহার করা যাবে। একজন মা ই তার সন্তানদের প্রতি সমান আচরণ করতে পারে না। সেখানে বউদের সাথে সমান আচরণ আশা করা যায় কি? আল্লাহও তো বলেছেন যে সমান আচরণ করা সম্ভব নয়!*

সূরা ৪ নিসা আয়াত ১২৯:

"তোমরা কখনও স্ত্রীগণের মধ্যে সুবিচার করতে পারবেনা যদিও তোমরা তা কামনা কর, সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুকে পড়োনা ও অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখোনা এবং যদি তোমরা পরস্পর সমঝতায় আসো ও সংযমী হও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

***ক্রীতদাসী বা যুদ্ধবন্দিনীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক**- কী ভয়ঙ্কর কথা! আল্লাহর এমন অমানবিক, অপমানকর, অসৌজন্যমূলক নিয়ম নারীদের জন্য! মনে হচ্ছে কি এটা আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তার বিধান? প্রত্যেকটি সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তার কাছে সমান আদরের, সমান প্রিয় হওয়ার কথা। এতো দেখি পক্ষপাতিত্ব। এখন কি মনে হচ্ছে নারীদের জন্য ধর্ম আছে?*

সূরা ৪ নিসা, আয়াত নং ১৫:

"আর তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচার করে, তোমরা তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর। অত:পর তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তবে তোমরা তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখ যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের জীবন শেষ করে দেয়। অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ তৈরি করে দেন।"

*এখানে লক্ষ করুন 'তোমাদের নারীদের'। এখানেও তোমাদের বলতে মুমিন পুরুষদের বুঝিয়েছে। আর সেই পুরুষদের নারী। **নারী কোন স্বাধীন সত্তা নয়**। ব্যভিচার কি শুধু নারীরা করে? ব্যভিচার করতে একজন নারী এবং একজন পুরুষের দরকার হয়। যদি নারী পুরুষ সবার জন্য কোরান নাযিল হত তা হলে আয়াতটি হত নিম্নরূপ –*

"আর যদি কোন নারী ও পুরুষ ব্যভিচার করে তাদের জন্য সাক্ষী ও প্রমাণের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি সাক্ষ্য প্রমাণে সন্দেহাতীতভাবে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় তবে তাদের উভয়কে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের জীবন শেষ করে দেয়"। অথবা এমনও বলা হত, "তোমাদের নারীপুরুষের মধ্য থেকে"। কিন্তু তা বলা হয়নি।

সূরা ৪ নিসা, আয়াত নং ৪:

"আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে মোহর দাও, অত:পর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তি সহকারে খাও।"

এখনেও 'তোমরা' বলতে মুমিনদের তথা পুরুষদের বুঝিয়েছে। যদি নারীপুরুষ সবার জন্য কোরান নাযিল হত তাহলে আয়াতটি এমন হত, "স্বামীরা স্ত্রীদের মোহর দিবে, স্ত্রীরা চাইলে ছাড় দিতে পারে, পরস্পর আনন্দে একসাথে বসবাস করার জন্য।"

সূরা ৪ নিসা, আয়াত নং ২০:

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীকে বদলাতে চাও আর তাদের কাউকে তোমরা প্রদান করেছ প্রচুর সম্পদ, তবে তোমরা তা থেকে কিছু নিও না। তোমরা কি তা নেবে অপবাদ এবং প্রকাশ্য গুনাহের মাধ্যমে।"

উক্ত আয়াতের নায়কও সম্মানিত পুরুষগণ এবং পুরুষদের উদ্দেশ্যেই আর স্ত্রী হলো পণ্য। পছন্দ হল না সাথে সাথে বদলে ফেলা যাবে। তবে এত টুকু দয়া মহান আল্লাহতালা করেছেন তাদেরকে দেয়া জিনিস রাখা যাবে না। যদি নারীদের আল্লাহ, কোরাণ আর ধর্ম থাকতো তবে আয়াতটা হত এমন-

আর যদি স্বামীস্ত্রী পরস্পর পরস্পকে বদলাতে চায় বা তারা বিচ্ছেদ চায় তবে দাবীহীন শান্তিপূর্ণ ভাবে একে অপরকে ছেড়ে দিতে পারে। এতেই রয়েছে অসীম কল্যাণ।

সূরা বাকারা, আয়াত ২২২

আর তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা **অশুচি** । সুতরাং তোমরা হায়েযকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। [সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৪: ঋতুবতী মহিলা ঈদগাহ হতে দূরে থাকবে।]

44:51

নিশ্চয় জান্নাতে মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হূরদের সাথে। যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জিন।

55:58 তারা(হূর) যেন হীরা ও প্রবাল।

সূরা নং ৫৬ আল-ওয়াকিয়া আয়াত ৩৫-৩৭

"নিশ্চয় আমি হূরদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করব। অতঃপর তাদের বানাব কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়সী।"

লক্ষ্য করুন, বিশেষভাবে জান্নাতি নারী বানিয়ে মুমিন পুরুষদেরদের লোভ দেখিয়ে উনি ওনার দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করেছেন। উনি কি একজন নারী ব্যবসায়ী নন? পবিত্র কোরানে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে জান্নাতে গমনকারী নারীদের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয় গঠনে পুরুষ তৈরি হয়েছে।

সূরা নং ২ আল বাকারা, আয়াত নং ২২৩:

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ফসল ক্ষেত্র। সুতরাং তোমারা তোমাদের ফসল ক্ষেত্রে গমন কর, যেভাব চাও।

এই আয়াতটিতেও দেখা যাচ্ছে, তোমরা মানে নারী-পুরুষ সবাই নয়, শুধু পুরুষশার্দূলগণ। আর স্ত্রীদের শস্য ক্ষেত্র বলা হয়েছে। মানে পুরুষরা তার লাঙ্গল দিয়ে.যে ভাবে খুশি সে ভাবেই চাষ করতে পারবে আর ইচ্ছে মত ফসল ফলাবে। আর নারীরা বরাবরের মতই দ্রব্য, সম্পদ, বাচ্চাদানী হিসেবে ফুটে উঠেছে। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের জন্য, পুরুষের বিনোদন এবং অবসন্নতা কাটাবার জন্য।

সূরা নং ২ আল বাকারা, আয়াত নং ২৩৬:

"তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদেরকে স্পর্শ(সহবাস) করনি কিংবা তাদের জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করনি। এবং তোমরা তাদেরকে কিছু খরচপত্র দিয়ে (বিদায়)দিবে।"

তাফসীরঃ অর্থাৎ এমতাবস্থায় তোমাদের উপর (মোহরের) কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আর এ অবস্থায় তালাক দেয়াতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। যদিও এতে স্ত্রীদের মন ভাঙ্গা হয়ে যায়। এতে তাদের কিছুটা কষ্ট হয় এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তাদের কিছুই থাকে না। তাই এ নির্দেশ এমন মহিলাদের ব্যাপারে- বিবাহের সময় যার দেনমোহর নির্ধারিত হয়নি এবং স্বামী সহবাসের পূর্বেই যাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে, (বলা হচ্ছে,) তাকে কিছু না কিছু খরচপত্র (ক্ষতিপূরণস্বরূপ) দিয়ে বিদায় কর।

এখানেও আবার একই রকম পুরুষ তোষণ! তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, এমন অবস্থায় যে তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি কিংবা মোহর নির্ধারণ করনি। মোহর তো স্ত্রীর শরীরকে ভোগ করার জন্য প্রদত্ত অর্থ, আরো স্পষ্ট করে হাদিসে বলা হয়েছে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ভোগ হালাল করার টাকা! তবে তো ভালো হত একবার স্ত্রী গমনে কত মোহর তা নির্ধারণ করলে।

সূরা নং ৫ আল-মায়িদাহ, আয়াত নং ৬:

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।

উপরের আয়াতে সালাতে দণ্ডায়মান হতে হলে পুরুষদের কখন কী কী করতে হবে তার বর্ণনা রয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস কর অত:পর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। তার মানে হল নামাজ শুধু পুরুষদের জন্য। আর যদি নারীপুরুষ সবার জন্য তবে আয়াতটিতে স্ত্রীসহবাস না লিখে শুধুমাত্র সহবাস লিখলেই হত। নারীরা বুঝে নিতো নামাজ তাদেরও জন্য। পুরো কোরান শরীফ জুড়ে আরো বহু জায়গায় এভাবেই মহান আল্লাহতালা কখনও হে মুমিনগণ বা তোমাদের বা তোমরা বলে পুরুষদেরই সম্বোধন করে কথা বলেছেন। আপনার দরকার পুরুষ আর পুরুষের দরকার নারীর। নাকি আপনি পুরুষ গোত্রীয়?

এবারে চলুন ইসলামে নারীকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্বন্ধে একটা ভিডিও দেখে আসি,
https://drive.google.com/file/d/1-4XhIYYxsHGpuVm9mzTxvNvI_jehAl-0/view?usp=drive_link

ইসলামে নারীর প্রতি কতটা নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী!! = https://drive.google.com/file/d/1-Q7c-ACz_0beJSxIIkR_Kha-wgXzFRDc/view

অন্তত নিজের মা বোনদের কথা চিন্তা করেও যদি আপনার মনে নারী জাতির প্রতি সামান্য সম্মান-মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে তবে- সাহাবীদের ইসলামে ও ইসলামের জন্য জীবন দিতে আকৃষ্ট করার জন্য_ নবী মুহাম্মদের কাল্পনিক প্রলোভন নামক তথাকথিত জান্নাত ওরফে হেরেমখানায় (যেখানে একজন পুরুষ অনেক সুন্দরী নারীর শরীর ভোগ করে ফূর্তি করে) আপনি কোনদিনই যেতে চাইবেন না, এমনকি কল্পনাতেও নয় (পড়ার জন্য লেখার উপর ক্লিক করুন)।

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের প্রতি ইসলাম

৫৮৮৬ নবী সা **হিজড়াদের উপর উপর লা'নত করেছেন**। তিনি বলেছেনঃ ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও।

৬৮৩৪ পরিচ্ছদঃ **নপুংসকদের(হিজড়াদের) নির্বাসিত করা।**
ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, **রাসূলুল্লাহ সা অভিশাপ দিয়েছেন নারীরূপী পুরুষ ও পুরুষরূপী নারীদের উপর এবং বলেছেনঃ তাদেরকে বের করে দাও তোমাদের ঘর হতে এবং নবী সা অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন।**

নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ্, ছহীহ তারগীব হা/২০৭০
ইবনু উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন- **'তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে না- তারমধ্যে রয়েছে পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী'।**

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৪১০৯। আয়িশাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা এক হিজড়াকে আল-বায়দা নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর সে হিজড়া প্রতি শুক্রবার খাদ্যের জন্য শহরে আসতো।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
পরিচ্ছেদঃ ৬১. হিজড়া সম্পর্কে বিধান
৪৯২৮। আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেন, এক হিজড়াকে নবী সা এর নিকট আনা হলো। তার হাত-পা মেহেদী দ্বারা রাঙ্গানো ছিলো। রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ এর এ অবস্থা কেন? বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে নারীর বেশ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ সা তাকে আন-নকী নামক স্থানে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেনঃ সালাত আদায়কারীকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

জ্বীন জাতির বিষ্ময়কর ইতিহাস, ইসলামের মহাপন্ডিত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি

৫০ জ্বিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস

হিজড়া জন্মায় কেমন করে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হিজড়ারা জ্বিনদের সন্তান। কোনও এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন যে এমনটা কেমন করে হতে পারে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন যে মানুষ যেন তার স্ত্রীর মাসিক স্রাব চলাকালে যৌনসঙ্গম না করে। সুতরাং কোনও মহিলার সঙ্গে তার ঋতুস্রাব চলার সময় সঙ্গম করা হলে শয়তান তার আগে আগে থাকে এবং সেই শয়তানের দ্বারা ওই মহিলা গর্ভবতী হয় ও হিজড়া সন্তান প্রসব করে।[৩]

জ্বিন-মানুষের যৌথ মিলনজাত সন্তানের নাম কী

আল্লামা সাআলাবী (রহঃ) বলেছেনঃ মানুষ ও জ্বিনের যৌথ মিলনজাত বাচ্চাকে বলা হয় 'খুন্নাস'।[৬]

↥

ইসলাম এবং বিজ্ঞান

তিরমিজী (তাহকীককৃত)

৩১১৭। ইয়াহুদীরা নবী সা এর নিকট এসে বলল, **আমাদেরকে মেঘের গর্জন প্রসঙ্গে বলুন**, এটা কি? নবী সা বললেনঃ মেঘমালাকে হাকিয়ে নেয়ার জন্য ফেরেশতাদের একজন নিয়োজিত আছে। তার সাথে রয়েছে আগুনের চাবুক। এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে সেদিকে পরিচালনা করেন, যেদিকে আল্লাহ তা'আলা চান। তারা বলল, **আমরা যে আওয়াজ শুনতে পাই** তার তাৎপর্য কি? রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ **এটা হচ্ছে ফেরেশতার হাকডাক**। এভাবে হাকডাক দিয়ে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে নিয়ে যায়।

সূনান তিরমিজী (ইফা)

৩১১৭। ইবন আব্বাস রা বলেন, একবার কতিপয় ইয়াহূদী নবী সা এর কাছে এসে বললঃ আপনি আমাদের বলুন, বজ্র কি? তিনি বললেনঃ মেঘ-বিষয়ে দায়িত্বশীল এক ফেরেশতা। যার সঙ্গে **আগুনের একটি বেত** রয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ যেখানে চান সেখানেই এই ফেরেশতা মেঘ হাঁকিয়ে নিয়ে যান। তারা বললঃ **আমরা যে শব্দ শুনতে পাই তা কি**? তিনি বললেনঃ **এ হল মেঘ তাড়ানোর হাঁক যখন তিনি মেঘ তাড়িয়ে নিয়ে যান পরিশেষে তা নির্দেশিত স্থানে গিয়ে পৌঁছে**। তারা বললঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

সহীহ মুসলিম (হাদিস একাডেমী)

৭৩০৬। রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **মানুষের শরীরে এমন একটি হাড় আছে, যা জমিন কখনো ভক্ষণ করবে না**। কিয়ামাতের দিন এর দ্বারাই পুনরায় মানুষ সৃষ্টি করা হবে। সহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আবার কোন হাড্ডি? রসূল সা বললেন, এটা হলো- মেরুদণ্ডের হাড্ডি।

৫৫২ কিতাবুল ফিতানি ওয়া আশরাতুস সা'আতি

(৭২৬৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ".

(৭২৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের সব কিছুই মাটি খাইয়া ফেলিবে। কেবল মেরুদণ্ডের হাড় বাকী থাকিবে। ইহার দ্বারাই প্রথমতঃ মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারাই আবার তাহাদেরকে সৃষ্টি করা হইবে।

সূনান নাসাঈ (ইফা)

১৩৭৭। আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন- নবী সা বলেছেন, তোমাদের সকল দিনের মধ্যে পরম উৎকৃষ্ট দিন হল জুমুআর দিন, সে দিন আদম আ কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পড়। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়। তারা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিভাবে আমাদের দরুদ আপনার কাছে পেশ করা হবে। যেহেতু আপনি এক সময় ওফাত পেয়ে যাবেন **অর্থাৎ তারা বললেন, আপনার দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে**। নবী সা বললেন, **নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যমীনের জন্য নবীগণের দেহ গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন**।

আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

৩৮৯৫। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, **কেউ ব্যথার অভিযোগ করলে** নবী সা তাঁর মুখের থুথু বের করে তাতে মাটি মিশিয়ে বলতেনঃ এ **পৃথিবীর মাটিতে আমাদের কারো থুথু মিশালে** আমাদের রবের আদেশে **রোগী ভালো হয়ে যায়**।

হাদীস সম্ভার

১১৬৪। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সা নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের পদ্মরাগরাজির দুই পদ্মরাগ। আল্লাহ এ দু'য়ের নূর(জ্যোতি) কে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। যদি উভয়মণির নূরকে তিনি নিষ্প্রভ না করতেন, তাহলে উদয় ও অস্তাচল(দিগদিগন্ত) কে উভয়ে জ্যোতির্ময় করে রাখত।

সূনান তিরমিজী (ইফা)

৮৭৮। রাসূলুল্লাহ সা বলেন, হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ন হয়েছিল তখন সেটি ছিল দুধ থেকেও সাদা। **মানুষের গুণাহ- খাতা এটিকে এমন কালো করে দিয়েছে**।

সুনানে ইবনে মাজাহ

৪২৪৪। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে**। **অতঃপর সে তওবা করলে, পাপকাজ ত্যাগ করলে তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে আরও গুনাহ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে যায়**। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন- "কক্ষনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং (মরিচা) ধরিয়েছে"।

সূনান তিরমিজী (ইফা)

৩৩৩৪। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ বান্দা যখন কোন গুনাহ করে তখন তার কলবে একটি কাল দাগ পড়ে। পরে যখন সে গুনাহ থেকে বিরত হয় এবং তাওবা করে তখন তার কলব উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু **সে যদি পুনরাবৃত্তি করে তবে কাল দাগ বৃদ্ধি পায়**।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

৫২। রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ জেনে রাখ, **শরীরের মধ্যে একটি মাংসের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে মাংসের টুকরোটি হল কলব**।

২০১৩। রাসূল সা বলেনঃ হে আয়িশাহ্! **আমার দু'চোখ ঘুমায় বটে কিন্তু আমার কালব নিদ্রাভিভূত হয় না**।

৩৮৮৭। নবী সা মিরাজের রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এক সময় আমি কাবা ঘরের একটি অংশে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন এবং **আমার বুকের উপরিভাগ হতে নাভি পর্যন্ত কেটে ফেললেন। তারপর** আগন্তুক **আমার কলব বের করলেন**। তারপর আমার নিকট একটি সোনার পাত্র আনা হল যা ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার **কালবটি ধৌত করা হল** এবং ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে **যথাস্থানে আবার রেখে দেয়া হল**। তারপর সাদা রং এর একটি জন্তু(বুরাক) আমার নিকট আনা হল। যা আকারে খচ্চর হতে ছোট ও গাধা হতে বড় ছিল। এটি একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ সীমায়। আমাকে তার উপর চড়ানো হল।

৭৫১৭ নবী সা বলেনঃ মিরাজের রাতে জিবরীল (আ.) তাঁর গলার নিচ হতে বুক পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং **তাঁর বুক ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচেড়ে যমযমের পানি দ্বারা নিজ হাতে ধৌত করেন। সেগুলোকে পরিস্কার করলেন**, তারপর একটি সোনার পাত্র আনা হল যা ছিল ছিল ঈমান ও প্রজ্ঞায়। **তাঁর বুক ও গলার রগগুলো এর দ্বারা পূর্ণ করলেন**। তারপর সেগুলো যথাস্থানে রেখে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে উঠলেন।

সুনান আদ-দারেমী

১৩। রাসূলুল্লাহ সা বর্ণনা করেন, ...তারা দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে ধরে চিত করে শুইয়ে দিল। তারপর **আমার পেট চিরে ফেলে আমার 'কলব' বের করে সেটিও চিরে ফেলল**। **সেখান থেকে কালো রংয়ের দু'টি রক্তপিণ্ড বের করে ফেলল**। এরপর তাদের একজন তার সাথীকে বলল: বরফের পানি নিয়ে আস। অতঃপর সে পানি দিয়ে আমার ভেতরটা ধুয়ে দিল। তারপর একজন অপরজনকে বলল: সমান করে সেলাই করে দাও, ফলে সে সমান করে সেলাই করে দিল।

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)

৬৭৯৭। রাসুলুল্লাহ সা বলেন, আল্লাহ তাআলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন। রোববার দিন তিনি এতে পর্বত সৃষ্টি করেন। সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার দিন তিনি আপদ বিপদ সৃষ্টি করেন। বুধবার দিন তিনি নূর সৃষ্টি করেন। **বৃহস্পতিবার দিন** তিনি **পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়িয়ে দেন** এবং **জুমুআর দিন(শুক্রুবার) আসরের পর তিনি আদম আ কে সৃষ্টি করেন**।

মুহাম্মদ নারীদের ভ্যাজাইনাল লিকুইডকে নারীদের বীর্য মনে করত

১৩০ রাসূলুল্লাহ্ সা এর নিকট উম্মু সুলায়ম (রা.) এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? রাসূল সাঃ বললেনঃ 'হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তখন **উম্মু সালামাহ (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয় কি?' রাসূল সা বললেন, 'হ্যাঁ, তা না হলে তাদের সন্তান তাদের আকৃতি পায় কীভাবে !**

৩৩২৮ নবী সা বলেন- "মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে তাদের উপর গোসল ফরজ হবে, যখন সে বীর্য দেখতে পায়। এ কথা শুনে উম্মু সালামাহ (রা.) হাসলেন এবং বললেন, মেয়েদের কি স্বপ্নদোষ হয়? তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেন, তা না হলে সন্তান তার মত কিভাবে হয় !

সহীহ মুসলিম (ইফা)

পরিচ্ছেদঃ মহিলার মনী (বীর্য) বের হলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব

৬০৩। রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ পুরুষের বীর্য গাড় সাদা আর **মেয়েলোকের বীর্য পাতলা, হলুদ**।

৩৩২৯,৩৯৩৮ আবদুল্লাহ ইবনু সালাম, রাসূলুল্লাহ সা কে জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে সন্তান তার পিতার মত দেখতে হয়? আর কী কারণে কোন কোন সময় তার মামাদের মত হয়?

তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেন, এই মাত্র জিবরাঈল (আ.) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। সন্তান সদৃশ হবার ব্যাপার এই যে- পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে বের হয় তবে সন্তান পিতার মত দেখতে হবে আর যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের পূর্বে বের হয় তখন সন্তান মায়ের মত দেখতে হয়।

৫৩৫ রাসূল সা বলেনঃ **গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফলেই সৃষ্টি হয়**।

৫৩৭ রাসূল সাঃ বলেনঃ জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট এ বলে নালিশ করে, হে আমার প্রতিপালক! (দহনের প্রচন্ডতায়) আমার এক অংশ আর এক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। **ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে দু'টি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দু'টি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচন্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচন্ড ঠান্ডা অনুভব কর তাই**। সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) ১২৯০।

৩২৬০ রাসূল সা বলেছেন, জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলেছে, হে রব! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান **করেন। একটি নিঃশ্বাস শীতকালে আর একটি নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে। কাজেই তোমরা গরমের তীব্রতা এবং শীতের তীব্রতা পেয়ে থাক**।

সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

১২৭৯। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সা বলেছেন, **তোমরা যে শীত অনুভব কর, তা জাহান্নামের শ্বাস; আর যে গ্রীষ্ম অনুভব কর, তাও জাহান্নামের শ্বাস**।

Az-Zumar 39:42

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
Allah / takes / (at the) time / (of) their death,

وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
and the one who / (does) not / die / in / their sleep.

فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا
Then He keeps / the one whom, / He has decreed / for them

ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
the death, / and sends / the others / for / a term / specified.

আল্লাহ জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মরেনি তাদের নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

৭৩৯৩ নবী সা বলেছেনঃ **তোমরা কেউ বিছানায় গেলে তখন যেন সে বলে, হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার জীবন আটকে রাখ, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিবে। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, হিফাযত কোরো।**

৭৩৯৪ নবী সা যখন আপন বিছানায় যেতেন, তখন বলতেন- **হে আল্লাহ্! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি, আবার তোমারই নামে জীবিত হই**। আবার **ভোর হলে বলতেনঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবিত করেছেন**।

৫৯৫ বিলাল (রা.) বললেন, আমার এতো অধিক ঘুম আর কখনও পায়নি। আল্লাহর রাসূল সা. বললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তোমাদের রূহ্ কবয করে নিয়েছেন; আবার যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তা তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।

৭৪৭১ আবূ ক্বাতাদাহ (রা.) এর পিতা হতে বর্ণিত। যখন তাঁরা সালাত থেকে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন নবী সা বলেছিলেনঃ আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তোমাদের রূহকে নিয়ে নেন, আর যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে দেন। এরপর তারা তাদের প্রয়োজন সারলেন এবং ওযূ করলেন।

৭৩৪৭,৭৪৬৫ আলী (রা.) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ সা আমাদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সালাত পড়েছ কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জীবন তো আল্লাহর হাতে। তিনি আমাদেরকে যখন জাগাতে চান, জাগিয়ে দেন। এ কথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ সা চলে গেলেন, তার কথার জবাব দিলেন না।

আলী (রা.) বলেন, আমি শুনতে পেলাম, তিনি চলে যাচ্ছেন, আর ঊরুতে হাত মেরে মেরে বলছেনঃ মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই বিতর্কপ্রিয়।

৬৯১ রাসূল সা বলেনঃ তোমাদের **কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন**।

৭৫০ নবী সা বলেছেনঃ লোকদের কী হলো যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়? তিনি বললেনঃ যেন তারা অবশ্যই এ হতে বিরত থাকে, অন্যথায় **অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে**।

↥

১০৩৯ নবী সা. বলেছেনঃ গায়বের চাবি, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না- কেউ জানে না যে, কখন বৃষ্টি হবে।

৫৬৫৫ নবী সা এর এক কন্যা যাইনাব(রা.) এর এক শিশুকন্যা মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত ছিল। শিশুটিকে নবী সা এর কোলে তুলে দেয়া হল। শিশুটির তার নিঃশ্বাস দ্রুত উঠানামা করছিল। সাদ (রা.) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটা কী? তিনি উত্তর দিলেনঃ এটা হল রহমত। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে করেন তার হৃদয়ে এটি দিয়ে দেন।

৫৪৮৪ নবী সা বলেন- যদি তুমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে থাক; এরপর তা একদিন বা দু'দিন পর এমন অবস্থায় হাতে পাও যে, তার গায়ে তোমার তীরের আঘাত ব্যতীত অন্য কিছু নেই, তাহলে খাও।

৫৪৭৭ আদী ইবনু হাতিম (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা কে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে শিকারে পাঠিয়ে থাকি। তিনি বললেনঃ কুকুরগুলো তোমার জন্য যেটি ধরে রাখে সেটি খাও। আমি বললামঃ যদি ওরা হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেনঃ যদি ওরা হত্যাও করে ফেলে।

১৭২ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেন তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে তবে তা যেন সাতবার ধুয়ে নেয়।

২৩৫ রাসূলুল্লাহ্ সা কে ঘিয়ে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ ইঁদুরটি এবং তার আশ পাশ হতে ফেলে দাও এবং তোমাদের অবশিষ্ট ঘি খাও।

৩৩২০ নবী সা বলেছেন, 'তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দেবে। অতঃপর তাকে উঠিয়ে ফেলবে। কেননা তার এক ডানায় রোগ থাকে আর অপর ডানায় থাকে রোগের প্রতিষেধক।'

৫৬৭৮ নবী সা বলেছেনঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ পাঠাননি যার আরোগ্যের ব্যবস্থা দেননি।

৫৬৮৮ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন- **কালোজিরা মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের ঔষধ**।

ব্রেন ক্যান্সার বা এইডস আক্রান্ত রোগীকে খাইয়ে হাদিসটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া থেকে বাচাতে পারেন

৫৬৮৯ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন- তালবীনা(তরল খাদ্য) রোগীর কলিজা মযবূত করে।

৩৩০৯ নবী সা বলেছেন, লেজকাটা সাপ দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

৫৬৯২ উম্মু কায়স(রা.) বলেন: নবী সা বলেছেন- তোমরা ভারতীয় চন্দন কাঠ ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি আরোগ্য রয়েছে। শ্বাসনালীর ব্যথার জন্য এর (ধোঁয়া) নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়, পাঁজরের ব্যথা বা পক্ষাঘাত রোগ দূর করার জন্যও তা ব্যবহার করা যায়।

৫৬৯৬ নবী সা বলেনঃ তোমরা যে সব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা কর, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল শিঙ্গা লাগানো এবং সামুদ্রিক চন্দন কাঠ। তোমরা চন্দন কাঠ দিয়ে চিকিৎসা কর।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)
পরিচ্ছেদঃ মদ(Alcohol) দিয়ে চিকিৎসা করা হারাম
৫০৩৫। তারিক ইবনু সুওয়াইদ (রা) রসূলুল্লাহ সা কে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি তাকে বারণ করলেন এবং মদ প্রস্তুত করাকে খুব জঘন্য মনে করলেন। তারিক (রা) বললেন, আমি তো শুধু ঔষধ তৈরি করার জন্য মদ প্রস্তুত করি। তিনি বললেনঃ এটি তো ব্যাধি নিরামক ঔষধ নয়, বরং এটি নিজেই ব্যাধি।

৫৬৮৩ নবী সা বলেছেন: তোমাদের ঔষধসমূহের কোনটির মধ্যে যদি কল্যাণ থাকে তাহলে তা আছে শিঙ্গাদানের মধ্যে কিংবা মধু পানের মধ্যে।

৫৬৮১ নবী সা বলেনঃ রোগমুক্তি আছে তিনটি জিনিসে। শিঙ্গা লাগানোতে, মধু পানে এবং আগুন দিয়ে দাগ দেয়াতে। তবে আমার উম্মাতকে আগুন দিয়ে দাগ দিতে নিষেধ করছি।

৫৭১৬ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সা এর কাছে এসে বলল যে, আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে। নবী সা বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু সেবন করাল। এরপর বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু অসুখ আরো বাড়ছে। তিনি বললেনঃ আল্লাহ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়।

৫৭০৪ নবী সা বলেছেন: যদি তোমাদের চিকিৎসাসমূহে কোনটির মধ্যে আরোগ্য থাকে, তাহলে তা আছে শিঙ্গা লাগানোতে কিংবা আগুন দ্বারা দাগ লাগানোতে।

২১০৩ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, নবী সা শিঙ্গা লাগালেন এবং যে তাঁকে শিঙ্গা লাগিয়েছে, তাকে তিনি মজুরী দিলেন।

৫৬৯৭ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) অসুস্থ মুকান্নাকে দেখতে যান। এরপর তিনি বলেনঃ আমি যাব না, যতক্ষণ না তুমি শিঙ্গা লাগাবে। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সা-কে বলতে শুনেছিঃ 'নিশ্চয় এতে আছে নিরাময়'।

৪৪৭৮ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আল-কামাআত(ব্যাঙের ছাতা) এর পানি চোখের রোগের প্রতিষেধক।

৫৭০৮ নবী সা বলেছেন- ছত্রাক এক প্রকারের শিশির থেকে হয়ে থাকে। আর এর রস চোখের আরোগ্যকারী।

৫৭৭৬ নবী সা বলেনঃ **রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই**।

৫৭১৭ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **রোগের কোন সংক্রমণ নেই**। তখন এক বেদুঈন বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমার উটের এ অবস্থা কেন হয়? কোনো চর্মরোগাগ্রস্ত উট এসে সেগুলোর পালে ঢুকে পড়ে এবং এগুলোকেও চর্ম রোগে আক্রান্ত করে ফেলে। নবী সা বললেনঃ তাহলে প্রথমটিকে চর্ম রোগাক্রান্ত কে করেছে?

৫৭৭০ নবী সা বলেনঃ রোগের মধ্যে কোন সংক্রমণ নেই। তখন এক বেদুঈন বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে যে উট পাল মরুভূমিতে থাকে, হরিণের মত তা সুস্থ ও সবল থাকে। উটের পালে একটি চর্মরোগওয়ালা উট মিশে সবগুলোকে চর্মরোগগ্রস্ত করে দেয়? রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ তবে প্রথম উটটির মধ্যে কীভাবে এ রোগ সংক্রামিত হল?

৫৭৭৪ আবূ সালামাহ (রহ.) বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে শুনেছি, নবী সা বলেছেনঃ রোগাক্রান্ত উট নীরোগ উটের সাথে মিশ্রিত করবে না।

৫৭০৭ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ রোগের কোন সংক্রমণ নেই। তোমরা কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে তুমি বাঘ থেকে দূরে থাক।

৫৭৫৩ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **ছোঁয়াচে** ও শুভ-অশুভ **বলতে কিছু নেই**। অমঙ্গল তিন বস্তুর মধ্যে স্ত্রীলোক, গৃহ ও পশুতে।

৫৭৭২ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই। অশুভ কেবল ঘোড়া,নারী ও ঘর এ তিন জিনিসের মধ্যেই রয়েছে।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), ২৩/ চিকিৎসা

৩৯১২। আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই**।

সুনান আবূ দাউদ (ইফা)

৩৮৭২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **কোন রোগই ছোঁয়াচে নয়**।

৫৭২১ আনাস (রা.) বলেনঃ আমাকে পাঁজর ব্যথা রোগের কারণে রাসূলুল্লাহ সা এর জীবিত কালে আগুন দিয়ে দাগ দেয়া হয়েছিল। আর আবূ ত্বালহা (রাঃ) আমাকে দাগ দিয়েছিলেন।

৬৩৪৯ খাব্বাব (রা.) লোহা গরম করে শরীরে সাতবার দাগ দিয়েছিলেন।

৫৭২৩ পরিচ্ছেদঃ জ্বর হল জাহান্নামের উত্তাপ।

নবী সা বলেছেনঃ **জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়**। কাজেই তাকে পানি দিয়ে নিভাও।

৫৭২৫ নবী সা বলেছেনঃ **জ্বর হয় জাহান্নামের তাপ থেকে**। কাজেই তোমরা পানি দিয়ে তা ঠান্ডা কর।

৫৭২৪ আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.)-এর নিকট যখন কোন জ্বরে আক্রান্ত স্ত্রীলোকদেরকে নিয়ে আসা হত , তখন তিনি পানি হাতে নিয়ে সেই স্ত্রীলোকটির জামার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন এবং বলতেনঃ রাসূলুল্লাহ সা আমাদের নির্দেশ করতেন, আমরা যেন পানির সাহায্যে জ্বরকে ঠান্ডা করি।

৫৭৩৩ নবী সা বলেনঃ উদরাময় রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ।

৫৭২০ আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ সা আনসারদের এক পরিবারের লোকদের বিষাক্ত দংশন ও কান ব্যথার কারণে **ঝাড়ফুঁক** গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দেন।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৩৮৮৭। আশ-শিফা বিনতু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একদা আমি হাফসাহ (রা) এর নিকট ছিলাম, তখন নবী সা আমার নিকট এসে বললেনঃ তুমি হাফসাকে যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, সেখাবে **পোকা কামড়ের ঝাড়ফুঁক** শিক্ষা দাও না কেন।

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)
পরিচ্ছদঃ চোখলাগা, পার্শ্বঘা, দুরাবস্থা, **বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া হতে মুক্তির জন্য ঝাড়ফুক করা মুস্তাহাব**
৫৬২০। **রসূলুল্লাহ সা সাপের ছোবলে আক্রান্ত রোগীর ঝাড়ফুঁকের অনুমতি দেন। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একটি বিছা আমাদের এক লোককে ছোবল দিল। আমরা সেথায় রসূলুল্লাহ সা এর সাথে বসা ছিলাম। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে ঝেড়ে দেই? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন লোক যদি তার ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন তা করে।**

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), ২৩/ চিকিৎসা
৩৮৮৪। ইবনু হুসাইন (রা) বলেন, নবী সা বলেছেনঃ **বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের চিকিৎসায় ঝাড়ফুঁক দেয়া যায়**।

নবী মুহাম্মদের নযর, বদনযর এর কুসংস্কার

৫৭৩৯ উম্মু সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সা তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখলেন যে, তার চেহারা মলিন। তখন তিনি বললেনঃ **তাকে ঝাড়ফুঁক করাও, কেননা তার উপর নযর লেগেছে**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত),
পর্ব: চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক
৪৫৩১। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী সা বলেছেনঃ নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য।

৫৯৪৪ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **নযর লাগা প্রকৃত সত্য**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
৪৫৬০। আসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: হে রসূল! তাইয়্যার-এর সন্তানদের ওপর দ্রুত বদনযর লেগে থাকে। আমি কি তাদের জন্য ঝাড়ফুঁক করাব? নবী সা বললেনঃ হ্যাঁ, কেননা যদি কোন জিনিস তাকদীরের অগ্রগামী হতে পারত, তবে বদনযরই তার অগ্রগামী হত।

বদনজরের ইসলামি চিকিৎসা

নবী মুহাম্মদ যে শুধুমাত্র বদনজর লাগার মত অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন তাই নয়, তিনি এর চিকিৎসা হিসেবেও অত্যন্ত হাস্যকর, নোংরা এবং জঘন্য একটি পদ্ধতি দিয়ে গেছেন। সেই পদ্ধতিটি এমনই নোংরা যে, তা ভাষায় প্রকাশ করতেও ঘৃণা হয়। নবী মুহাম্মদ যার বদনজর লেগেছে তার পুরো শরীর, এমনকি গোপনাঙ্গ ধোয়া পানি দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে ধুইয়ে দিতে শিখিয়ে গেছেন। এতে নাকি বদনজর কেটে যায় !

মুয়াত্তা মালিক
বদনজর সংক্রান্ত অধ্যায়
পরিচ্ছেদঃ বদ নজরের প্রভাব হইতে মুক্তির জন্য
রেওয়ায়ত ২। .... এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সহল ইবনে হানীফ-এর কিছু খবর রাখেন কি? সে মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেছে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা বলিলেন, তুমি কি মনে করিতেছ যে, তাহাকে কেহ বদনজর দিয়াছে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আমর ইবন রবীআ বদনজর দিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা 'আমির ইবন রবী'আকে ডাকিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, তোমাদের কেহ নিজের মুসলিম ভাইকে কেন আহত করিতেছ? তুমি (بارك الله) কেন বলিলে না? এইবার তুমি তাহার জন্য গোসল কর। অতএব আমির হাত, মুখ, হাতের কনুই, হাটু, পায়ের আশেপাশের স্থান এবং **লুঙ্গির নিচের আবৃত দেহাংশ ধৌত করিয়া ঐ পানি একটি বরতনে জমা করিল**। সেই পানি সহলের দেহে ঢালিয়া দেওয়া হইল।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক
৪৫৬২। ...... জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি সাহল ইবনু হুনায়ফ-এর জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন? আল্লাহর কসম! সে তো তার মাথা উঠাতে পারছে না। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি কাউকেও তার সম্পর্কে অভিযুক্ত করো? লোকেরা বলল : আমরা 'আমির ইবনু রবী'আহ্-এর ওপর সন্দেহ করি।
বর্ণনাকারী বলেনঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ সা 'আমিরকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করে বললেনঃ বদনযর একটি সত্য ব্যাপার। তুমি তার জন্য কল্যাণের দু'আ করলে না কেন? **তুমি তোমার শরীরের কিছু অঙ্গ সাহল-এর জন্য ধুয়ে দাও।** তখন 'আমির নিজের মুখমণ্ডলে, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত, উভয় পা হাঁটু হতে অঙ্গুলির পার্শ্ব এবং **ইযারের ভিতরের অঙ্গ ধুয়ে পানিগুলো একটি পাত্রে নিলেন, অতঃপর সে পানি সাহল-এর উপর ঢেলে দেয়া হলো**।

৫৭৮১ ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন যে, আমি এ আবূ ইদরীস(রহ.)-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, উটের পেশাব পান করা বৈধ কিনা? তিনি বলেছেনঃ আগেকার মুসলিমগণ **উটের প্রস্রাবের সাহায্যে চিকিৎসার কাজ করতেন এবং এটা তারা কোন পাপ মনে করতেন না**।

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)
৪২৪৬। উকল গোত্রের আটজনের একটি দল রসূলুল্লাহ সা এর নিকট আসলো। **তারা রসূলুল্লাহ সা এর কাছে ইসলামের উপর বাই'আত করল। অতঃপর মাদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূল হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে** এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সা এর নিকট অভিযোগ করল। **নাবী সা বললেনঃ তোমরা কি আমাদের রাখালের সাথে গমন করে উটের মূত্র এবং দুগ্ধ পান করতে পারবে? তখন তারা বলল, জী হ্যাঁ**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
৩৫৩৯। আনাস (রা) বলেন, নবী সা এর নিকট উকল সম্প্রদায়ের কিছু লোক উপস্থিত হলো। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মাদীনার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুপযোগী হলো। **নবী সা তাদেরকে উটনীর নিকট গিয়ে তার** দুধ ও **প্রস্রাব পানের নির্দেশ দিলেন**।

The urine of camels as medicine (islamweb.net)

https://www.islamweb.net/en/fatwa/93051/the-urine-of-camels-as-medicine

> The urine of camels as medicine
> Fatwa No: 93051
> The Prophetic narration which you mentioned in the question is authentic and is reported by Al-Bukhari, Muslim and others may Allaah have mercy upon them.
> The narration is proves the permissibility of drinking the urine of camels and that it is a beneficial medicine. Moreover, some doctors stated this fact as well, like Ibn Seenaa may Allaah have mercy upon him in his book entitled "Al-Qaanoon (The Law (of medicine))".
> The urine of camels and that of cows is pure; and this is the view of the majority of the scholars may Allaah have mercy upon them.
> Similarly, the urine and dung of animals which we are allowed to eat their meat, is pure as stated by the scholars may Allaah have mercy upon them.

৫৭৬৮,৭৯ নবী সা বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালবেলায় সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, ঐ দিন রাত অবধি কোন বিষ তার কোন ক্ষতি করবে না।**

কোনো মুমিন ব্যক্তিকে প্রতিদিন সকালবেলায় সাতটি আজওয়া খেজুর খাইয়ে black mamba সাপের ছোবল খেতে বলেন, সে যদি আতংকিত হয় বিষের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে, তার ঈমান ওখানেই শেষ। আর এই হাদিসটি নতুন করে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার কিছু নেই। স্বয়ং নবীই বিক্রিয়াই ভুগেছেন জীবনের পুরো শেষ সময় জুড়ে।

সুনান আত তিরমিজী (ইফা), ৩১/ চিকিৎসা, পরিচ্ছেদঃ আজওয়া খেজুর ও মাসরুম।

২০৭২। আবূ হুরায়রা রা বলেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **আজওয়া হলো জান্নাতী খেজুর। এতে আছে বিষের প্রতিষেধক**, আর **মাসরুম এর পানি হলো চক্ষু রোগের প্রতিষেধক।**

৩৪৮৫ নবী সা বলেছেন, এক ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারের সাথে লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এই অবস্থায় তাকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হল এবং **কিয়ামত পর্যন্ত সে এমনি অবস্থায় নীচের দিকেই যেতে থাকবে।**

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

৫৮৩৩। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আমি মাক্কায় একটি পাথরকে জানি, যে আমার নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার আগেও আমাকে সালাম করত; আমি এখনও তাকে চিনতে পারি।

আল-লুলু ওয়াল মারজান, পরিচ্ছেদঃ নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়িয।

১৯৪. আবূ হুরায়রাহ্ (রা) বলেন, নবী সা বলেছেনঃ বনী ইসরাঈলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করতো। কিন্তু মূসা (আঃ) একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাঈলের লোকেরা বলাবলি করছিল, মুসা 'কোষবৃদ্ধি' রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মূসা (আ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। **পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল**। তখন মূসা (আ) 'পাথর! আমার কাপড় দাও,' 'পাথর! আমার কাপড় দাও' বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বনী ইসরাঈল মূসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম মূসার কোন রোগ নেই। মূসা (আ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন।

১৪৮২ রাসূল সা বলেনঃ **উহুদ পর্বত আমাদেরকে ভালবাসে** এবং আমরাও তাকে ভালবাসি।

সুনান ইবনু মাজাহ

পরিচ্ছেদঃ হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা

২৯৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উপস্থিত করা হবে। তার দু'টি চোখ থাকবে, তা দিয়ে সে দেখবে, যবান থাকবে তা দিয়ে সে কথা বলবে এবং সে এমন লোকের অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে যে তাকে সত্যতার সাথে চুমা দিয়েছে।

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)

৯৬১। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা হাজরে আসওয়াদ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ! এই পাথরকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, এর দুটি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে।

সুনান আদ-দারেমী

২৩। আনাস (রা), রাসূলুল্লাহ সা সূত্রে বর্ণনা করেন- একদা রাসূলুল্লাহ সা ভারাক্রান্ত মনে বসে ছিলেন, এমতাবস্থায় জিবরীল আ তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি চান আমি আপনাকে কোন নিদর্শন দেখাই? তিনি বললেন: 'হ্যাঁ'। তখন জিবরীল আ পিছনের একটি গাছের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি একে ডাকুন। তখন তিনি গাছটিকে ডাকলেন আর সেটি চলে আসল এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তিনি (জিবরীল) বললেন, আপনি একে ফিরে চলে যেতে নির্দেশ দিন। তখন তিনি একে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেটি আপন স্থানে ফিরে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সা সাল্লাম বললেন: "এ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, এ-ই আমার জন্য যথেষ্ট।

২৩২৪ নবী সা বলেন- এক ব্যক্তি একটি গরুর উপর সাওয়ার ছিল, তখন **গরুটি সে ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে বলল, আমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে চাষাবাদ তথা ক্ষেতের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।** এশুনে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ্! গরুও কথা বলে? নবী সা বললেন- আমি, আবূ বকর ও উমার এটা বিশ্বাস করি।

আরো বললেন, এক নেকড়েবাঘ একটি বকরী ধরেছিল, রাখাল তাকে ধাওয়া করল। **নেকড়েবাঘটা তাকে বলল, সেদিন হিংস্র জন্তুর প্রাধান্য হবে, যেদিন আমি ছাড়া কেউ তার রাখাল থাকবে না, সেদিন কে তাকে রক্ষা করবে?** লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! চিতা বাঘ কথা বলে! নবী সা বললেন- **আমি, আবূ বকর ও উমার এটা বিশ্বাস করি**।

৫৬৫ মধ্যাহ্ন গড়ালেই রাসূল সা যুহরের নামাজ আদায় করতেন এবং সূর্য সতেজ থাকতে আসরের নামাজ আদায় করতেন। আর সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবার সাথে সাথে মাগরিবের নামাজ আদায় করতেন। ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন। **৫৮১** রাসূল সা ফজরের পর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন। **৫২৯৭** রাসূলুল্লাহ সা পূর্বদিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেনঃ যখন তোমরা ওদিক থেকে রাত্রি নেমে আসতে দেখবে, তখন রোযাদার ইফতার করবে।

৭৪৮ নবী সা এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি এজন্য সালাত আদায় করেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল! সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনাকে দেখলাম যেন কিছু একটা ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে দেখলাম, আবার পিছিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমাকে জান্নাত দেখানো হয় এবং তারই একটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে যাচ্ছিলাম। আমি যদি তা নিয়ে আসতাম, তাহলে দুনিয়া স্থায়ী থাকা পর্যন্ত তোমরা তা হতে খেতে পারতে।

৫১৬৫,৭৩৯৬ নবী সা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌনসঙ্গম করে, তখন যেন সে বলে, -আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ।

এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে যে বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।

৩২৮৬ নবী সা বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় **তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার দুই আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে**। তবে ঈসা (আ.)-এর ব্যতিক্রম।

৩৪৩১,৪৫৪৮ রাসূল সা বলেছেন- **জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই প্রত্যেক সন্তান চিৎকার করে কাঁদে।**

৬২২৩ নবী সা বলেনঃ আল্লাহ হাঁচি দেয়া পছন্দ করেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। আর হাই তোলা, শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, তাই যথাসম্ভব তা রোধ করা উচিত।

৩২৮৯ নবী সা বলেছেন, **হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হাই' তুলার জন্য হা করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।**

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

৯৮৫। রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ 'হাই' দেয়ার সময় শয়তান মুখে ঢুকে যায়।

৩২৮০ নবী সা বলেছেন, সূর্যাস্তের পরপরই যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে।

অতঃপর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার।

৩৩০৩ নবী সা বলেছেন, **'যখন তোমরা যখন গাধার ডাক শুনবে তখন শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, কেননা এ গাধাটি শয়তান দেখেছে।'**

৬৯৮৩ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ নেককার লোকের ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। [নবী ভিন্ন সাধারণ মানুষের কাছে ওহী আসে না, কিন্তু নেককার মানুষকে ভাল স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যা আল্লাহ জানাতে চান। এটা নবুওতের ক্ষুদ্র একটা অংশ।]

৬৯৮৫ নবী সা বলেছেনঃ যেখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাই সে যেন এ জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং অন্যের কাছে তা বর্ণনা করে। আর যদি অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। তাই সে যেন এর ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়। আর কারো কাছে যেন তা বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

৬৯৯৫ নবী সা বলেনঃ খারাপ স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে। কেউ যদি স্বপ্নে কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, সে যেন বামদিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

১২২১। নবী সা এর সম্মুখে এক লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তাঁকে বলা হলো, লোকটি সকাল পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে থাকে, সলাতের জন্যে উঠে না। নবী সা বললেন, এ লোকের দু'কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।

৩২৯৫ নবী সা বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে উঠল এবং উযূ করল তখন তার উচিত নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা। কারণ, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে।

সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ)

৩৭৩৪। নবী সা বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে খায় এবং পান করে। কেননা, **শয়তান বাম হাতে খায় এবং পানি পান করে।**

৩৩০৫ নবী সা বলেন, বনী ইসরাঈলের একদল লোক নিখোঁজ হয়েছিল। কেউ জানে না তাদের কী হলো আর **আমি তাদেরকে ইঁদুর বলেই মনে করি। কেননা তাদের সামনে যখন উটের দুধ রাখা হয়, তারা তা পান করে না, আর যখন তাদের সামনে ছাগলের দুধ রাখা হয় তখন তারা তা পান করে।**

সহীহ মুসলিম (ইফা)

পরিচ্ছদঃ বিকৃত প্রাণী হওয়া প্রসঙ্গ

৭২২৭। আবূ হুরায়রা (রা) নবী সা সূত্রে বর্ণনা করেন, **ইঁদুর মানুষের বিকৃত প্রাণী**। এর নিদর্শন হচ্ছে এই যে, এদের সামনে বকরীর দুধ রাখা হলে তাঁরা তা পান করে, আর উষ্ট্রীর দুধ রাখা হলে তাঁরা তাঁর একটু স্বাদ গ্রহন করেও দেখেনা।

আল কোরআন ৫:৬০। যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের **কতককে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন**।

৩২৬৮ আয়িশাহ (রা.) বলেন, নবী সা কে যাদু করা হয়েছিল। এমনকি যাদুর প্রভাবে তাঁর খেয়াল হতো যে, তিনি স্ত্রীগণের বিষয়ে কোন কাজ করে ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেননি। তিনি রোগ আরোগ্যের জন্য বারবার দু'আ করলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন- "তুমি কি জান আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের আরোগ্য আছে? আমার নিকট দুজন লোক আসল। অতঃপর একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করল, এ ব্যক্তির রোগটা কী? লোকটি জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম লোকটি বলল, তাকে যাদু কে করল? সে বলল, লবীদ ইবনু আসাম। প্রথম ব্যক্তি বলল, কিসের দ্বারা? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তাকে যাদু করা হয়েছে, চিরুনি, সুতার তাগা এবং খেজুরের খোসায়। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, যারওয়ান কূপে "।

তখন নবী সা সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, **কূপের কাছের খেজুর গাছগুলো যেন এক একটা শয়তানের মাথা**। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, **আপনি কি সেই যাদু করা জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন? তিনি বলেন- "না। আমার আশংকা হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে।"**

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) ৫৫১৫। .... আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাহলে আপনি তা জনসমক্ষে আনলেন না কেন? তিনি বললেন, আমি তা সমীচিন মনে করিনি। কারণ, আমাকে তো আল্লাহ আরোগ্য করেছেন আর মানুষকে কোন অকল্যাণে উত্তেজিত করা আমি পছন্দ করিনি।

৩২৩২ নাবী সা- জিব্রাঈল (আ) কে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল।

৩৩২৬ নবী সা বলেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। তবে আদম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপে এসেছে।

২০৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সমগ্র পৃথিবী থেকে সংগৃহীত এক মুঠো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। তাই মাটি অনুপাতে আদমের সন্তানদের কেউ হয় সাদা, কেউ হয় গৌরবর্ণ, কেউ হয় কালো, কেউ মাঝামাঝি বর্ণের। আবার কেউ হয় নোংরা, কেউ হয় পরিচ্ছন্ন, কেউ হয় কোমল, কেউ হয় পাষাণ, কেউ বা এগুলোর মাঝামাঝি।

সুদ্দী (র) ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন মাসউদ (রা)-সহ কতিপয় সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিছু কাদামাটি নেয়ার জন্য জিবরাঈল (আ)-কে যমীনে প্রেরণ করেন। তিনি এসে মাটি নিতে চাইলে যমীন বলল, তুমি আমার অঙ্গহানি করবে বা আমাতে খুঁত সৃষ্টি করবে; এ ব্যাপারে তোমার নিকট থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। ফলে জিবরাঈল (আ) মাটি না নিয়ে ফিরে গিয়ে বললেন, হে আমার রব! যমীন তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করায় আমি তাকে ছেড়ে এসেছি।

এবার আল্লাহ্ তা'আলা মীকাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেন। যমীন তাঁর নিকট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করে বসে। তাই তিনিও ফিরে গিয়ে জিবরাঈল (আ)-এর মতই বর্ণনা দেন। এবার আল্লাহ্ তা'আলা মালাকুল মউত (আ) বা মৃত্যুর ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন। যমীন তার কাছ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, আর আমিও আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ বাস্তবায়ন না করে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তার পানাহ্ চাই। এ কথা বলে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সাদা, লাল ও কালো রঙের কিছু মাটি সংগ্রহ করে মিশিয়ে নিয়ে চলে যান। এ কারণেই আদম (আ)-এর সন্তানদের এক একজনের রঙ এক এক রকম হয়ে থাকে।

আজরাঈল (আ) মাটি নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা মাটিগুলো ভিজিয়ে নেন। এতে তা আটালো হয়ে যায়। তারপর ফেরেশতাদের উদ্দেশে তিনি ঘোষণা দেন ঃ

إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُوْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ .

অর্থাৎ— কাদামাটি দ্বারা আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ্ সঞ্চার করব; তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো। (১৫ ঃ ২৮)

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, যাতে ইবলীস তার ব্যাপারে অহংকার করতে না পারে। তারপর মাটির তৈরি এ মানব দেহটি থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যা জুম'আর দিনের অংশ বিশেষ ছিল[১] একইভাবে পড়ে থাকে। তা দেখে ফেরেশতাগণ ঘাবড়ে যান। সবচাইতে বেশি ভয় পায় ইবলীস। সে তাঁর পাশ দিয়ে আনাগোনা করত এবং তাঁকে আঘাত করত। ফলে দেহটি ঠনঠনে পোড়া মাটির ন্যায় শব্দ করত। এ কারণেই মানব সৃষ্টির উপাদানকে صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ তথা পোড়ামাটির ন্যায় ঠনঠনে মাটি বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর ইবলীস তাঁকে বলত, তুমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছ।

আদম! এটা তোমার এবং তোমরা বংশধরের অভিবাদন। আদম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার রব! আমার বংশধর আবার কি? আল্লাহ্ বললেন ঃ আদম! তুমি আমার দু'হাতের যে কোন একটি পছন্দ কর। আদম (আ) বললেন, আমি আমার রব্বের ডান হাত পছন্দ করলাম। আমার রব-এর উভয় হাতই তো ডান হাত— বরকতময়।

এবার আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতের তালু প্রসারিত করলে আদম (আ) কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর সকল সন্তানকে আল্লাহ্র হাতের তালুতে দেখেতে পান।

তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পিঠে হাত বুলান। সাথে সাথে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর সবক'টি সন্তান তাঁর পিঠ থেকে ঝরে পড়ে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রত্যেকের দু'চোখের মাঝে একটি করে নূরের দীপ্তি স্থাপন করে দিয়ে তাদেরকে আদম (আ)-এর সামনে পেশ করেন। তখন আদম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার রব! এরা কারা? আল্লাহ্ বললেন, এরা তোমার সন্তান-সন্ততি।

ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যথা সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তার ডান কাঁধে আঘাত করে মুক্তার ন্যায় ধবধবে সাদা তাঁর একদল সন্তানকে বের করেন। আবার তাঁর বাম কাঁধে আঘাত করে কয়লার ন্যায় মিশমিশে কালো একদল সন্তানকে বের করে আনেন। তারপর ডান পাশের গুলোকে বললেন, তোমরা জান্নাতগামী, আমি কারো পরোয়া করি না। আর বাম কাঁধের গুলোকে বললেন, তোমরা জাহান্নামগামী , আমি কারো পরোয়া করি না।

"উপরোক্ত সব ক'টি হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর সন্তানদের তাঁরই পিঠ থেকে ছোট ছোট পিঁপড়ার মত বের করে এনেছেন এবং তাদেরকে ডান ও বাম এ দু'দলে বিভক্ত করে ডান দলকে বলেছেন, তোমরা জান্নাতী, আমি কাউকে পরোয়া করি না। আর বাম দলকে বলেছেন, তোমরা জাহান্নামী, আমার কারো পরোয়া নেই।"

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আদম (আ)-এর উচ্চতা ছিল ষাট হাত আর প্রস্থ সাত হাত।

ইবনে জারীর (র) বলেন, এটা জানা কথা যে, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে জুম'আ দিবসের শেষ প্রহরে। আর তথাকার এক প্রহর দুনিয়ার তিরাশি বছর চার মাসের সমান। এতে প্রমাণিত হয় যে, রূহ সঞ্চারের পূর্বে মাটির মূর্তিরূপে আদম (আ) চল্লিশ বছর এমনিতেই পড়ে রয়েছিলেন। আর পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বে জান্নাতে অবস্থান করেছেন তেতাল্লিশ বছর চার মাস কাল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইবনে জারীর (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! আমার আরশ বরাবর পৃথিবীতে আমার একটি সম্মানিত স্থান আছে। তুমি গিয়ে তথায় আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে তা তাওয়াফ কর, যেমনটি ফেরেশতারা আমার আরশ তাওয়াফ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি আদম (আ)-কে জায়গাটি দেখিয়ে দেন এবং তাকে হজ্জের করণীয় কাজসমূহ শিখিয়ে দেন। ইবনে জারীর (র) আরো উল্লেখ করেন যে, দুনিয়ার যেখানে সেখানে আদম (আ)-এর পদচারণা হয়, পরবর্তীতে সেখানেই এক একটি জনবসতি গড়ে ওঠে।

উল্লেখ্য যে, প্রতি দফায় আদম (আ)-এর এক সঙ্গে একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিত। আর এক গর্ভের পুত্রের সঙ্গে পরবর্তী গর্ভের কন্যার ও কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়। পরবর্তীতে একই গর্ভের দু'ভাই-বোনের বিবাহ

রিয়াযুস স্বা-লিহীন

১৮৫৫। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, "জিন জাতিকে **সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে**। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

৩৮৬০ নবী সা বলেন- **হাড় ও গোবর হচ্ছে জ্বীনের খাবার**।

১২২২ রাসূল সা বলেছেনঃ সালাতের আযান হলে শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে সে আযান শুনতে না পায়। তখন তার **পশ্চাদ-বায়ু নিঃসরণ হতে থাকে**। [শয়তান আগুনের তৈরী- কোরআন ৫৫/১৫]

সহীহ বুখারী (ইফা)

১১৫৯। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে আযান শুনতে না পায় আর তার পশ্চাদ-বায়ু **সশব্দে** নির্গত হতে থাকে।

বুখারী ৬০৮ নং, মুসলিম, আবূদাঊদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, দারেমী, সুনান, মালেক, মুঅত্তা, আহমাদ, মুসনাদ ২/৩১৩

নবী (সা) বলেন, "নামাযের জন্য আযান দেওয়া হলে শয়তান পাদতে পাদতে এত দূরে পালায়, যেখানে আযান শোনা যায় না।

৬২১৩ কয়েকজন লোক নবী সা এর নিকট গণকদের(জ্যোতিষী) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ ওরা কিছুই না। তারা আবার বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো কোন সময় এমন কথা বলে দেয়, যা বাস্তবে ঘটে যায়। নবী সা বললেনঃ কথাটি জিন থেকে পাওয়া। জিনেরা তা আসমানের ফেরেশতাদের থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে এসে তাদের বন্ধু গণকদের কানে তুলে দেয়।

৪৭০১ নবী সা বলেছেন, যখন আল্লাহ আসমানে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ফেরেশতারা তাঁর কথা শোনার জন্য অতি বিনয়ের সঙ্গে নিজ নিজ পালক ঝাড়তে থাকে। এভাবে আল্লাহ তাঁর বাণী ফেরেশতাদেরকে পৌঁছান। শায়তানরা চুরি করে কান লাগিয়ে তা শুনে নেয়। শোনার জন্য শায়ত্বনগুলো একের ওপর এক এভাবে থাকে। আঙ্গুলের ওপর অন্য আঙ্গুল রেখে হাতের ইশারায় ব্যাপারটি প্রকাশ করলেন। তারপর কখনও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে এ কথাটি পৌঁছানোর আগেই আঘাত করে এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনও সে ফুলকি প্রথম শ্রবণকারী শায়ত্বন পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই সে তার নিচের সাথীকে খবরটি জানিয়ে দেয়। এমনি করে এ কথা পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। তারপর তা জ্যোতিষীদের কানে ঢেলে দেয়। তাই তার কথা সত্য হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলতে থাকে, এ জ্যোতিষী আমাদের কাছে অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছিল। বস্তুত আসমান থেকে শুনে নেয়ার কারণেই আমরা তা সত্যরূপে পেয়েছি।

৩২১০ রাসূল সা বলেন- ফেরেশতামন্ডলী মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশের ফায়সালাসমূহ আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শুনেও ফেলে। অতঃপর তারা সেটা জ্যোতিষীর নিকট পৌঁছে দেয়।

৩২৮৮ নবী সা বলেছেন, ফেরেশতামন্ডলী মেঘের মাঝে এমন সব বিষয় আলোচনা করেন, যা পৃথিবীতে ঘটবে। তখন শয়তানেরা দু একটি কথা শুনে ফেলে এবং তা জ্যোতিষদের কানে ঢেলে দেয়।

রিয়াযুস স্বা-লিহীন

১৮৫১। রসূল সা বলেছেন, বাজারে শয়তান ডিম পাড়ে এবং ছানা জন্ম দেয়।

৭০৫৯,৫২৯৩ একবার নবী সা রক্তবর্ণ চেহারা নিয়ে ঘুম থেকে জাগলেন এবং বলতে লাগলেন, নিকটবর্তী এক দুর্যোগে আরব ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়াজূজ-মাজূজের (প্রতিরোধ) প্রাচীর আজ এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। এই বলে তিনি নব্বই কিংবা একশ’র রেখায় আঙ্গুল রেখে গিঁট বানিয়ে দেখালেন।

৩৩৩০ নবী সা বলেছেন- **বনী ইসরাঈল যদি না হত তবে মাংস দুর্গন্ধময় হতো না।** [বনী ইসরাঈল আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে সালওয়া নামক পাখীর গোশত খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পেত। তা সত্ত্বেও তা জমা করে রাখার ফলে গোশত পচনের সূচনা হয়।]

বুখারী শরীফ (৬)—৪

১. মূসা (আ)-এর সময় বনী ইসরাঈল আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করে 'সালওয়া' নামক এক প্রকার পাখীর গোশত জমা করা শুরু করে। ফলে এ জমাকৃত গোশতে পচন ধরে। এ ঘটনা থেকেই গোশতে পচনের সূত্রপাত হয়।

সহীহ বুখারী (ইফাঃ) ৩১৬০।

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, **যদি বনী ইসরাঈল না হত, তবে মাংসে পচন ধরত না (meat would not decay)**। ।

৩৪৩৬ নবী সা বলেন, তিনজন শিশু ছাড়া আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। প্রথম জন ঈসা (আঃ), দ্বিতীয় জন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি।

৩৪৬৬ রাসূল সা বলেন, একদা একজন মহিলা তার কোলের শিশুকে স্তন্য পান করাচ্ছিল। এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার তাদের নিকট দিয়ে গমন করে। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ্! আমার পুত্রকে এই ঘোড়সওয়ারের মত না বানিয়ে মৃত্যু দান করো না।
তখন কোলের শিশুটি বলে উঠলো- হে আল্লাহ্! আমাকে ঐ ঘোড়সওয়ারের মত করো না, এই বলে পুনরায় সে স্তন্য পানে লেগে গেল।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
২৩২১। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **কৃষি সরঞ্জাম যে সম্প্রদায়ের ঘরে প্রবেশ করে, আল্লাহ সেখানে অপমান প্রবেশ করান**।

৫৪২৯ রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **ভ্রমণ হলো আযাবের একটা টুকরা**, যা তোমাদের **ভ্রমণকারীকে নিদ্রা ও আহার থেকে বিরত রাখে**।

৬৩২০ নবী সা বলেছেনঃ যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গির ভেতর দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, বিছানার উপর তার অনুপস্থিতিতে পীড়াদায়ক কোন কিছু আছে কিনা।

২৬৬৪ ইবনু উমার রা. বলেন- উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সা এর নিকট তাকে পেশ করা হল, তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক। তখন তিনি আমাকে যুদ্ধে গমনের অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধে আমাকে পেশ করা হল তখন আমি **পনের বছরে**র যুবক এবং তিনি অনুমতি দিলেন।
রাবী বলেন- খলীফা উমার ইবনু আবদুল আযীযের নিকট গিয়ে এ হাদীস শুনালাম। তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে **পুরুষদের জন্য প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়সের সীমারেখা**।

সহীহ বুখারী (ইফা)
১২৫৭। নবী সা বলেনঃ কবরে যারা কাফির তাদের দুই কানের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোরে আঘাত করা হবে, এতে সে চিৎকার করে উঠবে, মানুষ ও জ্বীন ব্যতীত তার আশেপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।
সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৪৭৫২। নবী সা বলেনঃ **মানব ও জ্বীন ছাড়া কবরের নিকট যারা থাকে সকলেই চিৎকার শুনতে পায়**।

↥

সুনান ইবনু মাজাহ

৪০১৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। যখন (কোন জাতি) যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। **যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না**।

করবে। যখন কোন জাতি তাদের ধন- সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন আসমানের বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুস্পদ জন্তু (গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ঘোড়া ইত্যাদি) না থাকতো, তাহলে আর বৃষ্টিপাত হতো না।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

পরিচ্ছেদঃ প্রাণহীন জিনিসের ছবি আঁকা

২২২৫। ....ইবনু আব্বাস (রা) তাঁকে বলেন, এ বিষয়ে রাসূল সা কে আমি যা বলতে শুনেছি, তাই তোমাকে শোনাব। যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরি করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। **গাছপালা এবং অন্য যে সকল জিনিসে প্রাণ নেই,** তার ছবি তৈরি করতে পার।

ইয়াজুজ-মাজুজ

৩৩৪৮ নবী সা বলেন, জাহান্নামী প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য হতে একজন আর এক হাজারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে। সহীহ মুসলিম (ইফা) ৪২৫।

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)

২২৪০। আল্লাহ ইয়াজুজ-মাজুজের দল পাঠাবেন। আল্লাহর বাণী অনুযায়ী, "তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে" (সূরাঃ আম্বিয়া-৯৬)। তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি সিরিয়ার তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। এদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, নিশ্চয়ই এই জলাশয়ে কোন সময় পানি ছিল। তারপর বাইতুল মাকদিসের পাহাড়ে পৌছার পর তাদের অভিযান সমাপ্ত হবে। তারপর ঈসা (আ) ও তার সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। তারা খাদ্যাভাবে এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে পতিত হবেন যে, তখন তাদের জন্য একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের একশত দীনারের চাইতে বেশি উত্তম মনে হবে। আল্লাহ তাআলা তখন ইয়াজুজ-মাজুজ বাহিনীর ঘাড়ে মহামারীরূপে নাগাফ নামক কীটের উৎপত্তি করবেন। তারপর ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন ঈসা (আ) তার সাথীদের নিয়ে পাহাড় হতে নেমে আসবেন। সেখানে তিনি এমন এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে না থাকবে।

সহীহ বুখারী (ইফা)

পরিচ্ছেদঃ ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘটনা। মহান আল্লাহর বাণীঃ নিশ্চয়ই ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারী (১৮: ৯৪) ২০০৭। মহান আল্লাহর বাণীঃ (হে নবী) তারা আপনাকে যুল কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তোমরা আমার কাছে লোহার পাতসমূহ নিয়ে আস। অবশেষে লোহার স্তুপ মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন দুটি পর্বতের সমান হল তখন তিনি লোকদের বললেন, তোমরা হাঁফরে ফুঁক দিতে থাক। যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হল, তখ তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা/সীসা নিয়ে আস। আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। এরপর ইয়াজুজ মাজুজ এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না অর্থাৎ তারা এর উপরে চড়তে সক্ষম হল না। তারা তা ছিদ্রও করতে পারল না। তিনি বললেন, এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে তখন তিনি এটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য, সে দিন তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিবেন এ অবস্থায় যে, একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে (১৮: ৯৬-৯৯)। এমন কি যখন ইয়াজুজ মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চ ভুমি থেকে ছুটে আসবে (২১: ৯৬।

সূরা আল-কাহাফ ৫০৩

৯৪. উহারা বলিল হে যুলকারনাইন ! ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে; আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে যে তুমি আমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবে?

৯৫. সে বলিল, আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। আমি তোমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়িয়া দিব।

৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহ পিন্ডসমূহ আনয়ন কর অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হইল। তখন সে বলিল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল তখন সে বলিল তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহা ঢালিয়া দেই উহার উপর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যোদয়ের স্থান ভ্রমণ শেষ করিয়া অন্য এক পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে প্রাচীরের ন্যায় দুইটি পাহাড়ের নিকট পৌছিলেন। দুই পাহাড়ের মাঝে একটি গিরীপথ ছিল এই গিরীপথের মাধ্যমেই ইয়াজুজ মাজুজ তুরকিস্তানে প্রবেশ করিত। তাহারা সেখানে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিত। ক্ষেত খামার জীবজন্তু ও ধ্বংস করিত এবং মানুষকে হত্যা করিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত তাহারা মানুষেরই একটি বিশেষ গোষ্ঠী। ইরশাদ হইয়াছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে আদম! তিনি বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি হাযির। আমি উপস্থিত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, দোযখের অংশ আপনি পৃথক করিয়া রাখুন। তিনি বলিবেন, দোযখের অংশ কি পরিমাণ? তিনি বলিলেন প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই তো দোযখে প্রবেশ করিবে এবং একজন বেহেশতে। এই সময় আতঙ্কগ্রস্ত শিশু বৃদ্ধ হইবে এবং গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তোমাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে তাহারা যেই দিকে থাকিবে তাহাদের সংখ্যাই হইবে অধিক। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ।

......

قوله وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا এবং যুলকারনাইন প্রাচীর দুইটির নিকটবর্তী এলাকায় এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইলেন যাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইবে দূরে ছিল এবং তাহাদের ভাষা ছিল আজমী এই কারণে তাহারা যুলকারনাইনের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইতেছিল না। قَالُوا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا তাহারা বলিল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ মাজুজ দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছে অতএব প্রাচীর নির্মাণের জন্য কি আপনার জন্য আমরা খাজনা ধার্য করিয়া দিব। ইবনে

......

↥

তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করিলাম" আয়াতটি দ্বিতীয় মতের সমর্থন করে। গলিত তামা ঢালিয়া দেওয়ার পর যখন উহা ঠাণ্ডা হইয়া গেল তখন উহা সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিণত হইল এবং সজ্জিত চাদরের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

ইবনে জরীর (র) বলেন, বিশ্‌র ইবনে ইয়াযীদ....কাতাদা হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, বলতো উহা কেমন? সে বলিল, নকশা করা চাদরের ন্যায়। উহাতে লাল কালো নকশা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ঠিক দেখিয়াছ হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত।

একবার খলীফা ওয়াসিক তার রাজত্বকালে বহু সাজ-সরঞ্জাম দিয়া একটি সেনাবাহিনীসহ তাহার মন্ত্রী পরিষদের কয়েকজনকে প্রাচীরের খবর লইতে প্রেরণ করিলেন যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার নিকট উহার সঠিক তত্ত্ব জানাইতে পারে। তাহারা রওয়ানা হইলেন এবং শহরের পর শহর দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া প্রাচীরের নিকট পৌছলেন। এবং লোহা তামা দ্বারা নির্মিত প্রাচীরটি দেখিতে পাইলেন। তাহারা বর্ণনা করিয়াছে যে তাহারা প্রাচীরের একটি মস্ত বড় দরজা এবং উহাতে বিরাট একটি তালা ঝুলিতে দেখিয়াছে। প্রাচীরে ব্যবহৃত ইটের অবশিষ্ট ইট একটি বুরুজের মধ্যে রহিয়াছে। তথায় পাহারার জন্য একটি চৌকিও আছে। প্রাচীরটি অতিশয় উঁচু। কোন উপায়েই উহার উপর আরোহণ করা সম্ভব নহে। আর সেই সকল পাহাড়ে আরোহণ করাও সম্ভব নহে যাহা প্রাচীরের উভয় পার্শ্বে দূর দূরান্ত পর্যন্ত অবস্থিত। ইহা ছাড়া তারা আরো বহু আশ্চার্যজনক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা দুই বৎসর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

৯৭. ইহার পর তাহারা উহা অতিক্রম করিতে পারিল না বা ভেদ করিতেও পারিল না। উহাতে ছিদ্র করিতেও পারিল না।

৯৮. সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহারা যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয় নাই এবং উহাকে ছিদ্র করিয়া উহা ভেদ করিতেও সক্ষম হয় নাই। ইরশাদ হইয়াছে فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا তাহারা প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয় নাই আর উহাতে ছিদ্রও করিত পারে নাই।

আয়াতটি এই কথারই প্রমাণ যে ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরে একটুও ছিদ্র করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ্ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন, ইয়াজুজ মাজুজ প্রত্যহ প্রাচীরটিকে ছিদ্র করিতে চেষ্টা করে এমন কি তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া সূর্যের কিরণ দেখিবার কাছাকাছি হয় তখন তাহাদের নেতা তাহাদিগকে বলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও, আগামীকল্য আমরা উহা ভেদ করিয়া যাইব। পুনঃরায় তাহারা উহা ছিদ্র করিতে আসিলে প্রাচীরটিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক মযবুত পায়। অবশেষে তাহাদের সময় যখন শেষ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বাহির করিতে ইচ্ছা করিবেন তখন তাহারা একদিন ছিদ্র করিতে করিতে সূর্যের আলো দেখিবার উপক্রম হইবে তখন তাহাদের নেতা বলিবে তোমরা ফিরিয়া যাও, ইনশাআল্লাহ আগামী কল্য উহা ছিদ্র করিয়া ফেলিব। পরদিন আসিয়া তাহারা দেখিবে প্রাচীরটি তেমনি রহিয়াছে যেমন তারা রাখিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাহারা সমস্ত নদ-নদীর পানি পান করিয়া শেষ করিবে এবং মানুষ তাহাদের ভয়ে কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে এবং এমনি অবস্থায় উহা প্রত্যাবর্তন করিবে যেন উহা রক্ত মিশ্রিত রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিবে আমরা পৃথিবীকে জয় করিয়া আসমানও বিজয় করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের ঘাড়ে ফোঁড়া বাহির হইবে এবং সকলেই মৃত্যু বরণ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন,

....

↥

মুনকার। কারণ, আয়াত দ্বারা প্রকাশ, ইয়াজুজ মাজুজ না তো প্রচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে এবং প্রাচীরটি অত্যধিক মযবুত দৃঢ় হইবার কারণে উহাতে ছিদ্র করিতেও সক্ষম হইবে না। কিন্তু কা'ব আহবার হইতে বর্ণিত, ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরের নিকট আসিয়া উহাতে ছিদ্র করিবার চেষ্টা করিত থাকে এমন কি উহাতে ছিদ্র হইতে অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তাহারা বলেন চল ফিরিয়া যাই আগামী কল্য আসিয়া ভেদ করিয়া ফেলিব। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আসিয়া তাহারা দেখে যে, উহা পূর্বের মত হইয়া আছে। অতঃপর তাহারা পুনরায় আবার ছিদ্র করিতে থাকে এবং অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে তাহারা ঠিক সেই কথা বলে যাহা প্রথম দিন বলিয়াছিল। অতঃপর তাহারা পর দিন আসিয়াও দেখে যে উহা পূর্বের ন্যায় মযবুত হইয়া আছে। এইভাবে ছিদ্র করিতে করিতে শেষ দিন তাহারা বলিবে আগামী কাল ইনশাআল্লাহ উহা ছিদ্র করিয়া ফেলিব। পরদিন তাহারা আসিয়া দেখিবে প্রাচীরটি যেমন রাখিয়া গিয়াছিল তেমনি রহিয়াছে। অতএব সেইদিন তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

....

কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি, নুমান ইবনে সালেম (র)....আউস ইবনে আবূ আওস (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন, ইয়াজুজ মাজুজের স্ত্রী আছে তাহারা সহবাস করিয়া থাকে। তাহাদের একজন মৃত্যুবরণ করিলে হাজার হাজার বরং ততধিক রাখিয়া যায়।

সহীহ মুসলিম (ইফা), পরিচ্ছেদঃ দুর্যোগসমূহ সন্নিকট হওয়া এবং ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর খুলে দেয়া প্রসঙ্গে
৬৯৭১। নবী সা বললেনঃ **নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত দুর্যোগে আরবরা ধংস হয়ে যাবে। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে**। পরিমাণ বোঝাতে হাত দ্বারা দশের চক্র করে দেখালেন। যাইনাব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধবংস হয়ে যাব? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেশী হবে।

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত), পরিচ্ছেদঃ ইয়াজুজ ও মাজুজের আত্মপ্রকাশ
২১৮৭। একদিন রাসূলুল্লাহ সা ঘুম হতে জাগ্রত হলেন, তখন তার মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেনঃ **ঘনিয়ে আসা দুর্যোগে আরবদের দুর্ভাগ্য। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ ফাক হয়ে গেছে**। এই বলে তিনি তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের সাহায্যে দশ সংখ্যার বৃত্ত করে ইঙ্গিত করেন। যাইনাব (রা) প্রশ্ন করলেন, আমাদের মধ্যে সৎ লোক থাকাবস্থায়ও কি আমরা সম্মুখীন হবো? রাসূল সা বললেনঃ হ্যাঁ, যখন পাপাচারের বিস্তার ঘটবে।

আসমান-যমীন সংক্রান্ত ইসলামের(স্বঘোষিত নবী মুহাম্মদের) কিছু সহীহ(অথেনটিক) বিশ্বাস,
নবীর মনের মা্ধুরী মিশিয়ে বানানো মিরাজের হাস্যকর গল্প (পড়তে লেখার উপর ক্লিক করুন)]]]

সূরা আল ইমরান, আয়াত ৯৬: নিশ্চয় **প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল, তা মক্কায়**।

সহীহ বুখারী (ইফা)

৩১২৭। আবূ যার (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ তৈরি করা হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, উভয় মসজিদের (তৈরীর) মাঝে কত ব্যাবধান ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর।

কিন্তু সমস্যাটি হচ্ছে, আল আকসা মসজিদ বা টেম্পল অফ জেরুজালেম ৯৫৮-৯৫১ খ্রিস্টপুর্বে নির্মিত হয়েছিল। এবং আব্রাহামিক ধর্মগুলো অনুসারে ইব্রাহিমের জন্ম-মৃত্যুও খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরে, আল আকসা মসজিদ নির্মানের বহু পূর্বে। এর অর্থ হচ্ছে, মুহাম্মদ এই উপাসনালয়গুলো তৈরির এবং নবীদের সময়কাল সম্পর্কে ঠিকভাবে জানতেন না।

৭০৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর

কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস

সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, পৃথিবীতে হযরত আদম (আ)-এর আগমনের পূর্বে ফেরেশতাগণ কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। আবূ জা'ফর বাকের মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরতুবীও হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়েতটি অন্য কোন হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন।' আতা, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব প্রমুখ ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত আদম (আ) পাঁচটি পর্বত হইতে পাথর আনিয়া কা'বা নির্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত পাঁচটি পর্বত হইতেছে-হেরা, সিনাই, যায়তা (زيتا), লেবানন এবং জূদী। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়েতও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), কা'ব আহবার, কাতাদাহ এবং ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন হযরত শীছ (আ)।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর ঘর (কা'বা)-কে সম্মানিত ও নিরাপদ ঘোষণা করিয়াছিলেন আর আমি মদীনা শহর অর্থাৎ উহার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্মানিত ঘোষণা করিতেছি।

৭৩১৯ নবী সা বলেছেনঃ কিয়ামত ক্বায়িম হবে না যে পর্যন্ত না আমার উম্মাত পূর্বযুগের লোকেদের নীতি পদ্ধতিকে আচার-অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ না করবে। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! পারস্য ও রোমদের মত কি? তিনি বললেনঃ **এরা ছাড়া মানুষের মধ্যে অন্য আর কারা**?

৭৪৪৪ নবী সা বলেছেনঃ ২টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভিতরের সব কিছুই হবে রূপার। আর ২টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভিতরের সবকিছুই হবে সোনার। জান্নাতে তাদের ও তাদের রবের দর্শনের মাঝে তাঁর চেহারার উপর অহঙ্কারের চাদর ব্যতীত আর কোন কিছু আড়াল থাকবে না।

১৮৯৯ রাসূল সা বলেছেনঃ রোযার মাস আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দী করে দেয়া হয়।

- আমি **নূহ**কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর সে পঞ্চাশ কম হাজার(**৯৫০) বছর তাদের মাঝে অবস্থান করেছিল(জীবিত ছিল)**। সূরা আনকাবুত, আয়াত: ১৪

- আমি মেঘমালা থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। 25/48 (what about acid rain!)

↥

- আর নিশ্চয় **চতুষ্পদ জন্তু**তে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। **তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে তোমাদেরকে আমি দুধ পান করাই।** সূরা নাহলঃ৬৬

তাফসীরে জালালাইন (৩য় খণ্ড) : আরবি-বাংলা ৪৯৫

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চলায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

৬৬১৭। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কারো সৃষ্টি (বীর্য) তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ রাত একত্রিত রাখা হয়।

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

৬৬২১। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, বীর্য জরায়ুতে চল্লিশ রাত স্থির থাকে।

আন্-নওয়াবীর চল্লিশ হাদীস

৪। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন: তোমাদের সকলের সৃষ্টি নিজের মায়ের পেটে **চল্লিশ দিন যাবৎ শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু হতে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট বাঁধা রক্তরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন গোশতপিণ্ড রূপে থাকে**, তারপর তার কাছে ফিরিশ্‌তা পাঠানো হয়। **অতঃপর সে তার মধ্যে রূহ(প্রাণ) প্রবেশ করায়।**

হাদীস সম্ভার

১২০,১২১। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ **বীর্য আকারে যখন বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়**, তখন আল্লাহ তার প্রতি একটি ফিরিশতা প্রেরণ করেন। **অতঃপর তিনি তার** রূপদান করেন, **তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চর্ম, মাংস ও অস্থি সৃষ্টি করেন**। **অতঃপর তিনি বলেন, 'হে প্রতিপালক! পুরুষ, নাকি স্ত্রী?' সুতরাং তোমার প্রতিপালক যা চান, ফায়সালা করেন এবং ফিরিশতা লিপিবদ্ধ করেন**---। (মুসলিম ৬৮৯৬)

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)

৬৪৮৫। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, যখন বীর্যের উপর বিয়াল্লিশ রাত-দিন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলা একজন ফিরিশতা পাঠান। সে সেটিকে একটি আকৃতি দান করে, **তার কান, চোখ, চামড়া, গোশত ও হাড় সৃষ্টি করে দেয়। এরপর সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পুরুষ, না স্ত্রীলোক হবে?** তখন তোমার রব যা চান নির্দেশ দেন এবং ফিরিশতা নির্দেশ মুতাবিক লিপিবদ্ধ করেন।

তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৪৫

সূরা তোহা ১৪৫

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক যমীনের মাঝে পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব এবং সর্বনিম্ন যমীন মাছের উপর অবস্থিত। মাছের দুইপ্রান্ত আসমানে অবস্থিত। মাছটি একটি পাথরের উপর এবং পাথরটি একজন ফিরিশ্‌তার হাতে দ্বিতীয় যমীন বায়ু আবদ্ধ। তৃতীয় যমীনে জাহান্নামের পাথর, চতুর্থ যমীনে জাহান্নামের গন্ধক। পঞ্চম যমীনে জাহান্নামের সাপসমূহ, ষষ্ঠ যমীনে জাহান্নামের বিচ্ছু। সপ্ত যমীনে জাহান্নাম এবং সেইখানে ইব্‌লীস বন্দি অবস্থায় রহিয়াছে। তাহার এক হাত সামনে ও এক হাত পশ্চাতে বাধা। যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হাদীসটি নিশ্চিত গারীব। ইহার মারফূ' হওয়াও বিবেচনা সাপেক্ষ।

সুনান ইবনু মাজাহ

২৯২১। সাহল ইবনে (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **দুনিয়ার সর্বশেষ প্রান্ত, উভয় দিকের সবকিছু তালবিয়া পাঠ করে।**

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)

৮২৮। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ যখন কোন মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়।

দাহাহা মানে উটপাখির ডিম ?!

https://www.islamweb.net/amp/en/fatwa/92448/

Meaning of Quran 79:30

Fatwa No: 92448, Fatwa Date:19-9-2006

Questionঃ This is regarding the verse of Surah Naziat 79: 30 where Allaah subhanawataala says in the Quran "And after that He spread the earth" Most of the Modern day scholars translate this verse to "Earth is like ostrich-egg shaped" in order to proof the shape of the earth is Spherical. I would appreciate if you can provide me with the etymology of the word daha. I would also like to know can we change the meaning and quote is as egg shaped. JazakAllaah Khair

Answer: Allaah Says: And after that He spread (Dahaahaa) the earth. [Quran 79:30]. The Arabic word Dahaahaa is extracted from the root Daha which means spreading as interpreted by Imaams Al-Qurtubi, Ibn Manthoor and other interpreters of the Quran. Indeed Allaah explained the fact of the Earth being spread just right after mentioning the above verse, as He Says: And brought forth therefrom its water and its pasture. And the mountains He has fixed firmly. [Quran 79:31-32]. **Therefore, it becomes evident that the verse does not mean that He made it egg-shaped.**

শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেদ আল উসাইমীন(র) যিনি সৌদি আরবের শীর্ষস্থানীয় ইসলামিক পণ্ডিত(স্কলার), সৌদিআরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ সদস্য, যাকে আধুনিকযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ হিসেবে বিবেচিত। তার রচিত ফতোয়ায়ে আরকানুল ইসলাম থেকে একটি বিখ্যাত ফতোয়া দেখে নিই,

↥
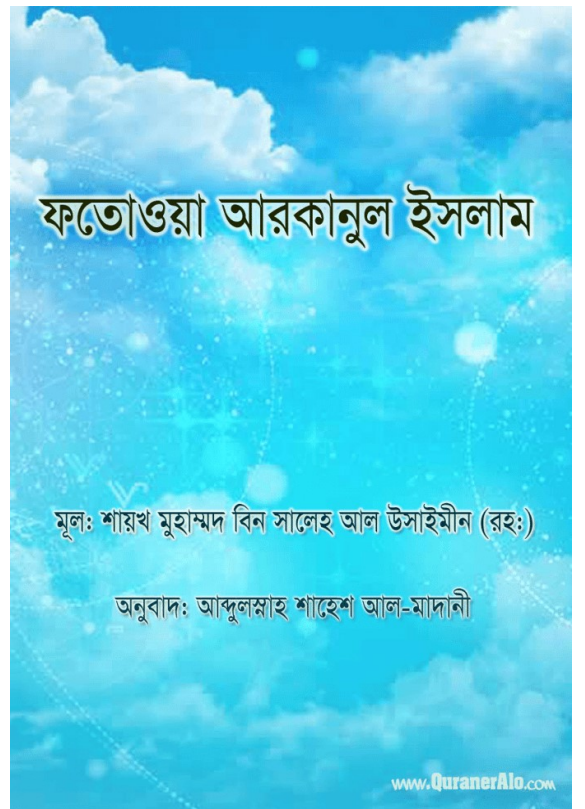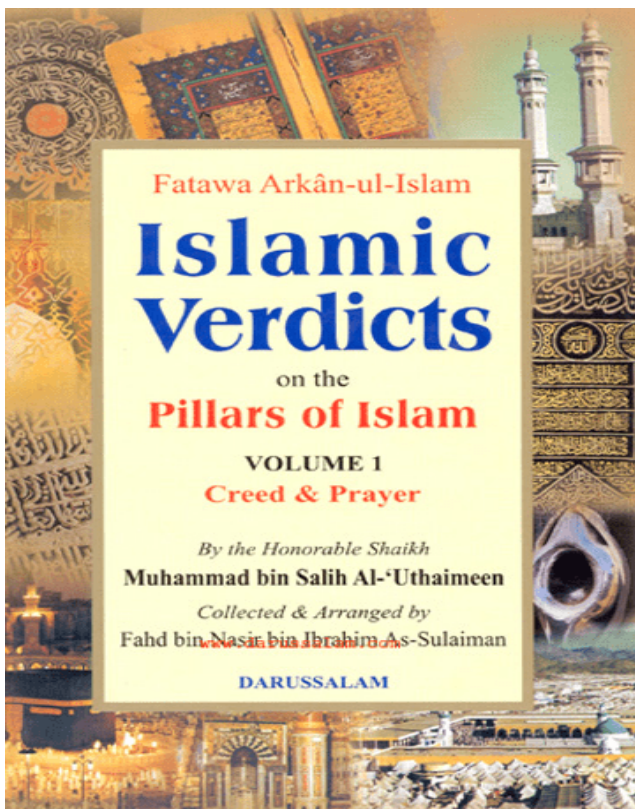
প্রশ্নঃ- (১৬) সূর্য কি পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে ?

উত্তরঃ- সম্মানিত শায়খ উত্তরে বলেন যে, শরীয়তের প্রকাশ্য দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, সূর্যই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে। এই ঘুরার কারণেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রির আগমণ ঘটে। আমাদের হাতে এই দলীলগুলোর চেয়ে বেশী শক্তিশালী এমন কোন দলীল নাই, যার মাধ্যমে আমরা সূর্য ঘূরার দলীলগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি। সূর্য ঘুরার দলীলগুলো হলঃ আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ﴾

"আল্লাহ তাআ'লা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৮) সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠার মাধ্যমে প্রকাশ্য দলীল পাওয়া যায় যে, সূর্য পৃথিবীর উপর পরিভ্রমণ করে।

২) আল্লাহ বলেনঃ

﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾

"অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেনঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত।" (সূরা আনআ'মঃ ৭৮) এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। একথা বলা হয়নি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেল। পৃথিবী যদি ঘূরত তাহলে অবশ্যই তা বলা হত।

৩) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَتَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾

"তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়।" (সূরা কাহাফঃ ১৭) পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী যদি নড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলতেন সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে সূর্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যই ঘুরে। পৃথিবী নয়।

৪) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

"এবং তিনিই দিবা-নিশি এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। সবাই আপন আপন কক্ষ পথে বিচরণ করে।" (সূরা আমবীয়াঃ ৩৩) ইবনে আব্বাস বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে।

৫) আল্লাহ বলেনঃ

﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾

"তিনি রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিনের মাধ্যমে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে।" (সূরা আ'রাফঃ ৫৪) আয়াতে রাতকে দিনের অনুসন্ধানকারী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুসন্ধানকারী পিছনে পিছনে দ্রুত অনুসন্ধান করে থাকে। এটা জানা কথা যে, দিবা-রাত্রি সূর্যের অনুসারী।

৬) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾

অর্থঃ "তিনি (আল্লাহ) আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী,ক্ষমাশীল।" (সূরা যুমারঃ ৫) আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, পৃথিবীর উপরে দিবা-রাত্রি চলমান রয়েছে। পৃথিবী যদি ঘুরতো তাহলে তিনি বলতেন, দিবা-রাত্রির উপর পৃথিবীকে ঘূরান। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "সূর্য এবং চন্দ্রের প্রত্যেকেই চলমান"। এই সমস্ত দলীলের মাধ্যমে জানা গেল যে, সুস্পষ্টভাবেই সূর্য ও চন্দ্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, চলমান বস্তুকে বশীভূত করা এবং কাজে লাগানো একস্থানে অবস্থানকারী বস্তুকে কাজে লাগানোর চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৭) আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾

"শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।" (সূরা আশ্-শামসঃ ১-২) এখানে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র সূর্যের পরে আসে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সূর্য এবং চন্দ্র চলাচল করে এবং পৃথিবীর উপর ঘুরে। পৃথিবী যদি চন্দ্র বা সূর্যের চার দিকে ঘুরত, তাহলে চন্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করতনা। বরং চন্দ্র একবার সূর্যকে, আর একবার সূর্য চন্দ্রকে অনুসরণ করত। কেননা সূর্য চন্দ্রের অনেক উপরে। এই আয়াত দিয়ে পৃথিবী স্থীর থাকার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করার ভিতরে চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে।

৮) মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রাতের পক্ষেও দিনের অগ্রবর্তী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।" (সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮-৪০) সূর্যের চলা এবং এই চলাকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারণ বলে ব্যাখ্যা করা এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য প্রকৃতভাবেই চলমান। আর এই চলাচলের কারণেই দিবা-রাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়। চন্দ্রের জন্য মনযিল নির্ধারণ করার অর্থ এই যে, সে তার মনযিলসমূহে স্থানান্তরিত হয়। যদি পৃথিবী ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর জন্য মনযিল নির্ধারণ করা হত। চন্দ্রের জন্য নয়। সূর্য কর্তৃক চন্দ্রকে ধরতে না পারা এবং দিনের অগ্রে রাত থাকা সূর্য, চন্দ্র, দিন এবং রাতের চলাচলের প্রমাণ বহন করে।

৯) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবু যরকে বলেছেনঃ

((أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا))

"হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবু যার বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরশের নীচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয়। সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে।"[1] এটি হবে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে। আল্লাহ সূর্যকে বলবেন, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত যাও, অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্য পৃথিবীর উপরে ঘুরছে এবং তার এই ঘুরার মাধ্যমেই উদয়-অস্ত সংঘটিত হচ্ছে।

১০) অসংখ্য হাদীছের মাধ্যমে জানা যায় যে, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া এবং ঢলে যাওয়া এই কাজগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সূর্য থেকে প্রকাশিত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট। পৃথিবী হতে নয়।

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ বাদউল খাল্‌ক, মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান

সহীহ বুখারী (ইফা)

পরিচ্ছদঃ ১৯৮৬. **চন্দ্র সূর্যের একটির জ্যোতি অপরটিকে ঢাকতে পারে না, আর তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়।**

৩২৭৩ নবী সা বলেছেন- তোমরা সূর্যোদয়ের সময়কে এবং সূর্যাস্তের সময়কে তোমাদের সালাতের জন্য নির্ধারিত করো না। কেননা তা(এসময়ে **সূর্য) শয়তানের দু শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।**

৪৮০২ আবূ যার (রা.) বলেন, একদা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আমি নবী সা-এর সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আবূ যার! **তুমি কি জান সূর্য কোথায় ডুবে?** আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, **সূর্য চলে, অবশেষে আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে।** নিম্নবর্ণিত وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ এ আয়াতের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে,- "সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের পানে, এ হল পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ"।

৪৮০৩ **পরিচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ আর সূর্য নিজ গন্তব্যস্থানের দিকে চলতে থাকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরাহ ইয়াসীন ৩৬/৩৮)**

আবূ যার গিফারী (রা.) বলেন, আমি নবী সা কে আল্লাহর বাণীঃ 36/38 وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا **"আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে" -** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেছেন, সূর্যের গন্তব্যস্থল আরশের নিচে।

সহীহ মুসলিম (ইফা)

২৯৮,২৯৯। আবূ যার (রা) বলেন, একদা আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ সা তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলে তিনি বললেনঃ জানো, এ সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। রাসুলুল্লাহ সা বললেনঃ সে তার **গন্তব্যস্থলে যায় এবং আল্লাহর কাছে সিজদার অনুমতি চায়। তখন তাকে অনুমতি দেয়া হয়।** পরে একদিন যখন তাকে বলা হবে যেদিক থেকে এসেছো সেদিকে ফিরে যাও। অনন্তর তা অস্তাচল থেকে উদিত হবে। এরপর তিনি

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদের কিরাআত অনুসারে তিলাওয়াত করেনঃ لَهَا ذَٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ এ তার গন্তব্যস্থল। আরশের নিচে তার গন্তব্যস্থল।

৩১৯৯ আবূ যার (রা.) বলেন, নবী সা সূর্য অস্ত যাবার সময় আমাকে বললেন, তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।
তিনি বললেন, **তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। অতঃপর সে আবার উদিত হবার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়।**
আর শীঘ্রই এমন সময় আসবে যে, সিজদা করবে কিন্তু তা কবূল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যে পথ দিয়ে আসলে ঐ পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে(কিয়ামতের আগে)—এটাই মর্ম হল মহান আল্লাহর বাণীরঃ "আর সূর্য নিজ কক্ষ পথে চলতে থাকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"

৭৪২৪ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেনঃ একদিন সূর্যকে নির্দেশ দেয়া হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। তখন সে তার অস্তের জায়গা থেকে উদিত হবে।

সহিহ হাদিসে কুদসি
১৬১। আবূ যর (রাঃ) বলেন, নবী সা আমাকে বলেন: "হে আবূ যর তুমি জান এটা**(সূর্য) কোথায় অস্ত যায়**?" আমি বললাম-আল্লাহ এবং তার রাসূল ভাল জানেন। নবী সা বললেন: **সূর্য অস্ত যায় একটি কর্দমাক্ত ঝর্ণায়, সে চলতে থাকে অবশেষে আরশের নিচে তার রবের জন্য সেজদায় লুটিয়ে পড়ে, যখন বের হওয়ার সময় তখন আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন, ফলে সে বের হয় ও উদিত হয়। তিনি যখন তাকে যেখানে অস্ত গিয়েছে সেখান থেকে উদিত করার ইচ্ছা করবেন আটকে দিবেন**, সে বলবে: হে আমার রব আমার পথ তো দীর্ঘ, আল্লাহ বলবেন: যেখান থেকে ডুবেছে সেখান থেকেই উদিত হও, এটাই সে সময় যখন ব্যক্তিকে তার ঈমান উপকার করবে না(কিয়ামতের দিন)"।

সূরা কাহফে (18:86) আল্লাহ বলেন- حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًاۗ قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا অবশেষে যখন যুলকারনাইন সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে **সূর্যকে একটি কর্দমাক্ত পানির ঝর্ণায় ডুবতে দেখতে পেল**।

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৪৪৩৯। রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ...... **সূর্য চলে, অবশেষে আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে।**

সূনান আবু দাউদ (ইফা)
৩৯৬১. আবূ যার (রা) বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সা এর সংগে একটি গাধার পেছনে সওয়ার ছিলাম। এ সময় সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি কি জান, সূর্য কোথায় অস্তমিত হয়? আমি বলি, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে অধিক অবহিত। তিনি বললেন- এটি عَيْنٍ حَامِيَةٍ অর্থাৎ **গরম প্রস্রবণের মধ্যে যায়**।

সহীহ মুসলিম (ইফা)
২৯৬। নবী সা বলেনঃ **তোমরা কি জানো, সূর্য কোথায় যায়?** সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এ **সূর্য চলতে থাকে এবং আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজদাবনত হয়ে পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, উঠো এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও! তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল দিয়েই উদিত হয়।**
তা আবার চলতে থাকে এবং আরশের নিচে অবস্থিত তার অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে সে সিজদাবনত অবস্থায় পড়ে থাকে। শেষে যখন তাকে বলা হয়, ওঠ এবং যেখান থেকে এসেছিলে সেখানে ফিরে যাও। তখন সে ফিরে আসে এবং নির্ধারিত উদয়স্থল হয়েই উদিত হয়। এমনিভাবে চলতে থাকবে; মানুষ তার থেকে অস্বাভাবিক কিছু হতে দেখবে না। একদিন সূর্য যথারীতি আরশের নিচে তার নির্দিষ্টস্থলে যাবে। তাকে বলা হবে, ওঠ এবং অস্তাচল থেকে উদিত হও। সেদিন সূর্য পশ্চিম গগনে উদিত হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ কোন দিন সে অবস্থা হবে তোমরা জানো? সে দিন হবে কিয়ামতের দিন।

৩১২৪ নবী সা বলেন- একজন **নবী জিহাদে গেলেন এবং আসরের সালাতের সময় এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটে আসলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদেশ পালনকারী আর আমিও আদেশ পালনকারী। হে আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন সূর্যকে থামিয়ে দেয়া হল।**

৭২৪২ সাহাবীরা নতুন চাঁদ দেখতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ **যদি চাঁদ আরো কয়দিন পরে উদিত হত, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের রোযা বাড়াতাম**।

আল্লাহর আকার সসীম, কারণ অসীম কোন কিছু সসীম জিনিসের উপর থাকতে পারে না

As-Sajdah 32:4 আল্লাহ আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। **তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন**।

Al-Haqqah 69:17 **ফেরেশতাগণ আসমানের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে। সেদিন তোমার রবের আরশকে- ৮ জন ফেরেশতা তাদের উর্ধ্বে বহন করবে**।

Ghafir 40:7 **যারা আরশকে ধারণ করে** এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা রবের প্রশংসা পাঠ করে।]

So, this is proven that The volume of islamic god is **not infinite, His physical volume is totally limited.**

& So If he Once comes to the earth he could no longer go to the heaven because_ in every moments there remains any place on earth where night remains

সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
২/ সালাত (নামায)
পরিচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন।
৪৪৬. কুতায়বা (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলেনঃ আমিই রাজধিরাক, যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাককে কবূল করি, যে আমার কাছে যাঞ্ছা করে আমি তাকে দেই, যে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। ফজরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। – ইবনু মাজাহ ১৩৬৬, বুখারি ও মুসলিম, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ৪৪৬ (আল মাদানী

১১৪৪,৬৩২১ রাসূল সা. বলেছেনঃ **আল্লাহ্ প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে** ঘোষণা করতে থাকেনঃ কে আছে এমন যে, আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা দিব।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
পরিচ্ছেদঃ ক্বিয়ামুল লায়ল-এর প্রতি উৎসাহ দান
১২২৩। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **প্রতি রাত্রে শেষ তৃতীয়াংশে** আমাদের মর্যাদাবান **রব দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন** এবং বলেন........।

(এই সহীহ হাদীসসমুহ অনুসারে, ইসলামের আকীদা প্রমাণ করে যে এক্ষেত্রে পৃথিবী সমতল না হয়ে গোলাকার হওয়ার/ভাবার কোনো সুযোগ নেই। কেননা নাহলে আল্লাহর পক্ষে রাতের শেষে সপ্তম আসমানের উপর আরশে যাওয়ার সুযোগ নেই।)

ইমান আহমদ (র) আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ননা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বাত্‌হা নামক স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা কি জান এগুলো কী? আমরা বললাম, মেঘমালা! তিনি বললেন, সাদা মেঘ বলতে পার। আমরা বললাম সাদা মেঘ। তিনি বললেন ঃ 'আনানও (মেঘ) বলতে পার, আমরা বললাম ওয়াল আনান। তারপর বললেন, আমরা নীরব থাকলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান যে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দূরত্ব কতটুকু? আব্বাস (রা) বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন ঃ উভয়ের মাঝে পাঁচশ বছরের দূরত্ব। এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ পর্যন্ত পাঁচশ বছরের দূরত্ব, প্রত্যেকটি আকাশ পাঁচশ বছরের দূরত্ব সমান পুরু এবং সপ্তম আকাশের উপরে একটি সমুদ্র আছে ঃ যার উপর ও নীচের মধ্যে ঠিক ততটুকু দূরত্ব; যতটুকু দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে। তারপর তার উপরে আছে আটটি পাহাড়ী মেষ, যাদের হাঁটু ও ক্ষুরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বের সমান দূরত্ব। সেগুলোর উপরে হলো আরশ। যার নিচ ও উপরের মধ্যে ততটুকু দূরত্ব, যতটুকু আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে। আল্লাহ হলেন তারও উপরে। কিন্তু বনী আদমের কোন আমলই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

পাঠটি ইমাম আহমদ (র)-এর। আর ইমাম আবু দাউদ ইব্‌ন মাজাহ ও তিরমিযী (র) সিমাক (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমান তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। আবার শুরায়ক সিমাক থেকে এ হাদীসটির অংশ বিশেষ মওকূফ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র)-এর শব্দ হলো ঃ

وهل ترون بعد ما بين السماء والأرض ؟ قالوا لا ندرى قال ما بينهما اما واحدة او اثنين او ثلاثة وسبعون سنة.

অর্থাৎ— "আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্ব কতটুকু তা কি তোমরা জান ? তাঁরা বলল, আমরা তো জানি না। তিনি বললেন, উভয়ের মাঝে একাত্তর কিংবা বাহাত্তর কিংবা তিহাত্তর বছরের দূরত্ব।[১] অবশিষ্টগুলোর দূরত্ব অনুরূপ।"

ইমাম আবূ দাঊদ (র) সাহাবী জুবায়র ইবন মুতইম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আরশ তার আকাশসমূহের উপরে এভাবে আছে। এ বলে তিনি তাঁর অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা ইশারা করে গম্বুজের মত করে দেখান। তারপর বললেন ঃ

وانه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.

অর্থাৎ—বাহন তার আরোহীর ভারে যেমন মচমচ করে উঠে আরশও তেমনি মচমচ করে উঠে। ইবন বাশ্‌শার (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে ঃ

ان الله فوق عرشه والعرش فوق سموته.

অর্থাৎ—আল্লাহ আছেন তাঁর আরশের উপর আর আরশ আছে তাঁর আকাশসমূহের উপর।

ইব্‌ন জারীর তাঁদের তাফসীরদ্বয়ে, ইব্‌ন আবূ 'আসিম ও তাবারানী তাঁদের কিতাবুস সুন্নাহয়, বায্‌যার তাঁর মুসনাদে এবং হাফিজ জিয়া আল মাকদেসী তাঁর 'মুখতারাত' গ্রন্থে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। উমর (রা) বলেন, একথা শুনে তিনি আল্লাহ তা'আলার মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ

إن كرسيه وسع السموت والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله.

অর্থাৎ—'নিঃসন্দেহে তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত এবং তা নতুন বাহন বোঝার ভারে শব্দ করার ন্যায় শব্দ করে।'

সহীহ্ বুখারীতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ.

অর্থাৎ—'সাদ ইব্ন মুআযের মৃত্যুতে রাহমানের আরশ কেঁপে উঠে।'

ইমাম আহ্মদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) উমায়্যা ইবন আবুস-সাল্ত-এর কবিতার নিম্নোক্ত দু'টো পংক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। উমায়্যা যথার্থ বলেছে। পংক্তি দু'টি হলো ঃ

رجل وثور تحت رجل يمينه – والنسر للأخري وليث مرصد.

অর্থাৎ—তাঁর (আরশের) ডান পায়ের নিচে আছে একজন লোক ও একটি ষাঁড়। আর অপর পায়ের নিচে আছে একটি শকুন ও ওঁৎ পেতে থাকা একটি সিংহ।

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে যথার্থই বলেছে। তারপর উমায়্যা বলল ঃ

والشمس تطلع كل آخر ليلة – حمراء مطلع لونها متورد

تأبى فلا تبد ولنا في رسلها – الا معذبة والا تجلد

অর্থাৎ—প্রতি রাতের শেষে লাল হয়ে সূর্য উদিত হয় যার উদয়াচলের রঙ হলো গোলাপী। আমাদের জন্য আত্মপ্রকাশ করতে সূর্য ইতস্তত করে থাকে। অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে শাস্তিদানকারী রূপে এবং কশাঘাতকারী রূপে।

শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে যথার্থই বলেছে। এ হাদীসের সনদ সহীহ এবং তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আর্শ বহনকারীদের বর্তমান সংখ্যা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.

অর্থাৎ—যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (৪০ ঃ ৭)

পূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, তারা হলেন আটজন এবং তাদের পিঠের উপর রয়েছে আরশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.

অর্থাৎ—এবং সে দিন আটজন ফেরেশতা তাঁদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধে। (৬৯ ঃ ১৭)

শাহ্র ইব্ন হাওশাব (র) বলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতা হলেন আটজন।

আর আরশ পানির উপর ভাসমান এবং আরশের উপর রয়েছেন বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যে আরশ বহন করেন সম্মানিত এবং আল্লাহর চিহ্নিত ফেরেশতাগণ।

ইব্ন আবদুল বার (র) প্রমুখ ইমাম তা বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

أذن لى أن أحدث عن ملك من ملئكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه ألى عاتقه مسيرة سبعماة عام.

অর্থাৎ—"আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী আল্লাহর ফেরেশতাদের একজনের বিবরণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাঁর কানের লতি ও কাঁধের মাঝে সাতশ বছরের পথ।"

অর্থাৎ—বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে তাতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।

তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।

তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রতি আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (৪১ ঃ ৯-১২)

এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পৃথিবী আকাশের আগে সৃষ্ট হয়েছে। কেননা, পৃথিবী হলো, প্রাসাদের ভিত স্বরূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ—তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (২ ঃ ২৯)

وَاَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ—যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশেছিল ওতপ্রোতভাবে; তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণসম্পন্ন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না ? (২১ ঃ ৩০)

আবূ মালিক, ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ
فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ.

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। পানির আগে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেননি। তারপর যখন তিনি মাখলূক সৃষ্টি করতে মনস্থ করেন তখন পানি থেকে ধোঁয়া আকারে বাষ্প বের করেন। ফলে তা পানির উপরে উঠে যায়। এই ওঠাকে আরবীতে سماء বলা হয়ে থাকে। তাই এ উপরে ওঠার কারণেই আকাশকে سماء বলে নামকরণ করা হয়।

তারপর পানি শুকিয়ে একটি যমীনে রূপান্তরিত করেন। তারপর তা পৃথক পৃথক করে দু'দিনে (রবি ও সোমবার দিন) সাত যমীনে পরিণত করেন।

আল্লাহ তা'আলা মঙ্গলবার দিন পাহাড়-পর্বত ও তাঁর উপকারিতা, বুধবার দিন গাছপালা, পানি, শহর-বন্দর এবং আবাদ ও বিনাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা আকাশকে পৃথক পৃথক করেছেন। বৃহস্পতি ও শুক্র এ দু'দিনে তিনি সাত আকাশে পরিণত করেন। উল্লেখ্য যে, জুমআর দিনকে জুমআ বলে এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এ দিনে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর বিধানের প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল।

তারপর তিনি প্রত্যেক আকাশে ফেরেশতা, পাহাড়-পর্বত, সাগরমালা, তুষার পর্বত ও এমন বস্তু সৃষ্টি করেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জ্ঞাত নয়। তারপর আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা

↥

সুশোভিত করে তাকে সুষমামণ্ডিত ও শয়তানের কবল থেকে সুরক্ষিত বানিয়েছেন। তারপর ইচ্ছা মত সৃষ্টি পর্ব শেষ করে তিনি আরশের প্রতি মনোসংযোগ করেন।

আল্লাহ তা'আলা সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং সংখ্যায় তাদের অনুরূপ যমীনও সৃষ্টি করেছেন। (৬৫ ঃ ১২)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين.

এটিও ইমাম আহমদের এককভাবে বর্ণিত হাদীস। ইমাম তাবারানী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, এ হাদীসগুলো যমীনের সংখ্যা যে সাত তার প্রমাণ হিসাবে প্রায় মুতাওয়াতির তুল্য—যাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর এর দ্বারা সাত যমীনের একটি যে অপরটির উপর অবস্থিত তা-ই বুঝানো হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, নীচের যমীন উপরের যমীনের ঠিক মাঝ বরাবর অবস্থিত। সপ্তমটি পর্যন্ত এভাবেই রয়েছে। সপ্তমটি হলো সম্পূর্ণ নিরেট—যার মধ্যে একটুও ফাঁকা নেই। এর মধ্যখানেই হলো কেন্দ্র। এটি একটি কল্পিত বিন্দু— আর এটিই হলো ভারি বস্তু পতনের স্থল। চতুর্দিক থেকে যা কিছু পতিত হয়, কোন কিছুর দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হলে তার সব গিয়ে ওখানেই পতিত হয়।

৭৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

এরপর وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا অর্থ আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে বিস্তৃত করে স্থির অটল করে দিয়েছি; ফলে তা আর তোমাদেরকে নিয়ে নড়ে না।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তা দুলতে শুরু করে, তাই তিনি পর্বতমালা সৃষ্টি করে তার উপর তা স্থাপন করেন। তাতে পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। পর্বতমালা দেখে ফেরেশতাগণ অবাক হয়ে বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক' আপনার সৃষ্টির মধ্যে পর্বত থেকে মজবুত আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, লোহা। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে লোহা থেকে বেশি মজবুত আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন হ্যাঁ, আগুন। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন ঃ হ্যাঁ বাতাস। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন ঃ হ্যাঁ, আদম সন্তান, যে ডান হাতে দান করে আর বাম হাত থেকে তা গোপন রাখে। 'ইমাম আহমদ (র) এককভাবে

৩৬৮ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করার পর যখন তিনি আকাশ সৃষ্টি করার জন্য মনোনিবেশ করিলেন তখন উর্দ্ধলোক বাষ্পায়িত ধুম্র-পুঞ্জবিশেষ ছিল।

كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ "আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই বাষ্প ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করিয়াছি। অনন্তর আমি প্রত্যেক বস্তুকে পানি দ্বারা সপ্রাণ করিয়াছি।"

আস্ সুদ্দী স্বীয় তাফসীরে ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্‌রাহ, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন– সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ পানির উপর সংস্থাপিত ছিল। পানির পূর্বে আল্লাহ্ পাক কোন বস্তুই সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং সৃজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম তিনি পানি হইতে বাষ্প সৃষ্টি করিলেন। উহা ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধলোকে উত্থিত হইল এবং উত্থিত বাষ্প ছাদরূপ পরিগ্রহ করিয়া আকাশে পরিণত হইল। এইজন্য উহার নাম হইল سماء (উর্দ্ধলোক)। অতঃপর পানি শুকাইয়া একটি ভূখণ্ড দেখা দিল। তখন উহাকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করা হইল। রবি-সোম দুই

↥

'তুমি বল, তোমরা কি সেই মহান সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছ কিংবা তাঁহার অংশীদার দাঁড় করাইতেছ যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনিই তো নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক। তিনি পাহাড় গাড়িয়া ভূপৃষ্ঠ স্থিতিশীল করিয়াছেন এবং পৃথিবীকে নানাবিধ দানে ধন্য করিয়াছেন। অতঃপর চারিদিনে উহা বিন্যস্ত করিয়া উর্বরা শক্তি দিয়াছেন। জিজ্ঞাসুদের জন্য উহাতে সন্তোষজনক সমাধান রহিয়াছে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তখন আকাশ ছিল বাষ্পাকার। তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বলিলেন- ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় আমার পরিকল্পিত রূপ পরিগ্রহ কর। তাহারা বলিল- আমরা স্বেচ্ছায় বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতেছি। এইভাবে দুই দিনে অকাশকে সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হইল এবং প্রত্যেক আকাশের কাজ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল। পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইল এবং শয়তানের অনাচার প্রতিরোধের জন্য প্রহরার ব্যবস্থা হইল। এই হইল সেই মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা।'

এই আয়াতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টি পরিকল্পনার সূচনা করিয়াছেন পৃথিবী সৃষ্টি দ্বারা। অতঃপর সপ্ত আকাশ সৃষ্টির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করিয়াছেন। যে কোন স্থাপত্য শিল্পের নিয়মই হইল এই যে, সর্বপ্রথম সৌধের নিম্নভাগের ভিত্তি স্থাপন করা। অতঃপর সৌধের উপরিভাগের কাজে হাত দেওয়া। আল্লাহ্র এই সৃষ্টি পরিকল্পনাও অনুরূপভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ মুজাহিদ বলেন ঃ সপ্ত আকাশ একটির উপর অপরটি এবং সপ্ত পৃথিবী একটির নিচে অপরটির অবস্থান। এই আয়াত

২৯. তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ - فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق وَحِفْظًا ط ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে, পৃথিবী নভোমণ্ডলীর আগে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আলিমদের ভিতর এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই।

২৬ তাফসীরে ইবন আব্বাস

(৩০) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(পরকালে) যেখানে তোমাদের কার্যকলাপের সমস্ত পুরস্কার ও বিনিময় দেয়া হবে। এরপর আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য কি অবদান রেখেছেন তার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ (هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ) তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন (مَا فِي الْاَرْضِ) যা কিছু পৃথিবীতে আছে জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি। (جَمِيْعًا) সবগুলিকেই তোমাদের মঙ্গলের জন্যই (ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ) তারপর তিনি আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন (فَسَوّٰهُنَّ) তারপর তিনি তাদেরকে (سَبْعَ سَمٰوٰتٍ) সপ্ত আকাশে সুবিন্যস্ত করে দিলেন, এবং পৃথিবীর উপর সমভাগে বিস্তৃত করলেন (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ) তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টির সর্ববিষয়ে (عَلِيْمٌ) সর্বজ্ঞানী। এরপর তিনি ফিরিশতাদের ঘটনাবলির উল্লেখ করেন, যারা হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল ঃ

Ancient Cosmology
The Pre-Copernican Universe
throne of God
7th heaven: Saturn
6th heaven: Mars
5th heaven: Sun
4th heaven: Venus
3rd heaven: Mercury
2nd heaven: Moon
First Heaven: Stars
Canopy
stars hanging from sky-dome
invisible pillars
sky a solid dome
Earth
ocean
mountains
seven earths

↥

নিরীহ প্রাণীর প্রতি ইসলাম
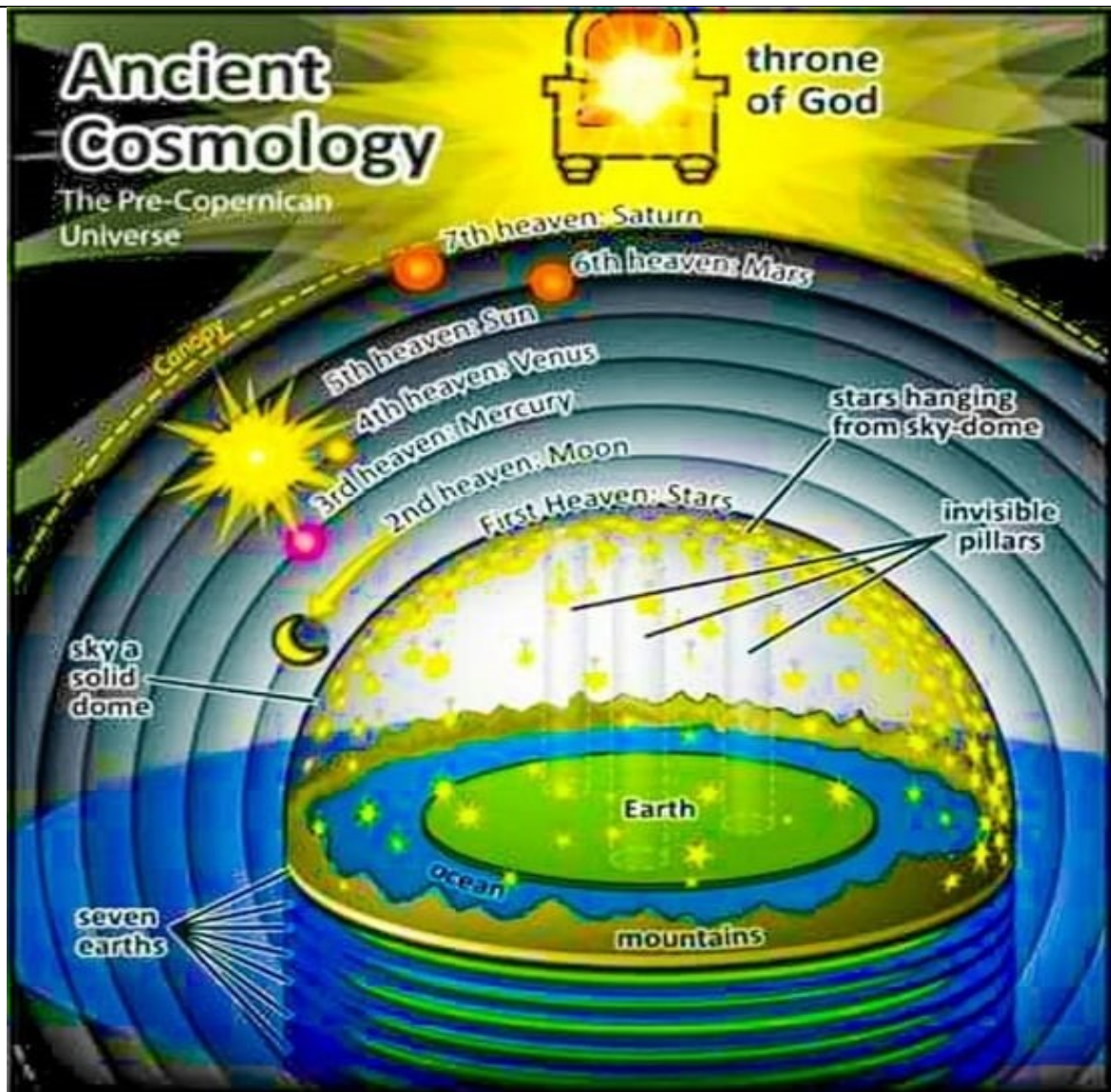
আবু দাউদ (ইফা:)

১৮৪৬। রাসূলুল্লাহ সা বলেন, পাঁচ শ্রেনীর জীবজন্তু **হত্যায় কোন গুনাহ্ নেই**। তার মধ্যে রয়েছে- ইঁদুর, **কাক**, চিল।

সহীহ বুখারী (ইফা)

৫৫২৫। নবী সা বলেছেনঃ ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করেনা, যে ঘরে কুকুর থাকে।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

৫৪০৬। মাইমূনা (রা) বলেন, **আমাদের পর্দা ঘেরা খাট এর নিচে একটি কুকুর ছানার কথা তার স্মরণ হলো। রসূলুল্লাহ সা নির্দেশ করলে সেটি বের করে দেয়া হলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ সা তার হাতে সামান্য পানি নিয়ে তা ঐ কুকুর শাবক বসার স্থানে ছিটিয়ে দিলেন**। নবী সা সেদিন সকাল বেলায় কুকুর নিধনের নির্দেশ দিলেন। এমনকি তিনি ছোট বাগানের পাহারাদার কুকুরও মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সহীহ মুসলিম (হাদিস একাডেমী)

১০২৪। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে **কালো কুকুর, গাধা, মহিলা চলাচল করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে**।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হে আবূ যার (রাঃ) **কালো কুকুরের কি অপরাধ**, অথচ লাল ও হলুদ বর্ণের কুকুরও তো রয়েছে? তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছ, আমিও রাসূলুল্লাহ সা কে এ রকম প্রশ্ন করেছিলাম। নবী সা উত্তরে বলেছেনঃ **কালো কুকুর হলো একটি শয়তান**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

৪১০১। নবী সা শিকারী কুকুর/গবাদিপশু পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ছাড়া- অন্যান্য সব কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমি)

৩৯১০। আবদুল্লাহ্ ইবনু উমর (রাঃ) বলেন- **রসূলুল্লাহ সা কুকুর হত্যার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর মদীনার ভেতরে ও তার চারপাশের কুকুর ধাওয়া করা হত। আর কোন কুকুরই আমরা না মেরে ছেড়ে দিতাম না**। এমনকি বেদুঈনদের দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর সাথে যে কুকুর থাকত তাও আমরা হত্যা করতাম।

আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

২৮৪৬। জাবির (রাঃ) বলেন, নবী সা আমাদেরকে কুকুর হত্যার আদেশ দেন, এমন কি কোনো মহিলাও যদি জঙ্গল থেকে তার কুকুরসহ আসতো সেটাও আমরা হত্যা করতাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে কুকুর হত্যা নিষেধ করে বলেনঃ তোমরা শুধু কালো কুকুর হত্যা করবে।

গ্রন্থের নামঃ সূনান আবু দাউদ (ইফা)

২৮৩৬। রাসূলূল্লাহ্ সা বলেছেন, যদি কুকুর আল্লাহ্ তা'আলার বহুজাতিক সৃষ্টজীবের মাঝে এক জাতীয় সৃষ্টি না হত, তবে আমি তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। এখন তোমরা তাদের থেকে কেবল কালবর্ণের কুকুরকেই হত্যা করবে।

৩৩২৩ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন- '**রাসূলুল্লাহ্ সা কুকুর মেরে ফেলতে আদেশ করেছেন**।'

আবু দাউদ (ইফা)

৪৪০৫। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ যদি কেউ কোন পশুর সাথে সঙ্গম করে, তবে তাকে হত্যা করবে এবং **সে পশুকেও তার সাথে হত্যা করবে**। বর্ণকারী আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করিঃ **পশুর অপরাধ কি?** তিনি বলেনঃ আমার মনে হয়, নবী সা সে পশুর গোশত খাওয়া ভাল মনে করেননি, যার সাথে কেউ এরূপ কুকর্ম করে।

২৩০০ নবী সা ইবনু আমির রা. কে কিছু ভেড়া সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করতে দিলেন। বণ্টন করার পর একটি **বকরীর বাচ্চা** বাকী থেকে যায়। তিনি তা নবী সা কে অবহিত করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি **এটাকে কুরবানী করে দাও**।

১৮২৯, ৩৩১৪,৩৪১৫ রাসূল সা বলেছেনঃ পাঁচ প্রকার প্রাণী এত ক্ষতিকর যে, এগুলোকে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হারামের মধ্যেও হত্যা করা যাবে/যে হত্যা করবে তার কোন দোষ নেই। তারমধ্যে **৩টি** হল- কাক, চিল, ইঁদুর।

৩৩৫৯ রাসূলুল্লাহ সা গিরগিটি মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, ওটা **ইবরাহীম (আ.) যে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তাতে এ গিরগিটি ফুঁ দিয়েছিল**।

৩৩০৬ নবী সা গিরগিটি বা রক্তচোষা টিকটিকিকে নিকৃষ্টতম ফাসিক(অবাধ্য) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫৫০১,২,৪,৫ কাব ইবনু মালিক(রা.) একটি দাসী বকরী চরাত। বকরীগুলোর মধ্যে একটিকে মরার উপক্রম দেখে সে একটি **পাথর দ্বারা সেটিকে জবাই করল**। এ ব্যাপারে নবী সা-কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেনঃ সেটি খাও।

সহীহ মুসলিম (ইফা)

পরিচ্ছেদঃ হত্যাকারীর তাওবা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য; যদিও সে বহু হত্যা করে থাকে।

৬৭৫৫। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানকে এক এক জন খ্রীষ্টান বা ইয়াহুদী দিয়ে বলবেন, এ হচ্ছে তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তিপণ।

২৩৩, ১৫০১,৫৬৮৫ উরাইনাহ গোত্রের কিছু লোক মদিনায় এলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। **রাসূল সা তাদের উটের** নিকট যাবার এবং ওর **পেশাব** ও দুধ **পান করার নির্দেশ দিলেন**। তারা সেখানে চলে গেল। অতঃপর তারা রাখালকে হত্যা করে উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এ সংবাদ রাসূলের নিকট এসে পৌঁছল। **তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনে জন্য লোক পাঠালেন। তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হল।**

অতঃপর **রাসূলুল্লাহ্ সা এর আদেশে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হল। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়া হল এবং উত্তপ্ত পাথুরে ভূমিতে তাদের নিক্ষেপ করা হল। তারা যন্ত্রণায় পাথর কামড়ে ধরে ছিল। তারা পানি চাইছিল, কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। তারা নিজের জিভ দিয়ে মাটি কামড়াতে থাকে, অবশেষে মারা যায়।**

৩০১৮ ....**রাসূল সা এর নির্দেশে লৌহ শলাকা গরম করে তাদের চোখে ঢুকানো হয়** এবং তাদেরকে উত্তপ্ত ভূমিতে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চেয়েছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। **অবশেষে তাদের মৃত্যু ঘটে**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

পর্বঃ কিসাস (প্রতিশোধ)

পরিচ্ছেদঃ ধর্মত্যাগ এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে হত্যা করা প্রসঙ্গে

৩৫৩৯। ....রাসূলুল্লাহ সা লৌহ শলাকা আনার হুকুম করলেন, যাকে গরম করা হলো এবং তাদের চোখের উপর দেয়া হলো। অতঃপর তাদেরকে উত্তপ্ত মাটিতে ফেলে রাখলেন। তারা পানি চাইল কিন্তু তাদেরকে পানি পান করানো হয়নি। পরিশেষে তারা এ করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।

------------------------------- মুখতাসার যাদুল মা'আদ ------------------------------- 304

উরায়নার ঘটনা

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন- একদা উরায়না কিংবা উক্ল গোত্রের কিছু লোক নাবী (ﷺ) এর কাছে আগমণ করল। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থের অনুকুল না হওয়ার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে গেল। নাবী (ﷺ) তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যেতে আদেশ করলেন এবং বললেন- তোমরা উটের দুধ এবং পেশাব পান কর। তারা তথায় চলে গেল। কিছু দিন পর সুস্থ হয়ে তারা নাবী (ﷺ) এর রাখালকে হত্যা করল এবং পশুগুলো নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। দিবসের প্রথম ভাগে যখন নাবী (ﷺ) এর নিকট এ সংবাদ আসল, তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য একদল সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। দ্বিপ্রহরের সময় তাদেরকে পাকড়াও করে রসূল (ﷺ) এর দরবারে নিয়ে আসা হল। নাবী (ﷺ) এর আদেশে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল এবং লোহার কাঠি গরম করে তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দেয়া হল। তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত বালুর উপর ফেলে রাখা হল। তারা পানির পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলেও তাদেরকে পানি দেয়া হল না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন- এই ঘটনা থেকে জানা গেল, (১) উটের পেশাব পান করা জায়েয।

(২) যে সমস্ত পশুর গোশত খাওয়া হালাল সে সমস্ত পশুর পেশাব পবিত্র।

৬৭৮৩ নবী সা বলেন, চোরের উপর আল্লাহর লানত হোক, এ জন্য তার হাত কাটা হয় এবং সে একটি রশি চুরি করে এ জন্য তার হাত কাটা হয়।

৬৭৯৮ **নবী সা তিন দিরহাম মুল্যের ঢাল চুরির জন্য চোরের হাত কেটেছেন**।

৬৭৯৯ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেন, আল্লাহর লানত বর্ষিত হয় চোরের উপর যে একটি ডিম চুরি করেছে তাতে তার হাত কাটা গেছে বা একটি দড়ি চুরি করেছে যার ফলে তার হাত কাটা গেছে।

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)

৪২৬১। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা অভিসম্পাত করেন সে চোরের ওপর, **যে একটি ডিম (বা ডিমের মূল্যের পরিমাণ বস্তু) চুরি করল। এতে তার হাত কাটা যাবে**। আর যে ব্যক্তি একটি দড়ি কিংবা দড়ির সমমূল্যের পরিমাণ বস্তু চুরি করল, তারও হাত কাটা যাবে।

আবু দাউদ (ইফা)

৪৩৫৮। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ জনৈক চোরকে রাসূলুল্লাহ সা এর সামনে হাযির করা হলে, **তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন সাহাবীগণ বলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসুল! এ লোক তো কেবল চুরি করেছে !** তখন রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ তবে তার হাত কেটে দাও। তখন সে ব্যক্তির ডান হাত কেটে দেওয়া হয়।

#ক্লেপটোম্যানিয়া হচ্ছে একটি মানসিক সমস্যা। এই সমস্যায় আক্রান্ত মানুষ চুরি করার আকাঙ্ক্ষা কোনভাবেই দমন করতে পারে না। তারা কোন বাসায় বেড়াতে গেলে কিছু জিনিস লুকিয়ে নিয়ে আসে, আবার কোন দোকানে গেলেও কিছু চুরি করে আনে। তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, এই অভ্যাসটি পরিত্যাগ করা। যত শাস্তিই দেয়া হোক না কেন, তারা চুরি করবেই। এদের জন্য প্রয়োজন মানসিক চিকিৎসার। নিচের হাদিসটি পড়ুন,

সূনান আবু দাউদ (ইফা)

পরিচ্ছদঃ যে বার বার চুরি করে, তার শাস্তি সম্পর্কে।

৪৩৫৮। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ জনৈক চোরকে নবী করীম সা-এর সামনে হাযির করা হলে, তিনি বললেনঃ তার হাত কেটে দাও। তখন সে ব্যক্তির **ডান হাত কেটে দেওয়া হয়**। এরপর সে দ্বিতীয়বার চুরি করলে, তাকে নবী সা-এর নিকট উপস্থিত করা হয় এবং তিনি বলেনঃ তার পা কেটে দাও। **তখন তার বাম-পা কেটে ফেলা হয়**। এরপর সে ব্যক্তিকে তৃতীয় বার চুরির কারণে নবী করীম সা-এর সামনে পেশ করা হলে, তিনি কাটার নির্দেশ দিলে, সে ব্যক্তির **বাম-হাত কাটা হয়**। পরে সে ব্যক্তিকে চতুর্থবার নবী সা এর সামনে পেশ করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ বলেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসুল! এ ব্যক্তি তো চুরি করেছে। তখন তিনি কাটার নির্দেশ দিলে তার **ডান-পা কেটে ফেলা হয়**।
এরপর সে ব্যক্তিকে **পঞ্চমবারের** অপরাধের কারণে নবী সা এর সামনে হাযির করা হলে, তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। জাবির (রা) বলেনঃ এরপর **আমরা তাকে প্রান্তরে নিয়ে হত্যা করি এবং তার লাশ টেনে কূপের কাছে নিয়ে তাতে নিক্ষেপ করি। পরে তার মৃত দেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করি**।

৫৪০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে উপরিউক্ত হাদীসটি এইভাবে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে জনৈক মহিলা চুরি করে। যাহাদের মাল চুরি করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আনিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলাটি আমাদের মাল চুরি করিয়াছে। তখন মহিলার বংশের লোকেরা আসিয়া বলিল, আমরা ইহার ক্ষতি পূরণ দিব। তথাপি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ইহার হাত কাটিয়া দাও। ইহার পর মহিলার বংশের লোকেরা পাঁচশত দীনার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার তোয়াক্কা না করিয়া বলিলেন ঃ ইহার হাত কাটিয়া দাও। ফলে তাহার ডান হাত কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন মহিলাটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি আমার জন্য তওবা স্বরূপ ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ এখন তুমি পাপ হইতে

সূরা মায়িদা ৫৩৫

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ একব্যক্তি তিন দিরহাম মূল্যের জানালার একফালি কাঠ চুরি করার অভিযোগে হযরত উসমান (রা) তাহার হাত কাটিয়া দিয়াছিলেন।

ইমাম মালিক (র)......আমরাহ্ বিনতে আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করেন যে, আমরাহ্ বিনতে আবদুর রহমান বলেন ঃ উসমান (রা)-এর শাসনামলে এক ব্যক্তি দরজার একফালি কাঠ চুরি করে। উসমান (রা) উহার মূল্য নির্ধারণ করিতে আদেশ দেন এবং উহার মূল্য দাঁড়ায় মাত্র তিন দিরহাম। অতঃপর হযরত উসমান (রা) তাহার হাত কাটিয়া দেন।

সহীহ মুসলিম (ইফা), পরিচ্ছদঃ **রাসুলুল্লাহ সা এর হেরেম** সন্দেহমুক্ত হওয়া

৬৭৬৬। রাসুলুল্লাহ সা এর স্ত্রীদের সাথে এক ব্যক্তির প্রতি অভিযোগ(অপবাদ) উত্থাপিত হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সা আলী (রাঃ) কে বললেন, **যাও। তার গর্দান উড়িয়ে দাও**। আলী (রাঃ) তার নিকট গিয়ে দেখলেন,তার পুরুষাঙ্গ কর্তিত, তার লিঙ্গ নেই। তখন আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলেন। তারপর তিনি নবী সা এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে তো লিঙ্গ কর্তিত তার তো লিঙ্গ নেই!

৭৩৫০ রাসূলুল্লাহ সা বনী আদী গোত্রের এক লোককে খায়বারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন। এরপর সে ফিরে আসল উন্নতমানের খেজুর নিয়ে। তখন নবী সা জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এ রকম? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! সব খেজুরই এমন নয়। আমরা দু কেজি মন্দ খেজুরের বিনিময়ে এরূপ এক কেজি ভাল খেজুর খরিদ করেছি। রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ এমন কোরো না। বরং সমানে সমানে কেনা বেচা করো। কিংবা এগুলো বিক্রি করে এর মূল্য দিয়ে সেগুলো খরিদ করো। ওজনের সব জিনিসের হুকুম এটাই।

৫৬২০ পরিচ্ছেদ: পান করতে দেয়ার ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য তার ডানে অবস্থিত লোক থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

সাহল ইবনু সাদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা এর সামনে শরবত পেশ করা হল, তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানে ছিল একটি বালক, আর বামে ছিলেন কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি।

তখন নবী সা বালকটিকে বললেনঃ তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যে, আমি ঐ বয়স্ক লোকদের আগে পান করতে দেই? বালকটি বললঃ আল্লাহর কসম! আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না। রাসূলুল্লাহ সা তখন পেয়ালাটি বালকটির হাতে তুলে দিলেন।

৩৬১১ নবী সা বলেছেন, শেষ যুগে একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। তারা মুখে খুব ভাল কথা বলবে। তারা ইসলাম হতে বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে না। যেখানেই এদের সঙ্গে তোমাদের দেখা মিলবে, এদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদের হত্যা করবে তাদের এই হত্যার পুরস্কার আছে কিয়ামতের দিন।

৫০৫৭ ....তাদের ঈমান গলার নীচে পৌঁছবে না। সুতরাং তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও, হত্যা করবে। এদের হত্যাকারীর জন্য কিয়ামতে পুরস্কার রয়েছে।

৫৩১১ সাঈদ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, এক লোক তার স্ত্রীকে যিনার ব্যাপারে দোষী বলল- তার বিধান কী? তিনি বললেন, নবী সা বনূ আজলানের স্বামী-স্ত্রীর দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহ জানেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাচারী। সুতরাং কেউ তওবা করতে প্রস্তুত আছ কি? তারা দুজনেই অস্বীকার করল। এরপর তিনি তাদেরকে পৃথক করে দেন।

তারপর লোকটি বললঃ আমার দেয়া মালের(মোহরানা) কী হবে? তাকে বলা হল, **তোমার মাল(মোহরানা) ফিরে পাবে না। কেননা তুমি তার সঙ্গে সহবাস করেছ**।

৫৩৬৮ নবী সা-এর নিকট এক লোক এলো এবং বলল আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেনঃ কেন? সে বললঃ রামাযান মাসে আমি দিবসে স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি।

তিনি বললেনঃ একনাগাড়ে দু’মাস সওম পালন কর। সে বললঃ সে ক্ষমতা আমার নেই। তিনি বলেনঃ তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াও। সে বললঃ সে সামর্থ্যও আমার নেই।

এ সময় নবী সা-এর কাছে এক বস্তা খেজুর এল। রাসূল বললেনঃ এগুলো সাদাকাহ কর। সে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার চেয়ে অভাবগ্রস্তকে দিব। আল্লাহর শপথ, মদিনার প্রস্তরময় দু’পার্শ্বের মধ্যে আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কোন পরিবার নেই। তখন নবী সা হাঁসলেন এমন কি তাঁর চোয়ালের দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল এবং বললেনঃ আচ্ছা, তুমি তা নিয়ে যাও।

৭২১৩ রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ তোমরা চুরি করবে না, যিনা করবে না; তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না এবং কোন ব্যক্তিকে এমন মিথ্যা অপবাদ দেবে না যা তোমাদেরই গড়া, আর **যদি কেউ এর কোন একটি অপরাধ করে ফেলে আর আল্লাহ্ যদি তা গোপন রাখেন, তাহলে তার বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত**। তিনি ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছে করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

৪৮১০ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, মুশরিকদের কিছু লোক বহু হত্যা করে এবং বেশি বেশি ব্যভিচারে((ধর্ষণ,পরকীয়াসহ যেকোনো বিবাহব্যতীত যৌনমিলনকে যিনা/ব্যভিচার বলে) লিপ্ত হয়। তারপর তারা মুহাম্মদ সা-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর বলল আমাদের যদি অবগত করতেন, আমরা যা করেছি, তার শাস্তি কী? এর প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয় - ''হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন সকল পাপ।''(৩৯/৫৩)

সহীহ মুসলিম (ইফা)

১৭৫। আবূ যার (রা) বলেন, আমি নবী সা বললেনঃ যে কোন বান্দা لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই) বলবে এবং এ বিশ্বাসের উপর মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি আরয করলাম, যদি সে ব্যভিচার করে করে তবুও? রাসুল সা বললেনঃ যদিও সে ব্যভিচার করে। আমি আবার আরয করলাম, **যদি সে ব্যভিচার করে তবুও**? রাসুল সা বললেনঃ যদিও সে ব্যভিচার করে। এ কথাটি তিনবার পূনরাবৃত্তি করা হল। চতুর্থবারে রাসুলুল্লাহ সা বললেনঃ **আবু যারের অপছন্দ হলেও (সে জান্নাতে প্রবেশ করবে)**।

সহীহ বুখারী (ইফা)

৭০০১। আনাস (রা) বলেন, নাবী সা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশে যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকেও জান্নাতে দাখিল করা হবে।

৬৪০৫ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ যে লোক প্রতিদিন একশ'বার সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ বলবে, তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।

৭০৬৭ নবী সা বলেছেন, কিয়ামত যাদের জীবনকালে সংঘটিত হবে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)

৫৬৯৮। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সা এর সাথে এক এলাকায় সফর করছিলাম। তখন এক কবি কবিতা আবৃতি করতে করতে আসতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ **শয়তানটাকে রুখে দাও**। **কোন লোকের পেট পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া কবিতায় ভর্তি হওয়া থেকে উত্তম**।

৬৮৪৩ দুজন লোক রাসূলুল্লাহ্ সা-এর নিকট তাদের বিবাদ নিয়ে আসল। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কিতাব মুতাবিক আমাদের বিচার করে দিন। তারপর বলল, আমার ছেলে তার মজুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলেছে।

তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সা বললেনঃ কসম ঐ সত্তার! অবশ্যই আমি আল্লাহর কিতাব মুতাবিক তোমাদের উভয়ের মাঝে ফায়সালা করব। ছেলেটিকে একশ বেত্রাঘাত করলেন ও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করলেন। আর উনাইস (রা.)-কে আদেশ করলেন যেন সে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যায় এবং যদি সে স্বীকার করে তবে যেন তাকে রজম(পাথর মেরে হত্যা) করে।

৫৪৯০,১৮২৩ আবূ ক্বাতাদাহ (রা.) নবী সা এর সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে তিনি মক্কার কোন এক রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁরা ছিলেন ইহরাম বাঁধা অবস্থায়। আর তিনি ছিলেন ইহরাম বিহীন। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে গাধাটির পিছনে দ্রুত গতিতে ছুটলেন এবং সেটিকে হত্যা করলেন। নবী সা এর সাহাবীদের কেউ কেউ তা খেলেন, আবার কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে তাঁরা যখন নবী সা এর কাছে পৌঁছলেন তখন তাঁরা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ এটি তো এমন খাদ্য যা আল্লাহ তোমাদের খাওয়ার জন্য দিয়েছেন।

২৮৫৪ আবূ ক্বাতাদাহ (রা.) একদা একটি বন্য গাধা শিকার করে সঙ্গীদের নিয়ে এর গোশ্ত আহার করেন। এতে তারা লজ্জিত হন। অতঃপর তারা যখন আল্লাহর রাসূল সা-এর নিকট পৌঁছলেন তখন তিনি বলেন, গাধাটির কোন অংশ তোমাদের নিকট আছে কি? তারা বললেন, আমাদের সঙ্গে একটি পায়া আছে। নবী সা তা নিয়ে আহার করলেন।

৫৫২৭ আবূ সালাবা (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সা গৃহপালিত গাধার মাংস খাওয়া হারাম করেছেন।

৬৫৩৭ আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী সা বলেনঃ কিয়ামতের দিন যারই হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ কি বলেননি, অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবেই নেয়া হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ তা কেবল পেশ করা মাত্র। কিয়ামতের দিন যার হিসাব খতিয়ে দেখা হবে তাকে অবশ্যই আযাব দেয়া হবে।

৬৪২৩ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে এবং এ বিশ্বাস সহকারে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

৬৬৫৬ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেনঃ **যে মুসলিমের তিনটি সন্তান মারা গেছে (সে যদি ধৈর্য ধরে) তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না**।

সুনান ইবনু মাজাহ
পরিচ্ছেদঃ সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতার সওয়াব।
১৬০৪। উতবা ইবনু আবদুস সুলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা-কে বলতে শুনেছিঃ **কোন মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা গেলে, সে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করতে পারবে**।

সুনান ইবনু মাজাহ
পরিচ্ছেদঃ কোন মহিলার গর্ভপাত হলে।
১৬০৯। মুআয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, নবী সা ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ! গর্ভপাত হওয়া সন্তানের মাতা তাতে সওয়াব আশা করলে ঐ সন্তান তার নাভিরজ্জু দ্বারা তাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

৬৫৩ রাসূল সা বলেনঃ কলেরায় মৃত ব্যক্তি শহীদ।

৩৩৯৪ নবী সা বলেন, মিরাজের রাতে আমার সম্মুখে দু'টি পেয়ালা আনা হল। তার একটিতে ছিল দুধ আর অপরটিতে ছিল শরাব। তখন জিব্রাঈল (আ.) বললেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি স্বভাব প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। দেখুন, **আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মাতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত !**

৪৯০৭ জাবির (রা.) বলেন, নবী সা যখন মদিনায় হিজরত করে আসেন তখন আনসার সাহাবীগণ ছিলেন সংখ্যায় বেশি। এক যুদ্ধে আমরা যোগদান করেছিলাম। জনৈক মুহাজির, আনসারদের এক ব্যক্তির নিতম্বে আঘাত করলেন। এ সব কথা শুনার পর আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই বলল, সত্যিই তারা কি এমন করেছে? আল্লাহর কসম! আমরা মদিনায় ফিরলে সেখান হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বের করে দিবে!
তখন উমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী সা বললেন, **তাকে ছেড়ে দাও, যাতে লোকেরা এমন কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীদের হত্যা করেছেন**।

৩৬৯৯ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন- **ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) উহুদ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে গিয়েছিলেন**।

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত), দিয়াত বা রক্তপণ
১৪০০। রাসূলুল্লাহ সা বলেন- ছেলেকে খুনের অপরাধে বাবাকে হত্যা করা যাবে না, (তবে দিয়াত প্রদান করতে হবে)।

মুসনাদে আহমাদ
৩৪৬। **এক ব্যক্তি তার ছেলেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলো**। উমার (রা) এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের হলো। তিনি হত্যাকারীর ওপর একশো উট জরিমানা ধার্য করলেন। উমার(রা) বললেন, **আমি যদি রাসূলুল্লাহ সা কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, পিতাকে সন্তান হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না, তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতাম।**

৫৯৫০ নবী সা বলেছেন, কিয়ামতের দিন **মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে** তাদের, যারা প্রাণীর ছবি তৈরি করে।

↥

রিয়াযুস স্বা-লিহীন

পরিচ্ছদঃ পাথর, দেওয়াল, ছাদ, মুদ্রা ইত্যাদিতে প্রাণীর মূর্তি খোদাই করা হারাম। অনুরূপভাবে দেওয়াল, ছাদ, বিছানা, বালিশ, পর্দা, পাগড়ী, কাপড় ইত্যাদিতে প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করা হারাম এবং মূর্তি ছবি নষ্ট করার নির্দেশ

১৬৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা-কে বলতে শুনেছি যে, ‘‘প্রত্যেক ছবি বা মূর্তি নির্মাতা জাহান্নামে যাবে, তার নির্মিত প্রতিটি ছবি বা মূর্তির পরিবর্তে একটি করে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে।’

৫৯৫২ আয়িশাহ (রা.) বলেন, নবী সা নিজের ঘরের এমন কিছুই না ভেঙ্গে ছাড়তেন না, যাতে কোন (প্রাণীর) ছবি থাকত।

সহীহ মুসলিম (ইফা)

পরিচ্ছেদঃ যে ব্যাক্তি কুফরী অবস্থায় মারা যায়, তার কোন আমল তার উপকারে আসবে না

৪১১। আয়িশা (রা) বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইবনু জুদআন(অমুসলিম)- জাহেলী যুগে আত্নীয়-স্বজনদের হক আদায় করত এবং দরিদ্রদের আহার দিত। আখিরাতে এসব কর্ম তার উপকারে আসবে কি? রাসুলুল্লাহ সা বললেনঃ কোন উপকারে আসবে না।

সুনান ইবনু মাজাহ, ১২/ ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিচ্ছেদঃ ব্যক্তি মূল্য বেঁধে দেয়া অপছন্দ।

২২০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা এর যুগে একবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেনঃ **নিশ্চয় আল্লাহ মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সংকোচনকারী, সম্প্রসারণকারী** এবং রিযিক দানকারী। সুনান আদ-দারেমী ২৫৮৩, ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ **মুসলিমদের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেওয়া নিষেধ। !**

৬৬৪২ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ শপথ ঐ সত্তার! নিশ্চয়ই আমি কামনা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে।

৭২৭৪ রাসূলুল্লাহ সা বলেন- আমি আশা করি যে, **কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা সবার চেয়ে বেশি হবে**। !!

৬৭৭৬ আনাস (রা.) বলেন, **রাসূলুল্লাহ্ সা মদ পানের জন্য-** গাছের ডাল এবং **জুতা দ্বারা পিটিয়েছেন**।

৬৭৭৮ আলী (রা.) বলেন, আমি কাউকে শরীয়াতের দন্ড দেয়ার সময় সে তাতে মরে গেলে আমার দুঃখ হয় না। কিন্তু মদ পানকারী ছাড়া। সে মারা গেলে আমি জরিমানা দিয়ে থাকি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সা এ শাস্তির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারণ করেননি।

সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

৪৩৪৪। নবী সা এর নিকট একদিন একজন মদপানকারী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো। তখন তিনি দু’টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশ বারের মত তাকে বেত্রাঘাত করলেন। আবু বাকর (রা)-ও তার খিলাফত আমলে তাই করেন। পরে যখন উমার (রা) খালীফা হলেন, তিনি এ ব্যাপারে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ চাইলেন। তখন আবদুর রহমান (রা) বললেন, অপরাধের শাস্তি কমপক্ষে আশি বেত্রাঘাত হওয়া প্রয়োজন। তাই উমার (রা) এরই নির্দেশ দিলেন।

৪৬৮৭ একবার এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমু দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সা-এর কাছে এসে এ ঘটনা বললেন, তখন এ ঘটনা উপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হয়- অবশ্যই মুছে ফেলে বদ কাজ(11/114)

৫২৬ এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুম্বন করে বসে। পরে সে আল্লাহর রাসূল সা এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করে। তখন আল্লাহ্ তা’আলা আয়াত নাযিল করেনঃ ’’দিনের দু’প্রান্তে- সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম অংশে সালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ভালো কাজ পাপাচারকে মিটিয়ে দেয় ’’- (হূদ ১১/১১৪)। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ কি শুধু আমার বেলায়? আল্লাহর রাসূল সা বললেনঃ আমার সকল উম্মাতের জন্যই।

রিয়াযুস স্বা-লিহীন

২৪৫। নবী সা বলেন, ‘‘যে দুনিয়াতে কোনো বান্দার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।’’

সূনান তিরমিজী (ইফা)

৩১১৫। আবুল ইউসর রা বলেনঃ এক মহিলা একবার আমার কাছে খেজুর কিনতে আসল। আমি বললামঃ ঘরে আরো ভাল খেজুর আছে, সে তখন আমার সাথে ঘরে প্রবেশ করল। আমি তার দিকে ঝুঁকে তাকে চুমু দেই। পরে **আবূ বকর রা-এর কাছে এসে তার বিষয়টি বললাম। তিনি বললেনঃ নিজের মধ্যে তা গোপন রাখ, আর তওবা কর। এ বিষয়ে কাউকে জানাবে না**। কিন্তু (অনুশোচনায়) আমি স্থির থাকতে পারলাম না। উমর রা এর কাছে এসে বিষয়টি বললাম, তিনিও বললেনঃ **নিজের মধ্যেই তা গোপন রাখ, আর তওবা কর। এ বিষয়ে কাউকে জানাবে না**।

ইসলামে ধর্ষণের বিচার

সূনান আবু দাউদ (ইফা)

৪৩২৮। ওয়ায়েল (রা) বর্ণনা করেন, নরী সা এর যামানায় জনৈক মহিলাকে একজন পুরুষ **জোরপূর্বক ধর্ষণ করে**। সে মহিলা চিৎকার দিলে, তার পাশ দিয়ে মুহাজিরদের একটি দল গমনকালে সে মহিলা তাদের বলেঃ অমুক ব্যক্তি আমার সাথে এরূপ কাজ করেছে। তারপর তারা গিয়ে এক ব্যক্তিকে ধরে আনে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল যে, সেই এরূপ করেছে। এরপর তারা সে ব্যক্তিকে উক্ত মহিলার কাছে উপস্থিত করলে, সেও বলেঃ হ্যাঁ। এই ব্যক্তিই এ অপকর্ম করেছে।
তখন তাঁরা সে ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সা এর নিকট নিয়ে যায়। নবী সা সে ব্যক্তির উপর শরীআতের নির্দেশ জারী করার মনস্থ করেন, তখন অপকর্মকারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায় এবং বলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি-ই অপকর্ম করেছি। তখন **নবী সা সে মহিলাকে বলেনঃ তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমার অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন**। তখন সাহাবীগন নবী সা এর নিকট ধর্ষণকারী লোকটিকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করলে, তিনি বলেনঃ লোকটি এমন তাওবা করেছে যে, সমস্ত মদীনাবাসী এরূপ তাওবা করলে, তা কবূল হতো।

সূনান আবু দাউদ (ইফা)

৪৩২৮। ....এক ব্যক্তি তাকে নাগালে পেয়ে তার উপর চেপে বসে তাকে ধর্ষণ করে। সে চিৎকার দিলে লোকটি সরে পড়ে।......... অপরাধী ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ রাসূল! আমিই অপরাধী। তিনি ধর্ষিতা মহিলাটিকে বললেনঃ তুমি চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। নবী সা অপরাধী লোকটি সম্পর্কে বললেনঃ ‘সে এমন তওবা করেছে যে, মদীনাবাসী যদি এরূফ তওবা করে, তবে তাদের পক্ষ থেকে তা অবশ্যই কবূল হবে’। অগ্রাধিকারযোগ্য কথা হলো, তাকে পাথর মারা হয়নি।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী কারো উপর যিনার অভিযোগ আরোপ করতে হলে চারজন মুসলিম সত্যবাদী পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক, যারা স্বচক্ষে সরাসরি এই যিনা প্রত্যক্ষ করেছে।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
পরিচ্ছেদঃ ২৬. দুই ইয়াহুদীকে পরকীয়ার শাস্তি দেয়ার ঘটনা

৪৪৫২। ....রাসূলুল্লাহ সা সাক্ষীদের নিয়ে আসতে ডাকলেন। তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে এলো। **তারা সাক্ষ্য দিলো যে, সুরমা শলাকা যেরূপ সুরমাদানির ভিতরে ঢুকে যায় ঠিক সেরূপই তারা পুরুষটির গুপ্তাঙ্গ স্ত্রী লোকটির গুপ্তাঙ্গের মধ্যে ঢুকানোর অবস্থায় দেখেছে**। অতঃপর নবী সা তাদের পরকীয়ার শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দেন।

৩. মাসআলা ঃ সাধারণতঃ যিনা তখনই সাব্যস্ত হবে যদি চার ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হয়ে হাকিমের নিকট এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অমুক ব্যক্তি যিনা করেছে। এক্ষেত্রে সঙ্গম (جماع - وطى) শব্দ যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ এ জাতীয় শব্দের দ্বারা যিনা সাব্যস্ত হবে না (তাবয়ীন)। যখন চার ব্যক্তি একই মজলিসে কারো ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করবে, তখন বিচারক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, যিনা কি বস্তু এবং সে কোথায় যিনা করেছে? এরপর যখন তারা এই রূপ বর্ণনা করবে যে, সে প্রকৃতই যিনা করেছে এবং আমরা তাকে সুরমাদানিতে কাঠি ঢুকানোর ন্যায় তার জননেন্দ্রিয়কে অমুক মহিলার যোনিদ্বারে ঢুকানো অবস্থায় দেখেছি, তখন বিচারক তাদেরকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে কিরূপে যিনা করেছে? যখন তারা এর ধরন বিচারকের সামনে তুলে ধরবে তখন বিচারক আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে কখন যিনা করেছে ? এরপর যখন তারা এমন সময়ের কথা বর্ণনা করবে যে, এতে বেশী সময় বুঝা যায় না, তখন বিচারক ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যার সাথে যিনা করা হয়েছে। এরপর বিচারক সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, কোন জায়গায় যিনা করা হয়েছে। ঐ জায়গার কথা যখন তারা বর্ণনা করবে এবং বিচারক ব্যক্তিও সাক্ষীদের আদালত (عدالة) তথা ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আছেন তখন তিনি مشهود عليه (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হচ্ছে) এর احصان। অর্থাৎ শরঈ নিয়ম মত সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে কিনা এ সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদি সে (مشهود عليه) বলে, আমি محصن (বিবাহিত) অথবা যদি বলে, আমি محصن (বিবাহিত) নই কিন্তু সাক্ষিগণ সে বিবাহিত বলে সাক্ষ্য দেয় তখন বিচারক তাকে (مشهود عليه) -কে احصان। এর সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করবেন। যদি সে তা ঠিক ঠিক বর্ণনা করে তবে তাকে রজম করা হবে অর্থাৎ তার প্রস্তরাঘাত করা হবে। প্রস্তরাঘাত করা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, আমি বিবাহিত নই এবং সাক্ষিগণও তার বিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে তাকে দোররা (বেত) লাগানো হবে।

৪. মাসআলা ঃ চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য দেওয়ার পর তাদেরকে যিনার প্রকৃতি, বাস্তবতা ও এর ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তারা বলল, আমরা আপনার নিকট এর থেকে বেশী কিছু বলতে পারব না, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তাদের উপর অপবাদ প্রদানজনিত হদ্দ (حد قذف) ও প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা সাক্ষির জন্য যে সংখ্যার প্রয়োজন তাদের সে সংখ্যা রয়েছে। এইভাবে সাক্ষীর সংখ্যা পূর্ণ হওয়া তাদের উপর 'হদ্দে কযূফ' ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। যেমন কোন ব্যক্তির যিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে চারজন মহিলা সাক্ষ্য দিলে ঐ মহিলাদের উপর হদ্দে কযূফ (অপবাদ প্রদানজনিত হদ্দ) প্রয়োগ করা যায় না। এমনিভাবে সাক্ষিদের কেউ কেউ যিনার প্রকৃত সংজ্ঞা

৪. স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট ও বিশদ বর্ণনাসম্বলিত হতে হবে।

অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কখন, কার সাথে, কোন স্থানে, কোন অবস্থায় ও কিভাবে সঙ্গম করা হল তার বিশদ বিবরণ স্বীকারোক্তিতে থাকা প্রয়োজন।[৯৯]

৫. স্বীকারোক্তির ওপর অটল থাকতে হবে।

যদি স্বীকারোক্তি প্রদানকারী নারী-পুরুষ কোন পর্যায়ে নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

↥

অনুরূপভাবে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হওয়া ছাড়া কেউ যিনা করে অস্বীকার করলে তার ওপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এমনকি এ অপরাধ প্রকাশিত হয়ে না পড়লে তা গোপন করে রাখাই শ্রেয়।

২. সাক্ষ্য-প্রমাণ

যিনা প্রমাণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হল সাক্ষ্য-প্রমাণ। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাবে। তবে এ জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন-

ক. সাক্ষীদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. সাক্ষীদেরকে মুসলিম হতে হবে

অমুসলিমদের সাক্ষ্য যিনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীদের প্রত্যেককে মুসলিম হতে হবে। যদি কোন একজন সাক্ষীও অমুসলিম হয়, তাহলে সাক্ষ্যের নিসাব পূর্ণ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فاستشهدوا عليهن

৩. সাক্ষীদেরকে পুরুষ হতে হবে।

চার মাযহাবের ইমামগণের মতে, যিনার চারজন সাক্ষীর প্রত্যেককেই পুরুষ হতে হবে। মহিলাদের সাক্ষ্য যিনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।[১০৯]

৪. সাক্ষীদের সংখ্যা চার হতে হবে।

যিনা প্রমাণের জন্য চার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি সাক্ষীদের সংখ্যা একজনও কম হয়, তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে যিনা প্রমাণিত হবে না। উপরন্তু, যারা সাক্ষ্য দেবে, তাদের ওপর অপবাদ রটানোর হদ্দ কার্যকর করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

খ. সাক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

২. সাক্ষীদের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট ও বিশদ হতে হবে।

সাক্ষীদেরকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, সুরমাদানীর মধ্যে সুরমা লাগানোর কাঠি যেমন ঢোকা অবস্থায় থাকে, তেমনি তারা পুরুষাঙ্গকে নারীর যোনীর মধ্যে ঢোকানো অবস্থায় দেখেছে। কেননা অনেক সময় সাক্ষীরা এমন অনেক আচরণকে যিনা মনে করে নিতে পারে যে, যা মূলত যিনা নয়। তাই এ ক্ষেত্রে যিনার বিবরণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তদুপরি এ কথাও সুনির্দিষ্ট ও বিশদভাবে বলতে হবে যে, কার সাথে, কি অবস্থায়, কখন ও কোথায় যিনা সংঘটিত হয়েছে।[১১৪] এ থেকে জানা যায়, তারা দুজনে যিনা করেছে- সাক্ষীদের এমন কথার ওপর ভিত্তি করে কারো ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

আশরাফুল হিদায়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৭

অধ্যায় : হুদূদ (শাস্তি) ১৬৭ كتاب الحدود

অনুবাদ : সাক্ষীদের সংখ্যা যদি চারের কম হয় তাহলে তাদের হদ্দে কযফ কার্যকর হবে। কারণ (আইনত) তারা অপবাদ আরোপকারী। কেননা সংখ্যার অপূর্ণতার সময় সাক্ষ্যদান কোনো ছওয়াবের কাজ নয়। আর

ইসলামি শরীয়তে অডিও, ভিডিও, ডিএনএ বা যেকোন মেডিকেল টেস্ট, এগুলো কিছুই হদ্দের শাস্তি দেয়ার বেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়ত যেসমস্ত বিষয়কে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করবে, সেগুলোই প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া বাদবাকি সমস্ত কিছুই ইসলামী শরীয়া আদালতে বাতিল হয়ে যাবে।

https://islamqa.info/en/answers/6926/how-can-zinaa-be-proven বাংলা অনুবাদ

প্রশ্নঃ আমি জানি যে, অতীতে কাউকে যিনার দায়ে অভিযুক্ত করতে হলে তাদের ৪ জন সাক্ষী নিয়ে আসতে হতো। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান সময়ে ৪ জন সাক্ষী আনার পরিবর্তে কি আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে-যেমন ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে পারি?

উত্তরঃ ইসলামী শরিয়াহ অনুসারে, জিনা কেবল সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে, যথা চারজন বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্যবাদী সাক্ষী, যারা সরাসরি তা দেখেছিল, বা অভিযুক্ত যদি দোষ স্বীকার করে বা মহিলা যদি গর্ভবতী হয়। উপরে উল্লিখিত প্রমাণের পরিবর্তে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বা ক্যামেরা এবং ভিডিও প্রমাণের সাহায্যে এটি প্রমাণিত হতে পারে না।

Islamweb থেকে

Fatwa Title: **Proving Rape by Modern Medical Means**

Fatwa No: 70220

As for proving rape by modern medical means**, this is impermissible because Allah, the Exalted, enjoined that for zina to be proven, four witnesses must give their testimony, and He identified specific conditions for the testimony to be accepted.** Such restrictions are set forth by the sharia in order to conceal people's sins and safeguard their honor. It is impermissible to renounce these conditions and seek other means.

৪৭৪৭ হিলাল ইবনু উমাইয়াহ রাসূলুল্লাহ্ সা এর কাছে শারীক ইবনু সাহমার সঙ্গে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করল। নবী সা বললেন, সাক্ষী হাযির কর নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে। হিলাল বলল, **হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর উপর অন্য কাউকে দেখে তখন সে কি সাক্ষী তালাশ করতে যাবে?** নবী সা বলতে লাগলেন, সাক্ষী, নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ সা এর উপর অবতীর্ণ হলঃ ''যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে'' থেকে ''যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে'' পর্যন্ত। তারপর **হিলাল এসে সাক্ষ্য দিলেন। তারপর স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল**। আর রাসূলুল্লাহ্ সা বলছিলেন, **আল্লাহ্ তাআলা জানেন যে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাচারী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করবে?**

সময়টি আরব অঞ্চলে নবী মুহাম্মদের ত্রাস সৃষ্টির। দিকে দিকে ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে নবী মুহাম্মদের সাহাবীরা ছুটে যাচ্ছে, এবং গোত্রগুলোকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাচ্ছে। ইসলাম গ্রহণ করলে ভাল, নইলে আহলে কিতাবিদের জন্য অপমানিত অবস্থায় নত হয়ে জিজিয়া দাও নতুবা কতল করা হবে। মুশরিকদের জন্য তো শুধুমাত্র কতল কিংবা ইসলাম গ্রহণের বিধান। একটি অতি তুচ্ছ প্রেমের ঘটনা। মুহাম্মদের আগ্রাসী যুদ্ধে যেই গল্পটির কথা কেউ মনে রাখে নি। যেই প্রেমিক আর প্রেমিকার কথা সবার অগোচরেই রয়ে গেছে। যাদের প্রাণ গেছে নবীর জিহাদের নৃশংস ভয়াবহতায়।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে ভয়াবহতম খুনীদের একজন। নৃশংসতায় তার কোন তুলনা ছিল না। সে এত নির্মমতার সাথে এত কাফের হত্যা করেছে, যার কোন হিসেবই নেই। এত কাফের গোত্রকে সে সমূলে উধাও করে দিয়েছে, এত মানুষ মেরেছে, যার কারণে তার নাম শুনলেও তার বর্বরতার কারণে কাফেরদের এলাকাতে মহিলারা ভয়ে আতঙ্কে কাঁদতে শুরু করতো বলে ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায়। সেই খালিদ ইবন ওয়ালিদকে পাঠানো হয়েছিল একটি গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দিতে। খালিদের মত নৃশংস নরঘাতককে দেখেই সেই গোত্রের লোকেরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পন করে। কোন আলাপ আলোচনা ছাড়াই তাদেরকে বেঁধে ফেলে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ হত্যা করতে শুরু করে।

সেই সময়, একটি প্রেমিক যুগলের বর্ণনা পাওয়া যায়। যারা ইসলাম কী, আল্লাহ কী, মুহাম্মদ কী, কিছুই জানতেন না। তাদের ইসলাম কবুল করতে বলা হলে, সেই প্রেমিক ইসলাম আর মুহাম্মদ কী, তা জানেন না বলে তাদের জানান। তিনি তার প্রেমিকার প্রেমে এতটাই মগ্ন ছিলেন, এতটাই ভালবাসায় আচ্ছন্ন ছিলেন যে, প্রেমিকাকে একনজর দেখার জন্য এতটাই উদগ্রীব ছিলেন যে, যার সামনে ইসলাম মুহাম্মদ আল্লাহ জিহাদ এমনকি নিজের জীবনটিও তুচ্ছ হয়ে যায়। তিনি মুসলিম সৈন্যদের বলেন, তার প্রেমিকাকে এক নজর দেখতে দিলে মুসলিমরা যা চাইবে, তার সাথে সেটাই করতে পারবে। শুধু একটিবার যেন সে চোখ জুড়িয়ে তার ভালবাসার মানুষটিকে দেখতে পারেন।

তাকে এক নজর দেখার সুযোগ দেয়া হলো। এরপরে তার গর্দান উড়িয়ে দিলো মুসলিম জিহাদি সৈন্যরা, কারণ সে ইসলাম কবুল করে নি। আর সেই মৃতদেহের ওপর কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ দিয়ে দিলো তার সেই প্রেমিকা।

মুহাম্মদ ওরফে আল্লাহর আর মুহাম্মদের সৈন্যদের কাছে, এই দুটি সামান্য প্রাণের মূল্য রাস্তার কুকুরের চেয়ে বেশি কিছু নয়! তারা একজন আরেকজনকে ভালবেসেছিল, একজন আরেকজনকে একনজর দেখার জন্য মুহাম্মদের জিহাদী সৈন্যদের হাতে জীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে নি। সত্যি কথা বলতে কি, ঘটনাটি পড়ার পরে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নি। আপনাদের সামনেও তাই তুলে ধরছি। পুরো ঘটনাটি ইসলামিক সোর্স থেকে পড়ুন এবার। আল হিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থ থেকে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কিনলে খণ্ড চার-এ। বর্ণনাটি ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থেও পাবেন।

৫৪২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

সিদ্দীক (রা)-এর নিকট খালিদের অপসারণ দাবি করেন এবং বলেন ঃ ان فی سیفه رهقا –তার তরবারির মধ্যে যুলুম আছে। কিন্তু খলীফা আবূ বকর (রা) তাকে অপসারণ করেননি এবং বলেন ঃ "لا اغمد سیفا سله الله علی المشرکین" – যে তরবারি আল্লাহ্ মুশরিকদের উপর কোষমুক্ত করেছেন, সে তরবারি আমি কোষবদ্ধ করবো না।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমার নিকট ইয়া'কূব ইব্ন উতবা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আখনাস যুহরীর সূত্রে ইব্ন আবূ হাদরাদ আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে ছিলাম। তখন আমার সমবয়সী বনূ জুযায়মার এক যুবক– যার হাত দু'গাছি রশি দিয়ে ঘাড়ের সাথে বাঁধা এবং তার থেকে অল্প দূরেই কতিপয় মহিলা সমবেত, এ অবস্থায় সে আমাকে সম্বোধন করে বললো ঃ ওহে যুবক! আমি বললাম, তুমি কি চাও? সে বললো, তুমি কি এই রশি ধরে আমাকে ঐ মহিলাদের কাছে নিয়ে যেতে পার? তাদের কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন শেষে তুমি আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে। তারপরে তোমাদের যা মনে চায় তাই করবে। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি যা চাইছো তা তো একেবারে মামুলী ব্যাপার। এরপর আমি রশি ধরে তাকে নিয়ে গেলাম এবং মহিলাদের সামনে হাযির করলাম। সে সেখানে দাঁড়িয়ে বললো ঃ

اسلمی حبیش علی نفد العیش۔

"আমার জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তুমি শান্তিতে থাক হে হুবায়শ।"

اریتك اذ طالبتُكم فوجد تُكم ‍ بحلية او الفيتكم بالخوانق
الم يكُ اهلاً ان ينوّلَ عاشق ‍ تكلُّفَ ادلاَجَ السرى والوادائق
فلاَ ذنبَ لی قد قلتُ اذ اهلُنا معا ‍ اثيبي بودٍّ قبل احدى الصفائق
اثيبی بودَ قبل ان يشحَطَ النوى ‍ وينأى الاميرُ بالحبيب المفارق
فانی لا ضيَّعتُ سرُّ امانة ‍ ولاراقَ عينی عنكِ بعدك رائق

অর্থ ঃ (হায়রে হুবায়শ!) তুমি কি লক্ষ্য করনি, আমি যখনই তোমাদেরকে খুঁজেছি, তখনই পেয়েছি হয় হিলিয়ায়, না হয় পেয়েছি খাওয়ানিকে।

ঐ প্রেমিক কি কিছু পাওয়ার যোগ্য হয়নি, যে অন্ধকার রাত্রে ও প্রচন্ড গরমে সফরের কষ্ট বরণ করেছে?

আমি আরও বলেছিলাম– আমাকে তুমি ভালবাসার বিনিময় দাও, দুর্যোগ এসে দূরত্ব সৃষ্টি করার আগেই। কেননা, বিরহী বন্ধুর কারণে নিজ পরিবারের কর্তাও দূরে চলে যায়।

কেননা, আমি গোপন আমানত ফাঁস করে দিয়ে খিয়ানত করিনি। আর তোমার পরে আর কোন সুন্দরীকে আমার চক্ষু তোমার চেয়ে আকর্ষণীয় পায়নি।

কবিতা শোনার পর মহিলাটি বললো ঃ আমি তো মাঝে মাঝে বিরতিসহ উনিশ বছর এবং বিরতিহীনভাবে আট বছর যাবত তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আবু হাদরাদ বলেন, আমি লোকটিকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম ও তার গর্দান উড়িয়ে দিলাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ ফারাস ইব্‌ন আবূ সুনবুলা আসলামী তাঁর কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী শায়খের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার নিকট বর্ণনা করেন, ঐ যুবকটির গর্দান যখন উড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল, তখন তার সেই প্রেমিকা সেখানে দাঁড়িয়ে তা' প্রত্যক্ষ করছিল। তারপর সে তার প্রেমিকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে এবং তাকে চুম্বন করতে করতে সেও সেখানে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

হাফিয বায়হাকী হুমায়দী সূত্রে - - - - ইসাম মুযায়নী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি আমাদেরকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন। আমরা তিহামার দিকে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে দেখলাম একজন পুরুষ একটি মহিলা কাফেলার পশ্চাতে ছুটছে। আমরা তাকে ডেকে বললাম, ওহে, ইসলাম গ্রহণ কর ! সে বললো, ইসলাম কী ? আমরা তাকে ইসলামের ব্যাখ্যা জানালে সে তা বুঝতে ব্যর্থ হলো। সে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলো। তোমরা যা কর, আমি যদি তা না করি তবে আমার কী হবে ? আমরা বললাম, তা হলে আমরা তোমাকে হত্যা করবো। তখন সে বললো, আমাকে ঐ মহিলা কাফেলার সাথে মিলিত হওয়ার একটু অবকাশ দেবেন কি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো। তবে তুমি যেতে থাক। আমরাও তোমার কাছে আসছি। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি যেতে যেতে মহিলা কাফেলার নাগাল পেল। সে তাদের একজনকে উদ্দেশ্য করে বললো ঃ اسلمي حبيش قبل نفاد العيش - ওগো হাবায়শ ! তুমি সুখে থাক, আমার আয়ু ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বে। অপরজন বললো, বিরতিসহ উনিশ বছর এবং বিরতিহীন আট বছর (এর প্রেম বিনিময় নিয়ে) তুমিও শান্তিতে থাক। বর্ণনাকারী এরপর উপরোল্লিখিত কবিতা وينأى الامير بالحبيب المفارق পর্যন্ত উল্লেখ করলেন। এরপর লোকটি সেখান থেকে ফিরে এসে আমাদেরকে বললো ঃ এবার তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পার। আমরা তখন অগ্রসর হয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিলাম। এ সময় ঐ মহিলাটি তার হাওদা থেকে বেরিয়ে এসে লোকটির দেহের উপর উপুড় হয়ে পড়লো এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়ে গেল। এরপর ইমাম বায়হাকী আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ সূত্রে - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এক অভিযানে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করেন। সে অভিযানে তারা প্রচুর গনীমত লাভ করেন। আটককৃত বন্দীদের মধ্যে এমন একজন লোক ছিল, যে মুসলিম সৈন্যদের নিকট নিবেদন করলো, আমি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক নই। আমি এখানকার এক মহিলাকে ভালবাসি। তার সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। সুতরাং আমাকে একটু অবকাশ দাও, আমি তাকে শেষ বারের মত একটি বার দেখে আসি। তারপরে তোমাদের যা মনে চায় তা করো। বর্ণনাকারী বলেন, দেখা গেল লোকটি গিয়ে এক দীর্ঘকায় সুন্দরী মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলছে ঃ ওহে হুবায়শ ! "তুমি শান্তিতে থাক, আমার আয়ু শেষ হওয়ার পূর্বে।" এরপর সে এ জাতীয় অর্থবোধক কবিতার দু'টি পংক্তি আবৃত্তি করলো। তখন মহিলাটি তার জবাবে বললো ঃ হ্যাঁ, আমি তো তোমাকে আমার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি। এরপর মুসলিম সেনারা তার নিকট এগিয়ে গিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিল। তখন মহিলাটি দৌড়ে এসে নিহত লোকটির উপর উপুড় হয়ে পড়লো এবং একবার অথবা দু'বার চিৎকার ধ্বনি দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। অভিযান

↥

আপনাকে একটা উদাহরণ দেই,

একটা খুনি,ধর্ষণকারী অমুসলিম- একটা ১১ বছরের (ঋতুবতী/বালেগা) হিন্দু বালিকাকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলল এবং পালিয়ে সৌদিতে দেশান্তর হল।

পরবর্তীতে বৃদ্ধ বয়সে ধর্ষক ও খুনি লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল এবং মারা গেল।

ইসলামের আইন অনুসারে- ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ঐ খুনি লোকটি সকল জঘন্য অপরাধের কারণে কোনো শাস্তি পেলনা, এবং মৃত্যু পরবর্তী কাল্পনিক জীবনে সে অনন্তঅসীমকাল জান্নাত ভোগ করবে,

আর সেই অমুসলিম নিস্পাপ মেয়েটা যাকে সে ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল, মেয়েটি অনন্তঅসীমকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে।

Dear mumin, please justify it

কোরআন ৩৩/৩৬

আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা নারী উক্ত বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন অধিকার রাখে না। আর যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।

নবী যেই কাজকে নিষিদ্ধ কর নি, তা আর কোন মুসলমান নিষিদ্ধ করতে পারে না। এই বিষয়ে বুখারী শরীফের একটি হাদিস দেখে নিই,

সহীহ বুখারী (ইফা)

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ

পরিচ্ছেদঃ ৩০৯৭. **কোন বিষয় নবী (সা) কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ। অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমান নয়।**

٣ بَابُ مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةً لاَ مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ

৩০৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিষয় নবী ﷺ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তা বৈধ হওয়ার প্র
অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয়

সহজ নসরুল বারী শরহে সহীহ বুখারী (১৩) ❖ ১৮৫

৩৮৫৮. অনুচ্ছেদ : কোন বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করাই তার বৈধ হওয়ার প্রমাণ। অন্য কারো অস্বীকৃতি বৈধতার প্রমাণ নয়।

উদ্দেশ্য : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, রাসূল ﷺ এর تقرير হুজ্জত কেননা, সেটা রাসূল ﷺ এর এক প্রকার فعل কারণ যদি রাসূল ﷺ তা অস্বীকারকারী হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তাতে বাঁধা প্রদান করতেন। আর এ ব্যাপারে কোন উলামায়ে কেরামের দ্বিমত নেই যে, রাসূল ﷺ এর উম্মতের কেউ কোন অন্যায় কাজ করলে বা অন্যায় কথা বললে রাসূল ﷺ তা শোনে বা দেখে সমর্থন দিয়ে দিবেন এটা তাঁর জন্য জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ এর উপর অপরাধ হতে বারন করাকে ফরজ করে দিয়েছেন।

এই হাদিসটি থেকে সুস্পষ্ট যে, নবী যা তিনি অবৈধ করেননি, অস্বীকৃতি জানাননি, তা পরবর্তী সময়ের যতবড় ইসলামের আলেমই হোক না কেন, সে তা অবৈধ বলার যোগ্যতা রাখে না। ইসলাম যদি দাসপ্রথাকে হালাল করে থাকে, পরবর্তীতে কোন মুসলিমের পক্ষে একে হারাম সাব্যস্ত করা বা অনৈতিক ও বেআইনি ঘোষণা করা অসম্ভব।

ইসহাক ইবনে রাহবিয়াহ (রহিঃ) বলেন:

"এ বিষয়ের উপর মুসলমানদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করবে সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও সে ইসলামের বাকি সকল বিধি-বিধান মানুক না কেন।"

- আল্লাহ উপমা পেশ করেছেন; একজন **অধিনস্ত দাস যে কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না**। আর একজন যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিযক দিয়েছি, অতঃপর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি সমান হতে পারে? আল কোরআন 16:75

- আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তাতে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ বিষয়ে সমান? [ব্যাখ্যাঃ দাস-দাসীরা মনিবের সম্পদের অংশীদার হয় না এবং মনিবরা তাদেরকে ভয়ও করে না। তেমনিভাবে সারা জাহানের মালিক আল্লাহর সাথে কারো অংশিদারিত্ব হতে পারে না।] আল কোরআন 30:28

- তোমরা তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। আল কোরআন 24:32

- তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আল কোরআন 24:32

↥

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
৪৪৮। রাসূল সা জনৈকা মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেনঃ তুমি তোমার গোলাম(দাস) কাঠমিস্ত্রীকে বল, সে যেন আমার জন্য কাঠের মিম্বার বানিয়ে দেয় যাতে আমি বসতে পারি।

[[[দাসদের মুক্ত করা ইসলামের আগের সমাজে একটি উত্তম কাজ বলেই বিবেচিত ছিল।
সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ৫১০১। উরওয়াহ (রা) বলেন, সুওয়াইবা ছিল আবূ লাহাবের দাসী এবং সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। সহীহ মুসলিম (ইফা) ২২৬। ইবনু যুবায়র (রা) বলেন, হাকীম ইবনু হীযাম (রা) জাহিলী যুগে একশ ক্রীতদাস আযাদ করেছিলেন, মাল বোঝাই একশ' উট দান করেছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনি একশ ক্রীতদাস আযাদ করেন।]]]

৬৭১৫ আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেন, নবী সা বলেছেনঃ যে লোক একটি **মুসলিম গোলাম আযাদ করবে** আল্লাহ্ সে গোলামের প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন হতে তার প্রত্যেকটি অঙ্গকে মুক্ত করবেন। এমন কি গোলামের গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে তার গুপ্তাঙ্গকেও।

২৩৮৯ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ **গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী, কাজেই সে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে**।
৯৭ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে তার জন্য দু'টি পুণ্য রয়েছে।
৩৪৪৬ নবী সা বলেছেন, যে গোলাম যদি তার রবকে ভয় করে এবং তার মনিবকে মান্য করে তার জন্যও দুটি করে সওয়াব রয়েছে।

৫৩৬১ ফাতিমা (রা) এর কাছে **নবী সা এর নিকট দাস আসার খবর** পৌঁছল।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
কৃতদাস তার নারী মনিবের চুল দেখতে পারে
৪১০৬। নবী সা এক কৃতদাসকে সঙ্গে নিয়ে ফাতিমাহ (রা)-এর নিকট এলেন, যে কৃতদাসটি তিনি তাকে দান করেছিলেন। ফাতিমাহ (রা) এর পরিধানে এরূপ একটি কাপড় ছিলো যা দিয়ে তিনি মাথা ঢাকলে পা দু'টিতে পৌঁছে না; আর পা ঢাকলে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে না। নবী সা বলেনঃ তোমার কোনো পাপ হবে না, কারণ এখানে তো শুধু তোমার পিতা ও তোমার কৃতদাস রয়েছে।

৪৭৫৭ আয়িশা (রা) বলেন, (...) এরপর আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সা কে বললাম যে, আমাকে আমার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। তিনি একটি দাসকে আমার সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

৪২৩৪, ৬৭০৭ আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেন, **খাইবার যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি কিন্তু গানীমাত হিসেবে আমরা সোনা, রুপা কিছুই পাইনি। আমরা গানীমাত হিসেবে পেয়েছিলাম গরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী এবং ফলের বাগান**। যুদ্ধ শেষে আমরা রাসূলুল্লাহ সা -এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা পর্যন্ত ফিরে এলাম। **নবী সা এর সঙ্গে ছিল মিদআম নামে তাঁর একটি গোলাম। বানী যিবাব এর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল।** এক সময়ে সে রাসূলুল্লাহ সা -এর হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে অজ্ঞাত একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়ল। তাতে গোলামটি মারা গেল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, কী আনন্দদায়ক তার এ শাহাদাত! তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেন, আচ্ছা? খাইবারের গনীমাত থেকে যে চাদরখানা তুলে নিয়েছিল সেটি আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে।

৫৩৬১,৫৪৩৩ আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সা তাঁর এক গোলামের কাছে গেলেন। সে তাঁর সামনে একটি পাত্র হাযির করল যাতে খাবার ছিল, আর তাতে কদুও ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সা বেছে বেছে কদু খেতে লাগলেন।

↥

৬১৬১, ৬২১১ আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা এর এক সফরে ছিলাম। **নবি সা সঙ্গে তখন আনজাশাহ নামের এক কালো গোলাম ছিল**। সে পুঁথি গাইছিল। রাসূলুল্লাহ সা তাকে বললেনঃ **ওহে আনজাশাহ! তোমার সর্বনাশ**। তুমি উটটিকে ধীরে চালাও, যেন কাঁচের পাত্রগুলো ভেঙ্গে না ফেল। ক্বাতাদাহ বলেন, **নবী সা 'কাঁচপাত্রগুলো' শব্দ দ্বারা স্ত্রীলোকদেরকে বুঝিয়েছেন।**

৭২৬৩ উমার (রা) বলেন, আমি আসলাম। **তখন রাসূলুল্লাহ সা তাঁর দোতলার কক্ষে ছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কালো গোলামটি দরজার সামনে দাঁড়ানো ছিল**। আমি তাকে বললাম, তুমি বল যে উমার এসেছে।

৩১৭৯ নবী সা বলেছেন- যে দাস স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করে, তার উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত((অভিশাপ) এবং ফেরেশতামন্ডলী ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরজ ইবাদাত কবূল হবে না।

মুসলিম ইফা

পরিচ্ছেদঃ পলাতক দাসকে 'কাফির' আখ্যায়িত করা

১৩২। জারীর (রা) নবী সা হতে বর্ণনা করেন- **যে দাস তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, সে কুফরী করল, যতক্ষন না সে তার প্রভুর(মনিবের) কাছে ফিরে আসে।**

হাদীস সম্ভার,

পরিচ্ছেদঃ মনিবের ঘর ছেড়ে ক্রীতদাসের পলায়ন নিষিদ্ধ

২০২৮। নবী সা বলেছেন, **যখন কোন দাস পলায়ন করবে, তখন তার নামায কবুল হবে না**। অন্য বর্ণনা মতে, 'সে কুফরী করবে।'

সহীহ বুখারী (ইফা)

পরিচ্ছেদঃ **যে গোলাম তার মনিবদের ইচ্ছার খেলাফ কাজ করে- তার গুনাহ**

৬২৯৯। আলী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেন- **যে ব্যক্তি মনিবের অনুমতি ছাড়া কোন গোলামকে আশ্রয় প্রদান করে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লা'নত। তার কোন ফরয বা নফল কিয়ামতের দিন কবুল করা হবে না**।

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)

২১২০,২১২১। রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেন, **যে গোলাম নিজের মনিব ব্যতীত অন্য মনিবের পরিচয় দেয় তার উপর অব্যাহতভাবে কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ। আল্লাহ তার ফরয ও নফল কোন ইবাদতই কুবুল করবেন না**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

পরিচ্ছেদঃ **অংশীদারী গোলাম মুক্ত করা ও নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করা**

৩৪০১। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার গোলামের সাথে চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্তিপণ করেছে। কিন্তু চারশ দিরহামস বাকি রেখে পরিশোধে অক্ষম হয়ে গেল, তাহলে সে গোলামই থেকে গেল।

সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ)

৩৯২০. এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার ছয়টি গোলাম আযাদ করে দেয় এবং এ ছয়টি গোলাম ব্যতীত তার আর কোন সম্পদ ছিল না। এ খবর **নবী সা** এর নিকট পৌঁছলে তিনি **গোলামদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং দু'জনকে আযাদ করেন এবং বাকী চারজনকে গোলামীতে বহাল রাখেন**।

৬৭৫২ নবী সা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ **দাস-দাসীর পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে যে তাকে মুক্ত করবে**।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

৩৩৯৬। ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **যে ব্যক্তি তার গোলামকে মুক্ত করে এবং সেই গোলামের যদি অর্থসম্পদ থাকে তাহলে মালিক তার ঐ সম্পদের অধিকারী হবে**।

সহীহ বুখারী (ইফা)

২৬/ ক্রয় – বিক্রয়

২০৩৪. আয়িশা (রা) বলেন, বারীরা (রা) আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে ৩৬০ দিরহাম দেওয়ার শর্তে মুকাতাবা(দাস-দাসীকে কোন কিছুর বিনিময়ে আযাদ করার চুক্তিকে মুকাতাবা বলে) করেছি। প্রতি বছর যা থেকে ৪০ দিরহাম করে দিতে হবে। আপনি (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পছন্দ করে যে, আমি তাদের একবারেই তা পরিশোধ করব এবং তোমার **ওয়ালা (আযাদ সূত্রে উত্তরাধিকার)** এর অধিকার আমার হবে, তবে আমি তা করব। তখন বারীরা (রা) তার মালিকদের নিকট গেল এবং তাদের তা বলল। তারা তা অস্বীকার করল। বারীরা (রা) তাদের নিকট থেকে আমার কাছে এলো। সে বলল আপনার কথা তাদের কাছে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ওয়ালার অধিকার সংরক্ষন ছাড়া রাযী হয়নি। আয়িশা (রা) নবী সা কে তা সবিস্তারে জানালেন। তিনি বললেন, ওয়ালা এর হক তারই, যে আযাদ করে।

সহীহ বুখারী (ইফা)

২৫৪২। আয়িশা (রা) বলেন, মুকাতাবা অবস্থায় বারীরা আমার কাছে এসে বলল, আমার মালিক আমাকে বিক্রি করে ফেলবে। আপনি আমাকে খরীদ করুন। তারপর আমাকে আযাদ করে দিন। **ওয়ালার অধিকার মালিকের থাকবে-এ শর্ত না রেখে তারা আমাকে বিক্রি করবে না**।' আয়িশা (রা) বললেন, **তবে তোমাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই**। পরে নবী সা তা শুনলেন এবং বললেন, **ওয়ালা** তারই হবে, যে আযাদ করবে। তারা শত শর্তারোপ করলেও।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) পরিচ্ছেদঃ **মুক্তদাসের জন্য তার মুক্তিদাতা ব্যতীত অন্য কাউকে ওয়ালার মালিক বানানো হারাম**। হাদিস নাম্বারঃ ৩৬৮৩

সহীহ বুখারী (ইফা)

২৩৯৫। আয়মান (রহঃ) বলেন, আমি আয়িশা (রা) এর কাছে গিয়ে বললাম, আমি উতবাহ(রা) এর গোলাম ছিলাম। **সে মারা গেলে তার ছেলেরা আমার মালিক হল। আর তারা আমাকে বিক্রি করে দিল।**

তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন

সূরা মুহাম্মদ ৭

ফুটে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত।

হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল।

কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হত। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হত তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম ভক্ত সাহাবায়ে কিরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

৩৬৬০ আম্মার (রা.) বলেন, রাসূল সা-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে তাঁর সঙ্গে মাত্র পাঁচজন গোলাম, দু'জন মহিলা এবং আবূ বকর (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ছিল না।

Sahih Al-bukhari, Vol-3, Page 421, Darus salam Publications, Saudi Arabia

49 – THE BOOK OF MANUMISSION (OF SLAVES) ٤٩ - كتاب العتق 421

مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [راجع: ٨٩٣]

(20) CHAPTER. If somebody beats a slave, he should avoid his face. (٢٠) بَابٌ إِذَا ضَرَبَ العَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ

সূনান আবু দাউদ (ইফা) ।

পরিচ্ছেদঃ **ইহরা্ম অবস্থায় কোনো ব্যক্তি নিজ গোলামকে প্রহার করলে।** ।

১৮১৮। আবূ বাকর (রা) তার গোলামকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সে উটটি কোথায়? জবাবে গোলামটি বলল, আমি গতকাল তাকে হারিয়ে ফেলেছি। আবূ বাকর (রা) বলেন- মাত্র একটি উট, তুমি তাও হারিয়ে ফেললে? তখন **আবূ বাকর (রা) গোলামটিকে মারধর করলেন**। **রাসূলুল্লাহ্ সা ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বলেনঃ** তোমরা এ মুহরিম ব্যক্তির(আবু বকর) দিকে দেখ, কী করছে ।

২২৩০ জাবির (রা.) হতে বলেনঃ **নবী সা মুদাববার গোলাম বিক্রি করেছেন**।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

নিলাম ডাকে কেনা-বেচা।

আতা (র) বলেন, আমি সাহাবায়ে কিরামকে দেখেছি যে, তারা গনীমতের মাল অধিক মূল্য দানকারীর কাছে বিক্রি করাতে দোষ মনে করতেন না।

২১৪১। জাবির (রা) বলেন, **এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তারপর সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল। নাবী সা গোলামটিকে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, কে একে আমার নিকট হতে ক্রয় করবে? নুআঈম (রা) তাঁর কাছ হতে সেটি এত মূল্যে ক্রয় করলেন। তিনি গোলামটি তার হাওয়ালা করে দিলেন**।

২৪১৫ এক ব্যক্তি তার গোলাম আযাদ করে দিয়েছিল। তার কাছে এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। **নবী সা তার গোলাম আযাদ করে দেয়া প্রত্যাখ্যান করে দিলেন**। পরে সে গোলামটি তার নিকট হতে ইবনু নাহহাম কিনে নিলেন।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

মুদাববার (ক্রীতদাস) বিক্রয় করা।

২৫৩৪। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমাদের **একজন তার এক ক্রীতদাসকে তার মৃত্যুর পর মুক্ত হবে বলে ঘোষণা করল**। তখন **নবী সা সেই ক্রীতদাসকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন**। **ক্রীতদাসটি সে বছরই মারা গিয়েছিল।**

২৫৯৪ **মায়মুনা (রা.) একবার নিজের দাসীকে মুক্ত করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সা তখন তাকে বললেন, তুমি যদি দাসীটিকে তোমার মামাদের কাউকে দিয়ে দিতে তবে তোমার অধিক পুণ্য হত**।

সুনান আবূ দাউদ (ইফা)

ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য

৩৪৭৫। আশআছ (রা) **খুমুসের (গনীমতের মালের পঞ্চমাংশ) গোলাম থেকে কয়েকটি গোলাম** আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) হতে বিশ হাজার টাকায় খরিদ করেন। এরপর আবদুল্লাহ্ (রা) আশআছ (রা) এর নিকট গোলামদের দাম আনার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। তখন **আশআছ (রা) বলেনঃ আমি তো তাদের দশ হাজার টাকায় খরিদ করেছি**।

গ্রন্থঃ সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী)

একই শ্রেণীর পশু ও কম-বেশি করে বিনিময় করা বৈধ

৪০০৫। জাবির (রা) বলেন, একদা একজন গোলাম এসে নাবী সা এর নিকট হিজরাতের উপর বাইআত করেন। নাবী সা বুঝতে পারেননি যে, সে লোকটি গোলাম। অতঃপর তার মনিব তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চলে আসেন। **নাবী সা তাকে বলেনঃ আমার কাছে একে বিক্রি করে দাও। তারপর তিনি দু'জন কালো রং বিশিষ্ট গোলামের বিনিময়ে একে খরিদ করেন।**

সহীহ মুসলিম শরীফ- ১৫তম খণ্ড ২১৭

بَاب جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

অনুচ্ছেদ ঃ একই জাতীয় জন্তু-জানোয়ার কম-বেশী করিয়া বিক্রি করা জায়িয হওয়ার বিবরণ

(৩৯৯৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحٍ قَالَا أَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ

(৩৯৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী ও ইবন রুমহ (রহঃ) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহঃ) তাঁহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা একজন গোলাম আসিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হিজরতের জন্য বায়আত গ্রহণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতেন না যে, সে লোকটি গোলাম। অতঃপর মুনিব আসিয়া তাহাকে ফিরাইয়া নিতে চাহিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, ইহাকে আমার নিকট বিক্রি করিয়া দাও। অতঃপর তিনি দুইজন কালো রং বিশিষ্ট গোলামের বিনিময়ে তাহাকে ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিলেন। তারপর হইতে তিনি বায়আত গ্রহণ করিতেন না যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন যে, সে গোলাম কি না?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

অতঃপর আলোচ্য হাদীছ দলীল যে, জন্তু-জানোয়ারের বিনিময়ে জন্তু-জানোয়ার কম-বেশী করিয়া বিক্রি করা জায়িয আছে যদি নগদ নগদ হয়। আর এই বিষয়ে সকল ফকীহ একমত। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার বাকীতে বিক্রি

হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস। (সূরা বাকারাঃ ১৭৮)

মুয়াত্তা মালিক, পরিচ্ছেদঃ ২১. হত্যার কিসাস

ইমাম মালিক (র) বলেন, **যদি কোন দাস স্বেচ্ছায় স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করে সেই দাসকে হত্যা করা হইবে। যদি স্বাধীন ব্যক্তি কোন দাসকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে তবে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে না।**

দরসে তাওহীদ ও কিতাল পৃষ্ঠা ৮

দ্বিতীয় বিবেচ্য: স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমকক্ষতা, অতএব গোলামের বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবেনা। চাই নিহত ব্যক্তি তার নিজের গোলাম হোক বা অন্যের। এ

৩. যার ওপর অপরাধ সংঘটিত হয়

[৩.১] ক্রীতদাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপরাধ ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রায় ছিল—ক্রীতদাস হত্যার বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।[৫] চাই সে দাস তার মালিকানাধীনে হোক কিংবা অন্যের মালিকানাধীন। কেননা দাস মর্যাদার দিক থেকে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। কাজেই মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো কিসাস হতে পারে না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রীতদাস হত্যার বিনিময়ে স্বাধীন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করতেন না। বরং তাকে একশ' চাবুক মেরে

فكفارته ان يعتقه কথাটির ব্যাখ্যা

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রহৃত গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। ওয়াজিব না হওয়ার দলীল হযরত সুয়াদ ইবনে মুক্‌রিনের হাদীস-তিনি বলেন, রাসূলের (সা.) যুগে আমাদের একটি মাত্র গোলাম ছিল। একদা আমাদের মধ্য হতে কেউ তাকে আঘাত করে। ঘটনা শুনে রাসূল (সা.) বলেন—তাকে আযাদ করে দাও। রাসূল (সা.)-কে বলা হলো, তাদের গোলাম এই একটিই। তখন তিনি বললেন—আপাতত খেদমত গ্রহণ করো, সুযোগ হলে আযাদ করে দিও।

কাজী ঈয়ায (রহ.) বলেন—সামান্য পরিমাণ আঘাত করলে আযাদ করা ওয়াজিব না এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে যদি আগুন দিয়ে পোড়ায় অথবা অঙ্গহানী করে কিংবা বিনা কারণে প্রচন্ড আঘাত করে তাহলে ইমাম মালেক ও ফকীহ আবু লাইছের মতে তাকে আযাদ করা ওয়াজিব। কিন্তু অন্যান্য আলিমদের মতে এক্ষেত্রেও আযাদ করা ওয়াজিব নয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ (ইহার কাফ্ফারা হইল তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সকল মুসলমান একমত যে, প্রহৃত গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব নহে, তবে মুস্তাহাব। গোলামের প্রতি যুলুম করার কারণে যেই গুনাহ হইয়াছে তাহা দুরীভূত হইবার জন্য। আর আযাদ করা ওয়াজিব না হইবার দলীল হইতেছে পরবর্তী ৪১৮০ নং হযরত মুআবিয়া বিন সুওয়াইদ (রহ.) বর্ণিত হাদীছ। উহার শেষ দিকে আছে "তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা তাহার দ্বারা সেবা গ্রহণ করিতে থাক, যখনই তোমরা তাহার অমুখাপেক্ষী হইবে তখনই তোমরা তাহাকে আযাদ করিয়া দিবে।"

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সামান্য আঘাত করার দ্বারা আযাদ করা ওয়াজিব না হইবার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত। কিন্তু যদি অহেতুক প্রচন্ড আঘাত করে কিংবা আগুন দিয়া পোড়ায় কিংবা মুছলা তথা নাক-কান কর্তন করিয়া অঙ্গহানী করে তাহা হইলে ইমাম মালিক ও তাহার অনুসারীগণ এবং ফকীহ লায়ছ (রহ.)-এর মতে উক্ত গোলামকে আযাদ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। আর প্রশাসক তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু অন্যান্য উলামায়ে কিরামের মতে এই ক্ষেত্রেও আযাদ করা ওয়াজিব নহে। -(তাকমিলা ২য়, ২২৪)

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী) ।

পরিচ্ছেদঃ ২. মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাস ও ঘোড়ার উপর কোন যাকাত নেই ।

২১৬৩। রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ মুসলিম ব্যক্তির **ক্রীতদাস ও ঘোড়া**র উপর কোন **যাকাত** নেই।

১৩. মাসআলা ঃ গোলামের সাক্ষ্য কোনও অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়। তা সে পূর্ণ গোলাম হোক বা মুদ্দাব্বর[১] মুকাতাব[২] হোক কিংবা উম্মু ওয়ালাদ[৩] হোক। এমনিভাবে যে গোলামের আংশিক আযাদ করা হয়েছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)- এর মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

৫. মাসআলা ঃ যে সকল লোক বন্দী তাদের ব্যাপারে শাসকের ইখতিয়ারাধীন থাকবে, ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করবে আবার চাইলে তাদেরকে দাস বানাবে। তবে আরবের মুশরিকদের এবং মুরতাদদের বিষয়টি ভিন্ন[১] (হয়ত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা তলোয়ার দ্বারা গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে) তিনি চাইলে তাদেরকে মুসলমানদের যিম্মী বানিয়ে স্বাধীনতা দিয়ে দিবেন। তবে আরবের মুশরিকদের এবং মুরতাদদের বিষয়টি ভিন্ন (তাদের স্বাধীনরূপে ছেড়ে দেওয়া যাবে না)। তবে বন্দীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদেরকে দাস বানানো ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না (তাবয়ীন)। আর তাদেরকে দারুল হারবে ফেরত দেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে হারবী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ হিসাবে

২. কারণ কাফির বন্দীদের ফেরৎ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের দুশমনদের সাহায্য করা। কারণ পরবর্তীতে এরাই জাগ্রত ও সোচ্চার হয়ে উঠবে এবং যোদ্ধা হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে। আর যুদ্ধ এমন একটি বিষয় যাতে গোটা মুসলিম জাতির ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে যা মুসলমান বন্দীকে দুশমনদের হাতে যিম্মী হিসাবে ছেড়ে রাখতে সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। কাজেই ইসলাম ও মুসলমানের সার্বিক অনিষ্টতা এবং লড়াইয়ের সম্ভাব্য ক্ষতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কয়েকজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করার চেয়ে অধিক শ্রেয়।

৭. মাসআলা ঃ বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা (অর্থাৎ তাদেরকে দাস কিংবা যিম্মী না বানিয়ে কিংবা হত্যা না করে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া জাইয নেই[১] (কাফী)।

৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি মুশরিক শিশুদের সঙ্গে তাদের মাতাপিতারাও বন্দী হয় তাহলে ঐ শিশুদেরকে মুক্তিপণ[২] হিসাবে দেয়া যাবে। আর যদি শুধু শিশুরা বন্দী হয় (তাদের মাতা-পিতারা বন্দী না হয়) এবং তাদেরকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয় তাহলে তাদেরকে মুক্তিপণ হিসাবে দেওয়া যাবে না।

অনুরূপ যদি দারুল হরবেই গনীমত বন্টন করা হয় এবং একটি শিশু কোন ব্যক্তির অংশে পড়ল কিংবা তথায় গনীমতের মাল বিক্রি করা হলে ঐ ব্যক্তি ক্রয় সূত্রে সে শিশুটির মালিক

১. কেননা ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো (সূরা বাকারা) তাছাড়া তাদেরকে বন্দী করে হাতের মুঠোয় আনার কারণে তারা দাস হওয়ার উপযুক্ত এবং তাতে রয়েছে মুসলমানদের হক। সুতরাং

আর তাদের বাসন পত্র এবং আসবাবপত্রসহ ঘরের যাবতীয় আসবাব পত্র এমনভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে যেন পরবর্তীর্তে এসব দ্বারা উপকৃত না হতে পারে। আর সকল ধরনের তরল জাতীয় পদার্থ প্রবাহিত করে দিবে, যেন তারা পরবর্তীতে এসব দ্বারা উপকৃত না হতে পারে। এসব কর্মকাণ্ড এজন্য করা হবে যাতে তারা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে।

১৮. মাসআলা ঃ দারুল হারবের অভিযান থেকে ফেরার সময় যদি বন্দীদের সঙ্গে আনা তাদের সম্ভব না হয় তাহলে পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে যদি ইসলাম গ্রহণ না করে এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধাদেরকে খাদ্য ও পানীয় বিহীন নির্জন স্থানে ফেলে আসবে, যেন তারা ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়। কেননা হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আসার কারণে হত্যা করা সম্ভব নয়, আবার বাঁচিয়ে রাখাও বিশেষ কোন যুক্তি নেই।[১]

একারণেই মুসলমানরা যদি দারুল হারবে কোথাও সাপ বা বিচ্ছু পায় তবে তারা বিচ্ছুর লেজ কেটে দিবে আর সাপ হলে তার দাঁত ভেঙ্গে দিবে যেন মুসলমানদের ওখানে থাকা অবস্থায় কোন ক্ষতি না হয়। আর তাদের একেবারেই মেরে ফেলবে না যেন তাদের বংশ পরম্পরা বাকি থাকে পরবর্তীতে তাদের বংশধররা কাফিরদেরকে দংশন করে ও কষ্ট দেয় (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৯. মাসআলা ঃ গনীমতের মাল যতক্ষণ পর্যন্ত দারুল ইসলামে এনে সংরক্ষণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মালিক হওয়া যায় না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

উপরোক্ত মূলনীতির উপর অনেক মাসাইল ভিত্তি করে (১) গনীমতের হকদারদের কেউ যদি (দারুল হারবের মধ্যেই) বন্দীকৃত দাসীর সাথে সংগম কর্ম করে এরপর উক্ত দাসী একটি সন্তান প্রসব করল আর ঐ ব্যক্তি সে সন্তানের দাবী করল তাহলে এক্ষেত্রে তার সাথে উক্ত সন্তানের বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না। তবে (সংগম করার কারণে) ঐ ব্যক্তির উপর উফর ওয়াজিব হবে।

কাজেই উক্ত দাসী, তার সন্তান এবং (আদায়কৃত) উফর গনীমতের হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। (২) দারুল হারবে গনীমতের মাল বণ্টন করার পর যখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ পেয়ে গেল এমতাবস্থায় কেউ যদি নিজ অংশ দারুল ইসলামে আনার পূর্বেই মারা

ফাতাওয়ায়ে ২৯২ ফকীহুল মিল্লাত -১২

باب الرق

পরিচ্ছেদ : দাস-দাসী

প্রশ্ন : দাস প্রথা কখন, কিভাবে এবং কেন নিষিদ্ধ করা হয়—এ ব্যাপারে জানাবেন এবং ভালো বইয়ের সন্ধান থাকলে জানাবেন।

উত্তর : দাস-দাসীর প্রথা ইসলামের পূর্বে ছিল, ইসলামের সূচনাকালে তার প্রচলন ছিল। বর্তমানেও শর্ত সাপেক্ষে তার শরয়ী হুকুম বিদ্যমান রয়েছে। যখন কাফেরদের সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন যুদ্ধবন্দিদের গোলাম বানানো যাবে। বর্তমানে জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে যে একে অপরের কয়েদিদের গোলাম-বাঁদী বানাবে না

দেখে নিই, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ইসলামিক আলেম শায়েখ সালেহ আল-ফাওজান কি বলেছেন। তিনি সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংস্থা "উর্ধ্বতন উলামা পরিষদের সদস্য। তিনি বর্তমানে ইসলামী গবেষণা ও ফাতাওয়া প্রদান স্থায়ী কমিটির সদস্য, যা "উর্ধ্বতন উলামা পরিষদ"-এর একটি কমিটি। এই পরিষদটি উর্ধ্বতন ধর্মতত্ত্ববিদের দ্বারা ইসলামী আইন বা ফিকাহ-এর বিষয় ও বিধিবিধান এবং গবেষণা পত্র প্রণয়ন করে থাকে। তিনি যা বলেছেন,

↥

“Slavery is a part of Islam. Slavery is part of jihad, and jihad will remain as long there is Islam.”

News

Author of Saudi Curriculums Advocates Slavery

Ali Al-Ahmed

Shaikh Saleh Al-Fawzan

(Washington)... November 7, 2003 ...The main author of the Saudi religious curriculum expressed his unequivocal support for the legalization of slavery in one of his lectures recorded on a cassette and obtained exclusively by SIA news.

Leading government cleric Sheikh Saleh Al-Fawzan is the author of the religious books currently used to teach 5 million Saudi students, both within the and in Saudi schools aboard – including those in the Washington, D.C. metro area.

“Slavery is a part of Islam,” he says in the tape, adding: “Slavery is part of jihad, and jihad will remain as long there is Islam.”

Government spokesman Adel Al-Jubeir and other officials have repeatedly claimed religious curriculums are being reformed, but Al-Fawzan's books continued to be used according to the minister of education's statements published by Al-Watan daily Septembe

Al-Fawzan is member of the Senior Council of Clerics, Saudi Arabia's highest religious body, a member of the Council of Religious Edicts and Research, the Imam of Prince Mitaeb Mosque in Riyadh, and a professor at Imam Mohamed Bin Saud Islamic Univer Wahhabi center of learning in the country.

Al-Fawzan refuted the mainstream Muslim interpretation that Islam worked to abolish slavery by introducing equality between the races.

“They are ignorant, not scholars,” he said of people who express such opinions. “They are merely writers. Whoever says such things is an infidel.”

Al-Fawzan's most famous book, “Al-Tawheed – Monotheism”, is taught to Saudi high school students. In it, he says that most Muslims are polytheists, and their blood and money are therefore free for the taking by “true Muslims.”

Among Al-Fawzan's other controversial beliefs is the right to ban the marriage of Arab women to non- Arab Muslims, according to his book “Al-Mulkhas Al-Fiqhee” (“Digest of Law”). He has also issued a fatwa forbidden the watching of TV.

Al-Fwazan is also is a leading opponent of those who seek to introduce change to the Saudi school curriculum. He also claimed that elections and demonstrations are western imitations.

Main: Exclusives, News, Democracy, Special Series: Documents on Terror and Hate, Articles, Human Rights, SIA in the News

Site: Home, Subscribe/Unsubscribe, Contact Us, About Us, Privacy Policy, Terms of Use

Newsletter Home: Subscribe, Unsubscribe, Submit

Total Active visitor: 838

You are visitor number: 2135727

Designed & Powered by webmaster

জান্নাতে থাকবে শিশু সেবক

৪৯২ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

সূরা তূর

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ অর্থাৎ "তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের খাদেম ও সেবকদের সম্পর্কে এবং জান্নাতে তাহাদিগের মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন যে, জান্নাতীদের কিশোর সেবকরা রূপ-লাবণ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পোষাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্যের দিক দিয়া তাহারা সজীব সতেজ সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ অর্থাৎ "জান্নাতীদের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির কিশোরেরা। পান-পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরা পূর্ণ পেয়ালা লইয়া।"

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীদের সেবার জন্য জান্নাতের কিশোরদের হইতে এমন বহু কিশোর তাহাদিগের আশে-পাশে ঘুরাফেরা করিবে, যাহারা চিরকাল একই রকম থাকিবে। উহাদিগের কৈশোরে কখনো কোন পরিবর্তন আসিবে না এবং বয়সও বৃদ্ধি পাইবে না।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে আবূ আইয়ূব (রা) সূত্রে কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ এক একজন জান্নাতীর সেবায় এক হাজার খাদিম নিয়োজিত থাকিবে। ইহাদিগের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কাজ আঞ্জাম দিবে। অর্থাৎ এক হাজার জন খাদিম এক হাজার রকম সেবায় তৎপর থাকিবে।

↥

কুরুচিবোধ, অস্বাস্থ্যকর এবং ইসলামের পবিত্রতা

গ্রন্থঃ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

অধ্যায়ঃ পবিত্রতা অর্জন

৬৬। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সা কে জিজ্ঞেস করা হলো, **আমরা কি মদীনার বুযাআহ নামক কূপের পানি দিয়ে অযু করতে পারি? কূপটির মধ্যে মেয়েলোকের মাসিকের কাপড়, কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হত।** রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ **পানি পবিত্র, কোন কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না।**

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) হাদিস একাডেমি

অধ্যায়ঃ পাক-পবিত্রতা পরিচ্ছদঃ পায়খানা-প্রস্রাবের আদাব

৩৬২। উমায়মাহ বিনতু রুক্বায়কা (রাঃ) হতে বর্ণিত। **নবী সা এর খাটের নিচে একটি কাঠের গামলা ছিল। নবী সা রাতে এতে পেশাব করতেন।**

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

অধ্যায়ঃ পবিত্রতা অর্জন পরিচ্ছদঃ কোন ব্যক্তি রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিকটে রেখে দেয়া।

২৪। রাসূলুল্লাহ **সা এর একটি কাঠের পাত্র ছিল। সেটি তাঁর খাটের নিচে থাকত। রাতের বেলায় তিনি তাতে পেশাব করতেন।**

৫৩৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া Contents

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর আল মুকাদ্দাসী (র)....উম্মু আয়মান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি পোড়া মাটির পাত্র ছিল যাতে তিনি (রাতের বেলা) পেশাব করতেন। সকাল হলে তিনি বলতেন, হে উম্মু আয়মান! পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দাও। এক রাতে আমি পিপাসিত হয়ে জেগে উঠলাম। পাত্রে যা ছিল তা আমি পান করে ফেললাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে উম্মু আয়মান! পাত্রে যা আছে তা ফেলে দাও। উম্মু আয়মান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পিপাসার্ত হয়ে জেগে উঠেছিলাম, তাই পাত্রে যা ছিল তা আমি পান করে ফেলেছি। তিনি বললেন— انك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا ابدا "আজকের দিনের পরে অবশ্যই তুমি কখনো তোমার পেটের পীড়ায় ভুগবে না।" ইবনুল আছীর (র) উসদুল গাবা গ্রন্থে বলেছেন, হাজ্জাজ ইবন মুহাম্মদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন....উমায়মা বিনত রুকায়্যা (রা) হতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি কাঠের পাত্র ছিল যাতে তিনি পেশাব করতেন। পাত্রটি খাটের নীচে রেখে দিতেন। বারাকাহ নাম্নী এক নারী এসে তা পান করে ফেলল। নবী করীম (সা) তা খোঁজ করে পেলেন না। তাঁকে বলা হল যে, বারাকাহ তা পান করে ফেলেছে।

নবী করীম (সা) বললেন, لقد احتظرت من النار بحظار - "একটি (বিশাল) প্রতিবন্ধক দিয়ে তুমি জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছ।" হাফিয আবুল হাসান ইবনুল আছীর

আল্লামা ইবনু হাজার কাসতালানী এর 'মাওয়াহিবে লাদুনিয়া' কিতাবের ১ম খণ্ড ২৮৪/২৮৫ পৃষ্ঠায় এই হাদিস উল্লেখ করেন-

> عن ام ايمن قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل الى فخارة فى جانب البيت
> فبال فيها فقمت من الليل وانا عطشا نة فشربت ما فيها وانالا اشعر فلما اصبح النبى
> صلى الله عليه وسلم قال يا ام ايمن قومى فاهريقى ما فى تلك الفخارة فقلت قد والله
> شربت ما فيها قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال أما
> والله لاييجعن بطنك ابدا .
>
> অর্থাৎ 'হযরত উম্মে আয়মন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাত্রিতে ঘুম মোবারক থেকে উঠে ঘরের পাশ্বে একটি মাটির পাত্রে পেশাব মোবারক করলেন। আমি রাত্রে ঘুম থেকে উঠে খুব তৃষ্ণার্তবোধ করলাম। অতঃপর মাটির পাত্রে যা ছিল তা পান করে নিলাম। পাত্রে কী ছিল আমি মোটেই অবগত নই। তার পর প্রত্যুষে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বললেন হে উম্মে আয়মন! ঘুম থেকে উঠো এবং মাটির পাত্রে যা আছে তা ফেলে দাও।অতঃপর আমি বললাম নিশ্চয় আল্লাহর কসম মাটির পাত্রে যা কিছু ছিল তা আমি পান করে ফেলেছি। তিনি (উম্মে আয়মন) বলেন তৎক্ষণাৎ আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেঁসে দিলেন।এমনকি তাঁর প্রান্তসীমার দাঁত মোবারক প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহর হাবীব বললেন,আল্লাহর কসম তোমার পেটে কখনো পীড়া হবে না।'

আল্লামা কাজী আয়াজ তার 'আশ শিফা' কিতাবের ১ম খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

> قد روى نحو من هذا عنه فى امرأة شربت بوله فقال لها لن تشتكى وجع بطنك ابدا ولم يامر واحدا منهم بغسل فم ولانهاه عن عودة وحديث هذه المرأة التى شربت بوله صحيح الزم الدار قطنى مسلما والبخارى اخراجه فى الصحيح . واسم هذه المرأة بركة واختلف فى نسبها وقيل هى ام ايمن .
>
> অর্থাৎ 'নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পেশাব মোবারক জনৈক মহিলা কর্তৃক পান করা সংক্রান্ত অনুরূপ আরো হাদিস বর্ণিত আছে। জনৈক মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পেশাব মোবারক পান করলে আল্লাহর হাবীব এ মহিলাকে বললেন, তোমার কষ্মিনকালেও কোন ব্যাধি হবে না।' আল্লাহর হাবীব তাদের কাউকে (যারা রক্ত মোবারক ও পেশাব মোবারক পান করলো) মুখ ধৌত করারও নির্দেশ প্রদান করেননি এবং পুনরায় পান করতেও নিষেধ করেননি। ইমাম বোখারী (রা.) এর বর্ণনাকে সহীহর মধ্যে গণ্য করেছেন।সে মহিলার নাম ছিল বারাকা (যিনি উম্মুল মো'মিনিন হযরত উম্মে হাবিবার সাথে আবিসিনিয়া থেকে এসেছিলেন) আর কেউ কেউ বলেছেন,তার নাম ছিল উম্মে আয়মন।'

৭৭ মাহমূদ ইবনু রাবী (রা.) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সা একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমন্ডলের উপর কুলি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক।

৬৩৫৪ মাহমূদ ইবনু রাবী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনিই ছিলেন সেই লোক, বাল্যাবস্থায় তাঁদেরই কূপ থেকে পানি মুখে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা যার চেহারার উপর ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

সহিহ মুসলিম (ইফাঃ)

৬১৮০। রাসুলুল্লাহ সা **একটি পানি ভর্তি পেয়ালা আনালেন**। তিনি তাঁর দুই হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং **তাতে কুলি করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা দুইজন এ থেকে পানি পান কর** এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ঢেলে দাও।

১৮৮ রাসূলুল্লাহ্ সা একটি পাত্র আনালেন যাতে পানি ছিল। অতঃপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও মুখমন্ডল ধুলেন এবং তার দ্বারা কুলি করলেন। অতঃপর বললেনঃ তোমরা এ থেকে পান কর !

১৮৯ রাসূলুল্লাহ্ সা যখন উযূ করতেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির উপর সাহাবারা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেন।

৩৯০৯ আসমা (রা.) বলেন, আমি হিজরত করে মদিনায় এসে পুত্র সন্তান প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী সা এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে থুথু দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আবদুল্লাহর পেটে গেল তা হল নবী সা-এর থুথু।

২৪১ রাসূলুল্লাহ্ সা হুদায়বিয়ার সময় বের হলেন। আর **রাসূল সা যখনই কোন** নাকের সর্দি ঝেড়ে ফেলছিলেন, তখন তা তাদের কারো না কারো হাতে পড়ছিল। তারপর (বরকত স্বরূপ) ঐ ব্যক্তি তা তার মুখমন্ডল ও শরীরে মেখে নিচ্ছিল!

২৩৪ মসজিদে নববী নির্মিত হবার পূর্বে- রাসূল সা **ভেড়ার খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করতেন**।

১২১৫ সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, সহাবীগণ নবী সা এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন এবং তাঁরা তাদের লুঙ্গি ছোট হবার কারণে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতেন। তাই মহিলাগণকে বলা হল, পুরুষগণ সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা সিজদা হতে মাথা তুলবে না।

২৭৩২ উরওয়াহ নবী সা এর নিকট এল এবং তাঁর সঙ্গে কথা শুরু করল। উরওয়াহ বলল, হে মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম! আমি কিছু চেহারা দেখছি এবং বিভিন্ন ধরনের লোক দেখতে পাচ্ছি যাঁরা পালিয়ে যাবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে। তখন **আবু বকর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি লাত দেবীর লজ্জাস্থান চেটে খাও**। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব? উরওয়াহ বলল, এ কে? লোকজন বললেন, আবু বকর।......

মুগীরাহ ইবনু শুবাহ (রা) এর প্রতি লক্ষ্য করে 'উরওয়াহ বলল, হে গাদ্দার! মুগীরাহ (রা) জাহেলী যুগে কিছু লোকদের সঙ্গে ছিলেন। একদা তাদের হত্যা করে তাদের সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূল সা কখনো থুথু ফেললে তা সাহাবীদের হাতে পড়তো এবং তা তারা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন।

উমার (রাঃ) দু'জন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন, তারা ছিল মুশরিক থাকাকালে তাঁর স্ত্রী। তাদের একজনকে মুআবিয়াহ ইবনু আবূ সুফইয়ান বিয়ে করেন।

রাসূল সা মদিনায় আসলেন। তখন আবূ বাসীর (রা.) নামক কুরাইশ এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল সা এর নিকট এলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দুজন লোক পাঠাল। তারা রাসূল সা এর কাছে এসে বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন তা পূর্ণ করুন। তিনি আবূ বাসীর কে ঐ দুই ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তাঁরা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে অবতরণ করল। আবূ বাসীর (রা.) তাদের একজনকে বললেন, **আল্লাহর কসম! তোমার তরবারিটি খুবই চমৎকার দেখছি। তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই আমাকে তা দেখাও। অতঃপর ব্যক্তিটি আবূ বাসীরকে তলোয়ারটি দিল। আবূ বাসীর (রা.) সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে মরে গেল**। অতঃপর অপর সঙ্গী পালিয়ে মদিনায় এসে পৌঁছল এবং দৌড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূল সা তাকে দেখে বললেন, এই ব্যক্তিটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে। ইতোমধ্যে ব্যক্তিটি রাসূল সা এর নিকট পৌঁছে বলল, আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, আমিও নিহত হতাম। এমন সময় আবূ বাসীর (রা.)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন- হে নবী সা। **আমাকে তার নিকট ফেরত দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন।** আবূ বাসীর (রা.) যখন বুঝতে পারলেন যে, চুক্তিঅনুযায়ী তাকে আবার কাফিরদের নিকট যেতে হবে তখন তিনি বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন। **তারপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই ইসলাম গ্রহণ করতো, সে-ই আবূ বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! তাঁরা যখনই শুনতে যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাবে,** তখনই তাঁরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন আর **তাদের হত্যা করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন**।

৬৪ **বুখারী শরীফ**

পাচ্ছি যাঁরা পালিয়ে যাবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করবে। তখন আবূ বকর (রা) তাকে বললেন, তুমি লাত দেবীর লজ্জাস্থান চেটে খাও। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব। উরওয়া বলল, সে কে? লোকজন

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)

পরিচ্ছেদঃ আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খাওয়া এবং পড়ে যাওয়া খাদ্যে যে ধুলাবালু লেগেছে তা মুছে খাওয়া মুস্তাহাব। আর চেটে খাওয়ার পূর্বে হাত মুছে ফেলা মাকরূহ।

৫১৩০। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, কেউ যেন তার হাত রুমাল দ্বারা মুছে না ফেলে যতক্ষণ না সে নিজে তা চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

২৩০ ইবনু ইয়াসার (রা.) বলেন, আমি আয়িশাহ (রা.)-কে কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।' তিনি বললেনঃ আমি রাসূল সা-এর কাপড় হতে তা ধুয়ে ফেলতাম। তিনি কাপড় ধোয়ার ভিজা দাগ নিয়ে সালাতে বের হতেন।

হাদীস সম্ভার

২০৩৭। **রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, যদি কোন লোককে দেখো যে, সে জাহেলিয়াতের বংশ-সম্পর্ক উত্থাপন করছে, তাহলে তোমরা তাকে তার বাপের লিঙ্গ কামড়াতে বলো এবং ইঙ্গিত করো না বরং স্পষ্ট বলো**।'

৩১২ আয়িশা (রা.) বলেনঃ **আমাদের কারো একটির অধিক কাপড় ছিল না। ঋতুস্রাব অবস্থায়ও এই কাপড়খানিই ব্যবহার করতাম, তাতে রক্ত লাগলে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নখ দ্বারা খুঁটিয়ে নিতাম**।

৩৩৪৯ নবী সা বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে হাশর ময়দানে উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। আর কিয়ামতের দিন সবার আগে যাকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইবরাহীম (আ)।

৩৩৫৬ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, **নবী ইবরাহীম (আ) অস্ত্র দিয়ে নিজের মুসলমানি করেছিলেন যখন তার বয়স ছিল ৮০ বছর**।

৭৩২৪ আবূ হুরাইরাহ রা: বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা এর মিম্বর ও আয়িশাহ (রাঃ)-এর ঘরের মধ্যবর্তী স্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। আগমনকারী আসত, তার নিজ পা আমার গর্দানে রাখত, মনে হতো আমি যেন পাগল। অথচ আমার তিলমাত্র পাগলামি ছিল না। আমার ছিল একমাত্র ক্ষুধার যন্ত্রণা।

একই নারীকে পর্যায়ক্রমে স্বামী মারা যাওয়ায় চাচাত ভাইদের পর্যায়ক্রমে বিয়ে ! :

৪৮২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

চতুর্থ কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব

বর্ণনাকারী আরো বলেন, ফাতিমা (রা)-এর অন্য দুই জন সন্তান ছিলেন যায়নাব ও উম্মু কুলছুম। এ যায়নাব (রা)- কে বিবাহ করেছিলেন তাঁর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর (রা) এবং সে ঘরে সন্তান হয়েছিল আলী ও আওন (র) এবং এ স্বামীর কাছেই তিনি ইনতিকাল করেন। আর উম্মু কুলছুম (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন আমিরুল মু'মিনীন উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)। এ বিবাহ তাঁদের সন্তান যায়দের জন্ম হয় এবং এ স্ত্রীকে রেখে উমর (রা) ইনতিকাল করেন। পরে একের পরে এক চাচাত ভাইদের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। প্রথমে 'আওন ইব্‌ন জা'ফর (রা)-এর সাথে; তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর (রা)-এর সাথে এবং তাঁরও মৃত্যু হলে তাদের ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা)-এর সংগে তাঁর বিবাহ হয় এবং এ স্বামীর ঘরেই তিনি ইনতিকাল করেন। যুহ্‌রী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৮৩

বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) আরো বিবাহ করেন উম্মু সালামা হিন্দ বিনত আবু উমায়্যা (ইব্‌নুল মুগীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযুম) (রা)-কে। এর আগে তিনি ছিলেন তার চাচাত ভাই আবু সালামা (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম (রা))-এর স্ত্রী।

৪৮৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সা) স্ত্রীরূপে আরো গ্রহণ করেন (যায়নাব) বিন্‌ত জাহাশ (রা) ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা কে। তাঁর মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতমা ফুফু উমায়মা (রা)। যায়নাব (রা)-এর আগের বিবাহ হয়েছিল

মুয়াত্তা মালিক

পরিচ্ছেদঃ দুধ পান করানোর বিবিধ বিষয়

রেওয়ায়ত ১৭। আয়েশা (রা) বলিয়াছেনঃ কুরআনে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে দশবার দুধ চোষার কথা নির্ধারিত ছিল, যাহা হারাম করিবে; তারপর উহা রহিত হইয়া যায় নির্ধারিত **পাঁচবার দুগ্ধ চোষা**র অবতীর্ণ হুকুমের দ্বারা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সা এর ওফাত হয় তখনও সেই পাঁচবার দুধ চোষার হুকুমের অংশ সম্মিলিত আয়াত তিলাওয়াত করা হত।

সুনান ইবনু মাজাহ

পরিচ্ছেদঃ **বয়স্ক লোকে দুধ পান করলে**।

↥

১৯৪৩। আয়িশাহ্ (রা) বলেন, সাহলা (রা) নবী সা-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার নিকট সালিমের যাতায়াতের কারণে আমার স্বামী আবূ হুযাইফাহর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করি। নবী সা বলেনঃ তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও। সে বললো, **আমি তাকে কিভাবে দুধপান করাবো, সে যে বয়স্ক পুরুষ**? রসূলুল্লাহ সা মুচকি হেসে বলেনঃ আমিও অবশ্য জানি যে, সে বয়স্ক পুরুষ। সহীহ মুসলিম (ইফা) ৩৪৬৯।

Sahih Muslim 1453a
In-book reference : Book 17 Book of Suckling, Chapter 7: **Breastfeeding an adult**, Hadith 33
USC-MSA web (English) reference : Book 8, Hadith 3424
'Aisha(R) reported that Sahla bint Suhail came to Rasulullah(ﷺ) and said: Rasulullah, I see on the face of Abu Hudhaifa (signs of disgust) on entering of Salim (who is an ally) into (our house), whereupon Rasulullah(ﷺ) said: **Suckle him**(أَرْضِعِيهِ). She said: **How can I suckle him as he is a grown-up man? Rasulullah(ﷺ) smiled and said: I know that he is a young man.**

সহীহ মুসলিম (ইফা)
৩৪৭৩। আয়িশা (রা) বললেন, সাহলা রাসুলুল্লাহ সা এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার নিকট সালিমের প্রবেশ করার কারণে আমি আবূ হুযায়ফার মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। তখন রাসুলুল্লাহ সা বললেনঃ তাকে তোমার দুধপান করিয়ে দাও। সাহলা বললেন, সে (সালিম) তো **দাড়িবিশিষ্ট**। তিনি বললেন, তুমি তাকে দুধ পান করিয়ে দাও, তাতে আবূ হুযায়ফার মুখমন্ডলের মলিনতা দূর হয়ে যাবে।

সহীহ মুসলিম ১০১

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
পাঁচবার দুধ চুষলে মুহরিম সাব্যস্ত হয়।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ.

৩৪৬২। আমরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে দুধ পানের কারণে হারাম হওয়ার বিষয় আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন ঃ এ বিষয়ে প্রথমে কুরআনে দশবার স্তন্য-চোষার কথা নাযিল হয়েছিলো এবং পরে পাঁচবার চোষার কথা নাযিল হয়েছিলো।

মুয়াত্তা মালিক
রেওয়ায়ত ৭। সালিম ইবন আবদিল্লাহ(র) বর্ণনা করেন, তিনি যখন দুগ্ধপোষ্য ছিলেন, তখন আয়েশা(রা) তাহাকে পাঠাইলেন তাহার ভগ্নী উম্মে কুলসুম(রা) এর নিকট এবং বলিয়া দিলেন- **সালিমকে দশবার দুধ চোষাইয়া দিন, যেন সে আমার নিকট প্রবেশ করিতে পারে**। সালিম বলেনঃ উম্মে কুলসুম আমাকে তিনবার **দুধ চোষাইয়াছেন**। তারপর আমি পীড়িত হই, তাই আর দুধ পান করান নাই, যেহেতু উম্মে কুলসুম আমাকে দশবার দুধ পান করান নাই তাই আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিতাম না।

আদম হাওয়ার ছেলে হাবিল ও কাবিলের বোনদের সাথে তাদের বিবাহ দেয়া হয়েছিল।

সুদ্দী (র) ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদ (রা)-সহ কতিপয় সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আদম (আ) এক গর্ভের পুত্র সন্তানের সঙ্গে অন্য গর্ভের কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিতেন। হাবীল

- জয়নব বিনতে জাহশ (রা) ছিলেন নবী সা এর ফুফাতো বোন এবং একইসাথে তার স্ত্রী। জয়নব(রা) এর মা ছিলেন উমামা বিনতে আবদুল মুত্তালিব, নবী সা এর পিতার আপন বোন। যয়নব(রা) ছিলেন মুহাম্মদের ফার্স্ট ব্লাড কাজিন।
- আলী(রা) ছিলেন নবী সা এর আপন চাচাতো ভাই। নবী সা তার সাথে নিজ মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিলেন।
- ইসলামে ফার্স্ট ব্লাড এবং সেকেন্ড ব্লাড কাজিন বিবাহ বৈধ এবং আইনগতভাবে একে নিষিদ্ধ করা কিংবা নিরুৎসাহিত করা কোন ইসলামিক দেশে সম্ভব নয়।

Cousin marriage has been linked to a variety of disorders, including:

- Congenital heart disease
- Blood diseases such as hemophilia and thalassemia
- Deafness
- Cystic fibrosis
- Breast cancer
- Depression
- Down’s syndrome
- Infantile cerebral palsy

১৩৮ ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল সা সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কাত হলেন আর **ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি নাক ডাকলেন**। অতঃপর মুয়াযযিন এসে তাঁকে সালাতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তার সঙ্গে সালাতের জন্য চললেন এবং সালাত আদায় করলেন, **কিন্তু উযূ করলেন না**। আমরা আমর (রহ.) কে বললামঃ লোকে বলে যে, রাসূল সা এর চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না।

১৪৪ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।

১৪৮ আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা 'আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে হাফসাহ (রা) এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ সা কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসেছেন।'

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)

৯। জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা) বলেন, **নবী সা কিবলার দিকে মুখ করে মলত্যাগ বা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন**। **আমি তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে তাকে কিবলার দিকে মুখ করে মলত্যাগ, পেশাব করতে দেখেছি**।

২২৪ রাসূলুল্লাহ্ সা একদা গোত্রের **ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে আসলেন**। **রাসূলুল্লাহ্ সা সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন**।

মুসলিম হাদিস একাডেমি

১৬০০। ইবনু আমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ কেউ বসে সালাত আদায় করলে তা অর্ধেক সালাতের সমকক্ষ। এরপর একদিন আমি রসূলুল্লাহ সা এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি বসে সালাত আদায় করেছেন। আমি তার মাথার উপর আমার হাত রাখলাম। তিনি বললেনঃ হে ইবনু আম্‌র কী ব্যাপার? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলেছেনঃ কেউ বসে সালাত আদায় করলে তা অর্ধেক সালাতের সমান হয়। কিন্তু এখন দেখছি আপনি নিজেই বসে সালাত আদায় করছেন। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সা বললেনঃ হ্যাঁ, তবে আমি তোমাদের কারো মত না*।

ব্যাখ্যাঃ *এ বিষয়ে আলেমদের বক্তব্য হল- নবী সা এর কতক বিশেষত্বের মধ্যে এটিও একটি ছিল যে, দাঁড়িয়ে নাফল সালাত আদায় করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার বসে সালাত আদায়ের সমান সাওয়াব লাভ হত।

৫২১৬,৫২৬৮ **পরিচ্ছেদঃ দিনের বেলা স্ত্রীদের নিকট গমন করা।**

আয়িশাহ (রা.) বলেন, যখন নবী সা আসরের সালাত শেষ করতেন, তখন স্বীয় স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে কোন একজনের নিকট গমন করতেন(মিলিত হতেন)। একদিন তিনি স্ত্রী হাফসাহ (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং সাধারণত যে সময় কাটান তার চেয়ে বেশি সময় কাটালেন।

বোখারী শরীফ (বাংলা তরজমা ও ব্যাখ্যা), খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২২৯

বোখারী শরীফ ২২৯

সন্তানের প্রতি হামদর্দি প্রকাশ

২০৬৪। ছাদীছ :—মেছ্‌ওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) আবুজহলের মেয়েকে বিবাহের পয়গাম দিয়াছিলেন। ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হা সেই সংবাদ জানিতে পাইয়া হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আপনার আত্মীয়-স্বজনগণ বলিয়া থাকে যে, (আপনার মেয়েদেরকে কষ্ট দেওয়া হইলেও) আপনি আপনার মেয়েদের পক্ষে হইয়া কাহারও প্রতি একটু রাগও দেখান না। ঐ দেখুন! আলী (রাঃ) আবু জহলের মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন।

৫২৩০ ইবনু মাখরামা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা-কে মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, হিশাম ইবনু মুগীরাহ(রা:), আলী (রা.) কাছে তাদের মেয়ে বিয়ে দেবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে;
কিন্তু আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, **যতক্ষণ পর্যন্ত না আলী (রা.) আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এর পরেই সে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে**। কেননা, **ফাতিমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা এবং সে যা ঘৃণা করে, আমিও তা ঘৃণা করি এবং তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়**।

২৮ সহীহুল বুখারী ৫ম খণ্ড

ফাতিমাহ -এর জীবদ্দশায় 'আলী কাউকে বিয়ে করেননি। পরে তিনি বিয়ে করেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫৮৯

আলী (রা)-এর বেশ কিছু উম্মে ওলাদ ছিল।[১] তাদের থেকেও অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কেননা, তিনি চার স্ত্রী ও উনিশ উম্মে ওলাদ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। এসব উম্মে ওলাদের এমন অনেক সন্তান আছে যাদের মায়ের সঠিক পরিচয় জানা যায়নি। যেমন উম্মে হানী,

৫২২৫ আনাস (রা.) বলেন, একদিন রাসূল সা তার একজন স্ত্রীর কাছে ছিলেন। ঐ সময় নবীর আরেকজন স্ত্রী একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নবী সা অবস্থান করছিলেন সে স্ত্রী খাদিমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী সা পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন তারপর খাদিমকে বললেন, তোমার এ আম্মাজীর আত্মর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে।

৫২২৮ আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা আমাকে বললেন, "আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাকো এবং কখন রাগান্বিত হও।" আমি বললাম, কী করে আপনি তা বুঝেন? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, মুহাম্মাদ সা-এর রব-এর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি নারাজ থাকলে বল, ইব্রাহীম (আ.)-এর রব-এর কসম!

৫৬৬৬ একবার আয়িশাহ (রা.) বলেছিলেন হায় যন্ত্রণায় আমার মাথা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ যদি এমনটি হয় আর আমি জীবিত থাকি তাহলে আমি তোমার জন্য দুআ করব। আয়িশাহ (রা.) বললেনঃ হায় আফসোস, আল্লাহর শপথ। **আমার ধারণা আপনি আমার মৃত্যুকে পছন্দ করেন। আর তা হলে আপনি পরের দিনই আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে রাত কাটাতে পারবেন।**
৭২১৭ আয়িশাহ (রা.) একদিন বললেন, আমার মাথা(যন্ত্রনা)। তা শুনে রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার জন্য দু'আ করব।
আয়িশাহ (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! **আমার মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু পছন্দ করছেন। হ্যাঁ, যদি এমনটি হয়, তাহলে তো আপনি সেদিনের শেষে অন্য কোন স্ত্রীর সঙ্গে বাসর করবেন।**

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৭৯

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) সা'ঈদ ইব্ন আরূবা-কাতাদা (র) সনদে রিওয়ায়াত করেছেন, কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পনর জন মহিলার সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের মাঝে তের জনের সহিত তিনি দাম্পত্য জীবন করেছেন। এঁদের মাঝে তাঁর কাছে একত্রে সমাবেশ ঘটেছিল এগার জনের এবং নয় জনকে রেখে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁরা হলেন, (১) আইশা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক আত-তায়মিয়্যা[২] (রা); (২) হাফসা বিনত 'উমর ইবনুল খাত্তাব আল-আদাবিয়্যা; (৩) উম্মু হাবীবা রামলা বিনত আবূ সুফিয়ান সাখ্র ইব্ন হারব ইব্ন উমায়্যা আল্-উমাবিয়্যা; (৪) যায়নাব বিন্ত জাহাশ আল্-আসাদিয়্যা; (৫) উম্মু সালামা হিন্দ বিনত আবূ উমায়্যা আল্-মাখ্যূমিয়্যা; (৬) মায়মূনা বিনতুল হারিছ আল্-হিলালিয়্যা; (৭) সাওদা বিন্ত যাম'আ আল্-'আমিরিয়্যা; (৮) জুওয়ায়রিয়্যা বিনতুল হারিছ ইব্ন আবূ যিরার আল্-মুসতালিকিয়্যা এবং (৯) সফিয়্যা বিন্ত হুয়ায়্য ইব্ন আখ্তাব আন্-নাযিরিয়্যা আল্ ইসরাঈলিয়্যা আল্ হারূনিয়্যা রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুন্না। এ ছাড়া ওফাত কালে তাঁর

হতেও বিষয়টি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। 'আইশা (রা) বলেন, যে দু'জন মহিলার সাথে তিনি দাম্পত্য জীবন-যাপন করেননি– তারা হলেন, 'আম্রা বিন্‌ত ইয়াযীদ আল্ গিফারিয়্যা এবং আশ্ শাম্বা (রা) (কিংবা আসমা' বিন্‌তুন্ নু'মান আল্ কিনদী)। এঁদের মাঝে 'আমরা (রা)-এর সংগে নবী করীম (সা) নির্জন বাসে মিলিত হয়ে তাঁকে অনাবৃত করলে তাঁর গায় শ্বেতী দেখতে পান এবং তাঁকে মোহরানা দিয়ে বিদায় করে দেন। তিনি (নবী-পত্নী রূপে) অন্যদের জন্য 'হারাম' সাব্যস্তা হন। আর শামবা'-র ঘটনা হল এই যে, তাকে নবী করীম (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলে সে 'সহজ আচরণ' না করায় তার আচরণ পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় তাকে বর্জন করে রাখলেন। পরে আচমকা নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম (আ)-এর মৃত্যু হলে শাম্‌বা বলল, তিনি নবী হলে তো তাঁর ছেলে মারা যেত না। তখন নবী করীম (সা) তাঁকে তালাক দিলেন

৪৯২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

আবূ ইয়াহয়া (র)....সাহল ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গিফার গোত্রের এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন। তার সংগে নিভৃত বাসের সময় তার বসন অনাবৃত করলে তার স্তনের কাছে শ্বেত কুষ্ঠ জনিত সাদা বর্ণ দেখতে পেলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) একটু সংকোচ বোধ করে সরে গেলেন এবং বললেন, خذى ثوبك "তোমার বসন গুছিয়ে নাও।" পরে সকাল হলে তাকে বললেন, الحقى باهلك তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৮৫

যুহরী (র) বলেন, নবী করীম (সা) বনূ বকর ইব্‌ন কিলাব গোত্রের আলিয়া বিনত জাবয়ান ইব্‌ন আমরকে বিবাহ করেছিলেন এবং তার সংগে বাসর করার পরে তাকে তালাক দিয়েছিলেন। বায়হাকী (র) বলেন, আমার কিতাবে অনুরূপ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আলিয়া বিনত জাবয়ান (ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন কিলাব)-কে বিবাহ করেছিলেন। ইনি অনেক দিন তার কাছে ছিলেন এবং পরে তিনি তাকে তালাক দেন। ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান (র) হাজ্জাজ ইব্‌ন আবূ মানী' (র....আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ নারীর তথ্য সরবরাহ করেছিলেন যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফিয়ান আল কিলাবী (রা)। আমি তখন পর্দার অন্তরাল থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। সে বলল, উম্মু শাবীব-এর বোনের প্রতি কি আগ্রহ বোধ করবেন ? উম্মু শাবীব হল যাহ্‌হাক-এর স্ত্রী। এ সূত্রেই যুহরী (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ আমর ইব্‌ন কিলাব-এর এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন। পরে তাকে এ মর্মে অবহিত করা হল যে, তার গায়ে ধবল কুষ্ঠ রয়েছে। তখন তিনি তার সংগে নিভৃত বাস না করেই তাকে তালাক দিয়ে দেন।

(আলী ইব্‌ন হুসায়ন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) লায়লা বিনতুল হাতিম আনসারী (রা)-কে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অতিশয় আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্না। তাই তিনি নবী করীম (সা)-এর সংগে নিজের দুর্ব্যবহারের আশংকা করে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার আবেদন করলেন। নবী করীম (সা) সে আবেদন মনজুর করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বনূল জাওন আল কিন্‌দী কন্যা' -কেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। এ কিনদীরা ছিল বনূ ফাযারা-র মিত্র গোত্র . এই মহিলাটি নবী করীম (সা) থেকে আল্লাহর স্মরণ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, "তুমি এক মহান সত্তার আশ্রয় নিয়েছ, যাও তোমার আপন জনের সংগে মিলিত হও।" এ ভাবে তার সাথে বাসর না করেই তাকে তালাক দিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) খাওলা বিনতুল হুযায়ল ইব্‌ন হুযায়রা আত তাগলিবকেও পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন খারনাক বিনত খালাফা –দিহয়া বিনত খালীফা-র বোন। সিরিয়া (শাম) হতে তাকে নবী করীম (সা)-এর জন্য নিয়ে আসা হচ্ছিল। পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে গেল। পরে তার খালা শিরাফ বিনত ফুযলা ইব্‌ন খালীফা-কে তিনি বিবাহ করেন। তাকেও সিরিয়া থেকে তার কাছে নিয়ে আসার সময় তিনিও মারা গেলেন। আর ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আসমা বিনত কা'ব আল জাওনীকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু তার সংগে 'নিভৃত বাস' না করেই নবী করীম (সা) তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন। অনুরূপ বনূ কিলাব ও পরে বনূল ওয়াহীদ-এর অন্যতমা নারী আমরা বিনত যায়দকে নবী করীম (সা) বিবাহ করেছিলেন। তার আগেকার স্বামী ছিলেন ফাযল ইব্‌ন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব। এ স্ত্রীকেও তিনি সহবাসের আগেই তালাক দিয়েছিলেন।

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র)....শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কয়েকজন নারী নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে 'হিবা' রূপে সমর্পিত করেছিলেন। তাদের কতকের সংগে তিনি নিভৃত বাস করেছিলেন

বায়হাকী (র) আরো বলেন, জাওন গোত্রীয় যে নারী রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর শরণ নিয়েছিল এবং নবী করীম (সা) তাকে তার পরিবারের সংগে মিলিত হতে বলেছিলেন তার ঘটনা প্রসংগে বিবৃত আবূ রুশায়দ আস সা'ইদী (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে আমরা বর্ণনা করেছি যে, তার নাম ছিল উমায়মা বিনতুন নু'মান ইব্‌ন শারাহীল (তার বর্ণনা অনুরূপই)। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আয-যুবায়রী (র)....(হামযা তার পিতা) আবূ উসায়দ (রা) থেকে এবং (আব্বাস তার পিতা) সাহল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) এবং তার কতিপয় সাহাবী আমাদের এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরাও তার সংগ নিলাম এবং 'আশ শাওত' নামের একটি বাগানের দিকে চলতে লাগলাম। আমরা দু'টি বাগান বেষ্টনীর কাছে পৌছে সে দু'টির মাঝে আমরা বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা বসে থাক। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তখন জাওন গোত্রীয়াকে নিয়ে আসা হয়েছিল। উমায়মা বিনতুন নু'মান ইব্‌ন শারাহীলের ঘরে তাকে নিভৃত বাসে রাখা হল। তার সংগে ছিল তার একজন ধাত্রী (পরিচারিকা)। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে গমন করে তাকে বললেন, هبى لى نفسك "তুমি নিজেকে আমার জন্য সমর্পণ করে দাও।" সে বলল, কোন রাজকুমারী কি নিজেকে সাধারণ (বাজারী) লোকের কাছে সমর্পণ করে থাকে? সে আরো বলল, আমি আপনার কবল হতে আল্লাহর স্মরণ প্রার্থনা করছি। নবী করীম (সা) বললেন, "তুমি এই শক্ত আশ্রয় প্রার্থনার যথাযোগ্য সত্তার আশ্রয় নিয়েছ।" তারপর তিনি আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, يا ابا أسيد اكسها دراعتين والحقها باهلها- "আবূ আসীফ! তাকে দুটি চাদর (জুব্বা) পরিধেয় রূপে দিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারে পাঠিয়ে দাও।" (আবূ) আহমাদ (র) ব্যতীত অন্যরা বলেছেন,....বনূ জাওন-এর এক নারী, যাকে আমীনা নামে ডাকা হত। বুখারী (র) বলেছেন, আবূ নুআয়ম (র)....আবূ আসীফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে বের হলাম এবং আমরা আশ শাওত নামের একটি বাগানের উদ্দেশ্যে চলতে থাকলাম। অবশেষে আমরা দেয়াল বেষ্টিত দু'টি বাগানের কাছে পৌছে সে দু'টির মাঝে বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা এখানে বসে থাক।" তিনি ভিতরে গেলেন। ওদিকে জাওন গোত্রীয় নারীকে নিয়ে এসে উমায়মা বিনতুন নুমান ইব্‌ন

শারাহীলের বাড়ির একটি মহলে অবস্থান করানো হয়েছিল। তার সংগে ছিল তার দাই-মা, যে তাকে লালন-পালন করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে প্রবেশ করে তাকে বললেন, هبى لى نفسك "তুমি নিজেকে আমার কাছে অর্পণ কর।" সে বলল, "কোন রাজরানী কি নিজেকে সাধারণ (বাজারী)-এর কাছে সমর্পিত করতে পারে?" বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী করীম (সা) তার গায়ে হাত রেখে তার উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে নিজের হাত তার দিকে প্রসারিত করলেন। তখন সে বলে উঠল, আমি আপনার কবল হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নবী করীম (সা) বললেন, "আশ্রয় প্রার্থনার যথার্থ যোগ্য সত্তার কাছে তুমি আশ্রয় প্রার্থনা করেছ।" তারপর আমাদের কাছে বের হয়ে এসে বললেন, "ও আবূ আসীফ! তাকে দু'খানি (কাতানের সাদা) কাপড় পরিধেয়রূপে দিয়ে দাও এবং তাকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দাও।"

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সে নবী করীম (সা) হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করলে তিনি রুষ্ট হয়ে তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে আসলে আশ'আছ (রা) তাকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এতে দুঃখিত হবেন না। আমার কাছে তার চেয়ে সুন্দরী গুণবতী রয়েছে। পরে তিনি নিজের বোন কাতীলাকে তার সংগে বিয়ে দিলেন। অন্যান্য বর্ণনা মতে এটি ছিল নবম হিজরীর রাবী (আউয়াল/ছানী) মাসের ঘটনা।

কিলাব গোত্রের স্ত্রীর নাম ছিল 'আম্‌রা। তার পিতা তার সম্বন্ধে এ বিবরণ দিয়েছেন যে, সে কখনো রোগাক্রান্ত হয়নি। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) তার প্রতি অনাগ্রহী হলেন না। আর মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) সূত্রে যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, এ স্ত্রীই হল ফাতিমা বিনতুন যাহ্-হাক ইব্ন সুফিয়ান, সে রাসূল (সা) হতে আল্লাহর পানাহ গ্রহণ করলে তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন।

রাসূল (সা) উম্মু শুরায়ক (রা)-এর সংগেও নিভৃত বাস করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বনূ হারাস ও পরে বনূ সুলায়ম গোত্রীয় আসমা বিনতুস সালতকেও বিয়ে করেছিলেন এবং তার সংগেও নিভৃত বাস করেন নি। আর হামযা বিনতুল হারিছ আল মুযানীকে তিনি পয়গাম পাঠিয়েছিলেন।

সা'ঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র) বলেন, কাতাদা (র) থেকে, রাসূলুল্লাহ (সা) পনের জন মহিলাকে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তিনি এদের মাঝে নাজ্জার গোত্রের আনসারী মহিলা উম্মু শুরায় (রা)-কেও উল্লেখ করেছেন। সা'ঈদ (র) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, "আনসারীদের মাঝে বিয়ে করা আমার পসন্দনীয়। কিন্তু আমি তাদের টনটনে আত্মমর্যাদা বোধ পসন্দ করিনা।"

আবূ উবায়দা মা'মার ইবনুল মুছান্না (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আঠার জন নারীকে বিয়ে করেছিলেন। এ বর্ণনায় তিনি আশ'আছ ইব্ন কায়স-এর বোন কাতীলা বিনত কায়স (রা)-কেও এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন, নবী করীম (সা) তার ওফাতের দুই মাস আগে তাকে বিয়ে করেছিলেন। এ বিয়ে হয়েছিল নবী করীম (সা)-এর ওফাত পূর্ববর্তী অসুস্থতাকালে। তাই, তাকে নবী করীম (সা)-এর কাছে নিয়ে আসা হয়নি এবং তিনি তাকে দেখেনও নি বা তার সংগে বাসরও করেননি।

অনেকে এ কথাও বলেছেন যে, নবী করীম (সা) এ মর্মে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, কাতীলাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। সুতরাং সে ইচ্ছা করলে তার জন্য নবী পত্নীসুলভ পর্দার হুকুম সাব্যস্ত হবে এবং মু'মিনদের জন্য তাকে বিয়ে করা হারাম হবে। আর ইচ্ছা করলে সে যাকে পসন্দ বিয়ে করতে পারবে। পরে সে বিয়ে করা ইখতিয়ার করলে ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল হাযরামাওতে তাকে বিয়ে করলেন। আবূ বকর (রা)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি তাঁদের দু'জনকে ভস্মীভূত করে দেয়ার সংকল্প করেছি।
নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর সে ধর্ম ত্যাগ করেছিল।

আবূ উবায়দা (র) নবী-পত্নী তালিকায় ফাতিমা বিনত শুরায়হ ও সাবা বিনতু আসমা ইবনুস সালত আস সুলামী (রা)-এর নামও যুক্ত করেছেন। ইব্ন আসাকির (র) কাতাদা সূত্রে অনুরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা

করেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিগণের মধ্যে সাবা' বিনত সুফিয়ান ইব্ন আওফ ইব্ন কা'ব ইব্ন আবূ বকর ইব্ন কিলাবও ছিলেন। ইব্ন উমর (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ আসীফ (রা)-কে পাঠালেন বনূ আমির-এর আম্রা: বিনত ইয়াযীদ (ইব্ন উবায়দা ইব্ন কিলাব)-কে বিবাহের পয়গাম দেওয়ার জন্য। পরে তাকে বিয়ে করার পর তিনি অবগত হলেন যে, এ নারীর 'ধবল' (কুষ্ঠ) রোগ রয়েছে। তখন তিনি তাকে তালাক দিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ (র) ওয়াকিদী (র) সূত্রে আবূ মা'শার থেকেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুলায়কা বিনত কা'ব (রা)-কেও বিবাহ করেছিলেন। মুলায়কা-র অতুলনীয় রূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল। তখন আইশা (রা) তার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার পিতৃহন্তাকে তোমার বিয়ে করতে লজ্জাবোধ হচ্ছে না ? তখন সে নবী করীম (সা) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে নবী করীম (সা) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন।
মক্কা বিজয় অভিযানে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন।

খুযায়মা আল হিলালী। এছাড়া তিনি যাদের সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বনূ বাকর ইব্ন আমর ইব্ন কিলাব গোত্রের আলিয়া বিনত জাবয়ান। তিনি আরো বিবাহ করেন কিনদার অন্তর্গত বনূ জাওন-এর জনৈক নারীকে। এছাড়া তিনি যুদ্ধবন্দী বাঁদীরূপে গ্রহণ করেন জুওয়ায়রিয়া বিনতুল হারিছ ইব্ন আবূ যিরার-মুসতালাকী খুযা'ঈকে; মুরায়সী' অভিযানে। যে অভিযানে 'মানাত' প্রতীমা ধ্বংস করা হয়েছিল এবং বনূ নাযীর-এর সাফিয়্যা বিনত হুয়ায় ইব্ন আখতাবকে। এ দুজন ছিলেন সমরাভিযানকালে 'ফায়' রূপে প্রাপ্ত, রাসূলুল্লাহ

(সা) আলিয়া বিনত জাবয়ানকে তালাক দিয়ে দেন। আমর ইব্ন কিলাব গোত্রীয় স্ত্রীকে এবং কিনদী জাওন গোত্রের স্ত্রীকেও তার ধবল কুষ্ঠের কারণে বিচ্ছিন্ন করে দেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই যায়নাব বিনত খুযায়মা হিলালী (রা) ইন্তিকাল করেন। আমরা এ তথ্য অবগত হয়েছি যে, তালাক প্রাপ্তা আলিয়া বিনত যাব্য়ান নবী পত্নীদের পুনঃ বিবাহ হারাম ঘোষিত হওয়ার আগেই অন্যত্র বিবাহ করেছিলেন। স্বগোত্রে তার এক জ্ঞাতি ভাইয়ের সংগে তার বিবাহ হয়েছিল

↥

ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) সূত্রে, উম্মু হানী-ফাখতা বিন্ত আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ননা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে (উম্মু হানীকে) বিবাহের প্রস্তাব দেন। উম্মু হানী (রা) তাঁর ছোট ছোট সন্তানদের কথা উল্লেখ করলে তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন

বর্ণনাকারী (ইব্ন সা'দ) বলেন, নবী করীম (সা) হাবীবা বিনতুল আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকেও বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। পরে দেখা গেল যে, তার পিতা (আব্বাস) নবী করীম (সা)-এর দুধভাই। আবূ লাহাবের বাঁদী ছুওয়ায়বিয়া তাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছিলেন।

এ-ই হচ্ছে নবী পত্নীগণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।

ইব্ন সা'দ ..... আফরার মওলা উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একাধিক সহধর্মিণী দেখে লোকজনকে বলল, "তোমরা এ লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, সে আহারে পরিতৃপ্ত হয় না; আল্লাহর কসম সে নারী ছাড়া কিছু বুঝে না।" সমাজে তাঁর একাধিক সহধর্মিণী থাকায় তারা তার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রতি দোষারোপ করে। তাদের মন্তব্য হল, যদি ইনি নবী হতেন, তাহলে নারীদের প্রতি এতো লিপ্সা থাকতো না। এ কুৎসা রটনায় সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে হুয়াই ইব্ন আখতাব। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি তাঁর দান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا أٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ (অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন, সে জন্যে কি তারা তাদেরকে হিংসা করে?) এখানে ناس বা মানুষ অর্থ রাসূল (সা) فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا —তাহলে ইবরাহীমের বংশধরকেও তো আমি কিতাবও হিকমত প্রদান করেছিলাম এবং তাদেররকে বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম। (৪ নিসা ঃ ৫৪)। ইবরাহীমের বংশধর বলতে এখানে হযরত সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর ছিলেন এক হাজার স্ত্রী, তাদের মধ্যে সাত শ' স্বাধীন এবং তিন শ' বাঁদী। আর হযরত দাউদ (আ)-এর ছিলেন একশ' জন স্ত্রী, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর মা-যিনি ইতিপূর্বে উরিয়ার স্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর স্ত্রী সংখ্যার তুলনায় তাঁদের সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। কালবীও ঠিক এইরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (তাহকিককৃত)

৩৯৩১। আয়িশাহ (রা) বলেন, **বনী মুস্তালিক যুদ্ধে জুয়ায়রিয়া বিনতু হারিস বন্দিনী হয়ে সাবিত ইবনু কায়িস (রা) এর ভাগে পড়েন**। অতঃপর তিনি নিজেকে আযাদ করার চুক্তি করেন। তিনি খুবই সুন্দরী নারী ছিলেন, নজর কাড়া রূপ ছিলো তার। আয়িশাহ (রা) বলেন, তিনি চুক্তির অর্থ চাইতে রাসূলুল্লাহ সা। তিনি দরজায় এসে দাঁড়াতেই **আমি তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলাম। কেননা যে রূপ-লাবন্য তার দেখেছি, আমি ভাবলাম, শিঘ্রই রাসূলুল্লাহ সা তাকে এভাবে দেখবেন**।

অতঃপর জুয়ায়রিয়াহ নবী সা এর কাছে এসে বললেন, আমি জুয়ায়রিয়া বিনতু হারিস, আমার সামাজিক অবস্থান অবশ্যই আপনার নিকট স্পষ্ট। আমি সাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শাম্মাসের গণীমতের ভাগে পড়েছি। **আমি মুক্ত হওয়ার চুক্তিপত্র করেছি, চুক্তির নির্ধারিত অর্থ আদায়ে সাহায্য চাইতে আপনার কাছে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেন, এর চেয়ে ভালো প্রস্তাবে তুমি রাজি আছো কি? তিনি বললেন, কি প্রস্তাব! রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ আমি চুক্তির সমস্ত পাওনা শোধ করে তোমাকে বিয়ে করতে চাই**।

৫২৫৬ ইবন সাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. উমাইমা বিনতু শারাহীলকে বিবাহ করেন। পরে তাকে তাঁর কাছে আনা হলে **তিনি তার দিকে হাত বাড়ালেন। সে এটি অপছন্দ করল**। তাই নবী সা তার একজন সাহাবীকে তার জিনিসপত্র গুটিয়ে এবং দুখানা কাতান বস্ত্র প্রদান করে তার পরিবারের নিকট পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিলেন।

নবী মুহাম্মদের নারীভোগের কামাতুর লোলুপ দৃষ্টি নিজের পালকপুত্রের স্ত্রী কেও রেহাই দেয়নি, যাকে এতদিন শ্বশুর বাবা ডাকত তার সাথেই শুতে হয়েছে, তার কাছেই নিজের দেহ বিলিয়ে দিতে হয়েছে !

ইবনে জারীর তাবারী (রহঃ) তাঁর তারীখ (৩/১৬১) এবং ইবনে সাদ তাঁর তাবাকাত (৮/১০১)

মুহাম্মাদ ইবনে উমার (আল ওয়াকেদী) বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আল আসলামী বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে হিশাম বলেন "রাসুলুল্লাহ সা তার পালকপুত্র যায়েদ এর বাসায় তাঁকে খুঁজতে গেলেন, তখন যায়দকে বলা হতো 'মুহাম্মাদের পুত্র'। কিন্তু তিনি তাঁকে বাসায় খুঁজে পেলেন না। এমতাবস্থায়, জয়নাব তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে তাঁর রাতের পোশাক পরে বের হলেন। নবী সা তাঁর মুখ ফেরালেন এবং তিনি (জয়নাব) বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! সে এখানে নেই, দয়া করে ভেতরে আসুন।' কিন্তু নবী সা (ভেতরে প্রবেশ করতে) রাজি হলেন না। তিনি **(জয়নাব) রাতের পোশাক পরে বের হয়েছিলেন**, কারণ তাঁকে বলা হয়েছিলো নবী ﷺ দরজায় দাঁড়িয়ে, তাই তিনি তাড়াহুড়ো করেছিলেন। **তিনি নবী ﷺ এর হৃদয়ে জায়গা করে নিলেন**। **নবী ﷺ অস্পষ্ট গুঞ্জন করতে করতে বের হয়ে গেলেন, (যার মধ্যে শুধু এতোটুকু বোঝা গেলো) 'সকল প্রশংসা তাঁর যিনি হৃদয়ের পরিবর্তন করেন**।

৪০০০ জাহিলীয়্যাতের যুগে কেউ পালকপুত্র গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে পালনকারীর প্রতিই সম্বোধন করত এবং সে তার ছেড়ে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী হত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ) অর্থাৎ "তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতার পরিচয়ে।"

আল্লাহ তোমাদের পালকপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহই সত্য কথা বলেন। কোরআন ৩৩/৪

সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর যা ফরয করেছেন এবং অন্যদের জন্য যা হারাম করেছেন- আল্লাহর নৈকট্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

৩২০৮। আয়েশা (রা) বলেন, **রাসূলুল্লাহ্ সা এর ইন্তিকালের পূর্বে আল্লাহ তাআলা তার জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন যাকে ইচ্ছা তিনি মহিলাদের মধ্য থেকে বিবাহ করতে পারবেন।**

২৬৮ রাসূলুল্লাহ্ সা তাঁর স্ত্রীগণের নিকট দিনের বা রাতের কোন এক সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলিত হতেন। তাঁরা ছিলেন এগারজন।

৫২১৫ পরিচ্ছেদঃ একই গোসলে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সা একই রাত্রে সকল স্ত্রীর নিকট গমন করেছেন(মিলিত হয়েছেন)। ঐ সময় তাঁর ৯ জন স্ত্রী ছিল।

সুনানে ইবনে মাজাহ

পরিচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করে। **পবিত্রতা** ও তার সুন্নাতসমূহ

৫৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। **নবী সা তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস শেষে একবার গোসল করতেন**।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)
৫৯৫। রাসূলুল্লাহ সা তার সকল স্ত্রীর কাছে একই গোসলে যেতেন। [ইসলামে স্ত্রীর কাছে গমন বা স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার মানে কী? https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=76153, https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=76154]

সুনানে ইবনে মাজাহ
পরিচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করে। পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ
৫৮৯। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা এর গোসলের পানি প্রস্তুত করে রাখলাম। তিনি একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর একবার গোসল করেন।

হেরেমখানা বানিয়েছিলেন নবী

হেরেম শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্ষিতাদের আবাসস্থল। স্ত্রীদের হেরেমে রাখা হয় না। শুধুমাত্র রক্ষিতাদের হেরেমে রাখা হয়। নবীর রক্ষিতাদের জন্য হেরেমখানা ছিল।
সহীহ মুসলিম (ইফা)
পরিচ্ছদঃ **রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হেরেম সন্দেহমুক্ত হওয়া**
৬৭৬৬। আনাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা এর উম্মে ওয়ালাদের সাথে এক ব্যক্তির প্রতি অভিযোগ (অপবাদ) উথাপিত হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সা আলী (রা) কে বললেন, যাও। তার শিরশ্ছেদ কর।

২৭৫ পরিচ্ছেদঃ মসজিদের ভিতরে নিজের জানাবাতের কথা স্মরণ হলে তখনই বেরিয়ে পড়বে।
একবার সালাতের ইকামত দেয়া হলে সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করছিলেন, তখন রাসূল সাঃ আমাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন। তিনি মুসাল্লায় দাঁড়ালে তাঁর মনে হলো যে, তিনি জানাবাত অবস্থায় আছেন। তখন তিনি আমাদের বললেনঃ নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাক। তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আবার আমাদের সামনে আসলেন।

২৯৯,২৬১ আয়িশা (রা.) বলেন- আমি ও নবী সা জানাবাত(যৌনমিলনজনিত অপবিত্র) অবস্থায় একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। একই পাত্রের পানি দিয়ে এভাবে গোসল করতাম যে, তাতে আমাদের দু'জনের হাত একের পর এক পড়তে থাকতো।
২৬৪ আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা ও তাঁর স্ত্রীদের কেউ কেউ একই পাত্রের পানি নিয়ে গোসল করতেন। তা ফরজ গোসল ছিল।

সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৫৭২। আয়িশা (রা) বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুমতী হয়ে পড়ত তখন রাসুলুল্লাহ সা এর নির্দেশে সে নিম্নাঙ্গে ভাল করে বস্ত্র ভাল করে বেধে নিত। তারপর রাসুলুল্লাহ সা তাঁর সাথে মেলামেশা করতেন।

সুনান আন-নাসায়ী (ইফা)
পরিচ্ছেদঃ ঋতুমতী স্ত্রীর শরীরে শরীর মিলানো
৩৭৪। আয়িশা (রা) বলেনঃ আমাদের কেউ ঋতুমতী হলে রাসূলুল্লাহ সা তাকে ইযার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি তার দেহের সাথে দেহ মেলাতেন।

৩০০ আয়িশা (রা.) বলেন- রাসুলুল্লাহ্ সা আমাকে নির্দেশ দিলে আমি ইযার পরে নিতাম, আমার ঋতুস্রাব চলাকালীন(মাসিক) অবস্থায় তিনি আমার সাথে **মিশামিশি** করতেন।

সৌদি আরবের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি প্রদত্ত ফতোয়া।
ফতোয়া নম্বর 41409 7/5/1421
প্রশ্নঃ এই বিষয়ে কুরআনের নিয়ম কী? বিশেষতঃ আল্লাহর রসূল (সাঃ) আয়েশা (রাঃ)'র শরীরে লিঙ্গ ঘষতেন বলে জানা যায়?
উত্তরঃ **আল্লাহর রাসুল সা আয়শাকে কোলে নিয়ে তার দুই থাইয়ের মাঝে আল্লাহর রাসুলের লিঙ্গ মুবারক স্থাপন করে হালকাভাবে নাড়াচাড়া করতেন।**

↥

https://www.islamweb.net/en/fatwa/92051/

Question

Asalamualaykumwarahmatullahiwabarakatahu can you explain to me the thing called "thighing" also pronounced "mufa

Answer

The term *Mufaakhathah* means to have foreplay with the wife in between her thighs. It is reported in one narration that when *the Prophet ﷺ wanted to enjoy one of his wives who was in menstruation, he would put a piece of cloth on her vagina (i.e. cover it).* [Ibn Maajah].

The author of Faydh Al-Qadeer interpreted the expression '*if he wanted to enjoy to mean having all permissible foreplay but avoiding the vagina [or the anus], like in between her thighs (i.e. Mufaakhathah).*

সুনান আন-নাসায়ী (ইফা) পরিচ্ছেদঃ ঋতুমতী স্ত্রীর শরীরে শরীর মিলানো

৩৭৪। আয়িশা (রা.) বলেন- আমাদের কেউ ঋতুমতী হলে রাসূলুল্লাহ্ সা তাকে ইযার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর **তিনি তার দেহের সাথে দেহ মেলাতেন**।

৩২২, ১৯২৮ উম্মু সালামা (রা.) বলেনঃ **রাসূলুল্লাহ্ সা রোযা রাখা অবস্থায় আমাকে চুমু খেতেন**। এবং নবী সা ও আমি একই পাত্র হতে পানি নিয়ে ফরজ-গোসল করতাম।

২৬৪৭ আয়িশা (রা) বলেন, নবী সা আমার নিকট আসলেন, তখন আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, হে আয়িশা! কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাচাই করে দেখে নিও। কেননা, **শুধুমাত্র ক্ষুধার কারণে দুধ পানে**র ফলেই শুধু দুধ(ভাই/বোন) সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ইসলামে নাবালিকা মেয়েকে তার অমতে যেকোন বয়সী পুরুষের(এমনকি বৃদ্ধের) সাথে বিয়ে এবং তার সাথে সঙ্গম করা সম্পূর্ণ বৈধ, যে মুসলমান এই বিধানকে অপছন্দ করবে সে সাথে সাথে কাফের হয়ে যাবে

কোরআন: 33:49

হে মুমিনগণ, **যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিবাহ করবে অতঃপর তাদের সাথে সহবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেবে তবে তোমাদের জন্য তাদের কোন ইদ্দত নেই** যা তোমরা গণনা করবে।

কোরআন: (65/4) সূরা ত্বলাক্ব, আয়াত ৪

যারা এখনো ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি(অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী) তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস। /

যারা ছোট থাকার ফলে মাসিকের বয়সে উপনীত হয় নি তাদের ইদ্দতও তিন মাস/

যারা (অল্পবয়স্কা হওয়ার কারণে) এখনও ঋতুবতী হয়নি তাদেরও ইদ্দতকাল তিন মাস

এখানে সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে- যারা ঋতুর বয়সে পৌঁছে নি_ তাদের যেহেতু ইদ্দতের কথা বলা আছে, তাই অবশ্যই সহবাসের অনুমতিও দেয়া আছে। নইলে ইদ্দতের নির্দেশই থাকতো না। ***কারণ সহবাস ছাড়া তো ইদ্দতের প্রয়োজনই নেই****। যেহেতু স্বামীর সেক্স করলেই তালাকের পর নারীর জন্য ইদ্দতকাল প্রযোজ্য হয় সেহেতু, এখনো ঋতুবতী হয় নি এমন বাচ্চা মেয়ের জন্যও তিন মাস ইদ্দতকাল প্রযোজ্য হওয়া প্রমাণ করে, ইসলাম ছোট্ট বাচ্চামেয়েদের সাথেও সেক্স করা সমর্থন করে।*

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, বার্ধক্যের কারণে যে মহিলার ঋতু আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তালাকপ্রাপ্তা হইলে তাহা তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে। অনুরূপভাবে যেই মেয়েরা এখনও ঋতুবতী হয় নাই তাহাদিগের ইদ্দতও তিন মাস।

ইব্‌ন জারীর (র) আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন সায়িব (র)....... আমর ইব্‌ন সালিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন সালিম (র) বলেন যে ঃ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) একদিন বলিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অনেক মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে তো কুরআনে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বৃদ্ধা ও গর্ভবতী নারী, তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন। এই হাদীস দ্বারা ইব্‌ন জারীর (র) দলীল পেশ করেন।

৫৮৮ তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, ষষ্ঠ খণ্ড [২৮তম পারা]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ : وَالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ মুবতাদা مُبْتَدَأٌ হলো আর এর خَبَرٌ উহ্য রাখা হয়েছে। আর তা হলো فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ যাদের এখনও হায়েজ আসেনি তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস। অর্থাৎ হায়েজ অল্পবয়স্কতার কারণে আসেনি, কিংবা অনেক স্ত্রীলোকের যেমন বহু বিলম্বে হায়েজ হয়, এমনিভাবে সারা জীবনে হায়েজ হয় না এমন স্ত্রীলোক কমই হয়ে থাকে। যা হোক না কেন সব অবস্থাই এ ধরনের স্ত্রীলোকের ইদ্দত তা-ই যা হায়েজ হওয়া হতে নিরাশ স্ত্রীলোকের ইদ্দত। অর্থাৎ তালাকের সময় হতে তিন মাস।

এখানে মনে রাখতে হবে, কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হয় সে স্ত্রীলোকের যার সাথে স্বামী নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হয়েছে। কারণ নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক হলে আদৌ কোনো ইদ্দত পালন করতে হয় না। -[আল-আহযাব-৪৯]

তাফসীরে মাযহারী/৫৬৪

মাসআলা ঃ ইদ্দতের এসকল হিসাব প্রযোজ্য হবে কেবল তালাকপ্রাপ্তাদের উপর। বিধবাদের উপরে এ সকল হিসাব প্রযোজ্য হবে না। বিধবা যদি গর্ভবতী না হয়, তবে তার ইদ্দত হবে চারমাস দশদিন, সে অপ্রাপ্তবয়স্কা, যুবতী, বৃদ্ধা, যে-ই হোক না কেনো। একথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সলফে সালেহীনের ঐকমত্য। আর এমতো ঐকমত্যের ভিত্তি হচ্ছে ওই হাদিস, যা হজরত উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে অবতরণের পরিপ্রেক্ষিতরূপে।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ যখন বলাবলি করলেন, অপ্রাপ্তবয়স্কা, যারা ঋতুবতী নয় এবং বিধবাদের সম্পর্কে তো কিছু বলা হলো না, তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। সাহাবীগণ ঠিকই বলেছিলেন। সেকারণেই আলোচ্য

পারা- ২৮ তাফসীরে তাওহীদুল কুরআন ❖ ৫৬৭ সূরা তালাক

وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতু আসার কোন আশা নেই, তোমাদের যদি (তাদের ইদ্দত সম্পর্কে) সন্দেহ হয়, তবে (জেনে রাখ) তাদের ইদ্দত হল তিন মাস।[৮] আর এখনও পর্যন্ত যারা ঋতুমতীই হয়নি, তাদেরও (ইদ্দত এটাই)। যারা গর্ভবতী, তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ হল, সন্তান প্রসব

৮. সূরা বাকারায় (২ : ২২৮) বলা হয়েছিল তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকাল তিনটি ঋতু। এতে কারও মনে প্রশ্ন দেখা দিল, যাদের বয়স বেশি হওয়ার কারণে ঋতু আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত কী হবে? এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ইদ্দতকাল তিন ঋতুর স্থানে তিন মাস হবে। এমনিভাবে নাবালেগ মেয়ে, যার এখনও পর্যন্ত ঋতু দেখা দেয়নি, তার ইদ্দতও তিন মাস। যাদেরকে গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে, তার ইদ্দত ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সন্তান প্রসব হয় বা কোন কারণে গর্ভপাত ঘটে,

ফতওয়ায়ে আলমগীরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় খণ্ড,

নাবালিকার সাথে সহবাস এবং তালাকের বিষয়ে ফতওয়া

তালাক অধ্যায় ৬৩৯

২০. মাসাআলা : 'আদাবুল কাযী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এখনো হায়িয জারী হয়নি এমন নাবালিগা স্ত্রীর সাথে তার স্বামী যদি সহবাস করে থাকে সে যদি এমন বয়সী হয়

কোন নাবালিগাকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দিল, তারপর একদিন কম তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, অতঃপর তার হায়িয আসল। তাহলে তিন হায়িয না যাওয়া পর্যন্ত

কোন নাবালিগ দাসীকে যদি সহবাসের পর তালাক দেওয়া হয়, তবে তার ইদ্দত দেড় মাস হবে। যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটে পৌঁছে তার হায়িয
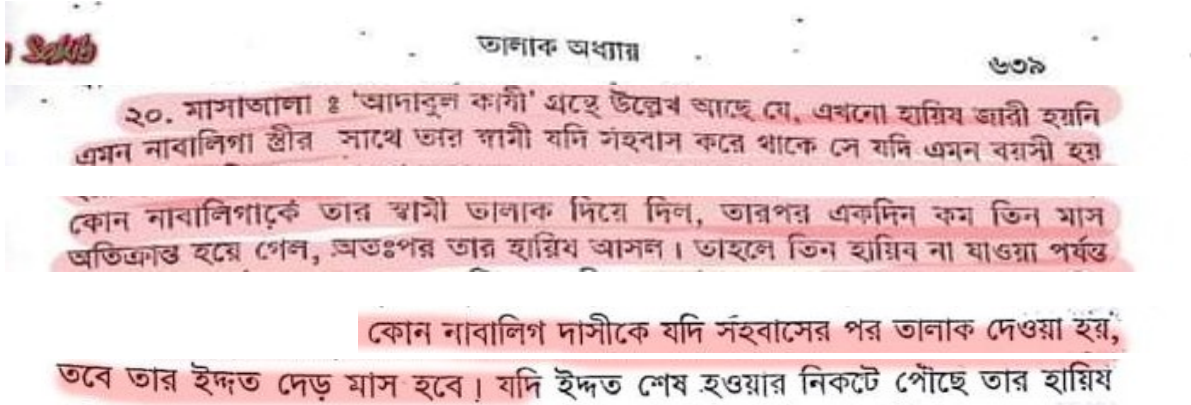
সুনান আদ-দারেমী (হাদিসবিডি)

পরিচ্ছেদঃ দাসীর ইসতিবরা

১২১২, ১২১৩.। আওযাঈ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, একটি লোক একটি দাসী ক্রয় করলো **যে এখনো হায়েযে উপনীত হয়নি আর গর্ভধারণের মতো (বয়সও তার) হয়নি**। এমতাবস্থায় সেই লোকটি কতদিন তার থেকে সম্পর্কহীন থাকবে? তিনি বললেনঃ তিন মাস। ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর বলেন, পঁয়তাল্লিশ দিন।

কিতাবুল কারাহিয়াহ ৬২৯

وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِى لاَ عَلَى الْبَائِعِ لِاَنَّ الْعِلَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ إِرَادَةُ الْوَطْىِ وَالْمُشْتَرِى هُوَ الَّذِى يُرِيدُهُ دُونَ الْبَائِعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرَ اَنَّ الْإِرَادَةَ اَمْرٌ مُبْطَنٌ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى دَلِيلِهَا وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْوَطْىِ وَالتَّمَكُّنُ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْمِلْكِ وَالْيَدِ فَانْتُصِبَ سَبَبًا وَأُدِيرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ تَيْسِيرًا فَكَانَ السَّبَبُ إِسْتِحْدَاثُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ الْمُؤَكَّدِ بِالْيَدِ وَتَعَدَّى الْحُكْمُ إِلَى سَائِرِ اَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِى مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ وَمِنَ الْمَرْأَةِ وَمِنَ الْمَمْلُوكِ وَمِمَّنْ لاَ يَحِلُّ لَهُ وَطْيُهَا وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُشْتَرَاةُ بِكْرًا لَمْ تُوْطَأْ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ وَإِدَارَةُ الْاَحْكَامِ عَلَى الْاَسْبَابِ دُوْنَ الْحِكَمِ لِبُطُوْنِهَا فَيُعْتَبَرُ تَحَقُّقُ السَّبَبِ عِنْدَ تَوَهُّمِ الشُّغْلِ ـ

অনুবাদ : ইসতিব্‌রা করা ক্রেতার উপর ওয়াজিব, বিক্রেতার উপর নয়। কেননা এর মূল কারণ হলো দাসীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করা। আর তা ক্রেতাই করে থাকে, বিক্রেতা করে না। অতএব, ক্রেতার উপরই إِسْتِبْرَا। তথা জরায়ু পবিত্র করা ওয়াজিব। তবে সহবাসের ইচ্ছা একটি গোপন বিষয়, তাই إِسْتِبْرَا। -এর হুকুম আবর্তিত হবে এর দলিলের উপর। আর সে দলিল হলো সহবাস করার বৈধ কর্তৃত্ব। এ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় মালিকানা ও দখলের দ্বারা। আর তাই কর্তৃত্বকেই কারণ বা সবব সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং বিষয়টিকে সহজ করার জন্য হুকুম উক্ত কর্তৃত্বের

↥

যদি ক্রয়কৃত দাসীটি সহবাসে অযোগ্য কুমারী হয় তবুও [ا‌ِسْتِبْرَا করা ওয়াজিব হবে]; সবব পাওয়া যাওয়ার কারণে। আর হুকুমসমূহ সববসমূহের সাথেই আবর্তিত হয়, হিকমত বা রহস্যসমূহের সাথে নয়। কেননা হিকমত গোপন থাকে। সুতরাং জরায়ুতে বীর্য থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও সবব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ وَفِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেসব দাসী মাস গণনার মাধ্যমে ইদ্দত পালন করতে হয় অর্থাৎ বয়সের স্বল্পতার কারণে এখনো যাদের হায়েয শুরু হয়নি কিংবা অধিক বয়সের কারণে হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে এমন দাসী যদি কারো অধিকারে আসে তাহলে সে দাসীর গর্ভাশয় পবিত্র বলে সাব্যস্ত হবে এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা। কেননা এসব মহিলার ক্ষেত্রে একমাসকে এক হায়েযের স্থলবর্তী এবং তিন মাসকে তিন হায়েযের স্থলবর্তী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সৌদি সরকারের ইসলামি গবেষণা ও ইফতা বিভাগ (The General Presidency of Scholarly Research and Ifta, http://www.alifta.net থেকে নাবালিকার সাথে সহবাস বিষয়ে-

Home Page | About Us | Ifta Site | Grand Mofty Corner | Sunnah Project

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء > English > Al-Ifta Contents > Fatwas of Permanent Commitee > Browse By Topic

Browse by subject > Sirah (the Prophet's biography) > The Prophet (peace be upon him) > The Prophet's wives, children, relatives and freed slaves > Q 1: Is it true that the Prophet's marriage to `A'ishah while still young was one of his particularities or was it a legislation for the whole Ummah? Is it permissible to consummate...

The first question of Fatwa no. 18734

Q 1: Is it true that the Prophet's marriage to `A'ishah while still young was one of his particularities or was it a legislation for the whole Ummah?

Is it permissible to consummate marriage with immature girl? If not, how then should she observe three months as `Iddah (waiting period)?

A: The Prophet (peace be upon him) betrothed `Aishah (may Allah be pleased with her) while she was six years old. He consummated the marriage in Al-Madinah when she was nine years old. Actually, this is not a particularity just for him. Thus, it is permissible to contract the marriage of an immature girl and consummate it

(Part No. 18; Page No. 125)

even before maturity if she is able to. As for the `Iddah of an immature girl, Allah (Glorified and Exalted be He) defined the `Iddah of those who have passed the age of monthly courses and those who are still immature to be three months. Allah (Exalted be He) said, (And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the 'Iddah (prescribed period), if you have doubt (about their periods), is three months; and for those who have no courses [(i.e. they are still immature)) In fact, immature girls are included under the category: (...and for those who have no courses [(i.e. they are still immature) their 'Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death].) May Allah grant us success. May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

The Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta'

Member	Member	Deputy Chairman	Chairman
Bakr Abu Zayd	Salih Al-Fawzan	`Abdul-`Aziz Al Al-Shaykh	`Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz

↥

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২

ফাতাওয়ায়ে ৪২ ফকীহুল মিল্লাত -৬

আইনি ঝামেলা এড়ানোর জন্য বয়স বাড়িয়ে লেখা

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সের কমে কোনো মেয়েকে বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ। অথচ শরয়ী আইন অনুযায়ী বিবাহে আবদ্ধ করানো জায়েয আছে। শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ দিলে অনেক সময় সরকারিভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। প্রশ্ন হলো, সরকারি হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য ১৪ বছর বয়সী মেয়েকে সরকারি খাতায় ১৮ বছর লিখিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত মেয়ের অভিভাবকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে যে মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হওয়ামাত্রই যেন তাড়াতাড়ি বিবাহ দেওয়া হয়। এর বিপরীতে কেউ যদি চাপ সৃষ্টি করে তাহলে জুলুম বা অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। শরীয়তের বিধান মানতে গিয়ে জুলুম বা অন্যায় থেকে বাঁচার যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বন করার অবকাশ আছে। (১৬/৪৭৯/৬৬১৮)

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٦/ ٤٠١ (٨٦٦٦) : عن أبي سعيد، وابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما، فإنما إثمه على أبيه".

Muhammad ibn Saad. Kitab al-Tabaqat al-Kabir Volume 8. Ta-Ha Publishers. Page: 299, 300

Other Women

Umm Kulthum bint 'Ali ibn Abi Talib

Her mother was Fatima, the daughter of the Prophet. She married 'Umar ibn al-Khattab when she was a young girl who had not yet reached puberty. She remained with him until he was killed and bore

বাল্যবিবাহ খাছ সুন্নত হওয়ার প্রমাণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শর'য়ী ফায়ছালা ও ফতওয়া

উমর রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তিনি উনার এক নাবালিগা মেয়েকে হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উনার নিকট বিবাহ দিয়েছেন। আর হযরত

৩৬

বোখারী শরীফ (বাংলা তরজমা ও ব্যাখ্যা), খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৭

বোখারী শরীফ ১৯৭

নাবালেগ মেয়ের বিবাহ

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন :—

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ...... وَالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ

ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।)

ব্যাখ্যা :—শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বে-আইনী সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বে-আইনী বিষয়কে অনুমোদন করা ইহারই নাম তাহ্‌রীফ বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন যাহা ইহুদী নাছারাগণ করিয়াছিল।

আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বজ্ঞ, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু আদি হইতেই জানেন! তাঁহার প্রদত্ত শাসনতন্ত্রের নামই হইল শরীয়ত। কোন প্রকার যুক্তি বা উপকার অপকার ইত্যাদির বুলি আওড়াইয়া শরীয়তের তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি সাধন করা প্রকারান্তরে সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের প্রতি দোষারোপ করার শামিল।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) কোরআন ও হাদীছ দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমানিত করিয়াছেন। ইহাকে বে-আইনী করা বস্তুতঃ শরীয়ত তথা আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক তাঁহার বান্দাদের জীবন-ব্যবস্থারূপে প্রদত্ত শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ ও উহার তাহ্‌রীফ বা বিকৃতি সাধন করা। যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমল করিয়াছিলেন, অতএব, এই অনুমোদনকে দুষণীয় সাব্যস্ত করা রসুলের কার্য্যকে দুষণীয় সাব্যস্ত করারই শামিল!

তাফহীমুল কুরআন (২১৫) সূরা আত তালাক

১৩. ঋতুস্রাব যদি অল্প বয়সের জন্য না হয়ে থাকে অথবা কিছু সংখ্যক মহিলাদের অনেক দেরীতে হয়ে থাকে বলে না হয়ে থাকে এবং বিরল কিছু ঘটনা এমনও হয়ে থাকে যে সারা জীবন কোন স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব হয় না এরূপ সর্বক্ষেত্রে এ রকম স্ত্রীলোকদের ইদ্দত রুদ্ধস্রাব বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত। অর্থাৎ তাদের ইদ্দত তালাকের সময় থেকে তিন মাস।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন মজীদের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে যে স্ত্রীর সাথে তার স্বামী নির্জনবাস করেছে কেবল তার ক্ষেত্রেই ইদ্দত পালনের প্রশ্ন আসে। কারণ, নির্জনবাসের পূর্বে তালাক হলে আদৌ কোন ইদ্দত পালন করতে হয় না। (আল আহযাব, ৪৯) সুতরাং যেসব মেয়েদের এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত বর্ণনা করা স্পষ্টত এ কথাই প্রমাণ করে যে, এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে শুধু জায়েযই নয়, বরং তার সাথে স্বামীর নির্জনবাস এবং মেলামেশাও জায়েয। এখন এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআন যে জিনিসকে জায়েয বলে ঘোষণা করেছে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই।

পারা ঃ ২৮

কোরআনের আয়াত ৬৫:৪ সম্পর্কে তাফসীরকারীরা কি বলেন তাও দেখে নেওয়া যাক।

কোরআন ৬৫:৪. তাফসীর আবু বকর যাকারিয়া

এ আয়াতে তালাকে ইদ্দতের আরও কিছু অবস্থা ও তার হুকুম আহকাম বর্ণিত হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইদ্দত পূর্ণ তিন হায়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োঃবৃদ্ধি বা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হায়েয আসা (ঋতুস্রাব) বন্ধ হয়ে গেছে, **এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয আসা শুরু হয়নি তাদের ইদ্দত আলোচ্য আয়াতে তিন হায়েযের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে**। (ফাতহুল কাদীর)

আহকামুল কুরআন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১

আলোচ্য আয়াতে এ কথারও প্রমাণ রয়েছে যে, পিতার জন্যে তার ছোট বয়সের কন্যাকে বিয়ে দেয়ার অধিকার আছে এ হিসেবে যে, সমস্ত অভিভাবকের জন্যেই তা জায়েয। আর পিতা তাদের সকলের তুলনায় অতি নিকটবর্তী অভিভাবক।

অতএব হায়য হয়নি— এমন অল্প বয়সী মেয়েকে তালাক দেয়া সহীহ্ হবে। আর তালাক তো সহীহ্ বিয়ের ক্ষেত্রেই হতে পারে। তাই আয়াতের এ তাৎপর্য রয়েছে যে, অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয। তাছাড়া বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-ই তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ ঘটনার দুটি তাৎপর্য। একটি, ছোট বয়সের মেয়েকে তার পিতা বিয়ে দিতে পারে— সম্পূর্ণ জায়েয। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, এই ছোট বয়সের মেয়ে পূর্ণবয়স্কা হয়ে সে বিয়ে রাখা-না-রাখার অধিকারিণী হবে না। তা বাধ্যতামূলক। কেননা নবী করীম (স) পূর্ণবয়স্কতা লাভের পর তাঁকে সে ইখতিয়ার দেন নি।

হানাফি ফিকাহ শাস্ত্র, আশরাফুল হিদায়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৬

৫৭৬ আশরাফুল হিদায়া ○ তৃতীয় খণ্ড

অনুবাদ : আর যদি অল্পবয়স্কতা কিংবা বার্ধ্যকের কারণে সে ঋতুমতী না হয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন মাস কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ .... الخ - 'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুস্রাব সম্পর্কে নিরাশ, তাদের বিষয়ে যদি সন্দিহান হও, তাহলে তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস।' তদ্রূপ যারা বয়স গণনা দ্বারা সাবালিকা হয়েছে, কিন্তু এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি [তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস]। আর এর প্রমাণ হলো উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশ। আর যদি সে গর্ভবতী হয়, তাহলে গর্ভ প্রসব হলো তার ইদ্দত। কেননা

সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ৫১৩৩

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "এবং যারা ঋতুমতী হয়নি"-(সূরাহ আত-ত্বলাক (তালাক): ৪) এই আয়াতকে দলীল হিসাবে ধরে নাবালেগার ইদ্দাত তিন মাস নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বে ইসলামি শারিয়া ও দ্বীনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সৌদি সরকারের ইসলামি গবেষণা ও ইফতা বিভাগ (The General Presidency of Scholarly Research and Ifta, http://www.alifta.net) , যার চেয়ারম্যান ছিলেন ইসলামি ফাতওয়ার সর্বোচ্চ মুফতি শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে বায, যার ডিক্রী বা রুলিংকে চ্যালেঞ্জে করার মত কোন কর্তৃপক্ষ সুন্নি বিশ্বে নাই। উপরন্ত, এই গবেষণা ও ইফতা বিভাগ কোরান ও হাদিস বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞানী মুফতিদের সমন্বয়ে গঠিত। **ফাতওয়া নং ১৮৭৩৪**। নবি পত্নী হযরত আয়েশা ও অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েদের সাথে বিবাহ ও যৌনসঙ্গম করার ব্যাপারে ফাতওয়া

প্রশ্নঃ এটা কি সত্য যে অপ্রাপ্ত বয়সের বিবি আয়েশার সাথে নবির বিবাহ শুধু নবির জন্য প্রযোজ্য? নাকি এটি সকল মুসলিম উম্মার জন্যও সমান ভাবে প্রযোজ্য? অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েদের সাথে যৌনসঙ্গম করা যাবে কি ? তারা কি ৩ মাস ইদ্দত কাল পালন করবে ?

উত্তরঃ আয়েশা (রা) নবী(সা) এর সাথে বাগদত্তা হয়েছিলেন ছয় বছর বয়সে। নবী(সা) এই বিবাহ পূর্ণ করেন (যৌনসঙ্গম দ্বারা) মদিনায় যখন বিবি আয়েশার বয়স ছিল নয় বছর। **এই বিধান শুধুমাত্র নবী(সা) এর জন্য নয়**। অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়ে বিবাহ করা ও যৌনসঙ্গম করা সবার জন্য বৈধ, এমনকি মেয়ে সাবালিকা না হলেও, যদি সে যৌনসঙ্গম করতে সক্ষম হয়। অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়ের ইদ্দত কালও ৩ মাস হবে।

Islamweb.net (Translated in Arabic to English)

Evidence that a father may marry off a young girl without her permission or consent(الدليل على جواز تزويج الأب البنت الصغيرة دون إذنها أو رضاها)

Fatwa Number: 230518, Evaluation: 3481 0 154

Question: Is there evidence in the Sharia texts that it is permissible to force a virgin to marry?
Answer: Scholars have narrated that there is consensus that the father can marry off his young virgin daughter without her consent, and her permission is not required, and we mean by little one who is not an adult. Knowing that the father's marriage to his young virgin daughter is permissible, if her husband is competent.
Ibn Abd al-Barr said: The scholars are unanimously agreed that a father has the right to marry his young daughter and not consult her, in order to marry the Messenger of God.

ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার- ৯/১২৩
ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. উল্লেখ করেছেন- يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ، ولو كانت في المهد– আহলে হক্ব আলেমগণের সকলের মতে বালেগ ছেলের সাথে নাবালেগা মেয়ের বিয়ে দেয়া জায়েয – **এমনকি যদিও সেই মেয়ে অতীব ছোটই হোক না কেনো**।

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা [উম্মাহাতুল মু'মিনীন], পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫

হলো, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে ছয় বছর বয়সে বিয়ে হয়। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে যান এবং এগারো হিজরীর রাবীউল আওয়াল মাসে আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন। এই হিসাবে তাঁর জন্মের সঠিক সময়কাল হবে নুবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষের দিক। অর্থাৎ হিজরাত পূর্ব নবম সনের শাওয়াল মাস, মুতাবিক জুলাই, ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ।'[১৩]

১৩. সীরাতে 'আয়িশা-২১; সাহাবিয়াত-৩৭

৬০ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

বর্ণনাটিতে খাদীজার (রা) ওফাতের বছরে বিয়ের কথা এসেছে।[৩৯]

অধিকাংশ গবেষকের সিদ্ধান্ত এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের গরিষ্ঠ অংশ যা সমর্থন করে তা হলো, খাদীজা (রা) নুবুওয়াতের দশম বছরে হিজরাতের তিন বছর পূর্বে রমজান মাসে ইনতিকাল করেন এবং তার একমাস পরে শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) আয়িশাকে (রা) বিয়ে করেন। তখন আয়িশার (রা) বয়স ছয় বছর। এই হিসাবে হিজরাত-পূর্ব তিন সনের শাওয়াল, মুতাবিক ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে আয়িশার (রা) বিয়ে হয়। আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থকার ইবন আবদিল বার এই মত সমর্থন করেছেন। মূলত বিয়ে হয়েছিল খাদীজার (রা) ওফাতের বছরেই এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তিন বছর পরে যখন নয় বছর বয়সে তাঁকে ঘরে তুলে নেন। আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা যা ইবন সা'দ নকল করেছেন, তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৪০]

৩৯. বুখারী তাযবীজু 'আয়িশা; মুসনাদ-৬/১১৮; ইবন কাসীর-১/৩১৭; জাহাবী : তারিখ-১/১৬৫
৪০. তাবাকাত-৮/৫৮,৫৯

বিয়ের প্রস্তাবে বিব্রত আবু বকর

৫০৮১ পরিচ্ছেদঃ বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে অল্প বয়স্কা মেয়েদের বিয়ে।
নবী সা, আবূ বকর (রা)এর কাছে আয়িশাহ (রা)-এর বিয়ের পয়গাম দিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি আপনার ভাই ! নবী সা বললেন, তুমি আমার আল্লাহর দ্বীনের এবং কিতাবের ভাই। কিন্তু সে(তোমার মেয়ে) আমার জন্য হালাল।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)
অধ্যায়ঃ বিবাহ
পরিচ্ছেদঃ পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে

৩৩৭০। আয়িশাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সা ও আমাকে বিয়ে করেছেন, আমার বয়স তখন ছয় বছর। তিনি আমাকে নিয়ে বাসর ঘরে যান, তখন আমার বয়স নয়। আমরা হিজরাত করে মাদীনায় পৌছার পর আমি একমাস যাবৎ জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম। আমার মা আমার নিকট এলেন, আমি তখন একটি দোলনার উপরে ছিলাম এবং আমার কাছে আমার খেলার সাথীরাও ছিল। তিনি আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন, আমি তার নিকট গেলাম। **আমি বুঝতে পারিনি যে, তিনি আমাকে নিয়ে কী করবেন**। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে দরজায় নিয়ে দাঁড় করালেন তারপর আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলে আমার কল্যাণ ও রহমাতের জন্য দুআ করলেন এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করলেন। দুপুরের সময় রসূলুল্লাহ সা এলেন এবং **তারা আমাকে তার নিকট সমর্পণ(সোপর্দ) করলেন**।

৫১৬০ **পরিচ্ছেদঃ দিবাভাগে বাসর করা** ।

আয়িশাহ (রা.) বলেন, নবী সা যখন আমাকে বিয়ে করার পর **আমার আম্মা নবী সা এর ঘরে নিয়ে গেলেন**। **দুপুর বেলা আমার কাছে তাঁর(নবীর) আগমন ব্যতীত আর কিছুই আমাকে বিস্মিত করেনি**।

৩৮৯৬ নবী সা এর মদিনায় হিজরত করার তিন বছর আগে খাদীজা রা(১ম স্ত্রী)এর মৃত্যু হয়। তারপর প্রায় দু’বছর অতিবাহিত হয় তারপর তিনি আয়িশাহ (রা.)-কে বিবাহ করেন। যখন তিনি ছিলেন ৬ বছরের বালিকা। তারপর **৯ বছর বয়সে বাসর উৎযাপন করেন**।

সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৪৮৫১। আইশা (রা) বলেনঃ আমরা যখন মদীনায় আসি, তখন আমার কাছে কয়েকজন মহিলা আসে, আর সে সময় আমি দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। তারা আমাকে নিয়ে গিয়ে সুন্দররূপে সুসজ্জিত করে রাসূলুল্লাহ সা-এর কাছে নিয়ে আসে। **এ সময় তিনি আমার সাথে সহবাস করেন, আর তখন আমার বয়স ছিল ৯ বছর**।

[9 lunar years-old = 8 years-old if the Gregorian calender is used to calculate her age]

আমাদের বর্তমান বছর গণনার হিসেবে আয়িশা(রা) এর বয়সঃ

প্রাচীন আরবে মানুষের বছর গণনা ছিল চন্দ্রবছরের হিসেব ধরে। আর আমরা বর্তমান সময়ে যেভাবে বছর গণনা করি সেটিকে বলা হয় সৌর বছর বা Solar Years। নবী মুহাম্মদের সময় মানুষের বয়স গণনা করা হতো চন্দ্রবছরের হিসেবে। পার্থক্য হচ্ছে, **চন্দ্র বছরের হিসেবে ৩৫৪ দিনে এক বছর হয়,** আর বর্তমানে সৌর বছরে সর্বমোট দিন হচ্ছে প্রায় ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। তাই প্রচলিত গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি মতে বছর হিসাব করা হয় ৩৬৫ দিনে।

- তাহলে, **হাদিস অনুসারে চন্দ্রবছরের হিসেবে আয়িশার বয়স ৬ বছর মানে হচ্ছে, আয়িশার বয়স আসলে ছিল ৬ X ৩৫৪= ২১২৪ দিন**। সেই হিসেবে, **বর্তমান সৌরবছরের হিসেবে, নবী যখন আয়িশাকে বিয়ে করেন তখন আয়িশার বয়স ছিল ২১২৪ / ৩৬৫ = ৫ বছর ১০ মাস**
- আবার, হাদিস অনুসারে চন্দ্রবছরের হিসেবে আয়িশার বয়স ৯ বছর মানে হচ্ছে, আয়িশার বয়স আসলে ছিল ৯ X ৩৫৪= ৩১৮৬ দিন। সেই হিসেবে, **বর্তমান সৌরবছরের হিসেবে নবী যখন আয়িশার সাথে সহবাস করেন, তখন আয়িশার বয়স ছিল ৩১৮৬ ÷ ৩৬৫ = ৮ বছর ৮ মাস**

৬১৩০ আয়িশাহ (রা.) বলেন, **রাসূলুল্লাহ সা এর সামনেই আমি পুতুল বানিয়ে খেলতাম। আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলা করত**। রাসূলুল্লাহ সা ঘরে প্রবেশ করলে তারা দৌড়ে পালাত। তখন তিনি তাদের ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সঙ্গে খেলত।

Sahih al-Bukhari 6130(https://sunnah.com/bukhari:6130)

Narrated Aisha: I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girl friends also used to play with me. When Allah's Messenger (ﷺ) used to enter (my dwelling place) they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. (The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for `Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty.)

বাংলা অনুবাদ: পুতুল খেলা এবং অনুরূপ কাজ হারাম, কিন্তু তখন আয়েশা(রা) এর জন্য হালাল ছিলো, কেননা তিনি তখন বাচ্চা মেয়ে ছিলেন, তখনও বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছাননি।

সহজ নসরুল বারী শরহে সহীহ বুখারী (১১) ❖ ২৪১

৫৭২৪. মুহাম্মদ রহ. ... আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনেই কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলতাম। আর আমার কজন বান্ধবী ছিল। তারা আমার সঙ্গে খেলত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করলে তারা দৌড়ে পালাত। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন আর তারা আমার সঙ্গে খেলা করত।

সহজ তাহ্‌কিক ও তাশ্‌রিহ

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা রাযি.-এর প্রতি উদারচিত্ত ও হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। হাস্যরস করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর পতুল খেলায়ও সম্মতি দিয়েছেন। তাঁর সাথে খেলার জন্য তাঁর বান্ধবীদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আর সে-সময় হযরত আয়েশা রাযি. নাবালিকা ছিলেন। তাই তিনি তাঁকে খেলাধুলার অনুমতি দিয়েছেন।

Sahih Al-Bukhari, vol. 8, Page: 88, 89, DARUSSALAM Publishers, Riyadh, Saudi Arabia

6130. Narrated 'Āishah رَضِيَ اللهُ عَنها : I used to play with the dolls in the presence of the Prophet ﷺ, and my girl friends also used to play with me. When Allāh's Messenger ﷺ used to enter (my dwelling place), they used to hide themselves, but the Prophet ﷺ would call them to join and play with me.

(The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for 'Āishah at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty.)

[See *Fath Al-Bārī*]

٦١٣٠ - حدَّثنا مُحَمَّدٌ: أخبرَنا أبو مُعاوِيَةَ: حدَّثنا هِشامٌ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بالبَناتِ عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ وكانَ لي صَواحِبُ يَلْعَبْنَ مَعي، فكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إليَّ فَيَلْعَبْنَ مَعي.

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)

৩৩৭২। আয়িশাহ (রা) থেকে বর্ণিত, **নয় বছর বয়সে তাকে রসূলুল্লাহ সা এর ঘরে বধুবেশে নেয়া হয় এবং** তার সঙ্গে তার খেলার পুতুলগুলোও ছিল।

সূনান আবু দাউদ (ইফা)

৪৮৪৯. আইশা (রা) বলেনঃ আমি কাপড়ের তৈরী স্ত্রী পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সা আমার কাছে এমন সময় আসতেন, যখন অন্যান্য বালিকারা আমার কাছে উপস্থিত থাকতো। আর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তারা চলে যেত এবং যখন তিনি বাইরে যেতেন, তখন তারা আবার আসতো।

আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

৪৯৩২। আয়িশাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা **খায়বারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন**। ঘরের তাকের উপর পর্দা ঝুলানো ছিলো। বায়ু প্রবাহের ফলে তার এক পাশ সরে যায় যাতে তার খেলার পুতুলগুলো দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। নবী সা এগুলোর মধ্যে কাপড়ের তৈরী দু' ডানাবিশিষ্ট একটি ঘোড়াও দেখতে পেলেন।

এই হাদীসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন– আয়িশাকে পুতুল নিয়ে খেলতে দেওয়ার একমাত্র কারণ তিনি তখনও বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছাননি।

মেয়েরা সাধারণত পিরিয়ড হওয়ার শুরুর দিকেই বেশি ব্যাথা পায় এবং কান্নাকাটি করে। উল্লেখ্য, এর আগে আয়িশার হায়েজ হয়েছিল, এরকম কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এছাড়া নবীর উত্তরের ধরণ থেকে এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, তখনই আয়িশার প্রথম হায়েজ হয়েছিল।

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

অধ্যায়ঃ হায়য, পরিচ্ছেদঃ **باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ** হায়যের সুচনা।

২৯০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছার পর আমার হায়য আসলো। রাসূলুল্লাহ সা এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন; এবং বললেনঃ কি হল তোমার? তোমার হায়য এসেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ এ তো আল্লাহ্ তা'আলাই আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

বাল্যবিবাহের এ সুন্নত সকল মুসলিমের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। যেসব মডারেট ইসলামিক বক্তা বর্তমানে এটাকে নিয়ে নতুন ফতোয়া দেয় তারা সাবাই পথভ্রষ্ট নবীর কথা অনুসারে।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

অধ্যায়ঃ সুন্নাহ, পরিচ্ছেদঃ **সুন্নাতের অনুসরণ আবশ্যক**

৪৬০৭। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন কারো বিদায়ী ভাষণ! অতএব আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন **তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত** এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে **আঁকড়ে থাকবে**। ***সাবধান! ধর্মে প্রতিটি নব আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আত হলো ভ্রষ্টতা*** "।

তাবাকাত, ইবনে সা'দ, পৃষ্ঠাঃ ৪৩

হিজরতের পর আবু বকর(রা), রাসূল এর নিকট আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীকে ঘরে আনছেন না কেন? প্রিয়নবী বললেন, "**এই মুহূর্তে মোহর পরিশোধ করার মতো অর্থ আমার কাছে নেই। আবু বকর (রাঃ) অনুরোধ করলেন- যদি আমার অর্থ কবুল করতেন।** **তখন রাসূল সা, আবু বকর (রা:) এর কাছ থেকে অর্থ ঋণ নিয়ে আয়িশা (রা) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন**।

Al-Tabari, Vol. 39, pp. 171-173

'Ā'ishah, daughter of Abū Bakr.[764]

Her mother was Umm Rūmān bt. 'Umayr b. 'Āmir, of the Banū Duhmān b. al-Ḥārith b. Ghanm b. Mālik b. Kinānah.[765]

The Prophet married 'Ā'ishah in Shawwāl in the tenth year after the [beginning of his] prophethood, three years before the Emigration. He consummated the marriage in Shawwāl, eight months after the Emigration. On the day he consummated the marriage with her she was nine years old.

According to Ibn 'Umar [al-Wāqidī]—Mūsā b. Muḥammad b. 'Abd al-Raḥmān—Rayṭah—'Amrah [bt. 'Abd al-Raḥmān b. Sa'd]:[766] 'Ā'ishah was asked when the Prophet consummated his marriage with her, and she said:

> The Prophet left us and his daughters behind when he emigrated to Medina. Having arrived at Medina, he sent

Bakr to buy [other] beasts they needed. Abū Bakr sent with them 'Abdallāh b. Urayqiṭ al-Dīlī, with two or three camels. He wrote to [his son] 'Abdallāh b. Abī Bakr to take his wife Umm Rūmān, together with me and my sister Asmā', al-Zubayr's wife, [and leave for Medina]. They all

safely descended the Lift.[771] We then arrived at Medina, and I stayed with Abū Bakr's children, and [Abū Bakr] went to the Prophet.[772] The latter was then busy building the mosque and our homes around it,[773] where he [later] housed his wives. We stayed in Abū Bakr's house for a few days; then Abū Bakr asked [the Prophet] "O Messenger of God, what prevents you from consummating the marriage with your wife?" The Prophet said "The bridal gift (*ṣadāq*)." Abū Bakr gave him the bridal gift, twelve and a half ounces [of gold], and the Prophet sent for us.[774] He consummated our marriage in my house, the one where I live now and where he passed away.[775]

এছাড়া সহিহ বুখারীর ৩৮৯৪ , সহীহ মুসলিমের ৩৩৭০ নং হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, **ছয় বছর বয়সে আয়েশা (রা)এর বিয়ে হওয়ার পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এতে তার চুল পড়ে যায়। তারপর নয় বছর বয়সের দিকে তার মাথায় আবার চুল জমে ওঠে এবং তারপরেই তাকে নবীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এথেকে বোঝা যায়, নবী আয়েশা (রা)এর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্যও অপেক্ষা করেছিলেন নিজের ঘরে আনার জন্য।**

Some shameful Claims of moderate mumins of nowadays

ইসলামে এই বর্বর শিশুকামকে জায়েজ করতে অনেক মুসলিমই দাবী করে যে, আয়িশা কেন প্রতিবাদ করেনি?
এই ধরণের বক্তব্য একদমই নিম্নমানের প্রতারণা ভিন্ন কিছু নয়। পৃথিবীতে অনেক অপরাধ ঘটে, যেখানে ভিক্টিমের কোন অভিযোগ পাওয়া যায় না। ভিক্টিমের অভিযোগ পাওয়া না গেলেই অপরাধটি ঘটেনি, এরকম বলা শুধু হাস্যকরই নয়, প্রতারণাও বটে। আমাদের দেশের নানীদাদীদের অনেকেই সারাজীবন স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পরে তারা কেউই স্বামীর নামে অভিযোগ করেননি। পরিবারের সম্মান, বংশের মর্যাদা, নিজের সম্মান, এইসব কিছু বিবেচনা করে বেশিরভাগ নির্যাতিত নারীই কখনো নির্যাতক স্বামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন না। এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না যে, তাদের স্বামীরা খুব ভাল মানুষ ছিলেন বা তাদের ওপর কখনোই নির্যাতন হয়নি। আমাদের দেশের অনেক মাদ্রাসার ছাত্রও শিক্ষকদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন। কিন্তু মুখ ফুটে সেগুলো তারা বেশিরভাগই বলতে পারেন না। একেই ভবিতব্য বলে জীবন কাটিয়ে দেন। এর মানে তো এই নয় যে, তাদের সাথে কিছু ঘটেনি!

একটি শিশুর যেহেতু সম্মতি দেয়ার বয়সই হয়নি, তাই তার সাথে যেকোন যৌন আচরণই ধর্ষণের অন্তর্ভূক্ত। সেটি সেই বাচ্চাটি অভিযোগ করুক কিংবা না করুক। আমরা যদি এটি প্রমাণ করতে পারি যে, তার সাথে এরকম আচরণ ঘটেছিল, তাহলে তার অভিযোগ করা না করা মূল্যহীন। তার ওপর তার স্বামী যদি খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়, তার সম্পর্কে তার স্ত্রী অভিযোগ করবে, এটি ভাবাই যায় না। আমাদের নিজেদের এলাকাতেই এক মস্তবড় রাজনৈতিক নেতা এক মেয়েকে বাসা থেকে তুলে এনে জোর করে বিয়ে করেছিল। বিয়ের প্রথম কয়েকমাস মেয়েটি দুঃখে ছিল। ধীরে ধীরে সে সব মেনে নিতে শুরু করে এবং কয়েকবছর পরে সে তার স্বামীকে ভালবাসতেও শুরু করে। কিন্তু তার মানে তো এই নয়, তাকে জোর করে তুলে এনে বিয়ে করার কাজটি নৈতিক কাজে পরিণত হলো!

পৃথিবীতে এমন অনেক পিতামাতাই আছেন, যারা সামান্য টাকার লোভে কিংবা কোন সুবিধা আদায়ের জন্য নিজের সন্তানকে বিক্রি করে দিতে কার্পণ্য বোধ করেন না। এলাকার ক্ষমতাবান লোকের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া গ্রামাঞ্চলে এখনো খুব প্রচলিত বিষয়। প্রায় প্রতিদিনই এরকম অসংখ্য খবর আমরা সংবাদপত্রে পড়ি। অনেক পীরের ভক্তকেও দেখা যায়, পীর সাহেবের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দেন জান্নাতের লোভে।

অনেক মডারেট মুমিন দাবী করতে পারে যে, আয়িশা বড় হওয়ার পরে তাহলে কেন মুহাম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলো না!
এটিও একটি নিম্নমানের প্রতারণা। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতাবান একজন পুরুষের স্ত্রী বা স্ত্রীগণ তার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন নির্যাতন নিপীড়নের অভিযোগ করবে, এরকম সম্ভাবনা সকল সমাজে অত্যন্ত কম, রক্ষণশীল সমাজে আরও কম। এইরকম রক্ষণশীল সমাজে একজন নারী নানাভাবে প্রভাবিত হয়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তার অভিযোগ করার সুযোগ কম থাকে। সেই স্বামীটি যদি ধর্মীয়ভাবেই ক্ষমতাবান হন, তাহলে সেই সম্ভাবনা আসলে শূন্যের কাছাকাছিই চলে যায়। এর পেছনে যেসকল বিষয় ভূমিকা রাখে, সেগুলো হচ্ছে,

- **অদৃশ্য ক্ষমতার উপস্থিতি ও প্রভাবঃ** সামাজিকভাবে একজন ক্ষমতাশালী পুরুষের একটি নির্দিষ্ট সমাজে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকে, এবং তার মৃত্যুর পরেও তার প্রভাব রয়ে যায়। একটি সম্পর্কের ভিতরে তা একটি অদৃশ্য ক্ষমতার প্রভাব তৈরি করে, যা সেই মানুষটির স্ত্রীকে মানসিকভাবে দুর্বল করে রাখে। পরিণতির ভীতি, সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়ার ভয় সেইসব নারীকে কার্যত সেরকম বিপ্লবী হওয়া থেকে বিরত রাখে।
- **সামাজিক চাপ এবং Stigma বা কলঙ্কঃ** বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সাথে জড়িত মানুষদের ক্ষমতার কারণে তৈরি হওয়া এক ধরণের সামাজিক চাপ এই সকল নারীর ওপর বজায় থাকে। ক্ষমতাবান স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করা সামাজিক দৃষ্টিতে নেতিবাচক ব্যাপার হিসেবে দেখা হয়, যা নানা ধরণের কটু মন্তব্য থেকে শুরু হয় তবে সেগুলো শুধু কটু মন্তব্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি তাকে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করতে পরোক্ষভাবে বিরত রাখে কারণ সেই নারী তার আত্মমর্যাদার উপরই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আর রাখতে পারে না।

- ***আর্থিক নির্ভরতাঃ*** *অনেক ক্ষেত্রে, একটি রক্ষণশীল সমাজে একজন নারী আত্মনির্ভরশীল থাকে না, নিজস্ব পড়ালেখা বা ব্যবসাবাণিজ্যের কোন সুযোগ তার হয় না। এই কারণে তার আর্থিকভাবে নির্ভর করতে হয় তার ক্ষমতাবান স্বামীর উপর, অথবা ক্ষমতাবান স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থের ওপর, অনেক সময় শুধুমাত্র তার স্বামীর প্রভাবের ওপর। স্বামী মারা গেলেও সেই স্বামীর ক্ষমতার প্রভাব যদি সমাজে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহলে তার বিদ্রোহ তার অর্থনৈতিক স্থায়িত্য ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অধিকাংশ নারীই এই ঝুঁকি নিতে চান না।*
- ***সমর্থনের অভাবঃ*** *একজন ক্ষমতাবান স্বামীর সাধারণভাবেই প্রচুর সংখ্যক সমর্থক, মিত্র থাকে এবং আইনি সংস্থাগুলিও সেই ক্ষমতাবান স্বামীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর থাকে। সেই ক্ষমতাবান স্বামীর একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, যেখানে ক্ষমতার চক্র তৈরি হয়। এর ফলে একজন স্ত্রী কোন সমর্থক খুঁজে পান না, যে তাকে বিদ্রোহ করার ক্ষেত্রে তার পাশে থাকবে। এটি সেই স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি করতে পারে, সে সমর্থকের অভাব বোধ করতে পারে। এটি তাকে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া থেকে আরও নিরুৎসাহিত করতে পারে।*
- ***মানসিক দুর্বলতাঃ*** *প্রতিটি মানবীয় সম্পর্কই অত্যন্ত জটিল, এবং আবেগ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অসংখ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন নির্যাতক স্বামী তার স্ত্রীকে প্রচুর নির্যাতন করার পরেও সেই স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি এক ধরণের আবেগ অনুভব করে। বিশেষ করে আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে এরকম উদাহরণ খুবই বেশি। স্বামী প্রতিদিনই মারধোর করে, কিন্তু সেই স্ত্রীর তারপরেও তার স্বামীর প্রতি মানসিক আবেগ বোধ করে। এটি হতে পারে ভালবাসার জন্য, হতে পারে আনুগত্যের জন্য। এটি সেই নারীর পক্ষে তার স্বামীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন করে তোলে।*

আর সবচেয়ে ভয়াবহ যে বিষয় সেটি হল- ইসলামের শরিয়তের বিধান অনুসারে, নবী মুহাম্মদের যেকোন সমালোচনাকারী শাতিমে রাসুল হিসেবে গণ্য এবং তার শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। আয়িশা যদি সাহস করে নবীর সম্পর্কে অভিযোগ করতোও, তাহলে তাকে কী আর জীবিত থাকতে দেয়া হতো? আয়িশা কী এটি জানতেন না যে, নবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তার ফলাফল কী হতে পারে? সেই সময়ে খলিফা কারা ছিলেন? আবু বকর, উমর, উসমান আলী, এরা। এরা সকলেই ছিল নবীর খুবই ঘনিষ্ঠ এবং নবীর নামেই তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার এবং খিলাফতের প্রধান হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তারা কী এরকম কথা সহ্য করতো?

Shameful Claim 1: Menstruation in hot climates starts earlier than in cold ones, so girls in Arabia matured as early as 9 ?! গরমের দেশে আম কাঁঠাল যেমন আগে আগে পেকে যায়, মেয়েরাও আগে আগে পেকে যেতো !! , মধ্যযুগে মেয়েরা আগে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছাতো?!

There is absolutely no evidence that climate has anything to do with the onset of menarche/puberty. In reality the truth is the opposite of what apologists claim. [Frederic Thomas, François Renaud, Eric Benefice, Thierry de Meeus, Jean-Francois Guegan, "International Variability of Ages at Menarche and Menopause: Patterns and Main Determinants," Human Biology: Volume 73, Number 2, April 2001, pp. 271-290, 10.1353/hub.2001.0029, , WebCite query result (webcitation.org), The Museum of Menarche (mum.org)]]

For girls in the Medieval (5^{th} to 15^{th} century) Middle East, the average age at menarche was between 12 to 13 years of age, not 9. In fact, the average age at menarche for Medieval Europeans was very similar, at 12 to 14 years of age.[Average age at menarche in various cultures- Mum.org]

Decline in menarcheal age among Saudi girls

Commentary: The decreasing age of puberty— as much a psychosocial as biological problem?

Shameful Claim 2: At that time, it was okay to have sex with 9 year olds in Arabia. It was a cultural norm !!
As they themselves have left behind no written records, there is no evidence of pedophilic marriages being accepted among the non-Muslim Arabs of Muhammad's time.
During the Medieval period it was the norm in Jewish Middle Eastern cultures for girls to be given in marriage when they were 12-13 years old,[Kiddushin (tosafot) 41a] coinciding perfectly with the average age at menarche in the Medieval Middle East which was also 12-13 years. A large age gap between the spouses was also opposed,[Yebamot 44a, Sanhedrin 76a] yet the age gap between Muhammad and Aisha was a massive 45 years.
Besides, a lot of other things were acceptable in the past, but that does not make them any moral standard.

Shameful Claim 3: We cannot judge Muhammad by today's standards !!
First of all Muslim scholars clearly disagree with this statement. Unlike other faiths, in Islam, Muhammad is the "uswa hasana, al-Insān al-Kāmil" (the perfect human, whose example is worthy of imitation). The

↥

Qur'an even refers to his morality as "sublime"[And most surely you conform (yourself) to sublime morality." - Qur'an 68:4] and as the Qur'an is believed by Muslims to be the literal and final words of God, they are beyond the constraints of time.

হামাগুড়ি দেয়া শিশু দেখেও নবী মুহাম্মদ সা এর বিবাহ করার ইচ্ছা হয়েছিল। যার রেফারেন্স পাওয়া যায় ইবনে ইসহাকের গ্রন্থে-

The Life of Muhammad 311

while al-'Abbās was bulky. When the apostle asked the former how he had managed to capture him, he said that a man such as he had never seen before or afterwards had helped him, and when he described him, the apostle said, "A noble angel helped you against him."')

(Suhaylī, ii. 79: In the *riwāya* of Yūnus I. I. recorded that the apostle saw her (Ummu'l-Faḍl) when she was a baby crawling before him and said, 'If she grows up and I am still alive I will marry her.' But he died before she grew up and Sufyān b. al-Aswad b. 'Abdu'l-Asad al-Makhzūmī married her and she bore him Rizq and Lubāba. . . .

সিরাতে রাসুলাল্লাহ (সা), পৃষ্ঠা ৩৫৩

রাসুলে করিম (সা.) বললেন, 'এক মহান ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করেছিল।' লোকটির বর্ণনা দিল সে।
[সুহায়লির ভাষ্য : ইউনুসের রেওয়াতে ইবনে ইসহাক বলেছেন যে উম্মুল ফজল যখন হামাগুড়ি দিতে
শেখা কচি শিশু, তখন রাসুলে করিম (সা.) তাকে দেখেন এবং বলেন, 'আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে
ও বড় হলে ওকে আমি বিয়ে করব।' কিন্তু সে বড় হওয়ার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাকে বিয়ে
করেন সুফিয়ান ইবনে আল-আসওয়াদ এবং তাঁর ঔরসে জন্ম হয় রিজক ও লুবাবার।
ওরা আবু লাহাবকে কবর দেয়নি। একটা দেয়ালের অপর পাশে

Musnad Ahmad, Number 25636

Prophet Muhammad(S) saw Um Habiba, the daughter of Abbas while she was fatim (age of nursing) and he said, "If she grows up while I am still alive, I will marry her.

বাংলা অনুবাদ,

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস উম্মে ফজল বিনতে হারেস থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সা আব্বাসের 'দুগ্ধপোষ্য শিশুকন্যাকে' দেখে বলেন, যদি আব্বাসের মেয়ে বালেগা হয় আর আমি ততদিন বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আমি তাকে বিয়ে করব।

নবী একজন রাজকন্যাকে হুকুম করেন, নবীর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে। রাজকন্যা বললেন, কোন বাজারি লোকের কাছে সে নিজেকে সমর্পন করতে পারবে না। এরপরে নবী তার গায়ে হাত দিলেন। তখন সেই রাজকন্যা আল্লাহর দোহাই দিয়ে নবীর থেকে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করলেন। আল্লাহর দোহাই দেয়ার পরে নবী তাকে ছেড়ে দিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সেই মেয়েটি ছিল খুবই অল্পবয়সী। তার Wet Nurse অর্থাৎ যে ধাত্রী শিশুকে মায়ের বদলে স্তন্য দেয়, সেই ধাত্রীও তার সাথে ছিল।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

অধ্যায়ঃ ত্বলাক, পরিচ্ছেদঃ ত্বলাক্ব দেয়ার সময় স্বামী কি তার স্ত্রীর সম্মুখে ত্বলাক্ব দেবে?

৫২৫৫। আবূ উসায়দ (রা) বলেনঃ আমরা নবী সা এর সঙ্গে বের হয়ে শাওত নামক বাগানের নিকট দিয়ে চলতে চলতে দু'টি বাগান পর্যন্ত পৌছলাম। তখন নবী সা আমাদের বললেনঃ তোমরা এখানে বসে থাক। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। তখন নু'মান ইবনে শারাহীলের কন্যা উমাইমার খেজুর বাগানস্থিত ঘরে- জাওনিয়াকে আনা হয়। তাঁর খিদমতের জন্য ধাত্রীও ছিল। **নবী সা যখন তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ কর। তখন সে(জাওনিয়া) বললঃ কোন রাজকুমারী কি কোন বাজারিয়া ব্যক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে?** এরপর নবী সা তাঁর হাত প্রসারিত করলেন তার শরীরে রাখার জন্য। সে বললঃ আমি আপনার থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। তিনি বললেনঃ তুমি উপযুক্ত সত্তারই আশ্রয় নিয়েছ। এরপর নবী সা আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেনঃ হে আবূ উসায়দ! তাকে দুখানা কাতান কাপড় দিয়ে তার পরিবারের নিকট পৌঁছিয়ে দাও।

এই হাদিসটির আরো কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে। আসুন সেই হাদিসগুলোও পড়ে দেখি। সেগুলো পড়ার আগে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিবাহের সময় মেয়ের অনুমতির প্রয়োজন হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে পিতা বা অভিভাবক চাইলেই দিতে পারেন, কন্যার তাতে সম্মতি থাকুক কিংবা না থাকুক। সেটি মনে রেখে এই হাদিসগুলো পড়তে হবে এই কারণে যে, হাদিসগুলো পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায় মেয়েটির সাথে নবীর বিবাহ মেয়েটির অমতেই হয়েছিল।
সুতরাং এই হাদিস থেকে এটাই বোঝা যায় যে, নবী আরো একজন শিশুকেও বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এই শিশুটি কিছুতেই নবীর কাছে নিজেকে সমর্পন করেনি। বরঞ্চ নবীকে বাজারি নিচু লোক বলে গালাগালি করে আল্লাহর কাছে পানাহ চান। যেই কারণে নবী বাধ্য হয়ে তাকে তালাক দিয়ে সঙ্গম না করেই তালাক দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
অধ্যায়ঃ তালাক, পরিচ্ছেদঃ তালাক দেওয়ার সময় স্বামী কি তার স্ত্রীর সামনাসামনি হয়ে তালাক দেবে ?
৪৮৭৭। আওযাঈ (র) বলেন আমি যুহরী (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম নবী সা এর কোন সহধর্মিনা তার থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল? উত্তরে তিনি বললেনঃ আয়িশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, **জাওনের কন্যাকে যখন রাসুলুল্লাহ সা এর নিকট একটি ঘরে পাঠানো হল আর তিনি তার নিকটবর্তী হলেন, তখন সে বলল! আমি তোমার থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি।** রাসুলুল্লাহ সা বললেন তুমি তো এক মহান সত্তার কাছে পানাহ চেয়েছ, তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও।

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
অধ্যায়ঃ তালাক, পরিচ্ছেদঃ তালাক দেওয়ার সময় স্বামী কি তার স্ত্রীর সামনাসামনি হয়ে তালাক দেবে ?
৪৮৭৮। আবূ উসায়দ (রা) বলেন, আমরা নবী সা এর সঙ্গে বের হয়ে শাওত নামক বাগানের নিকট দিয়ে চলতে চলতে দুটি বাগান পর্যন্ত পৌছুলাম এবং এ দুটির মাঝখানে বসে পড়লাম। তখন নবী সা বললেনঃ তোমরা এখানে বসে থাক। তিনি ভিতবে প্রবেশ করলেন। তখন নূমান ইবনু শারাহীলের কন্যা জুয়াইনাকে উমাইমার খেজুর বাগানস্থিত ঘরে পৌছান হল। আর তার সাথে তার সেবার জনা ধাত্রীও ছিল। **নবী সা যখন তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ কর। তখন সে বললঃ কোন রাজকুমারী কি কোন বাজারী (নীচ) ব্যাক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে?** রাবী বলেনঃ এরপর নবী সা তার দিকে হাত বাড়ালেন। সে এটি অপছন্দ করল। এরপর তিনি এরপর তিনি বেরিয়ে এসে আবূ উসায়দকে নির্দেশ দিলেন, **তার জিনিস গুটিয়ে এবং দুখানা কাতান বস্ত্র দিয়ে তাকে তার পরিবারে পৌছে দিতে।**

[সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৩৬: "তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদেরকে স্পর্শ(সহবাস) করনি কিংবা তাদের জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করনি। এবং তোমরা তাদেরকে কিছু খরচপত্র দিয়ে (বিদায়)দিবে।"]

[[**'নিসা' শব্দটি দ্বারা শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের বোঝানো হয় ?!**
অনেক ইসলামিক এপোলজিস্ট ইসলামের এই শিশুবিবাহ এবং শিশুকামের বৈধতাকে লজ্জার কারণে অস্বীকার করার জন্য দাবী করে থাকেন যে, কোরআনে নিসা শব্দটি দ্বারা শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের বোঝানো হয়, সেই সূত্রে সূরা তালাকের ৪ নম্বর আয়াতটিতে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ইদ্দতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রথমত, সমস্ত তাফসীরেই দেখা যাচ্ছে এই আয়াতটি নাজিলের কারণগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। দ্বিতীয়ত, সূরা নিসার ১২৭ নম্বর আয়াতে ইয়াতামা আন নিসাই (فِى يَتَـٰمَى ٱلنِّسَآءِ) শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, যার অর্থ নারীদের মধ্যে যারা ইয়াতীম। এর অর্থ হচ্ছে, নিসা শব্দটি সামগ্রিকভাবে সকল নারীদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত একটি শব্দ, যার মধ্যে মেয়ে শিশুও অন্তর্ভূক্ত। নইলে নারীদের মধ্যে যার ইয়াতীম, এই কথাটি বলা থাকতো না। কেননা ইসলামের বিধান অনুসারে, ইয়াতীম হয় শুধুমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীগণ। প্রাপ্তবয়স্ক নারী কখনো ইয়াতীম হয় না। যার প্রমাণ নিচে দেয়া হচ্ছে।
সূরা নিসার ১২৭ নম্বর আয়াতটি দেখে নিই, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ **فِى يَتَـٰمَى ٱلنِّسَآءِ** ٱلَّـٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا

লিসানুল আরব অভিধানে ইয়াতীমের সংজ্ঞায় বর্ণিত আছে,
اليتيم: الذي يموت أبوه حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم، واليتيمة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتيمة
অর্থঃ ইয়াতীম এমন সন্তানকে বলা হয়, যার পিতা মারা গিয়েছে, বালেগ হওয়া অবধি সে ইয়াতীম হিসাবে গণ্য হবে, বালেগ হবার পর ইয়াতীম নামটি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর মেয়ে সন্তান বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইয়াতীম বলে গণ্য হবে বিয়ের পর তাকে আর ইয়াতীম বলা হবে না।

একইসাথে, এই বিষয়ে অনেকগুলো সহিহ হাদিস রয়েছে, যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, বালেগ হওয়ার পর কেউ আর ইয়াতীম থাকে না। অর্থাৎ ইয়াতীম শব্দটি নাবালেগের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ব্যবহৃত হয়।

আবু দাউদ শরীফ ২৮৭৫, সুনানে কুবরা বায়হাক্বী ৬/৫৭ হাদীছ ১১৬৪২, মুজামুল কবীর তাবরানী ৩৪২২, সুনানে ছগীর লি বায়হাকী ২০৪৯, শরহুস সুন্নহ ৯/২০০, ফতহুল বারী ২/৩৪৬, উমদাতুল ক্বারী ২১/১০৭, কানযুল উম্মল ৬০৪৬
রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, বালেগ হওয়ার পর ইয়াতীম থাকে না।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
পরিচ্ছদঃ ইয়াতীমের মেয়াদকাল কখন শেষ হয়
২৮৭৩। আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা এর কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিঃ "যৌবনপ্রাপ্ত হলে কেউ ইয়াতীম থাকে না"।

বর্তমান সময়ের সবচাইতে বিখ্যাত ইসলামি পণ্ডিতদের একজন শায়েখ সালিহ আল মুনাজ্জিদের পরিষ্কার বক্তব্য পড়ি ইসলামকিউএ নামক বিখ্যাত ওয়েবসাইট থেকে। https://islamqa.info/en/answers/124483/how-old-was-aishah-when-she-married-the-prophet
অনুবাদঃ রাসুল সা যখন আয়িশার সঙ্গে বিয়ের চুক্তি সম্পাদন করলেন, তখন আয়িশার বয়স কত ছিল, আর যখন আয়িশার সঙ্গে বিছানায় যৌনকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বিবাহকে পূর্ণতা দিলেন, তখনই বা আয়িশার বয়স কত ছিল, এই পুরো ব্যাপারটি ইসলামি শাস্ত্র- **ইজতেহাদ বা কোন বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত মতের উপর একেবারেই নির্ভর করে না, যাতে কিনা কেউ তর্ক করতে পারে যে বিষয়টি ঠিক ছিল নাকি ভুল ছিল**। বরং এই ব্যাপারটি তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হওয়া একটি ইতিহাসভিত্তিক বিবরণ, যা কিনা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।]]

পেডোফিলিয়া কী ?
পেডোফিলিয়া শব্দটির অর্থ হচ্ছে শিশুকাম। এটি একটি ভয়াবহ মানসিক বিকৃতি। যখন বয়স্ক ব্যক্তিরা কোনো বাচ্চার প্রতি যৌনাকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, তখন বুঝতে হবে তিনি তিনি পেডোফিলিক। Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders আর্টিকেল থেকে যে বিষয়গুলো পরিষ্কার তা হচ্ছে,

- **১৩ বছর বয়সের চেয়ে ছোট** কোন শিশুর প্রতি বয়স্ক একজন মানুষের যৌন আকর্ষণ বা যৌনকর্ম করাকে শিশুকামিতা নামক মানসিক বিকৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে বয়সের পার্থক্য ৫ বছরের কম হলে সেটি শিশুকামিতা হবে না।
- কোন কোন শিশুকামী শুধুই শিশুদের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে থাকে, আবার **কোন কোন শিশুকামি এমনও আছে যারা শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করে থাকে।**
- নির্যাতনের উপযোগী শিশুর সন্ধানের জন্য অনেক সময় **শিশুকামিরা শিশুদের পিতামাতার সাথে** অনেক সময় **পারিবারিক বন্ধুত্ব** তৈরি করতে পারে, আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের শিশুকাম চরিতার্থ করতে পারে।
- শিশুকামী ব্যক্তিটি অনেক ক্ষেত্রেই **শিশুটির বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়,** যাতে করে বাচ্চাটির অনুরাগ, আগ্রহ ও আনুগত্য অর্জন করা তার জন্য সহজ হয়, এবং যাতে বাচ্চাটি ঘটনাটি কাউকে জানানো থেকে বিরত থাকে।
- অনেক ক্ষেত্রেই **মধ্যবয়সে পৌঁছোনোর পরে** অনেক শিশুকামির মধ্যে শিশুকামের প্রবণতা তৈরি হয়।

অনেক ইসলামিক এপোলোজিস্ট পেডোফিলিয়ার বিষয়ে দাবী করেন যে, নবী মুহাম্মদ বা সাহাবীগণ পেডোফাইল চরিত্রের ছিলেন না। কারণ এক্ষেত্রে নাকি শিশুদের প্রতি এই কামনা প্রাইমারি অথবা একচেটিয়া হতে হবে !

But the fact is: Nonexclusive pedophile বলা হয় সেই সব শিশুকামী যারা একইসাথে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিও আকর্ষণ বোধ করে, এরকম বহুগামী শিশুকামীদের একটি গবেষণা দেখে নিই। এই গবেষণাতে দেখা যাচ্ছে, ২৪২৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সেক্স অফেন্ডার বা যৌনঅপরাধীর উপর একটি মার্কিন সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে যে যাদেরকে "পেডোফাইল" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ৭% নিজেদেরকে একচেটিয়া শিশুকামী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ তারা শুধু এবং কেবলমাত্র শিশুদের প্রতিই যৌন আকর্ষণ বোধ করে। বাদবাকি অংশ অর্থাৎ ৯৩ শতাংশ শিশুকামীই মাঝে মাঝে শিশুদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, অন্য সময়ে তারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাথেও সম্পর্ক করে। এমনকি, এসব শিশুকামীর অনেকের পরিবার আছে।
(Hall RC, Hall RC (2007). "A profile of pedophilia: definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues". Mayo Clin. Proc. **82** (4): 457–71. doi:10.4065/82.4.457. PMID 17418075)
অর্থাৎ একজন নন এক্সক্লুসিভ পেডোফাইল অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাথেও যৌন সম্পর্ক রাখতে পারে। অন্য প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাথে যৌন সম্পর্ক থাকলে এটি প্রমাণ হয় না যে, তারা শিশুকামী নয়।

তারপরেও, এই প্রসঙ্গে হাদিসসমূহ থেকে জানা যায়, নবী মুহাম্মদের সবচাইতে বেশি আগ্রহ ছিল শিশু আয়িশার প্রতিই। এবং আয়িশার জন্য নবী মুহাম্মদের নির্ধারিত রাত্রিযাপনের পালা ছিল অন্য স্ত্রীদের চেয়ে বেশি। {রেফারেন্স সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৪০১৯, সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৪৮৩৩}

প্রাচীন রোম ও গ্রীসে বিবাহের বয়স

অনেক ইসলামিক বক্তা এবং আলেমই দাবী করে থাকেন যে, সেই চোদ্দশত বছর আগে সারা পৃথিবীর সকল সমাজেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল! এসব কথা কিছু ক্ষেত্রে সত্য যে, প্রাচীন অনেক অসভ্য বা অর্ধ সভ্য সমাজেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, তবে তা একটি ছেলে শিশু এবং একটি মেয়ে শিশুর মধ্যে বিবাহ। এবং একটি মেয়েশিশু এবং বয়স্ক পুরুষের বিবাহ উন্নত প্রাচীন সভ্যতাগুলোতেও খারাপ চোখে দেখা হতো। আসুন প্রাচীন রোমান আইন দেখে নিই, নবী মুহাম্মদের জন্মের বহু বছর আগেই সেই প্রাচীন রোমে শিশু মেয়েদের নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে ১২ বছরের কম বয়সে মেয়েদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। প্রাচীন স্পার্টায় তো আরও কঠিন বিধান ছিল। সেখানে মেয়েদের বিবাহ হতো ১৮ বছর হওয়ার পরে। অসভ্য সৌদি আরবের যেহেতু কোন উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠেনি, তাই সেই সব অঞ্চলে আদিম বর্বর প্রথাগুলোই প্রচলিত ছিল। ইসলাম সেই বর্বর আরবের সেই প্রথাগুলোকেই আইনে পরিণত করে কেয়ামত পর্যন্ত বৈধতা দিয়ে গেছে।

The Family in ancient Rome : new perspectives, Beryl Rawson, পৃষ্ঠা ২১

First marriages, at least, were normally arranged by the parents of the couple. Although these marriages must often have been intended to suit the interests or ambitions of the parents rather than the inclinations of the couple, the law required that when betrothal and marriage took place both partners should be old enough to understand the vows and both should consent. Since boys were normally older than girls at marriage (a five-year difference was probably most common[59]) and would already have begun some of the activities of a citizen, a son's wishes may have

Moreover, at a girl's first betrothal she was probably very young and not in a strong position to press her preferences against those of her parents. The legal minimum age of marriage was 12 for girls and 14 for boys, and betrothal could take place some time before that: Augustus fixed the minimum age for betrothal at 10.

অনুমতি প্রদানে অক্ষম (যেমন- কোনো অজ্ঞান, মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি) এরকম কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়াও ধর্ষণের আওতাভুক্ত।

একটি শিশুর সম্মতি দানের বোধবুদ্ধি কিংবা জ্ঞান থাকে না বিধায় পুরো সভ্য বিশ্বে শিশুদের সম্মতি দেয়ার একটি বয়স নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এই বয়সটিকে বলা হয় এইজ অফ কনসেন্ট বা সম্মতিদানের বয়স। এই বয়সে আসার আগে সে কোন যৌন কর্মে হ্যাঁ বলুক কিংবা না বলুক, উভয়ক্ষেত্রেই বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ শিশুটি তখনও এই কাজটি সম্পর্কে জেনে বুঝে কোন সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম নয়। সম্মতি তখনই সে দিতে পারবে, যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক, তখন যদি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সে সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই সেটিকে সম্মতি ধরতে হবে। এর আগে সে হ্যাঁ বলুক কিংবা না, তাতে কিছুই যায় আসে না। একটি শিশুর যেহেতু পরিপক্ক চেতনা নেই, সবদিক বিবেচনা করার সামর্থ্য নেই, যৌনকর্ম করার বা যৌন সঙ্গীবাছাই করার বা পছন্দ করার ক্ষেত্রে সে তাই কোন মতামত দিতে পারে না। তাই পুরো সভ্য বিশ্বে কোন শিশুর সাথে যৌনকর্ম সরাসরি ধর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ধরা যাক, একটি শিশু মেয়েকে কাল্পনিক কোনো কিছুর ভয় দেখিয়ে বা চকলেটের লোভ দেখিয়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মেয়েটির শরীরের বিভিন্ন জায়গাতে হাত দিলো। কিংবা স্কুলের শিক্ষক পরীক্ষায় ভাল নম্বরের লোভ দেখিয়ে তাকে নিজের রুমে ডেকে নিলো। শিশু মেয়েটি ভয়ে কিংবা চকলেটের লোভে অথবা অন্য কোন কারণে কাউকে এই বিষয়ে কিছুই বললো না। বরঞ্চ সে আপাত দৃষ্টিতে স্বেচ্ছায় কাজটি করলো বলে মনে হতে পারে। এরকম অবস্থাতেও ধরে নিতে হবে, এই মেয়েটির এই কাজে সম্মতি ছিল না। কারণ মেয়েটি এখনো শিশু, তাই সে সম্মতি দেয়ার মত বোধবুদ্ধি সম্পন্ন নয়। এরকম ঘটনায় সেই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে ধর্ষক হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং শাস্তি দিতে হবে।

ইউনিসেফ শিশু বিবাহকে মেয়েদের জন্য এক প্রকারের মৃত্যুদণ্ড বলে ঘোষণা দিয়েছে। কারণ-

মেয়েদের বয়ঃসন্ধি বা পিউবার্টির সময়ে নানাবিধ হরমোনাল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা মেয়ে যায় এবং এই সব হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে তার শরীরে এবং মনে নানা ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। **পিউবার্টি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।** এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কয়েকটি ধাপ রয়েছে, যেই ধাপগুলো পূর্ণ করা প্রয়োজন।

একটি মেয়ে ৮-১০ বছর বয়সে তার মস্তিস্কের হাইপোথেলামাস অংশটি গোনাড্রোপিন নামের একটি হরমোন নিঃসরণ শুরু করে। এই হরমোনটির কারণে তাদের রক্তে লুটেইনাইজিং হরমোন এবং ফলিকল-স্টিমুলেটিং হরমোন নিঃসরণ শুরু হয়। এই হরমোনগুলো তার ডিম্বাশয়ে পৌঁছালে ডিম্বাশয় এস্ট্রোজেন উৎপাদন করার জন্য সক্রিয় হয়। এর সাথে সাথে আরো কিছু হরমোন নিঃসরণ হতে থাকে, যা মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। **অনেক সময় এই প্রক্রিয়াটি বয়সের চাইতে আগেও হয়ে যেতে পারে। তখন তাকে বলে প্রিকোশিয়াস পিউবার্টি। তবে তা হয়ে থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া জরুরি। কারণ এরকম হওয়ার প্রধানতম কারণগুলো হচ্ছে নানা ধরণের অসুখ বিসুখ, ইনফেকশন, রেডিয়েশন এবং আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া। অথবা তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া(ম্যারিটাল পেনিট্রেশন)।** একটি শিশু মেয়ে যদি অতি অল্প বয়সেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, বা তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। **সেই সময়ে তাদের মস্তিষ্কে কিছু ভুল মেসেজ যায়। মানুষের মস্তিষ্ক জানে না, এটি যৌন নির্যাতন নাকি স্বেচ্ছায়** যৌনতা। মস্তিষ্ক তখন এই বিষয়ে একটিভ হয়ে ওঠে, এবং শরীরকে দ্রুত যৌনতার জন্য উপযুক্ত করে তোলার জন্য জরুরি হরমোনগুলো নিঃসরণ করতে শুরু করে দেয়। যা মেয়েটির ভবিষ্যত জীবন ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

একটি মেয়ের ক্ষেত্রে, পেলভিক ফ্লোর এই সময়ে গঠিত হয়। যা বাচ্চা জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। **বিষয়টি এমন নয় যে, একদিন একটি মেয়ের পিরিয়ড হওয়া শুরু হলো, আর সাথে সাথে মেয়েটি সেক্স এবং বাচ্চা জন্ম দেয়ার জন্য উপযুক্ত হয়ে গেল**। পুরো বিষয়টি ধীর গতির একটি প্রক্রিয়া, এবং এর এক একটি ধাপ রয়েছে। একটি ধাপ পরের ধাপের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু একটি মেয়েকে খুব ছোট বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেয়া হলে, বা নিয়মিত যৌন নির্যাতন করা হলে, বা বিয়ে দিয়ে স্বামীর যৌন চাহিদা মেটাতে হলে তার মস্তিষ্ক খুব দ্রুত তার শরীরকে যৌনতার জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করে। কিন্তু এই সময়ে যেই সমস্যাটি দেখা দেয়, তা হচ্ছে, মেয়েটির শারীরিক বৃদ্ধির জন্য যেই হরমোন নিঃসরণ প্রয়োজন, তা প্রায়শই শরীর বন্ধ করে দেয়। মানুষের মস্তিষ্ক এই সময়ে মনে করে, মেয়েটি যথেষ্ট বড় হয়েছে, সন্তান ধারণের উপযুক্ত হয়েছে, এখন আর শারীরিক বৃদ্ধির হরমোনের প্রয়োজন নেই। ফলশ্রুতিতে আরো বড় সমস্যা অপেক্ষা করে এদের জন্য, বয়স হওয়া শুরু হলে, বা সন্তান জন্মদানের সময়। পেলভিক ফ্লোর ঠিকমত গঠিত হওয়ার আগেই শরীর বৃদ্ধির হরমোন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এদের বাচ্চা জন্ম দেয়া একটি বিভীষিকাময় ঘটনা হয়ে ওঠে। অসংখ্য জটিলতা এবং ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে এই ধরণের মেয়েদের সন্তান জন্ম দেয়ার সময়। **এমনকি, মেয়েটি প্রাপ্তবয়ষ্ক হয়ে সন্তান জন্ম দিতে গেলেও ঠিক একই ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ তার শরীর বৃদ্ধি পাওয়ার আগেই বয়ঃসন্ধি চলে এসেছে, বয়ঃসন্ধি মেয়েটি অতিক্রম করেছে অতি দ্রুত, এবং শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে।** এই ধরণের মেয়েদের খুব স্বাভাবিকভাবেই মেরুদণ্ডে দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা, হাঁটুর জয়েন্ট ক্ষয় হয়ে যাওয়ার মত সমস্যায় ভোগেন।

এদের সন্তানরা নানারকম প্রতিবন্ধী হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। কারণ এদের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে নি, তাই সন্তানকে পেটে থাকা অবস্থায় এই ধরণের মেয়েরা স্বাভাবিক পুষ্টির যোগানও দিতে পারেন না। এদের সন্তানগণের রোগব্যধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইমিউন সিস্টেমও অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে।

তাই, বাল্যবিবাহ এবং শিশু বয়সেই নিয়মিত যৌন সম্পর্ক একটি শিশু মেয়ের পরবর্তী জীবনকে শুধু ধ্বংসই করে না, একটি পুরো প্রজন্মকেও ধ্বংস করে।

↥

সহীহ মুসলিম (ইফা)
পরিচ্ছেদঃ নির্জনে অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের কাছে অবস্থান করা এবং তার কাছে প্রবেশ করা হারাম
৫৪৮৬। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ সাবধান! কোন পুরুষ কোন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর কাছে কিছুতেই রাত যাপন করবে না; তবে যদি সে তার স্বামী হয় অথবা মাহরাম হয়।

উম্মে হানী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কা বিজয়ের পরে

সীরাতুল মুস্তাফা (সা) ৪৩

ইবন আসীর জাযরী 'তারীখে ইবন আসীর' এ বর্ণনা করেন, নবী (সা) যখন পুরুষদের বায়'আত গ্রহণ সম্পন্ন করে মহিলাদের বায়'আত গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। কুরায়শ গোত্রের যে সমস্ত মহিলা এ সময় বায়'আত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হন তাঁদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব অর্থাৎ হযরত আলী (রা) বোন,
২. উম্মে হাবীবা বিনত আ'স ইবন উমাইয়া আমর ইবন আবদ আমরীর স্ত্রী,
৩. আরওয়া বিনত আবিল আইস অর্থাৎ ইতাব ইবন উসায়দ এর ফুফু,
৪. আতিকা বিনত আবিল আইস অর্থাৎ আরওয়ার বোন,
৫. হিন্দা বিনত উতবাহ, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী এবং আমীর মু'আবিয়ার মা,

১১৭৬ উম্মে হানী (রা.) বলেন, নবী সা মক্কা বিজয়ের দিন পূর্বাহ্নে তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন।

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ৯৯

মক্কা বিজয়ের দিন উম্মু হানীকে ইতিহাসের দৃশ্যপটে দেখা যায়। তাঁকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ঘটনার কথা সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন এদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্বামী মক্কা থেকে পালিয়ে নাজরানের দিকে চলে যান।[৬] স্ত্রী উম্মু হানীর ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে তাঁকে তিরস্কার করে একটি কবিতা তিনি রচনা করেন। কবিতাটির কিছু অংশ সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়।[৭] নিম্নের

আসহাবে রাসুলের জীবনকথা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮

বর্ণনা দেখা যায়। যেমন রাসূল (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চাচা আবূ তালিবের নিকট উম্মু হানীর বিয়ের পয়গাম পাঠান। একই সংগে হুবায়রা ইবন 'আমর ইবন 'আয়িয আল-মাখযূমীও পাঠান। চাচা হুবায়রার প্রস্তাব গ্রহণ করে উম্মু হানীকে তার সাথে বিয়ে দেন। নবী (সা) বললেন : চাচা! আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হুবায়রার সাথে তার বিয়ে দিলেন? চাচা বললেন : ভাতিজা! আমরা তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করেছি। সম্মানীয়দের সমকক্ষ সম্মানীয়রাই হয়ে থাকে।[২] এতটুকু বর্ণনা। এর অতিরিক্ত কোন

বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও নবী মুসা তাকে বিয়ের আবারো প্রস্তাব দেন। কিন্তু সেই সময়েও উম্মে হানী সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।
সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)
৬৩৫৩। আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সা উম্মু হানী (রা) এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো বার্ধক্যে পৌছে গেছি এবং আমার সন্তানাদিও রয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সা বললেনঃ **উটে আরোহণকারিণীদের মধ্যে তুমি সর্বোত্তম নারী।**

সূরা বনী ইসরাঈল ২৫১

হযরত উম্মে হানী বিনতে আবূ তালেব (রা) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ সায়েব কলবী (রা)....উম্মে হানী বিনতে আবূ তালেব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সম্পর্কে বলেন, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সংঘটিত হয় সেই রাত্রে তিনি আমার ঘরে নিদ্রিত ছিলেন। ইশার সালাত শেষে তিনি পুনরায় নিদ্রা যান। আমরাও নিদ্রা যাই। ভোর হইবার পূর্বে আমরা রসূলুল্লাহ (সা) কে জাগ্রত করিলাম। যখন তিনি সালাত পড়িলেন এবং আমরাও তাহার সহিত সালাত পড়িলাম তখন তিনি বলিলেন হে উম্মে হানী আমি তোমাদের সহিত ইশার সালাত পড়িয়াছিলাম এবং এখন ফজরের সালাতও তোমাদের সহিত পড়িলাম। এই সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন এবং পুনরায় তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। যেমন তুমি দেখিতেছ। কালবী নামক রাবী মুহাদ্দিসিনগণের নিকট বর্জিত। কিন্তু আবূ ইয়ালা তাহার মুসনাদে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আনসারী....উম্মে হানী (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবুল কাসেম তবরানী আব্দুল আ'লা ইবনে আব্দুল মুসাভির.... হযরত উম্মে হানী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে ছিলেন। অতঃপর আমি তাহাকে না পাইয়া বড়ই অস্থির হইলাম এবং আমার বিনিদ্ররাত্র অতিবাহিত করিলাম ভয় হইল, কুরাইশরা তাহাকে কোন বিপদে ফেলে নাই

৭৬ সীরাতুন নবী (সা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে উম্মু হানী (রা)-এর বর্ণনা

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইস্‌রা সম্পর্কে উম্মু হানী বিন্‌ত আবূ তালিব (রা)-এর বর্ণনা নিম্নরূপ। তিনি বলতেন : আমারই ঘর থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ সফর শুরু হয়েছিল। তিনি সে রাতে আমার ঘরে শায়িত ছিলেন। তিনি ঈশার সালাত আদায় শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। আমরাও ঘুমিয়ে যাই। ফজরের সামান্য আগে তিনি আমাদের জাগালেন। এরপর আমরা সকলে তাঁর সংগে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি বললেন : হে উম্মু হানী! তোমরা তো দেখেছ, আমি তোমাদের সাথে ঈশার সালাত আদায় করে তোমাদের এখানেই শুয়ে পড়ি। কিন্তু এরপরে আমি বায়তুল-মুকাদ্দাস গমন করি এবং সেখানে সালাত আদায় করি। তারপর তো তোমাদের সাথেই ফজরের সালাত আদায় করলাম, যা তোমরা দেখলে। উম্মু হানী বলেন : এই বলে তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর চাদরের কিনারা ধরে ফেললাম। ফলে তাঁর পেট থেকে কাপড় সরে গেল। তা দেখতে ভাঁজ করা কিব্‌তী বস্ত্রের মত স্বচ্ছ ও মসৃণ। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি এ কথা লোকদের

সহীহ বুখারী (ইফা)

৩৫০। উম্মে হানী (রা) বলেনঃ আমি বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সা এর কাছে গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেনঃ মারহাবা, হে উম্মে হানী! গোসল করার পরে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করলে তাঁকে আমি বললামঃ আলী (রা) এক লোককে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি সে লোকটিকে আশ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হুবায়রার ছেলে অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ **হে উম্মে হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাঁকে আশ্রয় দিলাম**।

সুনান তিরমিজী (ইফা)

১৮৪৮। উম্মে হানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা একদিন আমার কাছে এলেন এবং বললেন, তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমি বললাম, শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরা ও সিরকা ছাড়া আর কিছুই নেই। নাবী সা বললেন, তা-ই নিয়ে আস।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

২৪৫৬। মক্কা বিজয়ের দিন উম্মু হানী (রা) এসে রাসূলুল্লাহ সা এর ডান পাশে বসলেন। এক দাসী এক পাত্র পানীয় এনে তাঁকে দিলে তিনি তা থেকে কিছু পান করার পর উম্মু হানীর দিকে পাত্রটি এগিয়ে দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন।

৬০৭২ মদিনাবাসীদের কোন এক দাসী রাসূলুল্লাহ সা এর হাত ধরে যেখানে চাইত নিয়ে যেত। আর তিনিও তার সাথে চলে যেতেন।

সুনান ইবনু মাজাহ

৪১৭৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, মদীনার কোন দাসী নিজ প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সা -এর হাত ধরে তাঁকে নিজ ইচ্ছামত মদীনার কোন স্থানে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতেন না।

২৮৪৪ নবী সা মদিনায় সুলাইমের মা ছাড়া কারো ঘরে যাতায়াত করতেন না তাঁর স্ত্রীদের ব্যতীত। এ ব্যাপারে রাসূল সা-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সুলাইমের মায়ের ভাই আমার সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়ে সে শহীদ হয়েছে, তাই আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাই।

২৭৮৮ আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন- রাসূল সা উম্মু হারিম বিনতে মিলহান রা. এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তিনি রাসূল সা কে খেতে দিতেন। তিনি ছিলেন, উবাদাহ ইবনু সামিত রাঃ এর স্ত্রী।
একদা রাসূল সা তাঁর ঘরে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান এবং তাঁর মাথার উকুন বাছতে থাকেন। এক সময় রাসূল সা ঘুমিয়ে পড়েন।

২৭৯৯ উম্মু হারাম বিনতু মিলহান (রা.) বলেন, একদা রাসূল সা. আমার নিকটবর্তী এক স্থানে শুয়েছিলেন।

নবী মানুষকে অভিশাপ দিতেন, কথায় কথায় মানুষের অকল্যাণ কামনা করতেন নবী মুহাম্মদঃ

৬১৫৯,৬০ আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী সা এক ব্যক্তিকে একটা কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিতে দেখে, তাকে বললেনঃ এতে সাওয়ার হও। সে বললঃ এটি তো কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বললেনঃ এতে সাওয়ার হও। সে বললঃ এটি তো কুরবানীর উট। তিনি বললেনঃ এতে সওয়ার হও। সে বলল, এটি তো কুরবানীর উট। **নবী সা বললেনঃ তোমার অকল্যাণ/অনিষ্ট হোক**। তুমি এটির উপর সওয়ার হয়ে যাও।

সহীহ মুসলিম শরীফ- ১২তম খণ্ড ২১৯

(৩১১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ সমাপনান্তে) যখন (মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে) রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করিলেন- তখন সাফিয়্যা (রাযিঃ)কে তাঁহার তাঁবুর দরজায় অবসাদগ্রস্তা ও বিষন্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ হে দুর্ভাগা! তোমার কল্যাণ না হউক। সম্ভবতঃ তুমি আমাদেরকে এই স্থানে অবস্থানে বাধ্য করিবে। অতঃপর তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি

৬১৬২ এক ব্যক্তি নবী সা এর সামনে অন্য জনের প্রশংসা করলো। **তিনি বললেনঃ তোমার অমঙ্গল হোক**। এবং বললেনঃ যদি তোমাদের কাউকে কারো প্রশংসা করতেই হয়, তবে শুধু এতটুকু বলবে যে, আমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে এ রকম ধারণা পোষণ করি।

অন্যদিকে

৬৯২৯ আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, **নবী সা কোন এক নবীর কথা বর্ণনা করেছেন যাকে তাঁর সম্প্রদায় প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেলে, আর তিনি আপন চেহারা থেকে রক্ত মুছেছেন ও বলেছেনঃ হে রব! তুমি আমার কাওমকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তারা বুঝে না।**

১৩০৫ আয়িশাহ্ (রা.) বলেন- মুতার যুদ্ধে জাফর (রা.) এর শাহাদাতের খবর নবী সা এর কাছে পৌঁছলে তাঁর মধ্যে শোকের আলামত প্রকাশ পেল। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জানাল- হে নবী সা, জাফর (রা.) এর পরিবারের মহিলাগণ কান্নাকাটি করছে। তিনি তাদের নিষেধ করার জন্য তাকে আদেশ করলেন। সেই ব্যক্তি চলে গেলেন। পরে এসে বললেন, আমি তাদের নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা কান্নাকাটি থামাচ্ছেনা। তিনি তাদের নিষেধ করার জন্য দ্বিতীয়বার তাকে নির্দেশ দিলেন। তিনি চলে গেলেন এবং এসে একই বিষয় জানাল।
নবী সা বললেন, তা হলে তাঁদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারো। আয়িশাহ (রা.) বলেন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তোমার নাক ধূলি মিশ্রিত করুন। আল্লাহ্র কসম! তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা করতে পারছ না ।

৪৪৫৮ আয়িশাহ (রা.) বলেন, আমরা নবী সা-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীদের স্বাভাবিক বিরক্তিবোধ। যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের ওষুধ সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিভাব। তখন তিনি বললেন, বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল যাতে তা আমি দেখি।
৫৭১২,৬৮৯৭ নবী সা এর অসুখের সময় আমরা তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তখন তিনি আমাদের ইঙ্গিত দিতে থাকলেন যে, তোমরা আমার মুখে ঔষধ ঢেল না। আমরা মনে করলাম, এটা ঔষধের প্রতি একজন রোগীর স্বভাবজাত অনীহা প্রকাশ মাত্র। এরপর যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন বললেনঃ আমি কি তোমাদের আমার মুখে ঔষধ ঢেলে দিতে নিষেধ করিনি? আমরা বললামঃ আমরাতো ঔষধের প্রতি রোগীর স্বভাবজাত অনীহা ভেবেছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ আমি এখন যাদেরকে এ ঘরে দেখতে পাচ্ছি তাদের সবার মুখে ওষুধ ঢালা হবে।

সুনান আত তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
২০৪৭। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ তোমরা রোগীকে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করবে না। কেননা, **আল্লাহ তা'আলা তাদের আহার করান এবং পান করান**।

৪৫৮৬ আয়িশাহ (রা.) বলেন, যে অসুখে রাসূলুল্লাহ সা কে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে সে অসুখে তাঁর ভীষণ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়েছিল।

২৬১৭ আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন- **এক ইয়াহূদী মহিলা নবী সা এর খিদমতে বিষ মিশানো বকরী নিয়ে এল। সেখান হতে কিছু অংশ তিনি খেলেন। পরবর্তীতে নবী সা এর তালুতে আমি বরাবরই বিষক্রিয়ার আলামত দেখতে পেতাম**।

সহীহ মুসলিম (ইফা)
৫৫১৭। আনাস (রা) বলেন, এক ইয়াহুদী মহিলারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বিষ মেশানো বকরীর গোশত নিয়ে এল। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন। এরপর থেকে রাসুলুল্লাহ সা এর আলজিভ ও তালুতে (তার ক্রিয়া) আমি প্রত্যক্ষ করতাম।
সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৪৫১৩। আনাস (রা) বলেন,...... আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সা এর আলাজিভে বিষের ক্ষত চিহ্ন দেখতে পেতাম।

৫৭৩৫ আয়িশাহ (রা) বলেন, নবী সা যে রোগে ওফাত পান সেই রোগের সময়ে তিনি নিজ দেহে 'মুআব্বিযাত' পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর যখন রোগের তীব্রতা বেড়ে গেল, তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁক দিতাম। আর আমি তাঁর নিজের হাত তাঁর দেহের উপর বুলিয়ে দিতাম। কেননা, তাঁর হাতে বারাকাত ছিল।

কিতাবুত্ তিব্বি ওয়ার রুক্বা ৩১৩

وَعَنْ ٤٣٧١ أَبِى كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِحْتَجَمَ عَلٰى هَامَتِهِ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَاحْتَجَمْتُ

৪৩৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ কাবশা আনমারী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষমিশ্রিত বকরির গোশ্ত খাওয়ার কারণে তিনি নিজের মাথার তালুতে শিঙ্গা লাগান। [অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী] মা'মার (রা.) বলেন,

৪৪২৮ আয়িশাহ (রা.) বলেছেন, **নবী সা ইন্তিকালের সময়কালে যে রোগে আক্রান্ত ছিলেন, তখন সে সময় তিনি বলতেন, হে আয়িশাহ! আমি খাইবারে বিষযুক্ত যে খাবার খেয়েছিলাম আমি সর্বদা তার যন্ত্রণা অনুভব করছি। আর এখন মনে হচ্ছে সে বিষক্রিয়ার ফলে আমার শিরাগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে**।

৪৪৮১ আয়িশাহ (রা.) বলেন, নবী সা তাঁর সেই রোগাবস্থায় যাথেকে তিনি আর সেরে উঠেননি।

সুনান আদ-দারেমী (হাদিসবিডি)
৬৮। আবু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা তাঁর অসুস্থতার সময় বলতেন: খায়বারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তা আজও আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এখন এটি আমার প্রাণ ধমনি কলিজা ছিঁড়ে ফেলছে।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৪৫১৩। **নবী সা যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন তখন উম্মু মুবাশশির (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার রোগ সম্পর্কে কি ভাবছেন?** আর আমি আমার ছেলের রোগ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নই সেই বিষ মেশানো বকরীর গোশত ব্যতীত যা সে খায়বারে আপনার সঙ্গে খেয়েছে। **নবী সা বললেনঃ আমিও ঐ বিষ ছাড়া আমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নই। এ মুহূর্তে তা আমার প্রধান ধমনি কেটে দিচ্ছে।**

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), পরিচ্ছেদঃ কাউকে বিষ খাইয়ে হত্যা করলে কি তাকেও হত্যা করা হবে?
৪৫১২। আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা উপহার(হাদিয়া) গ্রহণ করতেন কিন্তু দান গ্রহণ করতেন না। খায়বারের এক ইয়াহুদী মহিলা একটি ভুনা ছাগলে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হাদিয়া দেয়। **রাসূলুল্লাহ সা তা আহার করেন এবং লোকজনও আহার করে। তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। কারণ এটি আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, এটি বিষযুক্ত। বিষক্রিয়ার ফলে ইবনু বারাআত আনসারী (রা) মারা যান**। তিনি ইয়াহুদী মহিলাকে ডেকে এনে প্রশ্ন করেনঃ তুমি যা করলে তা করতে তোমাকে কিসে প্ররোচিত করেছে? **সে বললো, আপনি যদি সত্যি নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমি যা করেছি তাতে আপনার ক্ষতি হবে না**। অন্যথায় আমি আপনার থেকে মানুষকে শান্তি দিলাম। **রাসূলুল্লাহ সা নির্দেশ দিলে পরে তাকে হত্যা করা হলো**। **অতঃপর নবী সা যে ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন সেই সম্পর্কে বলেনঃ আমি সর্বদা সেই লোকমার ব্যথা অনুভব করছি যা আমি খায়বারে খেয়েছিলাম। এই সময়ে তা আমার প্রধান ধমনি কেটে দিয়েছে**।

সহীহ বুখারী (ইফা)
২২৪৭। আয়শা (রা) বলেন, **নবী (সা) যে রোগে ইন্তিকাল করেন সে সময় তিনি বলতেন, হে আয়শা! আমি খায়বারে বিষযুক্ত যে খাদ্য ভক্ষণ করেছিলাম, আমি সর্বদা তার যন্ত্রণা অনুভব করছি। আর এখন সেই সময় আগত, যখন সে বিষক্রিয়ার আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে**।

৩০৪   صحيح الترمذي / সহীহ আত-তিরমিযী

৯৭৯। আইশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর হতে আমার আর কোন ঈর্ষা হয় না অন্য কোন ব্যক্তির সহজ মৃত্যু হলে।

১১৪ রাসূলুল্লাহ্ সা -এর অসুখ যখন বৃদ্ধি পেল তখন তিনি বললেনঃ '**আমার নিকট লেখার জিনিস নিয়ে এস, আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব যাতে পরে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না**।' উমার (রা) বললেন, 'নবী সা এর রোগযন্ত্রণা প্রবল হয়ে গেছে (এমতাবস্থায় কিছু বলতে বা লিখতে তাঁর কষ্ট হবে)। আর আমাদের নিকট তো আল্লাহর কিতাব আছে, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। ইবনু 'আব্বাস (রা) এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন যে, 'হায় বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ! **আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর লেখনীর মধ্যে যা বাধ সেধেছে**।' সহীহ বুখারী (ইফা) ১১৫

৫৬৬৯ যখন রাসূলুল্লাহ সা এর ইন্তিকালের সময় আগত হল, তখন ঘরের মধ্যে অনেক মানুষের জমায়েত ছিল। যাঁদের মধ্যে উমার(রা) ও ছিলেন। তখন **নবী সা বললেনঃ লও, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেব, যাতে পরবর্তীতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।** তখন উমার (রা) বললেনঃ নবী সা এর উপর রোগ যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠেছে, আর তোমাদের কাছে কুরআন মাওজুদ। আর আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সময়ে আহলে বাইতের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হল। তাঁরা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেন, তন্মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলেনঃ নবী সা এর কাছে কাগজ পৌঁছে দাও এবং তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেবেন,

যাতে পরবর্তীতে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট না হও। আবার তাদের মধ্যে উমার (রা) যা বললেন, তা বলে যেতে লাগলেন। এভাবে নবী সা এর কাছে তাঁদের বাকবিতন্ডা ও মতভেদ বেড়ে চলল। তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ তোমরা উঠে যাও। **পরবর্তীতে ইবনু আব্বাস (রা) বলতেন, বড় মুসীবত হল লোকজনের সেই মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক, যা নবী সা ও তাঁর সেই লিখে দেয়ার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।**

হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, জালালুদ্দীন সুয়ূতি, ভাষান্তরঃ আধুনিক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৯৯, ১০০

১০০ **হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা**

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

দু'দিন পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফন-দাফনের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। কেননা, তাঁর জন্য কবর খনন করা হবে, না লহদ বানানো হবে, সে সিদ্ধান্ত তখনো গ্রহণ করা যায়নি। মক্কাবাসীদের মধ্যে কবর খননের রীতি ছিলো এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে লহদ বানানো। উভয় পক্ষই চাচ্ছিলো তাদের নিজ নিজ রীতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমাহিত করতে। শেষে হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ইবনে আবদিল মুত্তালিব দু'জন লোককে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ ও আবু তালহার কাছে প্রেরণ করেন।

আবু উবায়দা মক্কাবাসীদের রীতিতে কবর খনন করতেন। আর আবু তালহা মদীনাবাসীদের রীতিতে লহদ বানাতেন। আবু তালহাকে আনার জন্য যাকে পাঠানো হয়েছিলো, সে দ্রুত তাকে সংগে নিয়ে এলো। কিন্তু আবু উবায়দাকে আনার জন্য যাকে পাঠানো হয়েছিলো, সে সময় মতো এসে পৌঁছতে পারলো না। সুতরাং আবু তালহা মদীনাবাসীদের রীতিতে লহদ বানালেন এবং রাত্রিকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ চিরদিনের জন্য মাটির মধ্যে রেখে দেয়া হলো। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, রাত্রিকালে যখন আমরা কোদাল চালানোর শব্দ শুনতে পেলাম, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করা হয়েছে।

১৫৮২ নবুওয়াতের পূর্বে কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের সময় নবী সা ও আব্বাস (রা.) পাথর বহন করছিলেন। আব্বাস (রা) **নবী সা কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের ওপর দিয়ে নাও। তিনি তা করলে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর উভয় চোখ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তখন তিনি বললেনঃ আমার লুঙ্গি দাও। এরপর তাকে আর কখনো নগ্ন অবস্থায় দেখা যায়নি।**
৩৮২৯ ……… আববাস (রা) নাবী সা কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের উপর রাখ, পাথরের ঘর্ষণ হতে তোমাকে রক্ষা করবে। লুঙ্গি খুলতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর চোখ দু'টি আকাশের দিকে নিবিষ্ট ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি। তারপর তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল।

১০৩৪ আনাস (রা.) বলেন, যখন প্রবল গতিতে বায়ু প্রবাহিত হত তখন নবী সা এর চেহারায় ভয়ের চিহ্ন দেখা দিত।

মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকতেন নবী

২৮৮৫ আয়িশাহ (রা) বলেন, **এক রাতে রাসূল সা জেগে কাটান। অতঃপর তিনি যখন মদিনায় এলেন এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তি যদি রাতে আমার পাহারায় থাকত**। এমন সময় আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? **ব্যক্তিটি বলল, আমি সাদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস, আপনার পাহারার জন্য এসেছি। তখন নবী সা ঘুমিয়ে গেলেন**।

https://drive.google.com/file/d/1-9py5OxuJv0bdWdaf0CzVrW7RatkKgZ6/view?usp=sharing

৫০২৯,৩০,৮৭ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার জীবনকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নবী সা তার দিকে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখল, নবী সা তার সম্পর্কে কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সঙ্গে এর বিয়ে দিয়ে দিন।
রাসূল সা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর করলো- আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কিছুই নেই। আমার লুঙ্গি (শুধু এটাই আছে)। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর উঠে চলে যেতে উদ্যত হলে নবী সা তাকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী পরিমাণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ আছে? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে । নবী সা বললেন, **যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে তোমার কাছে এ মহিলাটিকে তোমার অধীনস্থ করে (বিয়ে) দিলাম**।

৩২১৭ আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। একদা নবী সা তাঁকে বললেন, হে আয়িশা! এই যে জিব্রীল (আ.) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁর প্রতি আল্লাহর সালাম, রহমত বর্ষিত হোক। **আপনি এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না**।

৩৬৩৪ একবার জিবরাঈল (আ.) নবী সা-এর নিকট আসলেন। তখন উম্মু সালামা (রা.) তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি(জিবরাঈল) এসে তাঁর(নবীর) সঙ্গে আলোচনা করলেন। অতঃপর উঠে গেলেন। নবী সা উম্মু সালামাহ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটিকে চিনতে পেরেছ কি? তিনি বললেন, **ইনিতো দিহ্‌ইয়া। উম্মু সালামা (রা) বলেন, কিন্তু নবী সা-কে তাঁর খুত্বায় জিব্রাঈল (আঃ)-এর আগমনের কথা বলতে শুনলাম**।

৭২১১ এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ্ সা-এর হাতে ইসলামের বায়আত নিল। মদিনায় সে জ্বরে আক্রান্ত হল। তখন সেই বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বায়আত ফিরিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সা তা অস্বীকার করলেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়আত ফিরিয়ে দিন। তিনি এবারও অস্বীকার করলেন।

৬০৫১ আবূ হুরাইরাহ বলেন, একবার নবী সা আমাদের নিয়ে যুহরের সালাত দু রাকআত আদায় করে সালাম ফিরালেন। সেদিন লোকেদের মাঝে আবূ বকর, উমার-ও হাযির ছিলেন। তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। কিন্তু জলদি করে কিছু লোক বেরিয়ে গিয়ে বলতে লাগলঃ সালাত খাটো করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ছিল, যাকে নবী সা 'যুল্ ইয়াদাইন' (লম্বা হাত বিশিষ্ট) বলে ডাকতেন, সে বললঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি কি ভুল করেছেন, না সালাত কম করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ আমি ভুলেও যাইনি এবং সালাত কমও করা হয়নি। তারা বললেনঃ বরং আপনিই ভুলে গেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেনঃ 'যুল্ ইয়াদাইন' ঠিকই বলেছে। তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন ও সালাম ফিরালেন।

৭২৪৯ আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী সা আমাদের নিয়ে যুহরে পাঁচ রাক'আত আদায় করলেন। তাকে বলা হল, সালাত কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেনঃ তোমার কী হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনি পাঁচ রাকআত সালাত পড়েছেন। তখন তিনি সালামের পর দুটো সাজদা দিলেন।

সুনান নাসাঈ (ইফা)
৩৯৬২। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা কে বললাম, আপনার জন্য কি শয়তান নেই? রাসূলুল্লাহ সা উত্তর দিলেন, থাকবে না কেন? **তবে আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন; ফলে সে শয়তান আমার অনুগত হয়ে গেছে**।

১২৩২ রাসূল সা বলেছেনঃ তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে বুঝতে পারে না যে, সে কত রাকআত সালাত আদায় করেছে।

১২৩১ রাসূল সা বলেছেনঃ সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হলে শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায়। ইকামত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমনকি সে সালাত আদায়রত ব্যক্তির মনে ওয়াস্‌ওয়াসা সৃষ্টি করে এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ কর, যা তার স্মরণে ছিল না। এভাবে সে ব্যক্তি কত রাকআত সালাত আদায় করেছে তা স্মরণ করতে পারে না।

আবূ দাউদ ৪৬৬ রসূলুল্লাহ সা মসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহর মর্যাদাপূর্ণ চেহারার ও তাঁর অফুরন্ত ক্ষমতায় বিতাড়িত শয়তান হতে। কেউ এ দুআ পাঠ করলে শয়তান বলে- আমার নিকট হতে সে সারা দিনের জন্য রক্ষা পেয়ে গেল।

৩২৯৩ রাসূল সা বলেছেন, যে লোক একশ'বার এ দুআটি পড়বেঃ "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই; রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। তাহলে তার জন্য একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে মুক্ত থাকবে। **কোন লোক তার চেয়ে উত্তম সাওয়াবের কাজ করতে পারবে না**।

৩৬৮৩ রাসূল সা বলেন, হে উমর! আল্লাহর কসম, শয়তান যখনই কোন রাস্তায় তোমাকে দেখতে পায় সে তখনই তোমার ভয়ে এ রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে।

৩২৮৭ মুগীরাহ (রা.) বলেন, সেই ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তাঁর নবী সা-এর মৌখিক দুআয় শয়তান হতে রক্ষা করেছেন, তিনি হলেন, আম্মার (রা.)।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মিথ্যুক নবী

হযরত মুহাম্মদ ছিলেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মিথ্যুক। কিন্তু খুব কৌশলে তিনি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায় আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজের অপরাধকে আল্লাহর নির্দেশ বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। যার একদম সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় সহি বুখারী হাদিসেই। নিচের হাদিসটি পড়ুন, এখানে বলা হচ্ছে, কোন বিষয়ে কেউ যদি প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু পরে যদি তার বিপরীতটি তার কাছে উত্তম মনে হয়, তাহলে প্রতিশ্রুতির কাফফারা দিয়ে বিপরীত কাজটিই করা যাবে। এতো সরাসরি মিথ্যাচার, এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। শুধু তাই নয়, নবী নিজেও এই কাজটি করতেন। কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে, তিনি পরে যদি মনে করতেন প্রতিশ্রুতির বিপরীত কাজটিই উত্তম বা লাভজনক, তিনি কিছু কাফফারা দিয়ে বিপরীত কাজটি, অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতেন

৬৬৮০ আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন,আমি কতক সাহাবীর সাথে বাহন চাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সা-এর নিকট উপস্থিত হলাম। যখন হাজির হলাম, তখন তাঁকে ক্ষুব্ধ অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বললেন যে, আমাদেরকে বাহন দিবেন না। এরপর বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি কোন কিছুর ওপর আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিক যখন কসম করি আর তার অন্যটির মাঝে কল্যাণ দেখতে পাই; তাহলে যেটা কল্যাণকর সেটাই করি আর কসমকে ভঙ্গ করি।

৬৬২২ নবী সা বলেনঃ **কোন কিছুর ব্যাপারে যদি কসম/শপথ কর আর তা ছাড়া অন্য কিছুর ভিতর কল্যাণ দেখতে পাও, তবে নিজ শপথের কাফ্ফারা আদায় করে তাথেকে উত্তমটি গ্রহণ কর।** [কাফফারা হল দশ জন গরীবকে মধ্যম মানের খাদ্যদান অথবা সেই টাকা না থাকলে ৩ দিন রোযা রাখা]

৪৬১১ রাসূলুল্লাহ সা বললেন, আল্লাহর কতক বান্দা আছে যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তাআলা তাদের কসম সত্যে পরিণত করেন।

৪১৪৫ উরওয়াহ (রা.) বলেন- হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.) ছিলেন আয়িশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ রটনাকারীদের একজন।

৬৬৭৯ আবূ বকর(রা.) আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে মিসতাহ (রা.) এর ভরণ-পোষণ করতেন। অপবাদ দেয়ার কারণে আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! মিসতা যখন আয়িশার ব্যাপারে অপবাদ রটিয়েছে; এরপর আমি আর তার জন্য কখনো কিছু খরচ করব না। তখন আল্লাহ্ আয়াত অবতীর্ণ করেন(আয়িশা নির্দোষ)। আবূ বকর (রা.) পুনরায় মিসতাহের ভরণ-পোষণের জন্য ঐ খরচ দেয়া শুরু করলেন, যা তিনি পূর্বে তাকে দিতেন এবং তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তার খরচ দেয়া কখনো বন্ধ করব না।

৪৩১৫ রাসূলুল্লাহ সা বলছিলেন- আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। সহীহ মুসলিম (ইফা) ৪৪৬৫

৪৩২৬ রাসূলুল্লাহ সা বলেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে, তার জন্য জান্নাত হারাম।

৬২৪২ আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, একবার ঐক লোক নবী সা এর এক কক্ষে উঁকি দিল। তখন তিনি একটা তীর ফলক কিংবা তীর ফলকসমূহ নিয়ে তার দিকে দৌড়ালেন। আনাস (রা.) বলেনঃ **তা যেন আমি এখনও দেখছি। তিনি ঐ লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য তাকে খুঁজছিলেন।**

৬৯০০ আনাস (রা.) বলেন- এক লোক নবী সা-এর কোন একটি হুজরার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন **তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে একটি তীক্ষ্ণ প্রশস্ত ছুরি নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার অজান্তে তাকে খোঁচা দেয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।**

৫৮৬২ মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রা.) থেকে বর্ণনা বলেন, তার পিতা একদিন তাকে বললেনঃ হে বৎস! আমার কাছে খবর এসেছে যে, নবী সা এর নিকট কিছু রেশমের কাপড় এসেছে। তিনি সেগুলো বণ্টন করছেন। চলো আমরা তাঁর কাছে যাই। আমরা গেলাম। আমাকে আমার পিতা বললেনঃ বৎস! নবী সা-কে আমার কাছে ডাক। আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। **নবী সা এর গায়ে তখন স্বর্ণের বোতাম লাগান মিহি রেশমী কাপড় ছিল।**
[এটি পুরুষের জন্য রেশম হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা।]

৫৬৩২ রাসূলুল্লাহ সা আমাদের নিষেধ করেছেন- রেশমের কাপড় পরতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পান-পাত্র ব্যবহার করতে। তিনি বলেছেনঃ উল্লেখিত বস্তুগুলো হল দুনিয়াতে কাফির সম্প্রদায়ের জন্য; আর আখিরাতে তোমাদের জন্য।

৫৮৬৪ নবী সা স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।
৫৮৬৬ রাসূলুল্লাহ সা স্বর্ণের একটি আংটি পরেন। তাতে তিনি مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ খোদাই করেছিলেন। লোকেরাও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। যখন তিনি দেখলেন যে, তারাও ঐ রকম আংটি ব্যবহার করছে, তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেনঃ আমি আর কখনও এটা ব্যবহার করব না।

হাদীস সম্ভার
১৯০০। **রাসূলুল্লাহ্ সা বলেছেন, আমি কিয়ামতের পূর্বে তরবারি-সহ প্রেরিত হয়েছি, যাতে শরীকবিহীনভাবে আল্লাহর ইবাদত হয়। আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে।** অপমান ও লাঞ্ছনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য।

২৮১৮ পরিচ্ছদঃ **জান্নাত হল তলোয়ারের ঝলকানির তলে।**
রাসূল সা বলেছেন, তোমরা জেনে রাখ, তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত।

৫৩৫৬ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ উত্তম দান তা-ই, যা দিয়ে মানুষ অভাবমুক্ত থাকে। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে তাদের থেকে শুরু কর।

৬৪৬০ রাসূলুল্লাহ সা দু'আ করতেনঃ হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ সা-এর পরিবারবর্গকে জীবিকা দান কর।
৬৪৫৮ আয়িশাহ (রা.) বলেন, **আমাদের উপর দিয়ে মাস কেটে যেত, আমরা এর মধ্যে ঘরে রান্নার আগুন জ্বলত না। আমরা কেবল খেজুর ও পানির উপর চলতাম।**

৪৪৬১ রাসূলুল্লাহ সা (মৃত্যুর সময়) কেবলমাত্র একটি সাদা খচ্চর এবং তাঁর যুদ্ধাস্ত্র আর একখন্ড যমীন (যা মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করে গেছেন) রেখে গেছেন।

৬৪৫১ আয়িশাহ (রা.) বলেন, নবী সা ইন্তিকাল করলেন। তখন **যৎসামান্য যব ছাড়া কোন প্রাণী খেতে পারে এমন কিছু আমার তাকের উপর ছিল না।**
৩০৯৭ আয়িশাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা-এর ওফাত হল, তখন আমার ঘরে এমন কোন বস্তু ছিল না, যা খেয়ে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে। শুধুমাত্র তাকের উপর আধা ওয়াসাক আটা পড়ে ছিল। আমি তা হতে খেতে থাকলাম এবং বেশ কিছুকাল কেটে গেল। অতঃপর তা শেষ হয়ে গেল।

৪৪০৯ সাদ (রা.) বলেন, বিদায় হাজ্জের সময় আমি মরণ রোগে আক্রান্ত হলে নবী সা কে বললাম, আমি একজন সম্পদশালী লোক কিন্তু আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই। কাজেই আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ সাদাকা করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ, তখন তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশই ঢের। তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় ছেড়ে যাও তবে তা তাদেরকে অভাবী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম-যাতে তাদের মানুষের কাছে হাত পেতে না বেড়াতে হয়।

১৯১৩ নবী সা বলেনঃ আমরা উম্মী জাতি। আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না। মাস এরূপ অর্থাৎ কখনও ঊনত্রিশ দিনের আবার কখনো ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে।

২৮৭২ রাসূল সা-এর আযবা নামের একটি উট ছিল। কোন উট তার আগে যেতে পারত না। একদা এক বেদুইন একটি জওয়ান উটে চড়ে আসল এবং আযবা-এর আগে চলে গেল। এতে মুসলিমদের মনে কষ্ট হল। নবী সা ও তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর নিয়ম এই যে, দুনিয়ার সব কিছুরই উত্থানের পর পতন আছে।

৩১২২ রাসূল সা বলেছেন, **আমার জন্য গানীমাত হালাল করা হয়েছে**।

৫৭৮৫ আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা নবী সা এর নিকট ছিলাম, এমন সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হল। তখন তিনি ব্যস্ত হয়ে মসজিদে পৌঁছলেন। লোকজন একত্রিত হল। তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। তখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। এরপর নবী সা আমাদের দিকে ফিরে বললেনঃ চন্দ্র ও সূর্যে, যখন তোমরা তাতে কোন কিছু হতে দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তা উজ্জ্বল হয়ে যায়।

৬৫৭৩ রাসূলুল্লাহ সা কয়েকজন লোককে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ **সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ না থাকে** তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না। http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=31337

১২০ আবূ হুরাইরা (রা.) বলেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল থেকে দু'পাত্র ইলম আয়ত্ত করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি এমন যে, প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে।

১২৮ একদা মুআয (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সা-এর পিছনে সওয়ারীতে ছিলেন, তখন তিনি তাকে ডাকলেন, হে মুআয! যে কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সা আল্লাহর রাসূল' -তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। মুআয (রা.) বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ্! আমি কি মানুষকে এ খবর দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?' তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর উপরই ভরসা করবে।' মুআয (জীবন ভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে ইলম গোপন রাখার গুনাহ না হয়।

৬৯১৯ **আবূ বকর (রা.) বলেন**, নবী সা বলেনঃ সবচেয়ে কঠিন কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা,মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমন কি **আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, হায় যদি তিনি নীরব হয়ে যেতেন**।

৬৬২৭ ইবনু উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা একবার একটি বাহিনী পাঠালেন যার **আমীর নিযুক্ত করলেন উসামাহ**কে। কতক লোক তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা দাঁড়িয়ে বললেনঃ অবশ্যই এ উসামাহ **সকল মানুষ অপেক্ষা আমার কাছে প্রিয়**।

৫২২৭ রাসূলুল্লাহ সা বললেন, আমি একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় জান্নাতে একটি প্রাসাদের প্রার্শ্বে একজন মহিলাকে ওযু করতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রাসাদটি কার? আমাকে বলা হলো, এটা উমার (রা.)-এর। তখন আমি উমারের আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করে পিছন ফিরে চলে এলাম।

৬৪৭৬ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেন- ভদ্রতার সঙ্গে **মেহমানদারী তিন দিন**।

সহীহ শামায়েলে তিরমিযী, অধ্যায়ঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর চুল, পরিচ্ছেদঃ তিনি চুলের মধ্যে বেণী বাঁধতেন
২৬। উম্মে হানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা -কে আমি চুলের চারটি বেণী বাঁধা অবস্থায় দেখেছি।

২৯১৫ নবী সা বদরের যুদ্ধ(ইসলামের প্রথম যুদ্ধ) এর দিন তাঁবুতে অবস্থানকালে দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার দোহাই দিয়ে বলছি, **আপনি যদি চান, তাহলে আজকের পরে আর আপনার ইবাদাত করা হবে না**।

মোজেজা দেখাতে বারবার ব্যর্থতা, তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ১৫ দিন

মুহাম্মদকে ইহুদিদের কাছ থেকে জেনে এসে তিনটি জটিল প্রশ্ন করেছিল কাফেররা, মুহাম্মদ আসলেই নবী কিনা সেটি পরীক্ষার জন্য। মুহাম্মদ উত্তরে তাদের বলেছিল, আগামীকাল তিনি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন। অথচ তার পনেরোদিন পর্যন্ত মুহাম্মদের উত্তরের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। তার কাছে নাকি এই পনেরোদিন জিব্রাইল আসেনি। এরকম একটি জরুরি মূহুর্তে, যেখানে আল্লাহ এবং মুহাম্মদের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি, ইসলামের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন এবং চ্যালেঞ্জ করেছে কাফেররা, সেখানে জিব্রাইল নাকি আসেনি। পরে মুহাম্মদ অজুহাত দেখিয়েছিল যে, সে নাকি সেইদিন ইনশাল্লাহ বলেনি দেখে আল্লাহ গোস্বা করে জিব্রাইলকে পাঠায়নি! এরকম ফালতু অজুহাত আমি জীবনে কোনদিন শুনিনি! এরকম একটি জরুরি মূহুর্ত, সেই সময়ে হঠাৎ আল্লাহ নাকি গোস্বা হয়ে সেন্টি খেয়ে বসে আছেন! কী মুসিবত। ১৫ দিন লাগলো মুহাম্মদের প্রশ্ন তিন্টার উত্তর সংগ্রহ করতে থুক্কু আল্লাহর রাগ ভাংতে। এরপরে জিব্রাইল পাঠালেন, কিন্তু যেই উত্তর দিলো, সেগুলো কোনটিই আসলে সেই প্রশ্নগুলোর সঠিক কোন উত্তর নয়।

জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কুরায়েশ গোত্রাধিনায়কেরা একবার নজর বিন হারেছ এবং উকবা বিন আবী মুয়ীতকে মদীনার ইহুদী আলেমদের কাছে পাঠালো। তাদেরকে বলে দিলো, তোমরা ইহুদী পণ্ডিতদেরকে মোহাম্মদ ও তার কথাবার্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখো। তারা গ্রন্থধারী। তাই তারা মোহাম্মদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য বলতে পারবে। তারা যা বলে তা শুনে এসে তোমরা আমাদেরকে জানিয়ো। নজর ও উকবা পৌঁছে গেলো মদীনায়। রসুল স. সম্পর্কে সব কথা তারা খুলে বললো ইহুদী পণ্ডিতদের নিকট। পণ্ডিতেরা বললো, তোমরা তাকে এই তিনটি প্রশ্ন কোরো। প্রশ্ন তিনটির জবাব দিতে পারলে, মনে করবে তিনি সত্য নবী। আর জবাব দিতে না পারলে মনে করবে, সে ভণ্ড। প্রশ্ন তিনটি এই— ১. অতীত যুগের ওই সকল যুবক কারা, যারা পৃথিবীতে ঘটিয়েছিলো একটি অসাধারণ ঘটনা। ২. ওই ব্যক্তির পরিচয় কী, যে পরিভ্রমণ করেছিলো পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত। ৩. রূহ কী ?

নজর ও উকবা ফিরে এলো মক্কায়। গোত্রাধিনায়কদের বললো, এবার তবে মোহাম্মদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়েই যাক। তোমরা তাঁকে এই তিনটি প্রশ্ন করে দেখো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলেন রসুল স. স্বয়ং। তারা তখন একে একে রসুল স.কে বর্ণিত প্রশ্ন তিনটি করলো। রসুল স. বললেন, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবো আমি আগামীকাল। কিন্তু একথার সঙ্গে তিনি স. ইনশা আল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) কথাটি উচ্চারণ করলেন না। পরিণতি হলো এই যে, একাধারে পনেরো দিন পর্যন্ত হজরত জিবরাইল আবির্ভূত হলেন না। অবতীর্ণ হলো না কোনো প্রত্যাদেশও। রসুল স. বড়ই পেরেশান হয়ে পড়লেন। অংশীবাদিরা করতে লাগলো নানা রকম অপমন্তব্য। এমতাবস্থায় সুরা কাহ্ফ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন হজরত জিবরাইল। এতে সন্নিবেশিত করা হলো অংশীবাদিদের সেই সঙ্গে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হলো অংশীবাদিদেরকে।

তাফসীরে মাযহারী/২০৪

↥

মোজেজা/প্রমাণ/নিদর্শন দেখানোতে ফেল্টু নবী, যার স্পষ্ট প্রমাণ কোরআন থেকে দেখুন, যা সে অজুহাত হিসেবে মুখ লুকোতে ব্যবহার করতঃ

- তারা বলল, 'তুমি তো কেবল আমাদের মত মানুষ, সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো'। কোরআন ২৬:১৫৪
- যারা ইয়াহুদী- খ্রীষ্টান, তুমি যদি তাদের নিকট সব নিদর্শন নিয়ে আস, তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণকারী নও। কোরআন ২:১৪৫
- যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, 'তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন নাযিল হয় না'? বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। কোরআন ১৩:২৭
- তাদের উপেক্ষা যদি তোমার কাছে কঠিন বলে মনে হয় তাহলে যদি তুমি পার ভূগর্ভে সুড়ঙ্গের কিংবা আকাশে আরোহণের জন্য সিঁড়ির সন্ধান কর, অত:পর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসো। কোরআন ৬:৩৫
- কোন রাসূলের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসবে। কোরআন ১৩:৩৮
- তারা বলে, 'কেন তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন নাযিল করা হয়নি'? বল, **'নিশ্চয় আল্লাহ যে কোন নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম**। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না'। কোরআন ৬:৩৭
- তারা আল্লাহর নামে কঠিন কসম করেছে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে। বল, **'সমস্ত নিদর্শন তো কেবল আল্লাহর কাছে। আর কিসে তোমাদের উপলব্ধি ঘটাবে যে, যখন তা এসে যাবে, তারা ঈমান আনবে না?** কোরআন ৬:১০৯
- আর তারা বলে, 'তাঁর রবের পক্ষ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন কেন নাযিল করা হয় না'? বল, 'গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রয়েছি'। কোরআন ১০:২০
- তারা বলে, 'তার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে নিদর্শনসমূহ নাযিল হয় না কেন'? বল, 'নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর কাছে, আর আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী'। কোরআন ২৯:৫০
- তারা বলে, "এগুলো অলীক কল্পনা, হয় সে এটি মন থেকে বানিয়েছে নয়তো সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে এমন নিদর্শন নিয়ে আসুক যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ।"। তাদের পূর্বে যে জনপদ ঈমান আনেনি তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি । তবে কি এরা ঈমান আনবে? কোরআন ২১:৫-৬
- আর পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করাই আমাকে তা(নিদর্শনাবলী) প্রেরণ করা হতে বিরত রেখেছে। কোরআন ১৭:৫৯
- তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করে? তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? কোরআন ৪০:৬৯
- আর বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর; অচিরেই তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন। কোরআন ২৭:৯৩
- বিশ্বজগতে ও তাদের নিজদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য। কোরআন ৪১:৫৩
- মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। কোরআন ২১:৩৭
- আর আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছ। কোরআন ৩০:২০
- তুমি কি দেখনি যে, নৌযানগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন তোমাদের দেখাতে পারেন। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। কোরআন ৩১:৩১

- আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে নেই, ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। কোরআন ৩৬:৩৭
- আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে। কোরআন ৩৭:১৪
- এটা কি তাদেরকে হিদায়াত করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যাদের বাসভূমিতে তারা চলাফেরা করে? নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। তবুও কি তারা শুনবে না? কোরআন ৩২:২৬
- আমি ইচ্ছা করলে আসমান থেকে তাদের উপর এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করতাম ফলে তার প্রতি তাদের ঘাড়গুলো নত হয়ে যেত। কোরআন ২৬:৪
- তারা কি তাদের সামনে ও তাদের পেছনে আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তাদেরকে সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আসমান থেকে এক খন্ড (আযাব) তাদের উপর নিপতিত করব, অবশ্যই তাতে রয়েছে প্রত্যেক বান্দার জন্য নিদর্শন। কোরআন ৩৪:৯
- তারা বলল, **'তুমি কেবল আমাদের মত একজন মানুষ। আর আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি'। 'অতএব, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আসমান থেকে এক টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও'**।
- কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রাসূলের উচিৎ নয়। কোরআন ৪০:৭৮
- আর তাদের উপর যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, শুনলাম তো। যদি আমরা চাই, তাহলে এর অনুরূপ আমরাও বলতে পারি। এতো পিতৃ-পুরুষদের কল্প-কাহিনী ছাড়া কিছু না। তারা বলে, 'হে আল্লাহ, যদি এটি সত্য হয় আপনার পক্ষ থেকে তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিয়ে আসুন'।
আর আল্লাহ এমন নন যে, তাদেরকে আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে, তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে আযাব দানকারী নন এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে ! কোরআন ৮:৩১-৩৩

সাফা পাহাড়কে সোনার পাহাড়ে পরিণত করা

নবী মুহাম্মদকে মক্কার কাফেরগণ চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল, সাফা পাহাড়কে তাদের চোখের সামনে সোনার পাহাড় করে দেখাতে পারলে মুহাম্মদের নব্যুয়ত্যে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। তারা মুসা নবীর মোজেজার মত একটি মোজেজা দেখাবার দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ সেই কাজটি করে দেখাতে পারেননি। বরঞ্চ নির্লজ্জ চাপাবাজির মাধ্যমে নিজের পিঠ রক্ষা করেছিল। আসুন ঘটনাটি পড়ে দেখি,

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে জারীর এবং বাগবী বর্ণনা করেছেন, (কালাবী সূত্রেও বাগবী এ রকম লিখেছেন)— একবার কুরায়েশ নেতারা রসুল স.কে উদ্দেশ্য করে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি বলে থাকো মুসার হাতে ছিলো একটি লাঠি। ওই লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করলে তা থেকে বেরিয়ে আসতো বারোটি পানির প্রস্রবণ। আরো বললো, ঈসা মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। এ কথাও তুমি বলে থাকো যে, সালেহ্ তার সম্প্রদায়ের জন্য পাথরের মধ্য থেকে একটি উট বের করে দিয়েছিলেন। তুমিও এ রকম একটি মোজেজা দেখাও। যদি দেখাতে পারো তবে আমরা তোমাকে সত্য বলে মেনে নেবো। রসুল স. বললেন, কী মোজেজা দেখতে চাও তোমরা? কুরায়েশেরা বললো, এই সাফা পাহাড়টিকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে সোনার পাহাড়ে পরিণত করে দাও। বাগবীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, অবিশ্বাসীরা তখন এ কথাও বলেছিলো, আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিকে জীবিত করে দেখাও— যেনো আমরা তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারি যে, তুমি যা বলছো তা সত্য। অথবা ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে এসো— যেনো তারা তোমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

ইবনে জারীর ও বাগবী কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. তখন বললেন, তোমাদের আবেদন যদি আমি বাস্তবায়ন করি, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা সমস্বরে বললো, আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি এ রকম করতে

↥

পারো, তবে আমরা সকলেই তোমার অনুসারী হয়ে যাবো। সাহাবীগণও বললেন, তাদের আবেদন পূর্ণ করা হোক। তাহলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। রসুল স. দোয়া করার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো সাফা পাহাড়কে সোনার পাহাড়ে পরিণত করার জন্য তিনি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। অকস্মাৎ সেখানে আবির্ভূত হলেন হজরত জিব্রাইল। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল!। আপনি প্রার্থনা করলে সাফা পাহাড় সোনার পাহাড় হয়ে যাবে। কিন্তু এরপরেও আবেদনকারী জনতা যদি ইমান না আনে, তবে তাদের প্রতি আপতিত হবে আল্লাহ্র গজব। সুতরাং আপনি ক্ষান্ত হন। তাদের আবেদনে সাড়া দেবেন না। এতে করে যারা প্রকৃতই সত্যান্বেষী তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য তওবা করবে। আর যারা তা নয়— তারা পূর্ববৎ অবিশ্বাসে নিমগ্ন থাকবে। রসুল স. বললেন, আমি চাই তাদেরকে ইমান গ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক— যাতে করে তারা আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং যারা তওবা করতে চায় তারা যেনো তওবার পথে এগিয়ে আসে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

তাফসীরে মাযহারী/২৮১

এই ভন্ড নবীকে জন্ম দেয়া তার পিতামাতা তার ধর্মের মতে আজীবন নরকবাসী ! চিন্তা করা যায় কত বড় কুলাঙ্গার হিলে এই কথা বলতে পারে ! যেই বাপমা না থাকলে তার পৃথিবীর আলোই দেখা হতোনা, সে তার নিজের বানানো ধর্মেমতে স্বর্গের সবচেয়ে আরামায়েশে থাকবে, ডজনডজন নারী নিয়ে মোজমাস্তি,ফূর্তি করবে আর সেই সময় তার জন্মদাতা বাপ-মা নরকে পুড়তে থাকবে !

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) পরিচ্ছদঃ কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জাহান্নামী; সে কোন শাফায়াত পাবে না
৩৯৪। **রাসূলুল্লাহ সা বলেন- আমার পিতা জাহান্নামে আছে**।

সূনান নাসাঈ (ইফাঃ) পরিচ্ছদঃ মুশরিকের কবর যিয়ারত করা
২০৩৮। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা তার মায়ের কবর যিয়ারত করার সময় বললেনঃ আমি আম্মার মাগফিরাতের অনুমতি চাইলাম কিন্তু আমাকে তার অনুমতি প্রদান করা হল না।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
২৪৫৬। আনসারী আবূ শুয়াইব (রা) নাবী সা -এর চেহারায় ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। কাজেই তিনি তাঁকে দাওয়াত করলেন।

- **নবী মুহাম্মদের হস্তক্ষেপে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল**= https://drive.google.com/file/d/1-KzmFUeReMg45DKE42oR-TEjFbyl4Bzw/view?usp=drivesdk

- **♦♦ নবী মুহাম্মদের জীবনে যেসকল ননমাহরাম নারী বৈবাহিক ও অবৈবাহিক উপায়ে সম্পর্কিত ছিল** = https://drive.google.com/file/d/1-BUoHXhcsF9WJHR7O1PIhp1NVqO9CWFp/view?usp=drivesdk

কুরআন, হাদীস নবী কখন,কীভাবে নাযিল করত ?

১১২ মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ সা উটের উপর আরোহণ করে ভাষণ দিলেনঃ এখন থেকে মক্কার কোন কাঁটা কিংবা গাছ কাটা যাবে না। তারপর আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হতে ইযখির (এক প্রকার লম্বা ঘাষ) **বাদ দিন। কারণ তা আমরা আমাদের গৃহে ও কবরে কাজে লাগাই**। নবী সা বললেন- 'ইযখির ব্যতীত, ইযখির ব্যতীত।'

৪৩১৩ কেননা ইয্খির ঘাস আমাদের কর্মকার ও বাড়ির ছাউনির কাজে লাগে। তখন রাসূলুল্লাহ সা চুপ থাকলেন। এর কিছুক্ষণ পরে বললেন, ইয্খির ব্যতীত। ইয্খির ঘাস কাটা অনুমোদিত।

সহীহ বুখারী (ইফাঃ)

৪৪২৭। উমর (রা) বলেন, "আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে ভাল ও মন্দ লোক আসে। আপনি যদি আপনাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে পর্দার আদেশ দিতেন তবে ভাল হত। তারপর আল্লাহ পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

৪৭৯৫ সাওদা(রা.) এমন স্থূল শরীরের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত লোকদের থেকে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে পারতেন না। উমার (রা.) তাঁকে দেখে বললেন, হে সাওদাহ! জেনে রাখ, **আল্লাহর কসম! আমাদের নযর থেকে গোপন থাকতে পারবে না। এখন দেখ তো, কীভাবে বাইরে যাবে?**

সাওদাহ (রা.) ফিরে আসলেন। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সা ঘরে রাতের খানা খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল টুকরা হাড়। সাওদাহ (রা.) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। তখন উমার (রা.) আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। আয়িশাহ (রা.) বলেন, এ সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিকট ওয়াহী অবতীর্ণ করেন। ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হল, হাড় টুকরা তখনও তাঁর হাতেই ছিল, তিনি তা রেখে দেননি।

৬২৪০ উমার ইবনু খাত্তাব নবী সা -এর নিকট প্রায়ই বলতেন যে, আপনি আপনার স্ত্রীদের পর্দা করান। কিন্তু তিনি তা করেননি। নবী সা-এর স্ত্রীগণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রাতে মাঠের দিকে বাইরে যেতেন। একবার সাওদাহ বিন্ত যামআহ বেরিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। তাই তিনি পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হবার আগ্রহে বললেনঃ ওহে সাওদাহ! আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। তখন আল্লাহ তাআলা পর্দার আয়াত নাযিল করলেন।

১৪৬ আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত, **রাসূল সা এর স্ত্রীগণ রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে- খোলা ময়দানে যেতেন**। আর উমার (রা) রাসূল সা কে বলতেন, 'আপনার স্ত্রীগণকে পর্দায় রাখুন।' কিন্তু রাসূল সা তখনও তা করেননি। **এক রাতে রাসূল সা এর স্ত্রী সওদাহ (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হন। তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী। উমার (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, 'হে সওদা! আমি কিন্তু তোমাকে চিনে ফেলেছি।' যেন পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হয় সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এ কথা বলেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা পর্দার হুকুম অবতীর্ণ করেন।**

১৬৯ আয়িশাহ (রা.) বলেনঃ একবার ফজরের সময় হল, তখন পানি অনুসন্ধান করা হল; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তায়াম্মুম এর আয়াত অবতীর্ণ হল।

৪৫৯২,৯৩,৯৪ যখন لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতটি অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ সা- যায়দ (রা.)কে ডাকলেন। তিনি তা লিখে নিলেন। ইবনু উম্মু মাকতুম (রা.) তাঁর অক্ষমতার ওযর পেশ করলেন, আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেনঃ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ "অক্ষম ব্যক্তিরা ব্যতীত" -(সূরা নিসা ৪/৯৫)।

৪৭৮৮ আয়িশাহ (রা.) বলেন, যেসব মহিলা রাসূলুল্লাহ সা এর কাছে নিজেকে হেবাস্বরূপ সমর্পণ করে দেন, **তাদের আমি ঘৃণা করতাম। আমি মনে মনে বলতাম, মহিলারা কি করে নিজেকে সমর্পণ(হেবা) করতে পারে**? এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ ''আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হতে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।'' তখন আমি বললাম, আমি দেখি যে, আপনি যা ইচ্ছা করেন আপনার রব, তা-ই শীঘ্র পূর্ণ করে দেন!

[কোন বিনিময় ব্যতীত স্বেচ্ছায় অন্য মুসলিমকে নিজের কোনো সম্পত্তির মালিক বানিয়ে দেয়াই হচ্ছে হেবা]

স্ত্রীমিলন সমভূমিকা পালন করে। তবে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত অন্যদের বেলায় কার্যকর। যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করে তবে তাহার সহিত মিলন ঘটিলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মোহর আদায় করা ওয়াজিব ছিল না। কারণ মোহর, সাক্ষী ও অলী ছাড়াই তাহার জন্য বিবাহ করা জায়েয ছিল। হযরত যায়নার (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের ঘটনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। হযরত কাতাদা (র) خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাড়া অন্য কোন পুরুষের জন্য কোন মহিলা নিজকে সমর্পণ করিলেও মোহর ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না। ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য জায়েয। قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ তাহাদের পত্নিগণের ও তাহাদের বাঁদীগণ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছি উহা আমি জানি। উবাই ইব্‌ন কা'ব মুজাহিদ, হাসান কাতাদাহ ও ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল চারজন আযাদ মহিলা পর্যন্ত বিবাহ সীমিত থাকা এবং বাঁদী রাখার ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকা, অলী, মোহর ও সাক্ষীর শর্ত হওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ইহার কোনটাকেই ওয়াজিব করা হয় নাই। لِكَىْ لاَيَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ যাহাতে তোমার উপর [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর] কোন অসুবিধা না হয়। وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

৫১. তুমি তাহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাহাকে দূরে রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই বিধান এই জন্য যে, ইহাতে উহাদিগের তুষ্টি সহজতর হইবে এবং উহারা দুঃখ পাইবে না এবং উহাদিগকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদিগের প্রত্যেকেই প্রীত থাকিবে। তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশ্‌র (র)... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। যে সকল মহিলা নিজ সত্তাকে সমর্পণ করিত তাহাদের উপর তাহার গায়রত হইত। তিনি বলিতেন, মোহর ব্যতীত এইভাবে নিজকে সমর্পণ করিতে কি লজ্জা হয় না? তখন নাযিল হইল تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ইহা নাযিল হইবার পর হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, আপনার প্রতিপালক দ্রুত আপনার চাহিদা মুতাবিক হুকুম নাযিল করেন, পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি আবূ উসামাহ হইতে, তিনি হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব সত্তা সমর্পণকারিণী মহিলাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা দূরে রাখিতে পার। وَتُؤْوِىْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার। তবে যাহাকে দূরে রাখিবে উহাতে তোমার ইখতিয়ার থাকিবে ইচ্ছা হইলে পরে তাহাকে গ্রহণও করিতে পারিবে। অতএব ইরশাদ হইয়াছে وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ যাহাকে তুমি দূরে রাখিয়াছ তাহাকে তুমি কামনা করিলে উহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। আমের শাবী تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে আসিয়া নিজকে মোহর ব্যতীত সমর্পণ করিলে তিনি তাহাদের কতকের সহিত মিলিত হইলেন এবং কতককে দূরে রাখিলেন। তাহাদের সহিত তাহার বিবাহ সংঘটিত হয় নাই। উম্মে শরীক তাহাদেরই একজন।

↥

আর যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য নির্দিষ্ট রাত্রকে অগ্রবর্তী কর। যাহাকে ইচ্ছা তাহার সহিত মিলিত হও আর কাহারও সহিত মিলনের ইচ্ছা না হইলে মিলিও না। ইব্ন

বাগবী লিখেছেন, যাঁরা স্বতঃপ্রণোদিতা হয়ে রসুল স. এর জীবনসঙ্গিনী হবার অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন হজরত খাওলা বিনতে হাকীম। তাঁর সম্পর্কে জননী আয়েশা বলেছেন, তার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম একজন নারী কীভাবে এরকম সম্ভ্রমবিবর্জিতা হয়? কিন্তু যখন অবতীর্ণ হলো 'তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো' তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্ তো দেখছি আপনার কোনো বাসনাই অপূর্ণ রাখেন না।

তাফসীরে মাযহারী/৫৩৮

৫১১৩ যে সব মহিলা নিজেদেরকে নবী সা-এর নিকট সমর্পণ করেছিলেন, খাওলা বিনতে হাকীম তাদের একজন ছিলেন। **আয়িশাহ (রা.) বলেন, মহিলাদের কি লজ্জা হয় না যে, নিজেদেরকে পুরুষের কাছে হেবা (সমর্পণ) করছে?!** কিন্তু যখন কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হল- ''হে মুহাম্মাদ! তোমাকে অধিকার দেয়া হল যে, নিজ স্ত্রীগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে আলাদা রাখতে পার..।''(আহযাবঃ ৫১) 'আয়িশাহ (রা.) বলেন, হে নবী! আমার মনে হয়, আপনার রব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিচ্ছেন !

আল কোরআন ৩৩/৫০ – "হে নবী (সা.)! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে যাদের মোহরানা তুমি প্রদান করেছ; আর বৈধ করেছি আল্লাহ **ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ কাফিরদের সম্পদ)** হিসেবে **তোমাকে যা দান করেছেন তার মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে** তাদেরকে,............। **কোন মুমিন নারী যদি নবীর জন্য নিজকে হেবা করে, নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও তার জন্য বৈধ। এটা বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়।** আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। **[নবী সা এর সাথে উম্মে হাবীবা (রা) এর বিয়ের মোহরানা বাদশাহ নাজাশী আদায় করেছিলেন। আর এক্ষেত্রে ফায় হিসাবে রায়হানা ও মারিয়া কিবত্বিয়া এদুজন ক্রীতদাসী হিসাবেই নবী সা ভোগ করেছিলেন যাদেরকে তিনি বিয়ে করেননি।**

তাফসীর ইবনে আব্বাস, তৃতীয় খণ্ড

৭০ তাফসীরে ইব্ন আব্বাস

বিয়ে করা যাবে, মাহ্র দিতে হবে ইত্যাদি এবং তাদের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যে, ওদেরকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় তা সীমিত থাকবে না (لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয় আল্লাহ্ তোমার জন্যে যা হালাল করেছেন, তা উপভোগে কোন দোষ কিংবা সংকট না হয় (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল তোমার কর্মের ব্যাপারে, পরম দয়ালু যে, তোমার জন্যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছেন।
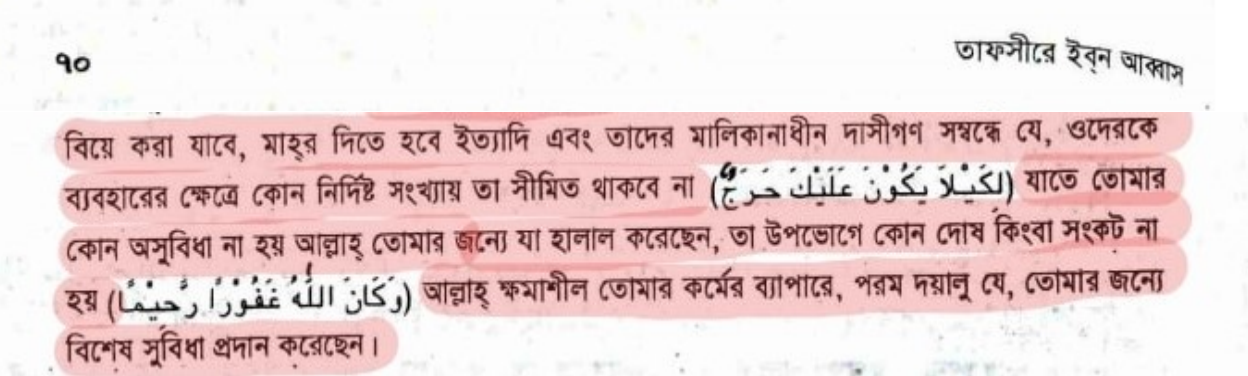
সূরাঃ আল-আহযাব, আয়াতঃ ৫০। তাফসীরে আহসানুল বায়ান

[1] শরীয়তে কিছু আহকাম নবী (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট, যেগুলিকে নবী (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য বলা হয়। যেমন কিছু বিশেষত্বের বর্ণনা কুরআন কারীমের এই স্থানে করা হয়েছে, যা বিবাহ সম্পর্কিত। যে সকল স্ত্রীদের নবী (সাঃ) মোহর আদায় করে দিয়েছেন **তাঁরা হালাল তাতে তাঁরা সংখ্যায় যতই হন না কেন**। তিনি সাফিয়্যা (রাঃ) ও জুওয়াইরিয়া (রাঃ) -কে স্বাধীন করাকেই তাঁদের মোহর ধার্য করেছিলেন।

[2] সুতরাং সাফিয়্যা (রাঃ) ও জুওয়াইরিয়া (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর মালিকানায় এলে তিনি তাঁদেরকে মুক্ত করে বিবাহ করেছিলেন এবং **রায়হানা ও মারিয়া কিবত্বিয়া ক্রীতদাসী হিসাবেই নবী সা-এর নিকট ছিলেন।**

[3] **নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট যদি কোন মহিলা নিজেকে নিবেদন করে এবং তিনি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে দেনমোহর ছাড়াই তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা তাঁর জন্য হালাল।**

[4] উপরোক্ত বিধান শুধু নবী (সাঃ)-এর জন্য। অন্য মু'মিনদের জন্য আবশ্যিক যে, সে (রীতিমতো) মোহর আদায় করবে, তবেই বিবাহ বৈধ হবে।

[5] অর্থাৎ, বিবাহ বন্ধনের যে শর্ত ও অধিকারসমূহ যা আমি ফরয করেছি; যেমনঃ কেউ **একই সঙ্গে** চারের অধিক স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে রাখতে পারে না। তবে **ক্রীতদাসী হলে যতজন ইচ্ছা রাখতে পারা যায়**।

তাফসীর ইবনে কাসীর থেকেও জানা যায়, **মারিয়া আসলে ছিলেন যুদ্ধবন্দী নারী। তাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা হয়েছিল, পরে তাকে নবী সা এর কাছে উপহার হিসেবে পাঠানো হয়**।

সূরা আহ্যাব ১৩১

وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ আর আল্লাহ্ যাহাদিগকে ফায় হিসেবে দান করিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে। অর্থাৎ গনীমতের মাল হইতে যে সকল মহিলার তুমি মালিক হইয়াছ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকেও তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সূত্রে হযরত সফীয়্যাহ ও জুওয়ায়রিরাহ (র)-এর মালিক হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাহাদিগকে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন। অনুরূপভাবে তিনি হযরত রায়হানাহ বিনতে সামউন নাযরীয়াহ ও হযরত ইব্রাহীম (র)-এর আম্মা হযরত মারিয়াহ কিবতিয়্যাহ এর মালিক হইয়াছিলেন। উভয়ই যুদ্ধ বন্দিনী ছিলেন।

৪৮৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

বায়হাকী (র) বলেন, হাকিম (র)....শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কয়েকজন নারী নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে 'হিবা' রূপে সমর্পিত করেছিলেন। তাদের কতকের সংগে তিনি নিভৃত বাস করেছিলেন

৪৮৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

হাবশা সম্রাট নাজাসী নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে উম্মু হাবীবা (রা)-কে চারশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) মহররূপে দিয়েছিলেন এবং শুরাহ্বীল ইব্‌ন হাসানা-র সংগে তাঁকে (মদীনায়)

৩০৮ সীরাতুল মুস্তাফা (সা)

১. হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)

হযরত মারিয়া (রা) দাসী ছিলেন। মহানবী (সা)-এর ছেলে হযরত ইব্‌রাহীম তাঁর উদর থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইসকান্দারিয়ার রাজা মুকাওকাশ হাদিয়া স্বরূপ মহানবী (সা)-কে হযরত মারিয়াকে দান করেছিলেন। তিনি হিজরী ১৬ সনে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। 'জান্নাতুল বাকী' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

২. হযরত রায়হানা বিনতে শামউন (রা)

হযরত রায়হানা বনী নযীর অথবা বনী কুরায়যা গোত্রের ছিলেন। যুদ্ধবন্দীনী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা) দরবারে উপস্থিত হন এবং দাসী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংসারে ছিলেন। ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের পর ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

↥

The Events of the Year 5 39

Then the Messenger of God sent Sa'd b. Zayd al-Anṣārī [a member of the Banū 'Abd al-Ashhal] with some of the captives from the Banū Qurayẓah to Najd, and in exchange for them he purchased horses and arms. The Messenger of God selected for himself from their women Rayḥānah bt. 'Amr b. Khunāfah, a woman from the Banū 'Amr b. Qurayẓah, and she remained his concubine; when he predeceased her, she was still in his possession.[170] The Messenger of God offered to marry her and impose the curtain (*ḥijāb*) on her, but she said, "Messenger of God, rather leave me in your possession [as a concubine], for it is easier for me and for you." So he did

The History of Al Tabari, page 141

An Account of the Messenger of God's Slave Concubines

They were Māriyah bt. Sham'ūn, the Copt, and Rayḥānah bt. Zayd al-Quraẓiyyah, who, it is said, was of the Banū al-Naḍīr. An account of them has been given above. [1778]

935. Ibn Sa'd, *Ṭabaqāt*, VIII, 106–7, 113–14, mentions Mulaykah bt. Ka'b al-Laythī, Bint Jundub, and Sabā bt. al-Ṣalt among the women whom the Prophet married but did not consummate the marriage and then divorced them. Khawlah bt. Ḥakīm and Amāmah bt. Ḥamzah were among the women to whom the Prophet proposed but did not marry.

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪৯৭

নবী করীম (সা)-এর বাঁদীগণের বিবরণ

নবী করীম (সা)-এর বাঁদী ছিলেন দু'জন। তাদের একজন মারিয়া বিনত শাম'উন কিবতী (মিশরী)। আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা জুবায়জ ইব্‌ন মীনা নবী করীম (সা)-এর সকাশে তাঁকে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। উপহার সামগ্রীর মধ্যে তার সংগে আরো ছিলেন তাঁর বোন শীরীন। আবূ নু'আয়ম (র) উল্লেখ করেন, উপহার প্রদত্ত চারটি বাঁদীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতমা। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আর ছিল একটি খোজা গোলাম, যার নাম ছিল মাবূর এবং 'দুলদুল' নামের একটি খচ্চর। নবী করীম (সা) তার এ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য মারিয়াকে বেছে নেন।

বর্ণনাকারী বলেন, মারিয়া ছিলেন সুন্দরী ও গৌরবর্ণ। তার সৌন্দর্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মুগ্ধ হন।

বুরায়দা ইব্‌নুল হুসায়ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিবতী শাসক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য দুই তরুণী বোনকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। তাদের সংগে ছিল একটি খচ্চর। তিনি মদীনায় এ খচ্চরটিতে আরোহণ করতেন। দুই তরুণীর একজনকে তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করলেন এবং তিনিই তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের গর্ভধারিনী। অন্যজনকে তিনি হেবা করে দিলেন।

আবূ সা'সা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মারিয়া কিবতিয়াকে অত্যন্ত পসন্দ করতেন। তিনি ছিলেন সুন্দরী ও মনোহর কোঁকড়ানো কেশধারিণী।

আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুকাওকিস নামে অভিহিত জনৈক সেনাপতি ও রাজা মারিয়া নাম্নী এক কুমারী কিবতী রাজকন্যাকে উপহার পাঠালেন এবং তাঁর সংগে তাঁর এক যুবা বয়সী চাচাত ভাইকেও উপহারের অন্তর্ভুক্ত করে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সংগে নিভৃত বাসে মিলিত হতেন। একদিন গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, তিনি (ইবরাহীমকে) গর্ভে ধারণ করেছেন। আইশা (রা) বলেন, তাঁর গর্ভ দৃশ্যমান হয়ে উঠল। সে তাতে অস্থির হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সা) নিরবতা অবলম্বন করলেন। পরে তার স্তনে দুধ হচ্ছিল না। তখন তার জন্য একটি দুধেল মেষ খরিদ করা হল। যা দিয়ে শিশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা হত। তাতে তার দেহ সুগঠিত হল এবং বর্ণও সুন্দর ও সুশ্রী হল। একদিন সে সন্তানটিকে কাঁধে করে নবী করীম (সা)-এর নিকট নিয়ে এল। নবী করীম (সা) বললেন, يا عائشة كيف ترين الشبه আইশা চেহারার সাদৃশ্যতা দেখে কেমন মনে হচ্ছে ?' তখন আমি এবং অন্যরা বললাম, 'বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখছি না।' তিনি বললেন, ولا اللحم আর দেহ ও গোশতের ব্যাপারটিও নয় ? আমি বললাম, আমার জীবনের দোহাই! মেষের দুধে প্রতিপালিত হলে তার গোশত তো সুন্দর হবেই।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫০৭

হাফিয আবূ বকর আল বাযযার (র) রিওয়ায়াত করেন। মুহাম্মদ ইবন মিসকীন (র)....
আমাস (রা) থেকে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হলে তার
ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর মনে কিছু দ্বিধার উদ্রেক হল। তখন জিবরীল (আ) তাঁর নিকট

৫০২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

করীম (সা)-এর ওফাতের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আবূ উবায়দা মা'মার ইবনুল মুছান্না (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চার জন বাঁদী ছিলেন মারিয়া, কিবতিয়া, রায়হানা কুরাজী, আর একজন বাঁদী ছিলেন জমীলা সুন্দরী। নবী সহধর্মিণীগণ তার বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করলেন। তাঁদের আশংকা ছিল যে, নবী করীম (সা)-এর উপর তিনি তাদের তুলনায় প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবেন এবং অন্য জন বাঁদী নফীসা -যাঁকে যায়নাব (রা) তাঁকে হিবা করেছিলেন। (ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে) নবী করীম (সা) সফিয়্যা বিনত হুয়ায় (রা)-এর কারণে যায়নাব (রা)-কে পরিত্যাগ করে রেখেছিলেন-যিলহজ্জ, মুহাররম ও সফর মাস। তার ওফাতের মাস রাবীউল আউয়াল শুরু হলে তিনি যায়নাব (রা) বললেন, আমি ভেবে স্থির করতে পারছি না যে আপনাকে কি প্রতিদান দেব ? পরে এ বাঁদীটিকে নবী করীম (সা)-কে হিবা করলেন।

৪৮৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

মুরায়সী যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সা) খুযাআ-র শাখা গোত্রের জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস। ইবন আবূ যিরার ইবনুল হারিছ ইবন আয়িয ইবন মালিক ইবনুল মুস্তালিক (রা)-কে যুদ্ধ বন্দীরূপে প্রাপ্ত হন এবং পরে তাকে আযাদ করে নিয়ে স্ত্রীরূপে বরণ করেন

alifta.net ফাতওয়া নং ৫৮৪৮। মারিয়া আল কিবতিয়ার বিষয়ে ফাতওয়া ও উত্তর

প্রশ্নঃ মারিয়া আল কিবতিয়া কি নবির স্ত্রী ছিলেন? এবং সেই হিসাবে উনি কি উম্মুল মুমিনিন (মুমিনদের মাতা) ?

উত্তরঃ মারিয়া আল কিবতিয়াকে নবী সা মিশরের শাসনকর্তা আল মুয়াকিস থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন, উনাকে নবির পত্নী বা উম্মুল মুমিনিন হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না। **মারিয়া আল কিবতিয়া যুদ্ধবন্দিনী ছিলেন যা নবির ডান হস্তের অধিগত ছিল (কাজেই বিবাহ ছাড়াই উনি নবির জন্য হালাল ছিলেন)**। উনি ইব্রাহিম নামে নবির ঔরসজাত সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, সেই কারনে উম্ম ওয়ালাদ (সন্তানের মাতা) উপাধি পেয়েছিলেন।

Was Mariyah al-Qibtiyyah one of the Mothers of the Believers? - Islam Question & Answer (islamqa.info)

The Prophet (S) DID NOT MARRY MARIYAH AL-QIBTIYYAH given to him by al-Muqawqis, the ruler of Egypt. That took place after the treaty of al-Hudaybiyah. Mariyah al-Qibtiyyah was a Christian.

Al-Isti'aab, 4/ 1912:

Mariyah WAS ONE OF THE PROPHET'S CONCUBINES, NOT ONE OF HIS WIVES.

Ibn al-Qayyim said:

Abu 'Ubaydah (R) said: Prophet (S) HAD FOUR CONCUBINES: MARIYAH, Rayhaanah; another beautiful slave woman whom he acquired as a prisoner of war; and a slave woman who was given to him by Zaynab bint Jahsh.

Ar-Rahikul-Makhtum,

3. A Letter to Chosroes, Emperor of Persia

"In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful.

From Muhammad, the Messenger of Allâh to Chosroes, king of Persia.

Peace be upon him who follows true guidance, believes in Allâh and His Messenger and testifies that there is no god but Allâh Alone with no associate, and that Muhammad is His slave and Messenger. I invite you to accept the religion of Allâh. I am the Messenger of Allâh sent to all people in order that I may infuse fear of Allâh in every living person, and that the charge may be proved against those who reject the Truth. Accept Islam as your religion so that you may live in security, otherwise, you will be responsible for all the sins of the Magians."

Muqawqas meditated over the contents of the letter deeply and He took the parchment and ordered that it be kept in an ivory casket. He called a scribe to write the following reply in Arabic:

From Muqawqas to Muhammad bin 'Abdullah.

Peace be upon you. I have read your letter and understood its contents, and what you are calling for. I already know that the coming of a Prophet is still due, but I used to believe he would be born in Syria. I am sending you as presents two maids, who come from noble Coptic families; clothing and a steed for riding on. Peace be upon you."

It is noteworthy that Muqawqas did not avail himself of this priceless opportunity and he did not embrace Islam. The presents were accepted; Maria, the first maid, stayed with the Prophet **[pbuh]**, and gave birth to his son Ibrahîm; the other Sirin, was given to Hassan bin Thabit Al-Ansari.

ড. আবু বকর যাকারিয়া সাহেবের মিথ্যাচার!

বাংলাদেশের প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার ড. আবু বকর যাকারিয়া সাহেব প্রকাশ্যে একটি মিথ্যাচার করেছেন। একটি প্রশ্নোত্তরে(নাস্তিকদের প্রশ্নোত্তরে আবু বকর জাকারিয়া) যাকারিয়া বলেছেন, মিশর থেকে নাকি উপহার হিসেবে দাসী মারিয়া কিবতিয়াকে বিবাহ দিয়েই হযরত মুহাম্মদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তার রেফারেন্স কী? কোন সহিহ হাদিসে তা বলা হয়েছে? যেখানে সুনানু নাসাই শরীফে (ইফাঃ৩৯৬১, উপরে দেয়া আছে) পরিষ্কার তাহক্বীককৃত সহিহ হাদিস রয়েছে যে, মুহাম্মদ তার বাঁদীর সাথে সহবাস করতেন। জাকারিয়া সাহেব কী সহিহ হাদিস নিয়ে লজ্জিত? মডারেট মূর্খ মুসলমানদের কাছে নবী মুহাম্মদের চরিত্র বাঁচাতে সহিহ হাদিস এড়িয়ে যেয়ে অসৎ মনগড়া মিথ্যাচার এটাই প্রমাণ করে, তিনি নবী মুহাম্মদের চরিত্র নিয়ে শরমিন্দা।

দাসী মারিয়া এবং শীরীন নামক দুইজনকে একত্রে উপহার হিসেবে নবী মুহাম্মদের জন্য পাঠানো হয়েছিল। দাসী দুইজনকে পাওয়ার পরে নবী মুহাম্মদ সুন্দরী মারিয়াকে নিজের জন্য রাখেন, আর শীরীনকে দিয়ে দেন সাহাবী হাসসান ইবনে ছাবিতকে। জাকারিয়া সাহেবের বক্তব্য হিসেবে দুইজনকেই মুহাম্মদের সাথে বিবাহ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। কারণ আলেক্সান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা দুইজনকেই মুহাম্মদের জন্যেই পাঠিয়েছিলেন। মুহাম্মদের সাথে বিবাহ দিয়েই যদি পাঠানো হয়ে থাকে, নবী মুহাম্মদ কি তাহলে নিজ স্ত্রী শীরীনকে তার অনুসারীকে ভোগ করতে দিয়েছিলেন? নবী মুহাম্মদ কী সাহাবীদের সাথে এভাবে স্ত্রী আদান প্রদান করে ভোগ করতেন?!

আমার দেওয়া সমস্ত রেফারেন্স, তথ্যউপাত্ত পর্যালোচনা করে এবং যাচাই বাছাই করে দেখার জন্য সকল পাঠককে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। যদি কোন রেফারেন্সে সমস্যা দেখেন, নিশ্চিন্তে তা উল্লেখ করতে পারেন। ইসলামের ইতিহাসে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য এবং পুরনো রেফারেন্সগুলোই এই পুরো পিডিএফটিতে যুক্ত করা হয়েছে।

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

৩২৭৮। ব্যাখ্যা:

নবী সা তার স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন করতেন। হাফসা (রাঃ)-এর পালার দিন এলে তিনি তার বাবার সাক্ষাৎে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, রাসূলুল্লাহ সা তাকে অনুমতি প্রদান করলেন তিনি বাপের বাড়ী চলে গেলেন। হাফসাহ্ (রাঃ) যখন চলে গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ সা মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। **মারিয়াহ কিবতিয়া (রা) আসলে তিনি তাকে হাফসাহ্ (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করালেন এবং তার সাথে মিলিত হলেন**। **ইতোমধ্যে হাফসা (রাঃ) যখন ফিরে এলেন, এসে দেখেন তার ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি অগত্যা দরজায় বসে রইলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সা ঘর্মাক্ত অবস্থায় ঘর থেকে বের হলেন- এ অবস্থা দেখে হাফসা (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন**। রাসূলুল্লাহ সা জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কাঁদছো কেন? উত্তরে হাফসা (রাঃ) বললেন, এজন্যই কি আপনি আমাকে বাপের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন? আমার পালার দিন, আমার বিছানায় একজন দাসীকে প্রবেশ করিয়েছেন? আপনি কি আমার মর্যাদা এবং আমার সম্মানের কথা ভাবেন না? আপনি স্ত্রীদের একজনের সাথে এই আচরণ করবেন?

রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, "তাকে কি আল্লাহ তাআলা আমার জন্য হালাল করে দেননি? **হে হাফসা, তুমি থামো! তাকে (মারিয়া কিবতিয়াকে) আমার জন্য হারাম করে নিলাম। আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই, তবে তুমি এ কথা স্ত্রীদের অন্য কাউকে বলো না**"।

তাফসীরে মাযহারী/৫৮৬

রসুল স. তাঁর পত্নীগণের জন্য পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। একবার জননী হাফসার পালা যখন পড়লো তখন তিনি রসুল স. এর কাছে পিতৃদর্শনের জন্য পিতৃগৃহে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি স. অনুমতি দিলেন। জননী হাফসা চলে গেলেন। রসুল স. তখন ওই ঘরেই ডেকে আনলেন জননী মারিয়াকে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে একান্তে মিলিত হলেন তিনি। ইত্যবসরে জননী হাফসা ফিরে এসে দেখলেন ঘর বন্ধ। সেখানেই বসে পড়লেন তিনি এবং কাঁদতে লাগলেন মনের কষ্টে। রসুল স. যখন

তাফসীরে মাযহারী/৫৮৭

বের হলেন তখন জননী হাফসাকে দেখতে পেয়ে বললেন, কী ব্যাপার! তুমি এখানে বসে কাঁদছো কেনো? জননী হাফসা বললেন, আপনি তাহলে এ উদ্দেশ্যেই আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন? আপনি আমার শয্যায় ক্রীতদাসীকে স্থান দিলেন। আমার পালার দিনে নৈকট্য দান করলেন তাঁকে। আপনার কাছে দেখছি আমার কোনো মূল্যই নেই। রসুল স. বললেন, তাকে কি আল্লাহ্ আমার জন্য হালাল করেননি? ঠিক আছে, আর কেঁদো না। তোমাকে খুশী করার জন্য আমি তাকে আমার জন্য হারাম করে নিলাম। তবে এ কথা তুমি কিন্তু তোমার সপত্নীদের কাউকে বোলো না। কিন্তু রসুল স. স্থান ত্যাগ করার পরেই জননী হাফসা জননী আয়েশার প্রকোষ্ঠে গেলেন। বললেন, শোনো একটি সুসংবাদ। রসুলুল্লাহ্ মারিয়াকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এখন আমরা আল্লাহর রসুলের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়া হবো। উল্লেখ্য জননী হাফসা ও জননী আয়েশার মধ্যে ছিলো গভীর অন্তরঙ্গতা। তাই তিনি জননী আয়েশাকে একথা না বলে পারলেন না।

যথাসূত্রে বাযযার বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর জনৈকা ক্রীতদাসী সম্পর্কে। ইবনে জাওজী তাঁর 'আত্তাহকীক' গ্রন্থে স্বসূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন,

তাফসীরে মাযহারী/৫৮৭

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর জনৈকা ক্রীতদাসী সম্পর্কে।

জননী আয়েশা এবং জননী হাফসার মধ্যে ছিলো গভীর সখ্য। একবার জননী হাফসা কোনো কর্মোপলক্ষে গেলেন বাপের বাড়িতে। ফিরে এসে দেখলেন তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি সেখানেই বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে ঘর থেকে জনৈকা ক্রীতদাসীকে চলে যেতে দেখে তিনি খুব দুঃখ পেলেন। প্রচণ্ড অভিমানের সঙ্গে রসুল স.কে বললেন, আমি তো দেখছি আপনি আমাকে জ্ঞান করেন ক্রীতদাসীতুল্য। তিনি স. বললেন, তুমি যদি প্রীতা হও, তবে আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলতে পারি। কথাটা কিন্তু তুমি আর কাউকে বোলো না। তিনি বললেন, কী? রসুল স. বললেন, আমি ওই ক্রীতদাসীটিকে আমার জন্য হারাম করে নিলাম। তুমি সাক্ষী থেকো। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

যথাসূত্রে হাকেম ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. এর এক বাঁদী ছিলো, যার সঙ্গে তিনি স. মাঝে মাঝে একান্তে মিলিত হতেন। জননী হাফসা তাঁর পিছনে লেগেই ছিলেন, যতক্ষণ না রসুল স. তাঁকে নিজের জন্য হারাম করে না নেন। 'আল মুখতার' গ্রন্থে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমার সহোদরা হাফসাকে বললেন, তুমি কাউকে যেনো বোলো না, আমি ইব্রাহিমের মাকে আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি। হাফসা কিন্তু পেটে কথা রাখতে পারেননি। বলে দিয়েছিলেন তাঁর সপত্নী আয়েশাকে। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। এ সকল হাদিসের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো জননী মারিয়া কিবতীয়াকে লক্ষ্য করে, যখন রসুল স. তাঁকে নিজের জন্য নিষিদ্ধা করে দিয়েছিলেন।

অতএব একথা মেনে নিতে আর কোনো বাধা নেই যে, জননী মারিয়ার ঘটনাটিই ছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রকৃত প্রেক্ষাপট।

সূনান নাসাঈ (ইফা)

৩৯৬১। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা এর কাছে একটি দাসী ছিল যার সাথে রাসূলুল্লাহ্ সা সহবাস করতেন। **এতে আয়েশা (রাঃ) এবং হাফসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সা এর সাথে লেগে থাকলেন**। পরিশেষে নবী সা সেই দাসীটিকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেনঃ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) "হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিয়েছেন (সূরা তাহরীমঃ ১)।

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, ষষ্ঠ খণ্ড [২৮ম পারা] ৬০৩

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ : সূরা আত-তাহরীম

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের স্ত্রীদের সাথে থাকার পালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন হযরত হাফসার দিন আসল, তিনি তাঁর মাতাপিতাকে দেখতে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন। হযরত হাফসা (রা.) চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসার ঘরে হযরত মারিয়াকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর সেখানে একাকিত্বে অবস্থান করলেন। ইতোমধ্যেই হযরত হাফছা চলে আসলে তাঁর ঘরে হযরত মারিয়াসহ রাসূল ﷺ-কে দেখতে পেলেন। এটা দেখে হযরত হাফসা (রা.) অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমার ঘরে আমার অনুপস্থিতিতে একে নিয়ে আসলেন এবং একাকিত্বে কাটালেন, এটা আমাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে নয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খুশি করার উদ্দেশ্যে বললেন, ঠিক আছে আমি আজ হতে তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলাম। এ সংবাদ তুমি অন্য কাউকেও দিও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর হতে বের হয়ে গেলে হযরত হাফসা এ সংবাদ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জানিয়ে দেন এবং গোপন কথাও ফাঁস করে দেন। এটা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে শপথ করলেন যে, আগামী এক মাস তিনি তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে প্রবেশ করবেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের হতে আলাদা থাকলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ আয়াতটি নাজিল করলেন। –[সাফওয়া, আসবাব, কুরতুবী, তাবারী, সাবী]

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, ষষ্ঠ খণ্ড [২৮ম পারা] ৬০৫

١. يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ج مِنْ أُمَّتِكَ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ لَمَّا وَاقَعَهَا فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ وَكَانَتْ غَائِبَةً فَجَاءَتْ وَشَقَّ عَلَيْهَا كَوْنُ ذٰلِكَ فِيْ بَيْتِهَا وَعَلٰى فِرَاشِهَا حَيْثُ قُلْتَ هِيَ حَرَامٌ عَلَيَّ تَبْتَغِيْ بِتَحْرِيْمِهَا مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ط أَيْ رِضَاهُنَّ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ غَفَرَلَكَ هٰذَا التَّحْرِيْمَ.

১. হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তাকে হারাম করছেন কেন? অর্থাৎ মারিয়া কিবতিয়াকে, যে আপনার জন্য বৈধ। হাফসা (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে আপনি তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছেন। আর সে যখন ফিরে এসে দেখল যে, এ সব কিছু তার আবাসগৃহে এবং তারই শয্যায় সংঘটিত হয়েছে। তার নিকট এটা বিরক্তিকর মনে হলো। তখন আপনি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেছেন, 'আমার জন্য সে অর্থাৎ মারিয়া হারাম আপনি কি চাচ্ছেন তাকে হারাম করার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি অর্থাৎ তাদের খুশি ও সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু আপনার এ হারাম করা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

নবী করীম ﷺ মধু নাকি মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে হারাম করেছেন? : এ প্রশ্নে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর দাসী মারিয়া কিবতিয়াকে তার জন্য হারাম করার প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাজিল করেছিলেন। –[তাফসীরে কাবীর]

তাসহীলে বলা হয়েছে, 'তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও?' এর অর্থ হলো দাসীকে নিজের জন্য হারাম করে হযরত হাফসার সন্তুষ্টি চাও। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা দাসী হারামকরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নাজিল হয়েছে। কারণ মধু হারামকরণ দ্বারা স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা করেননি। মধু হারাম করেছেন দুর্গন্ধের কথা শুনে। –[সাফওয়া]

তাফসীর ইবনে কাসীর

সূরাঃ তাহরীম ৬৬ [illegible] পারাঃ ২৮

তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীর ঘরে উম্মে ইবরাহীম (রাঃ)-এর সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন। তখন তাঁর ঐ স্ত্রী তাঁকে বলেনঃ "তোমার ঘরে ও আমার বিছানায় এ কাজ করবে?" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম।" তখন তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হালাল কিভাবে আপনার উপর হারাম হয়ে যাবে?" জবাবে তিনি বলেনঃ "আমি শপথ করছি যে, এখন হতে তার সাথে কোন প্রকারের কথাবার্তা বলবো না।" ঐ সময় এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

হযরত হাফসা (রাঃ)। উম্মে ইবরাহীম কিবতিয়্যাহ্ (রাঃ)-কে কেন্দ্র করেই ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে তাঁর পালার দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত মারিয়াহ্ কিবতিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হন। এতে হযরত হাফসা (রাঃ) দুঃখিতা হন যে, তাঁর পালার দিনে তাঁরই ঘরে ও তাঁরই বিছানায় তিনি মারিয়াহ্ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন! রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলে ফেলেনঃ "আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম। তুমি এই ঘটনা কারো কাছে বর্ণনা করো না।" এতদ্সত্ত্বেও হযরত হাফসা (রাঃ) ঘটনাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সামনে প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই খবর স্বীয় নবী (সঃ)-কে জানিয়ে দেন এবং এই আয়াতগুলো নাযিল করেন। নবী (সঃ) কাফ্ফারা আদায় করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন এবং ঐ দাসীর সঙ্গে মিলিত হন। এই ঘটনাটিকে

সূরাঃ তাহ্রীম ৬৬ ৫৬৭ পারাঃ ২৮

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে ছিলেন। যখন হাফসা (রাঃ) দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মারিয়াহ (রাঃ)-এর সাথে মশগুল রয়েছেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেনঃ "তুমি এ খবর হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জানাবে না। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। তা এই যে, আমার ইন্তেকালের পর আমার খিলাফত হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পর তোমার আব্বা লাভ করবেন।" কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) এ খবর হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জানিয়ে দেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন বলেনঃ "আমি আপনার দিকে তাকাবো না যে পর্যন্ত না আপনি মারিয়াহ (রাঃ)-কে আপনার উপর হারাম করবেন।" তখন তিনি হযরত মারিয়াহ (রাঃ)-কে নিজের উপর হারাম করেন। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ... -এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।"[১]

তাফসির ইবনে কাসীর, সূরা তাহরীমঃ হযরত হাফসা (রা)-এর ঘরে, তাঁর পালার দিনে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)এর সাথে মিলিত হন। এতে হযরত হাফসা (রা) দুঃখিতা হন যে, তাঁর পালার দিনে তাঁরই ঘরে ও তাঁরই বিছানায় তিনি মারিয়া (রা)এর সাথে মিলিত হলেন! রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হাফসা (রা)কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলে ফেলেনঃ "আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম। তুমি এই ঘটনা কারো কাছে বর্ণনা করো না।" এতদসত্ত্বেও হযরত হাফসা (রাঃ) ঘটনাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সামনে প্রকাশ করে দেন। **তখন** আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতগুলো নাযিল করেন। **নবী (স) কাফফারা আদায় করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন এবং ঐ দাসীর সঙ্গে মিলিত হন**।

সূরাঃ তাহ্রীম ৬৬ ৫৫৮ পারাঃ ২৮

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "এ দু'জন স্ত্রী কে ছিলেন?" উত্তরে হযরত উমার বলেনঃ "তাঁরা হলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফসা (রাঃ)। উম্মে ইবরাহীম কিবতিয়্যাহ্ (রাঃ)-কে কেন্দ্র করেই ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ঘরে তাঁর পালার দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত মারিয়াহ্ কিবতিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হন। এতে হযরত হাফসা (রাঃ) দুঃখিতা হন যে, তাঁর পালার দিনে তাঁরই ঘরে ও তাঁরই বিছানায় তিনি মারিয়াহ্ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন! রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলে ফেলেনঃ "আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম। তুমি এই ঘটনা কারো কাছে বর্ণনা করো না।" এতদ্সত্ত্বেও হযরত হাফসা (রাঃ) ঘটনাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সামনে প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতগুলো নাযিল করেন। নবী (সঃ) কাফ্ফারা আদায় করে স্বীয় কসম ভেঙ্গে দেন এবং ঐ দাসীর সঙ্গে মিলিত হন।

↥

তাফসীরে মাযহারী/৫৯৩

পড়ে। সুতরাং আপনি তালাক প্রত্যাহার করুন। উল্লেখ্য, রসুল স. ওই সময় তাঁর সহধর্মিণীগণ থেকে এক মাস পৃথক থাকেন এবং অবস্থান গ্রহণ করেন ইব্রাহিম জননী মারিয়া কিবতিয়ার বসবাসস্থলে। তাঁর এমতো অবস্থা প্রলম্বিত হয়েছিলো 'আয়াতে তাখাইয়্যুর'

৪৯১৬ উমর (রা) বলেন, নবী সা-কে সতর্কতা দানের জন্য তাঁর সহধর্মিণীগণ একত্রিত হয়েছিলেন। **আমি(উমর) তাঁদেরকে বললাম, যদি নবী সা তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁর প্রতিপালক সম্ভবত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তারপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল- "যদি নবী তোমাদের সবাইকে তালাক দেন, তবে তাঁর রব অচিরেই তোমাদের পরিবর্তে সম্ভবত তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী তাঁকে দিবেন"।** ৪৪৮৩ উমর (রা) বলেন, আমি জানতে পেরেছিলাম যে, নবী সা তাঁর কতক স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন আমি তাদের কাছে উপস্থিত হই এবং বলি যে, আপনারা এর থেকে বিরত থাকুন নচেৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সা কে আপনাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ৪৪৮৩ উমর (রা) বলেন, একবার নবী সা এর সহধর্মিণীগণ অভিমান সহকারে একত্রে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন আমি তাঁদেরকে বললামঃ আল্লাহর রাসূল সা যদি তোমাদের তালাক দেন, তাহলে তাঁর রব তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উত্তম অনুগত স্ত্রী দান করবেন।

তাফসীর ইবনে কাসীরঃ
উমার (রাঃ) বলেনঃ "**রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে মর্যাদাবোধ জেগে উঠেছিল। আমি তখন তাদেরকে বললামঃ যদি নবী (সঃ) তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন তবে তার প্রতিপালক সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী**। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং আমার ভাষাতেই আল্লাহ পাক তা নাযিল করেন।"

সুনান ইবনু মাজাহ
২০১৬। উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সা হাফসা (রা) কে তালাক দেন, অতঃপর তাকে ফিরিয়ে নেন।

[[বিদ্রোহী স্ত্রীদের খুশি করা আয়াত
অতঃপর আর কোন নারী তোমার জন্য বৈধ নয়। আর তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কোরআনঃ সূরা আহজাব, আয়াত ৫২
নবীর লাম্পট্যে ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত স্ত্রীগণকে খুশী করতে নিজে একটি আয়াত নাজিল করে, যেটি নবী নিজেকে আল্লাহ হিসেবে বক্তব্য দিয়ে আর বিয়ে শাদী করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আলেমদের মতে, এই আয়াতের পরেও নবী আরো বিবাহ করে, যেটি ছিল আল্লাহর এই নির্দেশনার লঙ্ঘন। যদিও সাহাবীদের মতে, এই আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে, আল্লাহ নাকি নবীকে পরে আরো বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন! কেননা এই সুরাটি নাজিল হওয়ার পরেও নবী মুহাম্মদ বেশ কয়েকটি বিবাহ করেছেন। এমনকি, মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি বিয়ে করেছেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ইবনে কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে। এছাড়া এর প্রমাণ আমরা হাদিসেও দেখতে পাই,
সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৩২০৮। আয়েশা (রাঃ) বলেন, **রাসূলুল্লাহ্ সা এর ইনতিকালের পূর্বে আল্লাহ তাআলা তার জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন যাকে ইচ্ছা তিনি মহিলাদের মধ্য থেকে বিবাহ করতে পারবেন** ।]]

শুধু যে নবীর পরে নবীর স্ত্রীদের বিবাহ হারাম করাই হয়েছে সেটিই নয়, নবী এই নিয়মও জারি করেন যে, নবী তালাক দিলে তার স্ত্রীগণ আর কোন খোরপোশ পাবেন না। অর্থাৎ নবী তাদের আর ভরণপোষণ দেবেন না। তারা আর কাউকে বিয়েও করতে পারবেন না, উল্টোদিকে ভরণপোষণও পাবেন না, এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তারা কীভাবে জীবন যাপন করবেন? তাদের পিতা কি তাদের আর দায়িত্ব নিতে রাজি থাকবে? বাকি জীবন পিতার ঘরে বোঝা হয়ে তারা থাকতে পারবেন? চাকরি বাকরি ব্যবসাবাণিজ্য করেও তো তারা চলতে পারবেন না। কারণ আরেক আয়াতে নবীর স্ত্রীগণকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করতেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৫০৬৭ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন- নবী সা-এর নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন। **আট জনের সঙ্গেতিনি পালাক্রমে রাত্রি যাপন করতেন**। আর একজনের সঙ্গে রাত্রি যাপনের কোন পালা ছিল না।

২৫৯৩ সাওদা (রা.) নিজের রাত নবী (সা) এর স্ত্রী আয়িশাহ (রা.)-কে দান করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ সা এর সন্তুষ্টি কামনা করতেন।

৫২০৬ আয়িশাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, ''এবং যদি কোন নারী স্বীয় স্বামী হতে রূঢ়তা কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে'' এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলা সম্পর্কে, যার স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে চায় না; বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করতে চায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে, আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না বরং অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করে নাও এবং তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে ভরণপোষণ নাও দিতে পার, আর আমাকে শয্যাসঙ্গিনী না-ও করতে পার। **আল্লাহ তাআলার উক্ত আয়াতে আপোষ বলতে এটিই বোঝানো হয়েছে**- ''তবে তারা পরস্পর আপোষ করলে তাদের কোন গুনাহ নেই, বস্তুতঃ আপোষ করাই উত্তম।

সুনান আবূ দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২১৩২ আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা আমাদের সাথে অবস্থানের ব্যাপারে আমাদের কারো উপর কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতেন না। আর এরূপ দিন খুব কমই হত, যেদিন তিনি আমাদের সকলের নিকট আসতেন না এবং সহবাস ব্যতীত তিনি সকল স্ত্রীর সাথে খোশালাপ করতেন। এরপর যেদিন যার সাথে রাত্রিবাসের পালা পড়ত, সেদিন তিনি তার সাথে রাতযাপন করতেন। আর সাওদা (রা.) এর বয়স যখন অধিক বৃদ্ধি পায় এবং তিনি এ ভয়ে ভীত হন যে, রাসূলুল্লাহ সা তাঁকে ত্যাগ করবেন, তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আমি আমার পালার দিনটি আয়েশার জন্য দান করলাম। রাসূলুল্লাহ সা তার পক্ষ হতে তা কবূল করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আশংকা করে ...। (নিসাঃ ১২৮)

৫২১৩ পরিচ্ছেদঃ **যখন কেউ স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী মেয়ে বিয়ে করে।**

অধ্যায়ঃ **আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করা।**

আল্লাহ্ বলেন, (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ (وَاسِعًا حَكِيمًا) **''তোমরা কক্ষনো স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না যদিও প্রবল ইচ্ছে কর, সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে তোমরা (অপরকে) ঝুলন্তের মত করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু''** (সূরা নিসা ৪/১২৯-১৩০)

৪৬০১ আয়িশাহ (রা.) বলেন, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا কোন ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে কোন মহিলা থাকে কিন্তু স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট নয় বরং তাকে আলাদা করে দিতে চায়, তখন স্ত্রী বলে আমার এই দাবী থেকে আমি তোমাকে অব্যাহতি দিচ্ছি, এ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হল।

বহুবিবাহে ইসলামিক ডিফেন্সকারীরা ইসলাম জানেনা

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

২৪৯৪। ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেন, আয়িশাহ (রাযি.)-কে এ আয়াতের -- "আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, **ইয়াতীম (মেয়ে)**দের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর অন্য মেয়েদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দমতো দুজন বা তিনজন কিংবা চারজনকে। কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে কিংবা তোমাদের অধীনস্থ দাসীকে। এটাই হবে অবিচার না করার কাছাকাছি।''- (সূরা নিসাঃ ৩) ---- সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আয়িশাহ (রা.) বললেন, **এ হচ্ছে সেই ইয়াতীম মেয়ের কথা, যে অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকে এবং তার সম্পদে অংশীদার হয়।** এদিকে মেয়ের ধন-রূপে মুগ্ধ হয়ে তার অভিভাবক মোহরানার ব্যাপারে সুবিচার না করে (অর্থাৎ, অন্য কেউ যে পরিমাণ মোহরানা দিতে রাজী হত, তা না দিয়েই) তাকে বিয়ে করতে চাইত। **তাই প্রাপ্য মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে সুবিচার না করা পর্যন্ত তাদেরকে আশ্রিতা ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পছন্দমত অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে।**

আয়িশাহ (রা) আরও বলেন, পরে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সা-এর নিকট মহিলাদের সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলেন তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন- "তারা আপনার নিকট মহিলাদের সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে তোমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কিতাব হতে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়, **তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ রয়েছে, তা তোমরা তাদের দাও না অথচ তাদের তোমরা বিয়ে করতে চাও**''- (সূরা-নিসা : ১২৭)। আয়িশা (রা) বলেন, অপর আয়াতে আল্লাহর ইরশাদ এর মর্ম হল, "ধন ও রূপের স্বল্পতা হেতু তোমাদের আশ্রিতা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের অনাগ্রহ"। তাই ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি অনাগ্রহ সত্ত্বেও শুধু ধন-রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য ন্যায়সঙ্গত মোহরানা আদায় করে বিয়ে করতে পারে।

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
অধ্যায়ঃ বিয়ে (كتاب النكاح)
হাদিস নম্বরঃ ৫০৯৮
আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীঃ ‘‘তোমরা বিয়ে কর দু’জন, তিনজন অথবা চারজন।’’ (সূরাহ আন্-নিসা ৪/২)
৫০৯৮। ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। **‘যদি তোমরা ভয় কর ইয়াতীমদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ কায়িম করতে পারবে না’**- (সূরা-নিসা ৪/৩)- এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ আয়াত **ঐ সমস্ত ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে**, যাদের অভিভাবক তাদের সম্পদের লোভে বিয়ে করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং তাদের সম্পত্তিকে ইনসাফের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, ঐ বালিকাদের ছাড়া বাকি মহিলাদের মধ্য থেকে তার ইচ্ছে অনুযায়ী দু’জন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিয়ে করতে পারবে।

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
হাদিস নম্বরঃ ২৭৬৩
আল্লাহর তা‘আলার বাণীঃ ‘‘ইয়াতীমদেরকে তাদের ধনসম্পদ দিয়ে দিবে এবং ভালোর সঙ্গে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সঙ্গে তাদের সম্পদ মিলিয়ে গ্রাস করবে না, তা মহাপাপ। তোমার যদি আশংকা হয় যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে।’’ (সূরা নিসা ২-৩)
উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
‘‘যদি আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের স্বত্বাধীন ক্রীতদাসীকে’’- (আন-নিসা ৩)। আয়াতটির অর্থ কী? ‘আয়িশাহ (রা) বললেন, এখানে সেই ইয়াতীম মেয়েদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের লালন-পালনে থাকে। অতঃপর সে অভিভাবক তার রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে, তার সম মানের মেয়েদের প্রচলিত মাহর থেকে কম দিয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। অতএব যদি মাহর পূর্ণ করার ব্যাপারে এদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারে তবে ঐ অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এদের বিবাহ করতে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের ব্যতীত অন্য মেয়েদের তোমরা বিবাহ করবে।

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
অধ্যায়ঃ কুরআন মাজীদের তাফসীর (كتاب التفسير)
৪৫৭৩। ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একজন ইয়াতীম বালিকা ছিল। অতঃপর সে তাকে বিয়ে করল। সে বালিকার একটি বাগান ছিল। তার অন্তরে ঐ বালিকার প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও বাগানের কারণে সে ঐ বালিকাটিকে বিবাহ করে রেখে দিতে চায়। এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়- আর যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না।

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
অধ্যায়ঃ কুরআন মাজীদের তাফসীর (كتاب التفسير)
হাদিস নম্বরঃ ৪৫৭৪
‘‘আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করে নাও অন্য নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের মনঃপুত হয়।’’ (সূরাহ আন-নিসা ৪/৩)
৪৫৭৪। উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ‘আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন মহান আল্লাহর বাণী وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامٰى সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন, হে ভাগ্নে! সে হচ্ছে পিতৃহীনা বালিকা, অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তার সম্পত্তিতে অংশীদার হয় এবং তার রূপ ও সম্পদ তাকে (অভিভাবককে) আকৃষ্ট করে। এরপর সেই অভিভাবক উপযুক্ত মাহর না দিয়ে তাকে বিবাহ করতে চায়। তদুপরি অন্য ব্যক্তি যে পরিমাণ মাহর দেয় তা না দিয়ে এবং তার প্রতি ন্যায়বিচার না করে তাকে বিয়ে করতে চায়। এরপর তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মাহর এবং ন্যায় ও সমুচিত মাহর প্রদান ব্যতীত তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তদ্ব্যতীত যে সকল মহিলা পছন্দ হয় তাদেরকে বিয়ে করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।
‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী- ‘তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহ প্রকাশ কর। ইয়াতীম বালিকার ধন-সম্পদ কম হলে এবং সুন্দরী না হলে তাকে বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করো না’। তাই ইয়াতীম বালিকাদের মাল ও সৌন্দর্যের আকর্ষণে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ন্যায়বিচার করলে ভিন্ন কথা। কেননা তারা সম্পদের অধিকারী না হলে এবং সুন্দরী না হলে তাদেরকেও বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
অধ্যায়ঃ কূটচাল অবলম্বন (كتاب الحيل)
হাদিস নম্বরঃ ৬৯৬৫
উরওয়াহ (র) আয়িশাহ (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম(নারী)দের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দমত দুই, তিন ও চার জনকে বিবাহ কর"- (সূরা-নিসা ৩)।
তিনি বললেন, এ আয়াত ঐ ইয়াতীম মেয়ের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। আর অভিভাবক তার সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার স্বগোত্রীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত মাহরের চেয়ে কম মাহর দিয়ে বিয়ে করে নেয়ার মনস্থ করে। তাই তাদেরকে এমন ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। **তবে যদি পূর্ণ মাহর দিয়ে তাদের সঙ্গে সুবিচার করে তবে অন্য কথা।**

পৃথিবীতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি ??!

https://statisticstimes.com/demographics/world-sex-ratio.php

World sex ratio estimates

Year	Male	Female	M per 100 F
2021	3,976,648,226	3,932,646,925	101.119
2020	3,943,612,192	3,897,340,688	101.187
2019	3,906,407,855	3,858,543,178	101.240
2018	3,866,135,266	3,817,654,563	101.270
2017	3,824,259,774	3,775,562,630	101.290
2016	3,781,091,377	3,732,382,861	101.305
2015	3,737,402,732	3,689,194,805	101.307
2014	3,693,112,764	3,645,900,655	101.295
2013	3,648,401,067	3,602,192,303	101.283
2012	3,603,431,424	3,558,266,498	101.269
2011	3,558,591,636	3,514,533,789	101.254
2010	3,514,408,098	3,471,195,007	101.245
2009	3,470,393,479	3,427,912,430	101.239
2008	3,426,553,494	3,385,043,778	101.226
2007	3,383,117,609	3,342,830,936	101.205
2006	3,340,199,243	3,301,216,976	101.181
2005	3,298,026,087	3,260,150,032	101.162
2004	3,256,371,438	3,219,380,041	101.149
2003	3,215,038,714	3,178,859,650	101.138
2002	3,173,877,429	3,138,529,931	101.126
2001	3,132,616,862	3,098,130,121	101.113
2000	3,091,099,541	3,057,799,434	101.089
1999	3,049,822,570	3,017,935,888	101.057
1998	3,008,968,271	2,978,344,209	101.028
1997	2,967,905,340	2,938,575,921	100.998
1996	2,926,632,435	2,898,512,863	100.970
1995	2,885,184,242	2,858,035,212	100.950
1994	2,843,434,270	2,817,293,723	100.928
1993	2,801,260,615	2,776,172,908	100.904
1992	2,758,361,747	2,734,324,345	100.879
1991	2,714,450,362	2,691,795,505	100.842

৫১৮৭ ইবনু উমার (রা.) বলেন, **আমরা নবী সা-এর সময় আমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথা-বার্তা ও হাসি-তামাশা করা থেকে দূরে থাকতাম এই ভয়ে যে, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হয়ে যায় নাকি। নবী সা-এর ইন্তিকালের পর আমরা তাদের সঙ্গে নির্ভয়ে কথাবার্তা বলতাম ও হাসি-তামাশা করতাম।**

৭৩০৯ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল- আমার সম্পদের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেব? আমার সম্পদগুলো কী করব? তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না, অবশেষে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হল।

৭২৮৮ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যে পর্যন্ত না আমি তোমাদের কিছু না বলি। কেননা, তোমাদের আগে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদেরকে বেশি বেশি প্রশ্ন করা ও নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার জন্যই ধ্বংস হয়েছে।**

৭২৮৯ **নবী সা বলেছেনঃ মুসলিমদের সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী ঐ লোক যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা আগে হারাম ছিল না, কিন্তু তার প্রশ্ন করার কারণে তা হারাম করা হয়েছে।**

৩৩৩৬ নবী সা বলেছেন- সমস্ত রূহ সেনাবাহিনীর মত একত্রিত ছিল। সেখানে তাদের যে সমস্ত রূহের পরস্পর পরিচয় ছিল, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর পরিচিতি থাকবে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ ও মতবিরোধ থাকবে।

৭৪৫৬ আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা ইয়াহূদীদের এক কাওমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। আবার কেউ কেউ বলল, তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। শেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সা দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি ভাবছিলাম, তাঁর ওপর ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে। পরে তিনি বললেনঃ ''তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, রূহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (একটি হুকুম)। এ সম্পর্কে তোমাকে অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।''- (সূরাহ ইসরা: ৮৫)।
তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলতে লাগল, বলেছিলাম তোমাদেরকে, তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), পরিচ্ছেদঃ আক্কীকার বর্ণনা
২৮৪২। একদা নবী সা কে আক্কীকাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ কষ্ট পছন্দ করেন না। **হয়তো সেজন্যই** তিনি আক্কীককে কষ্ট নামকরণ করেছেন।

৭৪৭৬ আল্লাহ তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে তাই প্রকাশ করেন, যা তিনি চান।

সূনান আবু দাউদ (ইফা)
৩৬০৭। **আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেনঃ আমি যা কিছু রাসূলুল্লাহ সা এর নিকট হতে শ্রবণ করতাম, তা লিখে রাখতাম। আমি ইচ্ছা করতাম যে, আমি এর সবই সংরক্ষণ করি। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করে এবং বলেঃ তুমি যা কিছু শোন তার সবই লিখে রাখ, অথচ রাসূলুল্লাহ সা একজন মানুষ, তিনি তো কোন সময় রাগান্বিত অবস্থায় কথাবার্তা বলেন এবং খুশীর অবস্থায়ও বলেন। একথা শুনে আমি লেখা বন্ধ করি এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা কে অবহিত করি। তখন নবী সা তার আংগুল দিয়ে নিজের মুখের প্রতি ইশারা করে বলেনঃ তুমি লিখতে থাক, আল্লহর কসম, যা কিছু এ মুখ হতে বের হয়, তা সবই সত্য।**

সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৫৯১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা গাছে গর্ভদানরত কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। নবী সা বললেন, **যদি এটা না কর তাহলে ভাল হবে**। লোকেরা তা করল না। এতে 'চিটা' খেজুর উৎপন্ন হলো। পরে রাসুলুল্লাহ সা তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খেজুর গাছের কি হলো? লোকেরা বললো, আপনি এমন এমন বলেছিলেন তা করায় এরূপ হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা বললেনঃ তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই অধিক অবগত।

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী), পরিচ্ছেদঃ দাজ্জাল এর বর্ণনা, তার পরিচয়
৭২৫১। ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সা মানুষের মধ্যে দাজ্জালের আলাপ-আলোচনা করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন। কিন্তু সতর্ক হও! **দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ।**

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত), পরিচ্ছেদঃ দাজ্জালের বর্ণনা
৫৪৭৪। হুযায়ফাহ্ (রা)] হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: **দাজ্জালের বাম চোখ অন্ধ।**

৬৩৬১ আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী সা-কে এ দুআ করতে শুনেছেনঃ হে আল্লাহ! **যদি আমি কোন মুমিন লোককে খারাপ বলে থাকি, তবে আপনি সেটাকে কিয়ামতের দিন তার জন্য আপনার নৈকট্য অর্জনের উপায় বানিয়ে দিন**।

৬০৪ পরিচ্ছেদঃ **আযানের সূচনা।**

মুসলিমগণ যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সালাতের সময় অনুমান করে সমবেত হতেন। এর জন্য কোন ঘোষণা দেয়া হতো না। একদা তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকজন সাহাবী বললেন, নাসারাদের ন্যায় নাকূস বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কয়েকজন বললেন, ইয়াহূদীদের শিঙ্গার ন্যায় শিঙ্গা ফোঁকানোর ব্যবস্থা করা হোক। উমার (রাযি.) বললেন, সালাতের ঘোষণা দেয়ার জন্য তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পার না? তখন আল্লাহর রাসূল সা বললেনঃ হে বিলাল, উঠ এবং সালাতের জন্য ঘোষণা দাও।

৮৬৯ আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, **যদি রাসূল সা. জানতেন** যে, নারীরা কী অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন বারণ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন।

৪৩৬৭ বানী তামীম গোত্র থেকে একটি অশ্বারোহী দল নবী সা-এর নিকটে আসল। আবূ বকর (রা.) প্রস্তাব দিলেন, ইবনু মাবাদ (রা.)-কে এদের আমীর নিযুক্ত করে দিন। উমার (রা.) বললেন, বরং ইবনু হাবিস (রা.)-কে আমীর বানিয়ে দিন। আবূ বকর (রা.) বললেন, আমার বিরোধিতা করাই তোমার উদ্দেশ্য। উমার (রা.) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমি কখনো করি না। এর উপর দু'জনের বাক-বিতন্ডা চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে উভয়ের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। ফলে এ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "হে মুমিনগণ! আল্লাহ এবং তার রাসূলের সামনে তোমরা কোন ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়ো না। বরং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সঙ্গে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে"- (সূরাহ আল-হুজুরাত ৪৯/১-২)।

৪৭৩৪ খাব্বাব (রা.) বলেন, কাফের আস ইবনু ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি পাওনা আদায় করতে তার কাছে আসলে সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে ওঠা পর্যন্ত। তখন তো আমাকে ধন-সন্তান দেয়া হবে। তখন তোমাকে পরিশোধ করে দেব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ "তাকে কি লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে"- (সূরা মারইয়াম ১৯/৭৭)।

৪৭৭০ রাসূলুল্লাহ্ সা সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন এবং আহবান জানালেন কুরাইশদের সহ বিভিন্ন গোত্রকে। অবশেষে তারা জমায়েত হল। যে নিজে আসতে পারল না, সে তার প্রতিনিধি পাঠাল, যাতে দেখতে পায়, ব্যাপার কী? সেখানে কুরাইশদের নেতা আবূ লাহাব ও কুরাইশগণও আসল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা বললেন, "আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।" আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ্ সা কে বলল, সারাদিন তোমার উপর ধ্বংস নামুক! এজন্যই কি তুমি আমাদের জমায়েত করেছ?
তখন নবী সা এর উপর এই আয়াত নাযিল হল, "ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্ত দু'টি এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও"।

৪৭৯২ নবী সা-এর নিকট যাইনাবকে বাসর যাপনের জন্য পাঠানো হয় এবং তিনি তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সা খাবার তৈরি করে লোকদের দাওয়াত করলেন। তারা খাওয়ার পর বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সা বাইরে গিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন, তখনও তারা বসে কথাবার্তা বলছিল।
তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন- **হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর ঘরসমূহে প্রবেশ করো না; যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় খাদ্য গ্রহণের জন্য, (আগেভাগেই এসে পড় না) খাদ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করে যেন বসে থাকতে না হয়। আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং তোমাদের খাওয়া শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। তোমাদের এ কাজ নবীকে কষ্ট দেয়। সে তোমাদেরকে (উঠে যাওয়ার জন্য) বলতে লজ্জাবোধ করে, আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।** (সূরা আহজাব, আয়াত নং ৫৩)

আর যখন নবীপত্নীদের কাছে তোমরা কোন সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। আর আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনো তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। নিশ্চয় এটি আল্লাহর কাছে গুরুতর পাপ। (Sura Al-Ahzab 33:53)
৪৭৯৩,৫১৬৬,৫৪৬৬

৪৬৮১ কিছু লোক উন্মুক্ত আকাশের দিকে নগ্ন হওয়ার ভয়ে পেশাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জা করতে লাগল। তখন তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়-
"জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা তাদের বক্ষকে কুঞ্চিত করে(যাতে উপর থেকে লজ্জাস্থান না দেখা যায়) যাতে আল্লাহর কাছে গোপন রাখতে পারে। স্মরণ রাখ, তারা যখন নিজেদেরকে কাপড়ে আচ্ছাদিত করে, তখন তারা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে আল্লাহ তা জানেন। " (সূরা হূদ ১১/৫)।

৪০৪৪ জাবির (রা.) বলেন, উহূদ যুদ্ধের দিন কতক সাহাবী সকাল বেলা মদ পান করেছিলেন। অতঃপর যুদ্ধে তাঁরা শাহাদাত লাভ করেন।
[তখন পর্যন্ত মদ পান করা হারাম হয়নি।]

৩০৯১ আলী (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমতের মালের মধ্য হতে যে অংশ আমি পেয়েছিলাম, তাতে একটি উটও ছিল। আর নবী সা খুমুসের মধ্য হতে আমাকে একটি জোয়ান উটনী দান করেন। আমার উট দুটি এক আনসারীর ঘরের পার্শ্বে বসা ছিল। আমি আসবাবপত্র যোগাড় করে এসে দেখি উট দুটির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং কোমরের দিকে পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। এ হাল দেখে আমি অশ্রু চেপে রাখতে পারলাম না। আমি বললাম, কে এমনটি করেছে? লোকেরা বলল, হামযা ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রা.) এমনটি করেছে। সে এ ঘরে আছে এবং শরাব পানকারী কতিপয় আনসারীর সঙ্গে আছে। আমি নবী সা এর নিকট চলে গেলাম। এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজকের মত দুঃখজনক অবস্থা দেখেনি। হামযাহ আমার উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পাঁজর ফেড়ে ফেলেছে। আর সে এখন অমুক ঘরে শরাব পানকারী দলের সঙ্গে আছে। তখন নবী সা হামযা (রা.) যে ঘরে ছিল সেখানে পৌঁছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল। তখন তারা শরাব পানে বিভোর ছিল। আল্লাহর রাসূল সা হামযা (রা.) কে তার কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। হামযা (রা.) তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার চক্ষু দু'টি ছিল রক্তলাল। সে তখন আল্লাহর রাসূল সা এর প্রতি তাকাল। অতঃপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাঁর মুখমন্ডলের দিকে তাকাল। অতঃপর হামযা রা.) বলল, তোমরাই তো আমার পিতার গোলাম। এ অবস্থা দেখে রাসূল সা বুঝতে পারলেন, সে এখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত আছে। তখন রাসূল সা পেছনে হেঁটে সরে আসলেন।

সহীহ বুখারী (ইফা)
৩৭৪৮। উহুদ যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক সাহাবী সকাল বেলা শরাব পান করেছিলেন।* এরপর তাঁরা শাহাদাত বরণ করেন।
* তখন পর্যন্ত শরাব পান করা হারাম ঘোষিত হয়নি।

আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৩৬৭১। একদা এক আনসার ব্যক্তি আলী (রাঃ) ও আব্দুর রাহমান (রাঃ) কে দাওয়াত করে উভয়কে মদ পান করালেন তা হারাম হওয়ার পূর্বে। অতঃপর মাগরিবের সালাতে আলী (রাঃ) তাদের ইমামতি করলেন। **আলী (রাঃ) সূরা "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" পাঠ করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হলোঃ** "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন মাতাল অবস্থায় থাকো তখন সালাতের কাছেও যেও না। সালাত তখনই পড়বে, যখন তোমরা কি বলছো তা সঠিকরূপ বুঝতে পারো।" (সূরা আন-নিসাঃ ৪৩)

তিরমিজী (ইফাঃ)
৩০২৬। আলী (রাঃ) বলেনঃ আবদুর রহমান ইবন আওফ একবার আমাদের জন্য আহারের আয়োজন করেন এবং আমাদের দাওয়াত করলেন। **সেখানে আমাদেন মদ পান করান (তখনও মদ হারাম হয়নি)**। আমাদেরকে মদের নেশায় ধরে। ইতোমধ্যে সালাতের ওয়াক্ত এসে পড়ে। এমতাবস্থায় লোকেরা আমাকেই ইমামত করতে এগিয়ে দেন। **আমি সালাতে কিরআত করলামঃ** (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) এবং (وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) **এর স্থলে পড়ে পড়লাম** (وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) **তোমরা যাদের ইবাদত কর আমরাও তাদের ইবাদত করি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ হে মুমিনগণ! মদ্যপ/নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হবে না যতক্ষণ না তোমরা বল তা বুঝতে পার**।

৭৩৬৯ যখন মিথ্যা অপবাদকারীরা আয়িশাহ (রা.) এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদ রটিয়েছিল। তিনি বলেন, **ওয়াহী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল**, তখন রাসূলুল্লাহ সা আলী ইবনু আবূ তালিব ও উসামাহ ইবনু যায়িদের কাছে কিছু পরামর্শ করার জন্য তাদেরকে ডাকলেন। এবং তাঁর স্ত্রী আয়িশাহ (রা.)-কে পৃথক করে দেয়া সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন।

সহীহ মুসলিম (ইফা)
৬৭৬৫। আয়িশা (রা) বলেন, আমার ব্যাপারে লোকেরা যখন কুৎসা রটাতে আরম্ভ করল, তখন রাসুলুল্লাহ সা ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, **যারা আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটাচ্ছে তাদের সমন্ধে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও**। **আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সমন্ধে মন্দ কোন কিছু জানিনা এবং তারা যার ব্যাপারে অপবাদ রটাচ্ছে তাঁর সম্বন্ধেও খারাপ কিছু আমি জানিনা**। আমার অনুপস্থিতিতে সে আমার গৃহে কখনো প্রবেশ করেনি এবং আমি যখন সফরে বের হয়েছি সেও তখন আমার সাথে সফরে বের হয়েছে। আয়িশা (রা) আরও বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সা আমার গৃহে প্রবেশ করে আমার বাঁদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তখন সে বললো, আল্লাহর কসম! আয়িশা (রা) এর মধ্যে আমি কোন দোষ দেখিনি।

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
আয়িশা (রা) বলেন, ...এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হলে **রাসূলুল্লাহ সা তার স্ত্রীর(আমার) বিচ্ছেদের(তালাক) বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করার জন্য আলী (রা) এবং উসামা (রা) কে ডেকে পাঠালেন**। উসামা (রা) বললেন, আপনাদের স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানিনা। আর **আলী (রাঃ) বললেন,** হে আল্লাহর রাসূল, **আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি, তাঁকে(আয়িশা) ছাড়া আরো বহু মহিলা আছে**। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসী বারীরা (রা) কে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে।

৩১০ সীরাতুন নবী (সা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জিজ্ঞাসাবাদ

আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে ডেকে তাঁদের পরামর্শ জানতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে উসামা আমার প্রশংসাই করলেন এবং উত্তম কথাই বললেন। তারপর তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার পরিবার, আমরা তো তাঁর সম্পর্কে উত্তম বৈ কিছুই জানি না। এটা একটা অপপ্রচার ও মিথ্যাচার। আর আলী (রা) বললেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মেয়ে লোকতো প্রচুর রয়েছে। আর আপনার এ সামর্থ্যও রয়েছে যে, একজনের বদলে অপরজন নিয়ে আসবেন। আর আপনি দাসীকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য সত্য সব বলে দেবে।"

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে বারী'রাকে ডাকলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আলী ইব্‌ন আবূ তালিব তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি তাকে ভীষণ প্রহার করলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্য সত্য সব বলবি।

সে বলল : আল্লাহ্র কসম! উত্তম ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই আমি জানি না। আমি

সহীহ বুখারী (ইফা)
৩৮৩৫। আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা **দীর্ঘ একমাস** অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোনো ওহী আসেনি।
সহীহ বুখারী (ইফা)
২৪৮৫, ৪৩৯১ । ....আয়িশা (রাঃ) বলেন, যে দিন থেকে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে সেদিন থেকে নবী সা আমার কাছে বসেননি। এর মধ্যে একমাস কেটে গিয়েছিল। অথচ আমার সম্পর্কে তার কাছে কোন ওয়াহী নাযিল হল না।

সহীহ বুখারী (ইফা)
৪৩৯৮। আয়িশাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সা আসরের সালাত আদায় করে আমার কাছে এলেন। এ সময় আমার ডানে ও বামে আমার আব্বা আমাকে ঘিরে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সা আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করে বললেন, হে আয়িশাহ! তুমি যদি কোন গুনাহর কাজ বা অন্যায় করে থাক তবে আল্লাহর কাছে তাওবা করস। তখন জনৈকা আনসারী মহিলা দরজার কাছে বসা ছিল। আমি বললাম, আপনি কি এ মহিলাকেও লজ্জা করছেন না, এসব কিছু বলতে? তবুও রাসূলুল্লাহ্ সা আমাকে নাসীহাত করলেন।

তখন আমি আমার আব্বার দিকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সা-এর জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি কী বলব? এরপরে আমি আম্মার দিকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সা-এর জবাব দিন। তিনিও বললেন, আমি কী বলব? যখন তাঁরা কেউই রাসূলুল্লাহ সা-কে কোন জবাব দিলেন না, **তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যদি বলি যে, আমি এ কাজ করিনি এবং আমি যে সত্যবাদী এ সম্পর্কে আল্লাহই সাক্ষী, তবে তা আপনাদের নিকট আমার কোন উপকারে আসবে না। কেননা, এ ব্যাপারটি আপনারা পরস্পরে বলাবলি করেছেন এবং তা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আর আমি যদি আপনাদের বলি, আমি তা করেছি অথচ আল্লাহ্ জানেন যে আমি এ কাজ করিনি, তবে আপনারা অবশ্যই বলবেন যে, সে তার নিজের দোষ নিজেই স্বীকার করেছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার এবং আপনাদের জন্য আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না।**

ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সা এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হল। আমরা সবাই নীরব রইলাম। ওহী শেষ হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ সা এর চেহারায় খুশীর নমুনা দেখতে পেলাম। তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলছিলেন, হে 'আয়িশাহ! তোমার জন্য খোশখবর! আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এ সময় আমি অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলাম। আমার আব্বা ও আম্মা বললেন, তুমি উঠে নবী সা এর কাছে যাও, এবং তার শুকরিয়া আদায় কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর দিকে যাব না এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না।

৪৯০ তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, চতুর্থ খণ্ড [অষ্টাদশ পারা]

অনুবাদ :

١٢. لَوْلَا هَلَّا إِذْ حِيْنَ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ أَىْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِيْنٌ. كِذْبٌ بَيِّنٌ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ اَىْ ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَقُلْتُمْ.

১২. যখন তোমরা একথা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করল না। অর্থাৎ একে অন্যের প্রতি ধারণা করা। এবং তারা কেন বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা। এখানে خِطَاب হতে غَيْبَتْ -এর দিকে اِلْتِفَاتْ হয়েছে। অর্থাৎ- ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَقُلْتُمْ [হে লোকজন! তোমরা কেন সুধারণা পোষণ করলে না ও বললে না।]

١٣. لَوْلَا هَلَّا جَآءُوْا اَيِ الْعُصْبَةُ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ج شَاهَدُوْهُ فَاِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ اَىْ فِىْ حُكْمِهٖ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ فِيْهِ.

১৩. তারা উক্ত দলটি কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি যারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। যেহেতু তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট অর্থাৎ তাঁর বিচারে মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে।

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاِخْوَانِهِمْ خَيْرًا وَهَلَّا قُلْتُمْ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ

[তোমরা যখন তা শুনলে হে মুমিনগণ! তোমাদের ভাইদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করলে না কেন? তোমরা কেন বললে না যে, এটা স্পষ্ট মিথ্যা।

৪৫০৮ যখন রমাযানের রোযার হুকুম নাযিল হল তখন মুসলিমরা গোটা রমাযান মাস স্ত্রীদের নিকটবর্তী(সহবাস) হতেন না আর কিছু সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে নিজেদের উপর (স্ত্রী-সম্ভোগ করে) অবিচার করে বসে। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন -"আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিলেন। অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা লাভ কর"- (সূরা-বাকারাহ ২/১৮৭)

৩৬১৭ আনাস (রা.) বলেনঃ এক খ্রিস্টান ব্যক্তি মুসলিম হল এবং সূরা বাকারাহ ও সূরা আল ইমরান শিখে নিল। সে নবী সা-এর জন্য ওহী লিখত। অতঃপর সে আবার খ্রিস্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মাদ-কে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে বেশি কিছু তিনি জানেন না।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র.) বর্ণনা করেন, কাফেরদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর ওহী লিপিবদ্ধ করত। কিন্তু পরে সে মুরতাদ হয়। সে এসব আপত্তিকর কথা রটায়। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর; পারা ১৪, পৃ. ৫৮]

↥

The History of Al-Tabari, vol 8, Page 179 , Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir (Vol 2, page 174) , আছ্‌রারুত তানজিল ওয়া আছ্‌রারুত্ তা'য়ীল' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আল বাদাওয়ী এই ঘটনাটি বর্ননা করেছেন,

একদিন নবী সা ওহী প্রাপ্ত হয়ে ২৩ নং সূরার ১২ থেকে ১৪ আয়াতের "এবং সত্যসত্যই আমি মানব মন্ডলীকে কর্দমাক্ত মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করিয়াছি...তৎপর তাহাকে আমি অন্যসৃষ্টিরূপে সৃষ্টি কারিয়াছি" এই অংশটি বলার পর লিখতে লিখতে সাদ বলে উঠেন, 'আল্লাহ গৌরবান্বিত অত্যুত্তম সৃষ্টিকর্তা'। শুনে নবী বললেন, 'যুক্ত করে নাও এই বাক্যটিও', চমকে উঠলেন সাদ। আরেকবার যখন এক আয়াতের শেষে মুহম্মদ সা বললেন, "এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ"- এই বাক্যটি সংশোধন করে সাদ লিখতে চেয়ে বললেন, 'এবং আল্লাহ সব জানেন ও বিজ্ঞ'। নবী সা অমত করলেন না, লিখতে বললেন।

আবদুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করলে রসুল স. তাকে কোরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু সে বিশ্বাসভাজন ছিলো না। রসুল স. যখন বলতেন 'সামিয়াম বাসিরান'। সে লিখতো— আলীমান হাকিমান। আবার রসুল স. বলতেন, 'আলীমান হাকিমান, 'সে তখন লিখতো—'গফুরার রহীমান।' একদিন অবতীর্ণ হলো—'ওয়ালাকৃদ খলাক্‌নাল ইনসানা মিন সুলালাতিম মিনতিন' (আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে)। রসুল স. সদ্য অবতীর্ণ আয়াতটি লিখতে নির্দেশ দিলেন। মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত এই আয়াতটি খুবই ভালো লাগলো আবদুল্লাহর। সে হঠাৎ বলে উঠলো—'ফা তাবারাকাল্লহু আহ্‌সানাল খলিক্বিন' (আল্লাহ্‌পাক কতোইনা সুন্দর স্রষ্টা)। রসুল স. বললেন, এ বাক্যটিও লিপিবদ্ধ করো। এই আয়াতটিও সদ্য অবতীর্ণ। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ্ ভাবলো— আশ্চর্য! আমার উপরেও তাহলে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। এ রকম চিন্তার ফলে সে হয়ে গেলো ধর্মত্যাগী। মিশে গেলো মুশরিকদের দলে। হজরত ইকরামা, ইবনে জারীর এবং সুদ্দীও এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। যথাস্থানে এর

তাফসীরে মাযহারী/২৬০

আবদুল্লাহ ইবনে সাদ এর ঘটনা

তিনি মুসলিম হয়েছিলেন, পরে ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় পালিয়ে আসেন। মক্কা বিজয়ের সময় নবী মুহাম্মদ- **উসমানের দুধভাই** প্রাক্তন মুসলিম ওহী লেখক আবদুল্লাহ ইবন সাদ কে হত্যার নির্দেশ দেন। **তাকে নিয়ে মুহাম্মদের খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল। কারণ সেই সময় উসমান সুপারিশ করেন যে, তাকে যেন ক্ষমা করা হয়। মুহাম্মদ না পারছিলেন তাকে হত্যা করতে, না পারছিলেন জীবিত রাখতে। এক অস্বস্তিকর উভয় সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল। মনে মনে চাচ্ছিলেন, কেউ তাকে হত্যা করুক, কিন্তু নিজের জামাইয়ের কারণে চক্ষুলজ্জার খাতিরে তা করতেও পারছিলেন না।** এর পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায় আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে-

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫১১

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সেনাধ্যক্ষদের নিকট থেকে এই মর্মে অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসা লোকদের ব্যতীত অন্য কারও সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না। তবে তিনি নাম উল্লেখ করে বিশেষ কিছু লোককে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এমনকি যদি তাদেরকে কা'বার গিলাফের নীচেও পাওয়া যায় তবু। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহ্ ছিল অন্যতম। সে বাহ্যত : ইসলাম গ্রহণ করে ও ওহী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু পরে সে মুরতাদ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করে তাকে হত্যার ঘোষণা দিলে সে পালিয়ে উছমান (রা)-এর কাছে আশ্রয় নেয়। সে ছিল উছমানের দুধভাই। উছমান তাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, 'আচ্ছা— ঠিক আছে।' উছমানের সাথে তার ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন একজন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও কি ছিল না, যে আমার নীরব থাকা অবস্থায় তাকে হত্যা করে দিত।

সুনান আবূ দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

২৬৭৪। মক্কা বিজয়ের পর আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ, উছমান (রা) এর নিকট আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সা যখন বায়াত গ্রহণের জন্য সকলকে আহ্বান জানান, তখন উছমান (রা) তাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ সা এর সামনে দাঁড় করে দেন এবং বলেনঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি আবদুল্লাহকে বায়াত করান। তিনি তাঁর মাথা উঠান এবং তিনবার তার দিকে তাকান এবং প্রত্যক বারই বায়াত করাতে অস্বীকার করেন।

তৃতীয় বারের পর তিনি তাকে বায়াত করান, পরে **নবী সা তাঁর সাহাবীদেরকে বলেনঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন চালাক লোক কি ছিল না, যখন সে আমাকে দেখল যে, আমি তাকে বায়াত করাচ্ছি না, তখন কেন সে তাকে হত্যা করল না? সাহাবীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার অন্তরের কথা বুঝতে পারিনি**।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

৪৯৯০। বারাআ (রা) বলেন, لَايَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ....وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْسَبِيْلِ اللهِ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে নবী সা বললেন, যায়দকে আমার কাছে ডেকে আন এবং তাকে বল সে যেন কাষ্ঠখন্ড, দোয়াত এবং কাঁধের হাড় নিয়ে আসে। এরপর তিনি বললেন, লিখ। **এ সময় অন্ধ সাহাবী আমর ইবনু উম্মু মাকতূম (রা) নবী সা-এর পেছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তো অন্ধ, আমার ব্যাপারে আপনার কী নির্দেশ? এ কথার প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত আয়াতের পরিবর্তে অবতীর্ণ হলঃ** ''সমান নয় সেসব মু'মিন **যারা বিনা ওজরে** ঘরে বসে থাকে এবং ঐসব মু'মিন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করে''- (সূরাহ আন-নিসা ৪/৯৫)।

হাদীস সম্ভার

১৫০৭। একদা উমর (রা) তাওরাত(ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ) এর কয়েকটি পাতা নিয়ে পড়ছিলেন। তা দেখে নবী সা রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! যদি মুসাও জীবিত হয়ে এসে যান, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যাও এবং আমাকে বর্জন কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

হাদীস সম্ভার

১৫০৬। একদা উমর (রা) এর হাতে একটি পাতা ছিল, যার মধ্যে তাওরাতের কিছু অংশ লিখা ছিল। নবী সা তা দেখে রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বললেন, আমার ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ আছে উমর?

অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়া কী বৈধ? ইসলাম অন্য ধর্ম সম্পর্কে যাচাই বাছাই, অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়ে বুঝে শুনে সিদ্ধান্তে আসার প্রক্রিয়াকে নিষেধ করে।

org.sa/fatwas/13812/حكم-القراءة-في-كتب-الاديان বাংলা অনুবাদ-

প্রশ্ন: **কৌতূহলবশত ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়া কি আমাদের পক্ষে বৈধ?**

উত্তর: মুসলিমের জন্য তৌরাত, বাইবেল বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পড়া উচিত নয়; কারণ এর মাধ্যমে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। এবং রসূল ﷺ তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি উমর(রা)কে তওরাত থেকে কিছু পাঠ করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন: হে উমর তোমার কী ইসলাম নিয়ে কোন সন্দেহ আছে !

https://islamqa.info/en/answers/209007/ মুল অংশের বাংলা অনুবাদ-

পবিত্র কোরআন থেকে আমরা যে সত্য বাণী প্রাপ্ত হয়েছি তাতে তাওরাত এবং গসপেল এ যে সত্যই বর্নিত থাকুক না কেনো সেটা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেনঃ “এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে তো অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান আনে।” (সূরা অনকাবুত ৫১)। ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন: **কুরআন যেহেতু সমগ্র বাণী সমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট তাদেরকে কুরআন ব্যতীত অন্য যে কোনো কিছু অনুসরণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।** সাহাবাগণ কুরআন ব্যতীত অন্য যে কোনো কিতাব পড়তে নিষেধ করেছেন। (মাজমুআল ফাতওয়া (১৭/৪১-৪২)

কেউ যদি কুরআন পাঠ করে, এর পর কেউ যদি এথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্য কিতাব সমূহের মুখাপেক্ষী হয় তবে তা পথভ্রষ্টতা এবং ক্ষতিকর, এবং ইহা একটি বাজে কাজ এবং সময়ের অপচয় মাত্র। (আল জামি লি আহকাম আল কুরআন (১৬/৩৭ ৮)। আল্লাহ্‌ যা যা বলেছেন তার মধ্যে যেটা সর্বাধিক কল্যাণকর তা আমরা কুরআনেই খুঁজে পেতে পারি , এজন্য অন্য কোথাও কিছু দেখার কোনো প্রয়োজন নেই।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৪৬০৩। নবী সা বলেনঃ **কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা কুফরী**।

ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম অধ্যায়ঃ আকীদাহ

"চিন্তার স্বাধীনতা" কথাটি কতটুকু সঠিক?

প্রশ্নঃ (১১০) "চিন্তার স্বাধীনতা" সম্পর্কে আমরা শুনে থাকি এবং পত্রিকায় পড়ে থাকি। মূলতঃ এটি আকীদা গ্রহণের স্বাধীনতার দিকে আহবান মাত্র। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে আমাদের কথা হল, যে ব্যক্তি আকীদার স্বাধীনতার দাবী করে এবং যে কোন দ্বীনে বিশ্বাসের অধিকার রাখে বলে মনে করে, সে কাফের। কারণ যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীন গ্রহণ করা বৈধ মনে করে, সে কাফেরে পরিণত হবে। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা না করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

ইসলামের পৌত্তলিক ভিত্তি

নবী মুহাম্মদ সহ মক্কার কুরাইশগণ কাবার কসম কাটতেন। একজন ইহুদি এসে মুহাম্মদের এই কাজটি সংশোধন করে দিয়ে যান। কারণ কাবার কসম বলা শিরক। আল্লাহ এবং তার ফেরেশতা জিব্রাইল সংশোধন করার আগে ইহুদি ব্যাক্তি এসে কীভাবে মুহাম্মদের এত বড় ভুল সংশোধন করে দিলো, তা বোধগম্য নয়। যেখানে শিরক নাকি আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচাইতে ভয়াবহ অপরাধ। এত মারাত্মক ব্যাপার আল্লাহ কেন আগেই সংশোধন করে দিলেন না!

সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৩৭৭৪। এক ইয়াহুদী নবী সা এর নিকট এসে বললোঃ **আপনারা তো আল্লাহর সাথে শরীক ও তার সমকক্ষ স্থির করে থাকেন !** আপনারা বলে থাকেনঃ যা আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন আর যা তুমি ইচ্ছা কর। আর আপনারা আরো বলে থাকেন, কাবার কসম! তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সা নির্দেশ দিলেন যে, যখন কসম করার ইচ্ছা করবে, তখন বলবেঃ কাবার রবের কসম! আরো বলবেঃ আল্লাহ্‌ যা চেয়েছেন। এরপর তুমি চেয়েছ।

সহীহ বুখারী (ইফা)
হজ্ব, পরিচ্ছেদঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে স’য়ী করা।
১৪৮৫। ‘আসিম (র) বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা) কে বললাম, আপনার কি সাফা ও মারওয়া সায়ী করতে অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, হাঁ। কেননা তা ছিল জাহেলী যুগের নিদর্শন। অবশেষে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেনঃ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। কাজেই হজ্জ বা উমরাকারীদের জন্য এ দুইয়ের মধ্যে সা’য়ী করায় কোন দোষ নেই।

সহীহ বুখারী (ইফা),
১৫৪১। যারা ইসলাম গ্রহনের পূর্বে মুশাল্লাল নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামের মূর্তির পূজা করত, তাঁর নামেই তাঁরা ইহরাম বাঁধত, তাঁরা সকলেই সাফা ও মারওয়া সায়ী করত। যখন আল্লাহ কুরআনে বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু সাফা ও মারওয়ার আলোচনা তাতে হল না, তখন সাহাবাগন বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাফা ও মারওয়া সা’য়ী করতাম, এখন দেখি আল্লাহ কেবল বায়তুল্লাহ তাওয়াফের কথা অবতীর্ণ করেছেন, সাফার উল্লেখ করেন নি। কাজেই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা’য়ী করলে আমাদের দোষ হবে কি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’য়ালা (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآيَةَ অবতীর্ণ করেন।

↥
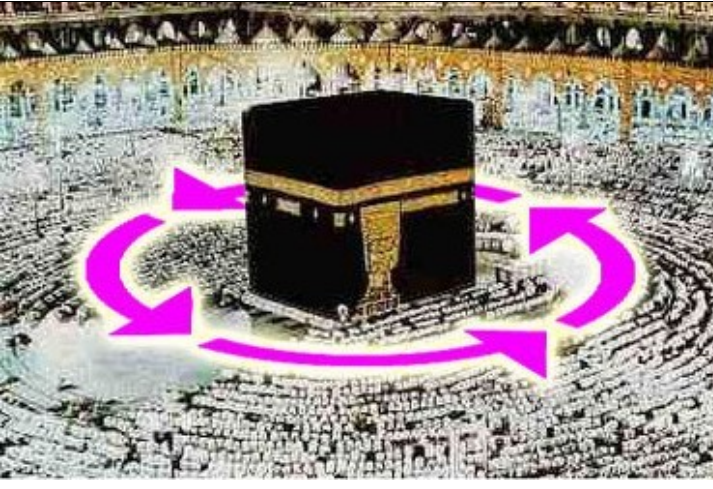
হিন্দু ধর্মে আগুনকে ঘিরে সাতপাক

ইসলাম আবির্ভাবের বহুকাল আগে থেকেই দেবদেবীর মূর্তিতে পরিপূর্ণ মক্কা কাবায় বছরে একবার তীর্থযাত্রীদের সমাগম হতো। অপবিত্র কাপড় পরে এই উপাসনা নিষিদ্ধ ছিল বিধায় সেলাই বিহীন কাপড় সেখানে গিয়ে পরতে হতো। কাবাকে বাম দিকে রেখে ডান দিক থেকে সাতবার চক্কর দেয়ার নিয়ম সেই সময়েই ছিল। ঘোরার সময় কালো পাথরকে চুম্বন করা ও মাথা নোয়ানোর নিয়ম ছিল। মক্কার দুই পর্বত সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানো থেকে শুরু করে শয়তানকে পাথর মারার প্রতিটি পুরনো প্যাগান ধর্মগুলোর রীতি। দেবতার সন্তুষ্টি লাভের আশায় সেই সময়ে গরু উট ছাগল ইত্যাদি কোরবানি দেয়াও ছিল পৌত্তলিক প্রথা।

প্রায় প্রতিটি প্যাগান প্রথাকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করতে মুহাম্মদ আরবে প্রচলিত নানা উপকথার সাথে মিলিয়ে নিজের উদ্ভাবিত নানা গল্পের সৃষ্টি করেছিল। যেখানে ইব্রাহিম বলে কেউ ছিল বা সে মক্কায় এসেছিল এরকম কোন বাস্তব প্রমাণই পাওয়া যায় না, সেখানে মুহাম্মদের প্রচারিত গল্পে ইব্রাহিমকে মক্কায় এসে কাবার পুনঃনির্মাণ করেছিল বলে দাবী করা হয়। সেই সাথে, নিজেকে ইসমাইলের বংশধর দাবী করার মধ্যেও তার স্বঘোষিত নবী হওয়ার বাসনা প্রকাশ পায়। প্রাচীন প্যাগান ধর্মগুলোর নানা অনুষ্ঠান, প্রথা নিয়ে খানিকটা অনুসন্ধান করলেই দেখা যায়, হজ্বের পুরো অনুষ্ঠানই প্যাগান ধর্মগুলো থেকে ইসলামীকরণের মাধ্যমে নেয়া।

ইহুদীদের মধ্যে সেই সময়ে দরিদ্রদের সম্পদের একটা অংশ দেয়ার প্রথা ছিল, যাকে বলা হয় Tzedakah বা Ṣedaqah। মুহাম্মদ এই প্রথাটিকে গ্রহণ করেন সাদাকাহ ও যাকাত নামকরণের মাধ্যমে। ইহুদীদের মধ্যে শুকরের খাওয়া হারাম ছিল, মুহাম্মদের নতুন ধর্মের ওজু এবং নামাজের সাথে সাবেইনদের ধর্মের প্রার্থনা ও ইহুদি ধর্মের প্রার্থনারীতির অনেকটাই মিলে যায়। ইহুদীরা শনিবার, খ্রিস্টানরা রবিবারকে প্রার্থনার জন্য বিশেষ দিন হিসেবে পালন করতো, মুহাম্মদ সেটাকে করেন শুক্রবারে। আরব পৌত্তলিক ও ইহুদিদের মধ্যে উপবাস প্রচলিত ছিল, যা তিনি গ্রহণ করেন রোজা নাম দিয়ে। এমনকি, এখনকার সময়ে সুন্নতে খৎনার ধারণাও ইহুদিদের অনুকরণে যুক্ত হয়।

ইহুদিরা সেই সময়ে মানমর্যাদার দিক দিয়ে সম্ভ্রান্ত ছিলেন, তারা সামাজিক সম্মান লাভ করতেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবেও তারা প্রভাবশালী ছিলেন। মুহাম্মদ তার নতুন ধর্মের নানা প্রথা ইহুদীদের থেকে নিয়েছিলেন। মুহাম্মদের প্রত্যাশা ছিল, হয়তো ইহুদীরা তাকে তাদের নবী হিসেবে মেনে নেবে। ইহুদিদের দলে টানার জন্য মুহাম্মদ তার নতুন ধর্মের কিবলা পরিবর্তন না করে ইহুদিদের মতই রেখে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিক মুখ করে নামাজ আদায় করতে শুরু করেন। শুরুতে মুহাম্মদের সাথে ইহুদিদের সখ্যতাই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইহুদীরা মুহাম্মদকে ভণ্ড এবং পাগল আখ্যা দিলে মুহাম্মদ পরবর্তী জীবনে ইহুদিদের প্রচন্ড ঘৃণা করতেন। শত্রুতা সৃষ্টির পরপরই মুহাম্মদ কিবলা পরিবর্তন করে ফেলে।

সহীহ মুসলিম (ইফা)
পরিচ্ছেদঃ **বায়তুল মুকাদ্দাস হতে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন**
১০৬১। আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাবার দিকে মুখ করবার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

সুনান আন-নাসায়ী (ইফা)
পরিচ্ছেদঃ কিবলামুখী হওয়া ফরজ প্রসঙ্গে
৪৮৯। বা'রা (রা) বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সা-এর সঙ্গে প্রায় ষোল-সতেরো মাস বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করি। পরে নবী সা -কে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

↥

৩০৪। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেনঃ একদা লোকেরা কুবা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের নিকট এক সাহাবী এসে বললেন যে, এ রাতে আল্লাহর রসূল সা -এর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁকে কাবামুখী হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই তোমারা কাবার দিকে মুখ কর। তখন তাঁদের চেহারা ছিল শামের (বায়তুল মুকাদ্দাসের) দিকে। একথা শুনে তাঁরা কাবার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

১৬ মাসের এই কিবলা পরিবর্তন, এরপরে ইহুদিদের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে আবার কাবার দিকে মুখ ফেরানো, এগুলো যে ইহুদিদের আকৃষ্ট করার জন্য করা হয়েছিল, তাফসীরে তা খুব সরাসরিই বলা আছে।

৪১২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ প্রথম খণ্ড

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাস। হিজরতের পরও ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তুল-মোকাদ্দাস—উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌঁছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।—(ইবনে কাসীর)

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন ঃ মক্কায় নামায ফরয হওয়ার সময় কা'বাগৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী (সা) মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ কা'বা-গৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। তফসীরে-কুরতুবীতে আবু আমরের বরাত দিয়ে এ শেষোক্ত উক্তিকেই অধিকতর বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। এর রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, মদীনায় আগমনের পর যখন ইহুদীদের সাথে মেলামেশা শুরু হয়, তখন মহানবী (সা) তাদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্দেশে তাদের কেবলাকেই কেবলা হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে যখন অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা হঠকারিতা ত্যাগ করবে না, তখন হুযুর (সা)-কে সাবেক কেবলার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ, পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কেবলা হওয়ার কারণে তিনি স্বভাবতই তাকে পছন্দ করতেন।

৩৪৪ তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, প্রথম খণ্ড

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا কা'বা কিবলা হোক– এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ-এর আগ্রহের কারণ : নবী করীম ﷺ বিভিন্ন কারণে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন এবং পছন্দ করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে তাঁর জন্যে কিবলা নির্দিষ্ট করে দিন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

১. ইহুদিদের থেকে তাঁর কিবলা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর হওয়া।
২. মহানবী ﷺ ওহী অবতরণ ও নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দীনে ইবরাহীমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কুরআনও তাঁর শরিয়তকে দীনে ইবরাহীমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কিবলাও কা'বাই ছিল।
৩. তাতে আরবের লোকদেরকে ঈমানের দিকে নিয়ে আসা অধিক সহজ ছিল। কেননা আরবের গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দীনে ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলে দাবি করত।
৪. সাবেক কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস দ্বারা আহলে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোলো / সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ মদিনার ইহুদিরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.) ও আহকামুল কুরআন থেকে সংক্ষিপিত]

শালোম আলেইকেম (/ʃəˌlɒm əˈleɪxəm, ʃoʊləm-/; হিব্রু ভাষায়: שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם shālôm ‘alêḵem) হিব্রু উচ্চারণ: [ʃaˈlom ʕaˈleχem]- হিব্রু ভাষার একটি কথ্য অভিবাদন বা শুভেচ্ছা বাক্য, যার অর্থ "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" এর যথার্থ প্রতিত্তোর হল আলেইকেম শালোম ("আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক") (হিব্রু ভাষায়: עֲלֵיכֶם שָׁלוֹם)। এটি সমগ্র বিশ্বেই ইহুদিদের মধ্যে পারস্পরিক শুভেচ্ছাবার্তা হিসেবে প্রচলিত ছিল। জেরুজালেম তালমুদে এটি ছয়বার উল্লেখ করা হয়েছে। এটি পৌত্তলিক প্রথা না হলেও, ইহুদিদের প্রথা, যা মুহাম্মদ ইসলামে সংযুক্ত করে। **এটির আরবি সংস্করণ হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম** ("আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক")। যার প্রতিত্তোরে বলা হয় ওয়া আলাইকুম সালাম ("আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক")। (আরবি ভাষায় السلام عليكم) আস-সালামু আলাইকুম এবং **এর রূপভেদগুলো বিভিন্ন ধর্মের আরবরা সালাম হিসাবে ব্যবহার করে**। আরামীয় এবং ধ্রুপদী সিরিয়াক ভাষায় Shlomo ‘aleykhun (ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠܶܝܟ݂ܽܘܢ) ব্যবহার করে যার অর্থ আপনাকে জানাই শান্তির বার্তা। খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক এবং অর্থডক্স গীর্জাতে তোমরা শান্তিতে রও (গ্রিকে: "Εἰρήνη πᾶσι", লাতিন ভাষায়: "Pax vobiscum") বলে একজন বিশপ বা যাজক প্রাথমিকভাবে অভিবাদন করে থাকেন। বাইবেলে বর্ণিত চরিত্রগুলোকে একে অপরকে šālôm ləkā (šālôm to you, m. singular) or šālôm lākem (plural) বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়।

ওজুও ছিল পৌত্তলিক প্রথা

৪৬২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

রহমান ইব্ন হারমালাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমান ইব্ন হারমালা বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাবকে বলতে শুনেছি যে, আব্দুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম যখন যমযম খনন করলেন তখন বলেছিলেন, "এই কূপ গোসলকারীর জন্য হালাল নয়, এটি কেবল পানকারীর জন্যই বৈধ।" তিনি যমযম কূপে দু'টি হাউজ তৈরি করে দিয়েছিলেন। একটি পান করার জন্য অপরটি ওজু করার জন্য। তখন তিনি বলেছিলেন, একে আমি গোসলের জন্য ব্যবহারের

নামাজ/সালাতও ছিল পৌত্তলিক প্রথা

সহীহ বুখারী (ইফা) ৩৪৩৬ ....

নিয়ে সংক্ষেপে সালাত আদায় করলেন। যখন মুসল্লীগণ চলে গেলেন, তখন উমর (রা) বললেন, হে ইব্ন আব্বাস (রা) দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরা ইব্ন শো'বা (রা)-এর গোলাম (আবূ লুলু)। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ কারীগর গোলামটি? তিনি বললেন, হাঁ। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুল্লিাহ, আল্লাহ্ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটান নি। হে ইব্ন আব্বাস (রা) তুমি এবং তোমার পিতা মদীনায় কাফির গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পছন্দ করতে। আব্বাস (রা)-এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলি। উমর (রা) বললেন, তুমি ভুল বলছ। (তুমি তা করতে পার না) কেননা তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে তোমাদের কেবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, তোমাদের ন্যায় হজ্জ করে। তারপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেয়া হল। আমরা তাঁর সাথে চললাম। মানুষের

রোজা, ঈদও ছিল পৌত্তলিক প্রথা

সহীহ বুখারী (ইফা)

১৮৭৮। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা মদিনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, আশুরার দিনে রোজা পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি ব্যাপার? তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন? তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা (আ) সাওম পালন করেন। রাসূলুল্লাহ সা বললেনঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন।

সহীহ বুখারী (ইফা)
পরিচ্ছেদঃ জাহিলিয়্যাতের(ইসলাম পূর্ব) যুগ
৩৫৫৪। আয়িশা (রা) বলেন, জাহিলি যুগে আশুরার দিন কুরাইশগণ ও নবী সা রোযা পালন করতেন। যখন হিজরত করে মদিনায় আগমন করলেন, তিনি নিজেও আশূরার সাওম পালন করতেন এবং অন্যকেও তা পালনে আদেশ দিতেন।

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
১৮৭৯। আবূ মূসা (রা) বলেন, আশুরার দিনকে ইয়াহুদীগণ ঈদ মনে করত।

সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
পরিচ্ছেদঃ দুই ঈদের নামায।
১১৩৪। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লা মদ্বীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা দুইটি দিন (নায়মূক ও মেহেরজান) খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে থাকে। নবী সা জিজ্ঞাসা করেন, এই দুইটি দিন কিসের? তারা বলেন, জাহেলী যুগে আমরা এই দুই দিন খেলাধূলা ও উৎসব করতাম। নবী সা বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এই দুই দিনের পরিবর্তে অন্য দুইটি উত্তম দিন দান করেছেন এবং তা হল: কোরবানীর ঈদ এবং রোযার ঈদ।

যাকাতও ছিল প্রাক ইসলামিক প্রথা

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে ইহুদিদের টেজেডাকাহ বা Tzedakah বা ভিন্ন উচ্চারণে সাদাকাহ বা Ṣedaqah দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। টেজেডাকাহ একটি হিব্রু শব্দ যার সাধারণ অর্থ দানশীলতা বা সঠিক ও ন্যায়বিচার করার জন্য দান করার ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। ইহুদি ধর্মে টেজেদাকাহ (দাতব্য বা দান)কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজ হিসাবে দেখা হয়। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে অনাহারে থাকা মানুষদের খাবারের জন্য তাদের জমির অংশ ছেড়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

খৎনা এবং আকিকা দেয়া

সহীহ বুখারী (ইফা), হাদিস নং ৬।

১২ বুখারী শরীফ

ইব্ন নাতূর ছিলেন জেরুযালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাক্লের বন্ধু ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের পাদ্রী। তিনি বলেন, 'হিরাক্ল যখন জেরুযালেম আসেন, তখন একদিন তাঁকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর বলল, 'আমরা আপনার চেহারা আজ বিবর্ণ দেখতে পাচ্ছি', ইব্ন নাতূর বলেন, হিরাক্ল ছিলেন জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের বললেন, 'আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খতনাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান যুগে কোন্ জাতি খতনা করে' ? তারা বলল, 'ইয়াহূদী ছাড়া কেউ খতনা করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার যেন আপনাকে মোটেই চিন্তিত না করে। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখানকার সকল ইয়াহূদীকে হত্যা করে ফেলে।' তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন হিরাক্লের কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। হিরাক্ল তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন, 'তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখ, তার খতনা হয়েছে কি-না।' তারা তাকে নিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল, তার খতনা হয়েছে। হিরাক্ল তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জওয়াব দিল, 'তারা খতনা করে।' তারপর হিরাক্ল তাদের বললেন, 'ইনি

76 মোহরাঙ্কিত জান্নাতী সুধা

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই বিবি আমিনা আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্ম গ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। এ শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই তিনি আনন্দ উদ্বেল চিত্তে সূতিকাগারে প্রবেশ করে নয় জাতককে কোলে তুলে নিয়ে কাবগৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর অপূর্ব সুষমামণ্ডিত এ শিশুর মুখমণ্ডলে আনন্দাশ্রু সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আল্লাহর দরাবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। একান্ত আনন্দ মধুর এ মূহুর্তেই তিনি এটাও স্থির করে ফেলেন যে এ নব জাতকের নামা রাখা হবে মুহাম্মদ। আবরবাসীগণের নামের তালিকায় এটা ছিল অভিনব একটি নাম। তারপর আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা করা হয়।[৫]

[5] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৫৯-১৬০ পৃঃ তারীখে খুযরী ১ম খণ্ড ভিন্ন একটি বর্ণনা মতে তিনি খাতনাকৃত অবস্থায়ই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তালকীহুল ফোহুম ৪ পৃঃ কিন্তু ইবনে কাইয়েম বলেন যে, এ ব্যাপারে কোন প্রামান্য হাদীস নেই। যাদুল মায়াদ ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

পরিচ্ছেদঃ আক্বীকার বর্ণনা

২৮৪৩। বুরাইদাহ (রা) বলেন, জাহিলী যুগে আমাদের কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে একটি বকরী জবাই করতো এবং শিশুর মাথায় ঐ পশুর রক্ত মেখে দিতো। অতঃপর আল্লাহ যখন দীনে ইসলাম আনলেন, আমরা বকরী জবাই করতাম, শিশুর মাথা মুন্ডন করতাম এবং তাতে যাফরান মাখতাম।

দেনমোহর ছিল পৌত্তলিক প্রথা

১৭৮ সীরাতুন নবী (সা)

খাদীজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়ে

রাসূল (সা) খাদীজার এই প্রস্তাব স্বীয় চাচাদেরকে জানালেন। চাচা হামযা রাসূল (সা)-কে সাথে নিয়ে তৎক্ষণাৎ খাদীজার পিতা খুওয়ায়লিদের কাছে চলে গেলেন। তার সাথে দেখা করে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিলেন এবং অবিলম্বে বিয়ে সম্পন্ন হল।

ইবন হিশাম জানান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খাদীজাকে বিশটি তরুণ উট মোহরানা হিসাবে দিয়েছিলেন। খাদীজাই ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথমা স্ত্রী এবং তাঁর

একত্রে চার স্ত্রী রাখাও ছিল ইহুদীদের প্রথা

অনেক মুসলিমই খুব গর্বের সাথে দাবি করেন যে, ইসলামের পূর্বে নাকি যতখুশি স্ত্রী রাখার নিয়ম ছিল। ইসলাম এসেই প্রথম স্ত্রীর সংখ্যা চারে সীমাবদ্ধ করে দেয়, যেটাকে ইসলামের অনুসারিগণ খুব বিশাল নারী অধিকার বলে দাবী করে। চার স্ত্রী রাখা কীভাবে নারী অধিকারের প্রমাণ বহন করে, তা আমার জানা নেই, কিন্তু মুসলিমদের এই দাবিটিও নোংরা মিথ্যাচার। কারণ মুহাম্মদ এই নিয়মটি শুধুমাত্র কপি করেছেন, ইহুদি ধর্ম থেকে। ইহুদিদের মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই স্ত্রীর সংখ্যা সর্বোচ্চ চারে সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য, ইহুদি ধর্মের তালমুদে এটিও বর্ণিত আছে যে, সামর্থ্য থাকলেই শুধুমাত্র একাধিক স্ত্রী রাখা যাবে। যেটিও ইসলাম সরাসরি কপি করেছে। আসুন ইহুদি ধর্মে সর্বোচ্চ চার স্ত্রী রাখার নিয়মটি জেনে নিই। ইহুদিদের ব্যাবিলনীয় তালমুদের ইংরেজি অনুবাদ থেকে সরাসরি নিচে দেয়া হলো

Babylonian Talmud: Yevamoth 44a

Talmud - Mas. Yevamoth 44a

IF ONE OF THESE, HOWEVER, WAS ELIGIBLE[1] AND THE OTHER INELIGIBLE,[1] THEN IF HE[2] SUBMITS TO HALIZAH IT MUST BE FROM HER WHO IS INELIGIBLE,[3] AND IF HE CONTRACTS LEVIRATE MARRIAGE IT MAY BE EVEN WITH HER WHO IS ELIGIBLE.

MAY. And is he allowed?[5] Surely it was taught: Then the elder's of his city shall call him,[6] 'they' but not their representative; 'and speak unto him'[6] teaches that he is given suitable advice. If he,[2] for instance, was young and she[7] old, or if he was old and she was young, he is told, 'What would you with[8] a young woman'? or 'What would you with an old woman'? 'Go to one who is [of the same age] as yourself and create no strife in your house'![9] — This is applicable to that case only where he can afford it.[10] If so, even more wives also![11] — Sound advice was given: Only four but no more, so that each may receive one marital visit a month.[12]

(1) To marry a priest. V. Lev. XXI, 7.
(2) The levir.
(3) So that the halizah shall not disqualify the eligible widow from marrying a priest.
(4) If there were only four brothers and all of them died, how could levirate marriage take place?
(5) To marry four wives.
(6) Deut. XXV, 8.

Babylonian Talmud: Yevamoth 65a

If the husband states that he intends taking another wife to test his potency.[20] R. Ammi ruled: 'He must in this case also divorce [his present wife] and pay her the amount of her kethubah; for I maintain that whosoever takes in addition to his present wife another one must divorce the former and pay her the amount of her kethubah.'

Raba said: A man may marry wives in addition to his first wife; provided only that he possesses the means to maintain them.

Hebrewbooks, Baba Batra 75A

When you said yes, I saw, he said to him, empty. As two stories of **the first Adam**, Rabbi Yehuda says **a hundred cubits** against the temple and its walls, which it is said that we built like plantings grown in their youth, our daughters, like women, cut the pattern of the temple.

সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

২৯৩৯। আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস (রা) বলেন, আমি টাক মাথাওয়ালা অর্থাৎ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)কে কালো পাথর হাজারে আসওয়াদ চুমো দিতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর, তুমি কারও ক্ষতিও করতে পার না এবং উপকারও করতে পার না। আমি যদি রাসুলুল্লাহ সা কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমি তোমায় চুম্বন করতাম না।

৪৪৮৫ ইয়াহূদীরা ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলিমদের কাছে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেন, তোমরা ইয়াহূদীদের কিতাবকে বিশ্বাসও কোরো না আর অবিশ্বাসও কোরো না এবং এই আয়াত নাযিল হয়- "তোমরা বল, আমরা আল্লাহে ঈমান এনেছি এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে......"- (সূরা বাকারা ১৩৬)।

৩৪৬২ রাসূল সা বলেছেন, ইয়াহূদী ও নাসারারা দাড়ি-চুলে রং লাগায় না। অতএব তোমরা তাদের বিপরীত কাজ কর।

৩৮৩৮ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, মুশরিকগণ সাবীর পাহাড়ের উপর সূর্যের কিরণ না পড়া পর্যন্ত মুযদালাফা হতে রওয়ানা হত না। নবী সা সূর্য উঠার আগে রাওয়ানা হয়ে তাদের প্রথার খেলাফ করেন।

আরো কিছু কপি থিওরী

ইসলামের মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টি সম্পর্কে বেশিরভাগ বর্ণনাই প্রাচীন বাইবেল এবং ইহুদীদের সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে সরাসরি কপি করা। **এর সাথে আরো যুক্ত হয়েছে সেই সময়ে প্রভাববিস্তারকারী ও প্রচলিত নানা মতবাদের**। আসুন সেসব সম্পর্কে কিছু জেনে নেয়া যাক।

Thales, water philosophy : থেলিসের পানি তত্ত্ব বা পানি-দর্শন

থেলিস মনে করেন যে, পানি (water) সমস্ত দ্রব্যের মূল ও আদি কারণ। পানি থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি এবং পানিতেই সব কিছু বিলীন হচ্ছে। পৃথিবী মহাসমুদ্রে ভাসমান থেকে পানি হতে প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করে। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই পানির নানা রূপান্তর মাত্র। জগতের যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের গোচরীভূত হচ্ছে তার মধ্যে পানির গুণ এই যে, কঠিন, তরল, বায়বীয় এ তিন রকম অবস্থা পানি অতি সহজেই ধারণ করতে পারে। পানি কখনও বাষ্প হচ্ছে, কখনও বা জমে বরফ হচ্ছে। নদী, হ্রদ ইত্যাদি জলাশয় গ্রীষ্মকালে শুকোতে থাকে, বর্ষায় আবার প্লাবিত হয়। এ ছাড়াও সমুদ্রবক্ষে দ্বীপের উৎপত্তি, নদীগর্ভে নতুন ভূভাগের সৃষ্টি, ভূমিকম্পে জলরাশির আবির্ভাব ও তিরোভাব এ সমস্ত ঘটনা পানির ক্রিয়ারূপেই সম্পন্ন। বস্তুত পানিই সৃষ্টির মূল উপাদান। বস্তুমাত্রই পানি অবস্থাভেদে উৎপন্ন। পানি যে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তির উৎস, পানিই যে দ্রব্যের মূল ও আদি উপাদান, বস্তুত এটিই হচ্ছে থেলিসের দর্শন ও বিজ্ঞানসম্মত মতামত।

প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক থেলিস। তার মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালের দিকে। তিনি ছিলেন প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক, এবং তার মতবাদই সারা পৃথিবীতে সেসময় সবচাইতে প্রভাবশালী মতবাদ বলে বিবেচিত হতো। তিনি মনে করতেন, "সবকিছুর আদিমতম উপাদান হচ্ছে পানি"। তার এই মতবাদও অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ায় পরবর্তী সময়ের প্রায় সকল দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের ওপরই এই মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই প্রভাব আমরা দেখতে পাই বাইবেলের মধ্যে, একইসাথে কোরআনের মধ্যেও।

কুরআন ১১/৭- তিনিই সর্বশক্তিমান, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমীনকে ছয় দিনে আর **তিনি সিংহাসনে(আরশে) আসীন ছিলেন যা ছিল পানির উপরে।**

(সূরাহ হূদ ১১/৭) তখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল।

বাইবেল, আদিপুস্তক ১

আদিপুস্তক ১

১ শুরুতে, ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। প্রথমে পৃথিবী সম্পূর্ণ শূন্য ছিল; পৃথিবীতে কিছুই ছিল না।

২ অন্ধকারে আবৃত ছিল জলরাশি আর ঈশ্বরের আত্মা সেই জলরাশির উপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

৬ তারপর ঈশ্বর বললেন, "জলকে দুভাগ করবার জন্য আকাশমণ্ডলের ব্যবস্থা হোক।"

৭ তাই ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি করে জলকে পৃথক করলেন। এক ভাগ জল আকাশমণ্ডলের উপরে আর অন্য ভাগ জল আকাশমণ্ডলের নীচে থাকল।

৯ তারপর ঈশ্বর বললেন, "আকাশের নীচের জল এক জায়গায় জমা হোক যাতে শুকনো ডাঙা দেখা যায়।" এবং তা-ই হল।

মহাভারত, অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়, বিবরণ-সৃষ্টিবিস্তার

প্রথমে কেবল একমাত্র সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যামান ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মরীচি, অত্রি,অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত অগ্নিতুল্য পুত্রের উৎপত্তি হয়।

সমগ্র বিশ্ব এক ঘোরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, পরমব্রহ্ম নিজ তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জল সৃষ্টি করলেন। সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করলে একটি অতিকায় সুবর্ণ অণ্ড বা ডিম সৃষ্টি হয়। সেই অণ্ডের মধ্যে পরমব্রহ্ম স্বয়ং প্রবেশ করেন। এরপর অণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এর একভাগ দ্বারা আকাশ ও অপর ভাগ দ্বারা ভূমণ্ডল তৈরি হয়। এরপর ব্রহ্মা মন থেকে দশজন

সাত আসমান ও সাত জমিন

প্রাচীনকালের ধর্মীয় বা পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বে ধারণা করা হতো যে, পৃথিবীর ওপর সাতটি আসমান বা আকাশমণ্ডলের সাতটি স্তর রয়েছে, একই সাথে মাটির নিচেও রয়েছে সাতটি পৃথিবী। প্রাচীনকালে এগুলি দেবদেবী বা অতিপ্রাকৃতিক সত্ত্বা সমূহের আবাসস্থল হিসেবে গণ্য করা হতো। দৃশ্যমান জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তু যেমন গ্রহ-নক্ষত্র, এসবকে এই আসমানসমূহের সাথে সম্পর্কিত করা হত।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ান সভ্যতায় সপ্ত আসমানের ধারণা বিকশিত হয়েছিল। সুমেরীয় ভাষায় স্বর্গ (আসমান বা আকাশ) ও পৃথিবীকে (জমিন) বলা হত। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষের দিকে সুমেরীয় জাদুমন্ত্রে সপ্তস্বর্গের উল্লেখ আছে, যেমন একটিতে এরকম লেখা "আন-ইমিনবি কি-ইমিনবি" ("স্বর্গ সাতটি, পৃথিবী সাতটি") *[Barnard, Jody A. (2012). The Mysticism of Hebrews: Exploring the Role of Jewish Apocalyptic Mysticism in the Epistle to the Hebrews. Mohr Siebeck. p. 62. ISBN 978-3-16-151881-2. Retrieved 3 June 2015] [Horowitz, Wayne (1998). Mesopotamian Cosmic Geography. Eisenbrauns. p. 208. ISBN 0-931464-99-4. Retrieved 3 June 2015]*

হিন্দু ধর্মেও সাত স্বর্গের কথা বলা হয়েছে। স্বর্গকে"স্বর্গলোক" বা ঊর্ধ্বলোকও বলা হয়। পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বাংশ সাতটি লোক বা জগতের সমন্বয়ে গঠিত। পর্যায়ক্রমে এগুলি হচ্ছেঃ ভূলোক (পৃথ্বীলোক বা পৃথিবী), ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সবার ঊর্ধ্বে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক।

হিন্দু পুরাণ এবং অথর্ববেদে ১৪ টি লোকের কথা বলা হয়েছে। এর ৭টি স্বর্গ; বাকি ৭টি পাতাল বা নরক। সপ্তস্বর্গের ঠিক নিচেই সপ্তপাতাল অবস্থিত। ঐরাবত স্বর্গের প্রবেশদ্বার পাহারা দিচ্ছে। [শিবপুরাণ, বি. কে. চতুর্বেদী (২০০৪), পৃষ্ঠা ১২৪]

ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ তালমুদ অনুসারে মহাবিশ্ব সপ্ত স্বর্গ বা সাত আসমানসমূহ (হিব্রু ভাষায়: שָׁמַיִם "শামাইম"; এই শব্দেরই আরবি স্বগত্রীয় শব্দ "সামাওয়াত") সমন্বয়ে গঠিত ["Angelology". Jewish Encyclopedia]। এগুলির নামঃ

> বিলোন (וילון), রাকিয়া (רקיע), শেহাকিম (שחקים), যেবুল (זבול), মা'ওন (מעון), মাখোন/মাকোন (מכון), আরাবথ (ערבות)– সপ্তম স্বর্গ যেখানে 'ওফানিম' (যিহিষ্কেলের পুস্তকে বর্ণিত ঈশ্বরের স্বর্গীয় রথের চক্ররূপী রক্ষী), সরাফগণ ('সেরাফিম' – উচ্চপদের স্বর্গদূত বা ফেরেশতা অথবা এক জাতের আগ্নেয় স্বর্গীয় সত্তা), 'হায়োথ' বা 'খায়োৎ' (আরশ বহনকারী ফেরেশতা বা ঈশ্বরের আসনবাহক স্বর্গদূত) এবং প্রভূর সিংহাসন অবস্থিত [*Hagigah 12b*]।

ইহুদিদের 'মেরকাবাহ' (স্বর্গীয় রথ) ও 'হেখালৎ' ("প্রাসাদসমূহ") সাহিত্যে সপ্তস্বর্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হনোকের ৩য় পুস্তকে এর বর্ণনা পাওয়া যায় [Scholem, Gershom (1965). Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and the Talmudic Tradition.]।

খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারেও বাইবেলে কয়েকটি আসমানের কথা বলা হয়েছে। বাইবেলের নূতন নিয়মে তৃতীয় স্বর্গের একটি স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। [২য় করিন্থীয় ১২.২-৪]

পৃথিবী স্থির এবং নড়াচড়া করে না

আল্লাহই আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন যাতে ও দু'টো টলে না যায়। ও দু'টো যদি টলে যায় তাহলে তিনি ছাড়া কে ও দু'টোকে স্থির রাখবে? (কোরআন ৩৫:৪১)

তিনি আসমানসমূহ নির্মাণ করেছেন খুঁটি ছাড়া—তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ; তিনিই যমীনে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। (কুরআন ৩১ঃ১০)

কুরআন ৮৮/২০ এর তাফসীর

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, সপ্তম খণ্ড [৩০তম পারা] ৭৪৯

١٩. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ .

১৯. আর পর্বতমালার প্রতি, কিরূপে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?

٢٠. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ أَيْ بُسِطَتْ فَيَسْتَدِلُّوْنَ بِهَا عَلَى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَوُحْدَانِيَّتِهٖ وَصُدِّرَتْ بِالْإِبِلِ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ مُلَابَسَةً لَهَا مِنْ غَيْرِهَا وَقَوْلُهٗ سُطِحَتْ ظَاهِرٌ فِيْ أَنَّ الْأَرْضَ سَطْحٌ وَعَلَيْهِ عُلَمَاءُ الشَّرْعِ لَا كُرَةٌ كَمَا قَالَهٗ أَهْلُ الْهَيْئَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الشَّرْعِ .

২০. আর ভূতলের দিকে কিরূপে তাকে সমতল করা হয়েছে? সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সারকথা, এ সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর কুদরত ও একত্বের প্রতি ঈমান আনাই বাঞ্ছনীয় ছিল। সর্বপ্রথম উষ্ট্রের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে, যেহেতু এটা তাদের সাথে অন্যগুলোর তুলনায় অধিক সম্পৃক্ত। سُطِحَتْ শব্দ দ্বারা বাহ্যত এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী সমতল। শরিয়তের আলিমগণের মতও এটাই, ভূতত্ত্ববিদদের মতানুরূপ গোলাকার নয়। যদিও তাদের সে দৃষ্টিভঙ্গি শরিয়তের কোনো আহকামের জন্য বিপত্তিকর নয়।

নবী মুহম্মাদ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও টাইমলাইন

৫৭০ – মক্কায় জন্ম
৫৭৬ – মাতার মৃত্যুর পর এতিম
৫৯৫ – ধনী ব্যাবসায়ী খাদিজার সাথে বিবাহ
৬১০- ৪০ বছর বয়সে প্রথম ওহী নাজিলের খবর
৬১৯ – নবির নিরাপত্তা প্রদানকারী চাচা আবু তালিবের মৃত্যু
৬২০ – বোরাকে চড়ে মিরাজ গমন ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ
৬২২ – মক্কা হতে মদিনায় হিজরত ও আশ্রয় লাভ
৬২৩ – মক্কার বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলা ও লুট করার আদেশ প্রদান
৬২৪ – বদরের যুদ্ধ (জয়লাভ)
৬২৪ – মদিনার ইহুদি গোত্র বানু কাইনুকাকে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ
৬২৪ – নবী মহাম্মাদ (দঃ) এর বিরুদ্ধে কবিতা লেখায় ইহুদি কবি আবু আফাক এর হত্যার আদেশ
৬২৪ – কবি আবু আফাক এর হত্যার বিরুদ্ধে কবিতা লেখায় মহাম্মাদ (দঃ) কর্তৃক কবি আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যার আদেশ
৬২৪ – নবি মহাম্মাদ (দঃ) কর্তৃক ইহুদি কবি কাব বিন আশরাফকে হত্যার আদেশ

৬২৫ – উহুদের যুদ্ধ (পরাজিত)
৬২৫ – মদিনার ইহুদি গোত্র বানু নাদিরকে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ
৬২৭ – খন্দকের যুদ্ধ (জয়লাভ, প্রকৃত অর্থে কোন যুদ্ধ হয় নাই)
৬২৭ – মদিনার ইহুদি গোত্র বানু কুরাইযার ৯০০ পুরুষ হত্যা। নারি ও শিশুদের মালে গনিমত হিসাবে ভাগ বাটোয়ারা ও ইয়ামেনে দাস-দাসীর বাজারে বিক্রয় বিনিময়ে মুসলিমদের জন্য অস্ত্র ক্রয়
৬২৮ (৬ হিজরি) – মক্কায় হজ্জ পালনের নিরাপত্তার জন্য মক্কার মুশরিকদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর
৬২৮ – খাইবার আক্রমন, ইহুদি নিধন ও জীবিতদের উপর জিজিয়া কর আরোপ
৬২৯ – খ্রিস্টান ভুমিতে মুতা যুদ্ধের আদেশ (পরাজিত)
৬৩০ (৮ হিজরি) – আকস্মিক হামলায় মক্কা বিজয়
৬৩১ (৯ হিজরি) – খ্রিস্টান ভুমিতে দ্বিতীয় অভিযান তাবুকের যুদ্ধে নেতৃত্ব দান (কোন যুদ্ধ হয় নাই, কোন শত্রু সেনা ছিল না)
৬৩২ (১০ হিজরি) – নবীর ইন্তেকাল

কুরআন বুঝার জন্য কুরআনের সূরাসমূহের নাজিলের সময়ানুক্রম জানা জরুরি। নিচে কুরআনের সূরাসমূহের নাজিলের সময়ানুক্রম অনুসারে সূরার নাম উল্লেখ করা হল:

Order	Sura Name	Number	Type	Note
1	Al-Alaq	96	Meccan	
2	Al-Qalam	68	Meccan	Except 17-33 and 48-50, from Medina
3	Al-Muzzammil	73	Meccan	Except 10, 11 and 20, from Medina
4	Al-Muddaththir	74	Meccan	
5	Al-Faatiha	1	Meccan	
6	Al-Masad	111	Meccan	
7	At-Takwir	81	Meccan	
8	Al-A'laa	87	Meccan	
9	Al-Lail	92	Meccan	
10	Al-Fajr	89	Meccan	
11	Ad-Dhuhaa	93	Meccan	
12	Ash-Sharh	94	Meccan	
13	Al-Asr	103	Meccan	
14	Al-Aadiyaat	100	Meccan	
15	Al-Kawthar	108	Meccan	
16	At-Takaathur	102	Meccan	
17	Al-Maa'un	107	Meccan	Only 1-3 from Mecca; the rest from Medina
18	Al-Kaafiroon	109	Meccan	
19	Al-Fil	105	Meccan	
20	Al-Falaq	113	Meccan	
21	An-Naas	114	Meccan	
22	Al-Ikhlaas	112	Meccan	
23	An-Najm	53	Meccan	Except 32, from Medina
24	Abasa	80	Meccan	
25	Al-Qadr	97	Meccan	
26	Ash-Shams	91	Meccan	
27	Al-Burooj	85	Meccan	
28	At-Tin	95	Meccan	
29	Quraish	106	Meccan	
30	Al-Qaari'a	101	Meccan	
31	Al-Qiyaama	75	Meccan	
32	Al-Humaza	104	Meccan	
33	Al-Mursalaat	77	Meccan	Except 48, from Medina
34	Qaaf	50	Meccan	Except 38, from Medina
35	Al-Balad	90	Meccan	
36	At-Taariq	86	Meccan	

37	Al-Qamar	54	Meccan	Except 44-46, from Medina
38	Saad	38	Meccan	
39	Al-A'raaf	7	Meccan	Except 163-170, from Medina
40	Al-Jinn	72	Meccan	
41	Yaseen	36	Meccan	Except 45, from Medina
42	Al-Furqaan	25	Meccan	Except 68-70, from Medina
43	Faatir	35	Meccan	
44	Maryam	19	Meccan	Except 58 and 71, from Medina
45	Taa-Haa	20	Meccan	Except 130 and 131, from Medina
46	Al-Waaqia	56	Meccan	Except 81 and 82, from Medina
47	Ash-Shu'araa	26	Meccan	Except 197 and 224-227, from Medina
48	An-Naml	27	Meccan	
49	Al-Qasas	28	Meccan	Except 52-55 from Medina and 85 from Juhfa at the time of the Hijra
50	Al-Israa	17	Meccan	Except 26, 32, 33, 57, 73-80, from Medina
51	Yunus	10	Meccan	Except 40, 94, 95, 96, from Medina
52	Hud	11	Meccan	Except 12, 17, 114, from Medina
53	Yusuf	12	Meccan	Except 1, 2, 3, 7, from Medina
54	Al-Hijr	15	Meccan	Except 87, from Medina
55	Al-An'aam	6	Meccan	Except 20, 23, 91, 93, 114, 151, 152, 153, from Medina
56	As-Saaffaat	37	Meccan	
57	Luqman	31	Meccan	Except 27-29, from Medina
58	Saba	34	Meccan	
59	Az-Zumar	39	Meccan	
60	Al-Ghaafir	40	Meccan	Except 56, 57, from Medina
61	Fussilat	41	Meccan	
62	Ash-Shura	42	Meccan	Except 23, 24, 25, 27, from Medina
63	Az-Zukhruf	43	Meccan	Except 54, from Medina
64	Ad-Dukhaan	44	Meccan	
65	Al-Jaathiya	45	Meccan	Except 14, from Medina
66	Al-Ahqaf	46	Meccan	Except 10, 15, 35, from Medina
67	Adh-Dhaariyat	51	Meccan	
68	Al-Ghaashiya	88	Meccan	
69	Al-Kahf	18	Meccan	Except 28, 83-101, from Medina
70	An-Nahl	16	Meccan	Except the last three verses from Medina
71	Nooh	71	Meccan	
72	Ibrahim	14	Meccan	Except 28, 29, from Medina
73	Al-Anbiyaa	21	Meccan	
74	Al-Muminoon	23	Meccan	
75	As-Sajda	32	Meccan	Except 16-20, from Medina
76	At-Tur	52	Meccan	
77	Al-Mulk	67	Meccan	
78	Al-Haaqqa	69	Meccan	
79	Al-Ma'aarij	70	Meccan	
80	An-Naba	78	Meccan	
81	An-Naazi'aat	79	Meccan	
82	Al-Infitaar	82	Meccan	
83	Al-Inshiqaaq	84	Meccan	
84	Ar-Room	30	Meccan	Except 17, from Medina
85	Al-Ankaboot	29	Meccan	Except 1-11, from Medina
86	Al-Mutaffifin	83	Meccan	
87	Al-Baqara	2	Medinan	Except 281 from Mina at the time of the Last Hajj
88	Al-Anfaal	8	Medinan	Except 30-36 from Mecca
89	Aal-i-Imraan	3	Medinan	

90	Al-Ahzaab	33	Medinan	
91	Al-Mumtahana	60	Medinan	
92	An-Nisaa	4	Medinan	
93	Az-Zalzala	99	Medinan	
94	Al-Hadid	57	Medinan	
95	Muhammad	47	Medinan	Except 13, revealed during the Prophet's Hijrah
96	Ar-Ra'd	13	Medinan	
97	Ar-Rahmaan	55	Medinan	
98	Al-Insaan	76	Medinan	
99	At-Talaaq	65	Medinan	
100	Al-Bayyina	98	Medinan	
101	Al-Hashr	59	Medinan	
102	An-Noor	24	Medinan	
103	Al-Hajj	22	Medinan	Except 52-55, revealed between Mecca and Medina
104	Al-Munaafiqoon	63	Medinan	
105	Al-Mujaadila	58	Medinan	
106	Al-Hujuraat	49	Medinan	
107	At-Tahrim	66	Medinan	
108	At-Taghaabun	64	Medinan	
109	As-Saff	61	Medinan	
110	Al-Jumu'a	62	Medinan	
111	Al-Fath	48	Medinan	Revealed while returning from Hudaybiyya
112	Al-Maaida	5	Medinan	Except 3, revealed at Arafat on Last Hajj
113	At-Tawba	9	Medinan	Except last two verses from Mecca
114	An-Nasr	110	Medinan	Revealed at Mina on Last Hajj

মুশরিকদের দলে ভিড়াতে তাদের দেবীদের নামে প্রশংসামূলক আয়াত ও পরবর্তীতে শয়তানের উপর দায় চাপিয়ে অস্বীকার!

আল তাবারি এবং ইবন সা'দ এ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাটি হলো-

'রাসূল সা তখন মক্কায় ইসলামের দাওয়াত প্রচার শুরু করেছেন। একদিন তিনি কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে বসে সদ্য ইসলামে দাখিল হওয়া মুসলিমদের মাঝে বক্তৃতা রাখছিলেন। সেখানে মক্কার অন্যান্য পৌত্তলিক কুরাইশরাও ছিলো। ঠিক এমন সময়ে, হজরত জিব্রাঈল আ ওহী নিয়ে রাসূল সা এর কাছে আগমন করেন। সেদিন জিব্রাঈল সূরা 'আন নাজম' নিয়ে অবতীর্ণ হন। তাবারি(র) এবং ইবন সা'দ (র) বলেছেন,- সেদিন সূরা আন নাজমের ১৯ এবং ২০ নাম্বার আয়াতের পর রাসূল সা আরো বাড়তি দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, যা আদতে জিব্রাঈল (আ) ওহী হিসেবে নিয়ে আসেন নি। এই দুই আয়াত মূলত শয়তান রাসূল সা কে ধোঁকা দিয়ে কোরআনের আয়াতের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলো।

পরে, জিব্রাঈল রাসূল সা কে এ ব্যাপারে সতর্ক করলে রাসূল সা তা ওহী ছিলো না বলে বাদ দেন। সূরা আন নাজমের ১৯ এবং ২০ নাম্বার আয়াতে হল মুশরিকদের পূজিত সবচে বড় তিন দেবী- লাত, উযযা এবং মানাতকে নিয়ে।

সূরা আন নাজমের ১৯ এবং ২০ নাম্বার আয়াত-

'তোমরা কী ভেবে দেখেছো লাত ও উযযা সম্পর্কে?'

'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

এই দুই আয়াতের পরে আরো দুটি বাড়তি আয়াত ছিলো যা পরে রাসূল সা ভুল বুঝতে পেরে বাদ দিয়েছিলেন। সেই আয়াত দুটি এরকম ছিলো-

তাঁরা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের (ক্ষমতাবান) দেবী

তাই এদের মধ্যস্ততা আশা করা যেতে পারে।

পরের দুই আয়াত শুনে মক্কার মুশরিকরা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠে। তারা ভাবলো, মুহাম্মদ সা এবার তাদের দেবীদের প্রশংসা করলেন। তার মনে করল, মুহাম্মদ সা তাদের দেবীদের প্রভূ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাই, সেদিন মুহাম্মদ সা এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মক্কার মুশরিকরাও সিজদা করেছিলো মক্কা প্রাঙ্গণে। [Ref: Tabakat ibn Sa'd, Tafsir e Tabari]

পরে নবী নিজেই আবার এই শেষের দুই আয়াত বাদ দিয়ে সংশোধনমূলক আয়াত নাজিল করেন। এবং সূরাটির অন্যান্য আয়াত নাজিল হয়। আর সংশোধনের কারণ হিসেবে বললেন, ওগুলো আসলে আল্লাহ প্রেরিত আয়াত ছিল না। শয়তান ধোঁকা দিয়ে তার মুখ দিয়ে এই আয়াতগুলো বলিয়ে নিয়েছে। এর পরিবর্তে তিনি অন্য আয়াত দেন, দেবীদের প্রশংসামূলক আয়াতগুলো বাতিল ঘোষণা করেন।

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওযযা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?

পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এমতাবস্থায় এটা তো হবে অসংগত বন্টন।

এগুলো তো শুধু কতগুলো নাম, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছ। এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথ হিদায়াত এসেছে।

(সংশোধিত আয়াত)

উল্লেখ্য, সেই সময়ে আরবের পৌত্তলিকদের পূজিত সবচে বড় তিন দেবী ছিল লাত, উযযা এবং মানাত। এদের তিনজনকে আল্লাহর তিন কন্যা হিসেবেও গণ্য করা হতো। পৌত্তলিকগণ বারবার মুহাম্মদের কাছে আবদার করছিল, মুহাম্মদ তাদের দেবদেবীকে মেনে নিলে তারাও মুহাম্মদের আল্লাহকে মেনে নিবে। পৌত্তলিকগণ এই বিষয়টি খুবই অপছন্দ করছিল যে, নবী মুহাম্মদ তাদের দেবদেবী সম্পর্কে লাগাতার কটূক্তি, গালাগালি এবং সমালোচনাতে লিপ্ত ছিল। অনেকবার তাকে বোঝাবার পরেও সে ধর্মদ্রোহী কথা, কটূক্তি, দেবদেবীকে গালাগালি থেকে বিরত থাকে নি। এমনকি, মুহাম্মদের চাচা আবু তালিবের কাছে বিচার দিয়েও কোন কাজ হয় নি।

এরকম পরিস্থিতিতে মুহাম্মদের মুখ থেকে পৌত্তলিকদের দেবী সম্পর্কিত ঐ দুই আয়াত শুনে মক্কার মুশরিকরা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তারা ভাবলো, মুহাম্মদ এখন থেকে তাদের দেবদেবীদের নিয়ে আর কটূক্তি করবে না। বরঞ্চ প্রশংসা করবেন। মুহাম্মদ তাদের দেবদেবীদের মেনে নিয়েছেন, তারাও মুহাম্মদের আল্লাহকে মেনে নেবে। দুই পক্ষের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে গেছে। এখন সকল ধর্মের লোকের সহাবস্থান সম্ভব হবে। কেউ কারো উপাস্য দেবদেবী বা ঈশ্বরকে নিয়ে আর কটূক্তি করবে না। তাই, সেদিন মুহাম্মদ এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মক্কার মুশরিকরা একই সাথে সিজদা করেছিলো মক্কা প্রাঙ্গণে।

কিন্তু পরবর্তীতে নবী মুহাম্মদ দাবী করলেন, ঐ আয়াত দুটি শয়তানের ধোঁকা। তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কোন দেবদেবীকে মানবেন না। উনি আয়াত দুটি বাদ দিতে বললেন। তখন আবারো শুরু হলো দুই দলের দ্বন্দ্ব।

[[শয়তান কী নবীর ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে?

সুনান আন-নাসায়ী (তাহকীককৃত)

পরিচ্ছেদঃ ছুটে যাওয়া সালাত কিভাবে কাযা করা যায়?

৬২৩। আবু হুরায়রাহ্ (রা) বলেন, আমরা **রাসূলুল্লাহ সা এর সাথে সারা রাত সফর করার পরে শেষ রাতে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করি এবং ঘুমিয়ে পড়ি। সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কারো ঘুম ভাঙলো না।** তারপর রাসূলুল্লাহ সা আমাদের বললেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাহনের লাগাম ধরে এ জায়গা ত্যাগ কর। কারণ **এ স্থানে শয়তান আমাদের কাছে এসেছে।** আবূ হুরায়রাহ (রা) বলেন, আমরা তাই করলাম। তারপর কিছু দূর গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা পানি এনে উযু করলেন। এরপর ফজরের সালাত কাযা আদায় করলেন।]]

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) ৫৭৫, সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ৪৮৬২।

পরিচ্ছদঃ সূরা আন-নাজমের সাজদাহ

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, নাবী সা সূরা নাজমের মধ্যে সিজদা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলিম, মুশরিক সবাই সিজদা করল।

উপরের হাদিসটি থেকে জানা যায়, সূরা নাজমের আয়াত আবৃত্তি করার পরে শুধু মুসলিমগণই নয়, মুশরিকরাও নবী মুহাম্মদের সাথে তার অনুসরণ করে সকলে সিজদা করলো। প্রশ্ন হচ্ছে, ***সেই সময়ে তো মুহাম্মদের সাথে মুশরিকদের চরম দ্বন্দ্ব এবং শত্রুতা চলছে। কী এমন হলো, যার ফলে নবী মুহাম্মদ এবং তার অনুসারীরা, সেই সাথে মুশরিকরাও তারই সাথে একত্রে কোরআনের একটি সূরার সাথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করলো? এমন কী ঘটে গেল?***

আরো একটি হাদিস দেখি। যেই হাদিসে দেখা যায়, মক্কায় থাকা অবস্থায় নবী যখন সূরা নজম পাঠ করে শোনান, তখন একজন বৃদ্ধ কাফের লোকও মাটি কপালে নিয়ে সিজদার কাজটি করেছিল। পরবর্তী সময়ে সেই বৃদ্ধটি কাফের অবস্থায় নিহত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, বৃদ্ধটি কাফের অবস্থাতেই সিজদা করেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, সূরা নজম শুনে কাফের কেন সিজদার মত মাটি কপালে তুলবে?

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

পরিচ্ছেদঃ সূরা আন্ নাজমের সিজদা।

১০০৯। **একবার নবী সা সূরা আন্ নাজম তিলাওয়াত করেন, এরপর সিজ্‌দা করেন। তখন উপস্থিত লোকদের এমন কেউ বাকী ছিল না, যে তাঁর সঙ্গে সিজদা করেনি।** কিন্তু এক ব্যাক্তি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিয়ে কপাল পর্যন্ত তুলে বলল, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। (আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন) পরে আমি এ ব্যাক্তিকে দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

ভেবে দেখুন, এত বড় আশ্চর্য ঘটনা কীভাবে ঘটে? এটি জানতে আমাদের যেতে হবে সিরাত গ্রন্থ এবং তাফসীর সমূহতে।

[তাবারির ভাষ্য : রাসুলে করিম (সা.) সে সময়ে আপন লোকজনের ভালো-মন্দ চিন্তায় থাকতেন।
তাদের আকর্ষণ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। তাদের দলে নেওয়ার জন্য কোনো পন্থা
উদ্ভাবনের জন্য আকুলিবিকুলি করতেন বলে কোথাও কোথাও উল্লেখ আছে। একটি পন্থার কথা ইবনে
হামিদ আমার কাছে বলেছেন। বলেছেন যা সালামা বলেছেন ইবনে ইসহাক মদিনার ইয়াজিদ ইবনে
জিয়াদ সূত্রে ও ইয়াজিদ যা পেয়েছিলেন ইবনে কাব আল-কুরাজির সূত্রে। পন্থাটি হলো :
রাসুলে করিম (সা.) দেখলেন, তাঁর নিজের লোক তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর
কাছ থেকে তিনি যা এনেছেন, তার প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব। এসব দেখেশুনে খুব কষ্ট পেতেন
তিনি। ভাবতেন, আল্লাহর কাছ থেকে যদি এমন একটা ওহি আসত, যাতে তাঁর নিজের লোকদের
সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো হয়ে যায়, তাহলে খুব ভালো হতো। তিনি তাদের ভালোবাসতেন, তাদের
ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা করতেন। কাজেই তাঁর কর্তব্য সম্পাদনে যে বাধা উপস্থিত হচ্ছে, তা দূর হয়ে
গেলে ভালো হতো। কাজেই এর ওপর তিনি ধ্যান করলেন, এটা তিনি মনেপ্রাণে চাইলেন, এই
জিনিস (ভাবনা) তাঁর কাছে খুব প্রিয় হয়ে দেখা দিল। তারপর আল্লাহ ইরশাদ করলেন, 'অস্তগামী
নক্ষত্রের শপথ, তোমাদের সঙ্গী বিপথগামীও নয়, সে মনগড়া কথাও বলে না, এখান থেকে তোমরা

সিরাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) ● ১৯৭

কি ভেবে দেখেছ "লাত" ও "উজ্জা" সম্পর্কে এবং তৃতীয় বস্তু "মানাত" সম্পর্কে?' আল্লাহর বাণী এই পর্যন্ত এলো, তখন শয়তান, যে তাঁর [রাসুলের (সা.)] এই ধ্যান ও স্বজনদের সঙ্গে আপসের ব্যাপারটা পছন্দ করছিল না, সে করল কি, তাঁর জিহ্বায় জুড়ে দিল, এরা হলো মহান গারানিক,[১] যার মধ্যস্থতা অনুমোদিত।

কোরাইশরা এটা শুনে খুব আহ্লাদিত হয়ে গেল, তাদের দেবদেবী সম্পর্কে এমন প্রশংসাসূচক উক্তি শুনে তারা খুব খুশি হলো এবং তারা তাঁর কথা শুনতে মনোযোগী হয়ে উঠল। বিশ্বাসীগণ কিছুই সন্দেহ করল না, তাঁদের রাসুল (সা.) আল্লাহর কাছ থেকে যা আনেন, তা-ই সত্য। তাতে কোনো ভুল-ত্রুটি কিংবা মিথ্যা কামনা থাকতেই পারে না। সুরার শেষে সেজদার জায়গায় রাসুলে করিম (সা.) সেজদা দিলেন। তারাও দিল, কারণ রাসুলে করিমকে (সা.) মান্য করা তাদের কর্তব্য। বহু-ঈশ্বরবাদী কোরাইশ এবং অন্য যারা ছিল সেখানে, তারাও সেজদা করল। কারণ, রাসুলে করিম (সা.) তাদের দেবদেবীর নাম নিয়েছিলেন। কাজেই দেখা গেল, মসজিদের ভেতরে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবাই সেজদায় প্রণত হলো। আল-ওয়ালিদ ইবনে আল-মুগিরা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি নত হতে পারতেন না, কাজেই তিনি সেজদায় যেতে পারেন না। এক মুঠো ধুলো হাতে নিয়ে তাতেই মাথা ঠেকিয়েছিলেন। তারপর সবাই যে যার পথে চলে গেল। কোরাইশরা আনন্দে আটখানা। তারা বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ আমাদের দেবতা সম্পর্কে যা সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন! তিনি তাঁর আবৃত্তিতে বলেছেন তাদের দেবতারা হলেন গারানিক, যার মধ্যস্থতা অনুমোদিত।'

আবিসিনিয়ায় রাসুলে করিমের (সা.) সাহাবিদের কানে গেল সে কথা। তাঁরা শুনলেন কোরাইশরা সব মুসলমান হয়ে গেছে। অতএব, কিছু লোক তক্ষুনি রওনা হয়ে গেছেন, কিছু থেকে গেলেন।

তখন জিবরাইল (আ.) এলেন রাসুলে করিমের (সা.) কাছে। বললেন, 'এ কী করলে তুমি মুহাম্মদ? তুমি তাদের কাছে এমন কথা বলেছ, যা আমি আল্লাহর কাছ থেকে আনিনি, যা আল্লাহ কোনো সময় বলেননি।'

রাসুলে করিম (সা.) ভীষণ ব্যথিত হলেন, তিনি আল্লাহর ভয়ে ভীত হলেন। তখন আল্লাহ একটি প্রত্যাদেশ পাঠালেন, কারণ আল্লাহ তাঁর প্রতি বড় সদয় ছিলেন, তাঁকে শান্তি দিতে চাইতেন। তাঁর ভার লঘু করে দিতেন। তাঁকে বলতেন, তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত নবী ও রাসুল ঠিক তাঁরই মতো ইচ্ছা করতেন, ঠিক তাঁরই মতো চাইতেন, শয়তান কেবল মাঝেমধ্যে তাঁদের সেই চাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ইচ্ছেমতো একটা কিছু ঢুকিয়ে দিত। যেমন শয়তান এবার ঢুকিয়ে দিল তাঁর জিহ্বার মধ্যে। সুতরাং, শয়তান যা ঢুকিয়েছিল, তা খারিজ করে দিলেন আল্লাহ এবং আল্লাহ তাঁর আপন আয়াত প্রতিষ্ঠা করলেন, অর্থাৎ বলে দিলেন, 'তুমিও অন্যান্য নবী ও রাসুলের মতো একজন!' তখন আল্লাহ নাজিল করলেন, 'আমি তোমার আগে যেসব রাসুল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শয়তান তাদের আবৃত্তিতে কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে, কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে, আল্লাহ তা বিদূরিত করেন। তারপর আল্লাহ তাঁর নিজের আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[২] এমন করে আল্লাহ তাঁর রাসুলের দুঃখ মোচন করলেন, সমস্ত ভয় থেকে তাঁকে মুক্ত করলেন, তাদের দেবতা সম্পর্কে যে সমস্ত শব্দ শয়তান আল্লাহর বাণীর ভেতর প্রক্ষেপ করেছিল, তা বিদূরিত করেন। তিনি নাজিল করেন, 'তোমরা কি ভেবেছ ছেলেসন্তান তোমাদের জন্য আর মেয়েসন্তান আল্লাহর জন্য? এই রকম বণ্টন তো সংগত নয়। এগুলো কতিপয় নামমাত্র, যা তোমাদের পূর্বপুরুষ ও তোমরা রেখেছ এখান থেকে তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত এবং কে সৎপথপ্রাপ্ত'—এই পর্যন্ত। এর অর্থ হলো, কেমন করে তাদের দেবতাদের প্রক্ষেপ আল্লাহর সহাবস্থান করতে পারে?

শয়তানের এই আক্ষেপ খারিজ করে যখন আল্লাহর কাছ থেকে ওহি এল, তখন কোরাইশরা বলল, 'আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের দেবদেবীদের অবস্থান সম্পর্কে মুহাম্মদ আগে যা বলেছিল, তাতে এখন সে অনুতাপ করছে, সে তা বদল করে অন্য কিছু নিয়ে এসেছে।' এদিকে শয়তানের দেওয়া ওই শব্দগুলো সমস্ত পৌত্তলিকদের মুখে মুখে ঘুরে ফিরছিল। এখন তারা সবাই মুসলমানদের প্রতি, রাসুলে করিমের (সা.) প্রতি মারমুখী হয়ে উঠল। অন্যদিকে রাসুলে করিমের (সা.) সাহাবিরা যাঁরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাঁরা মক্কার কা

51. ACCOUNT OF THE CAUSES OF THE RETURN OF THE COMPANIONS OF THE PROPHET, MAY PEACE BE ON HIM, FROM ABYSSINIA

 I

Volume 1, Parts 1.51.1

Muhammad Ibn `Umar informed us; he said: Yunus Ibn Muhammad Ibn Fudalah al-Zafari related to me on the authority of his father; (second chain) he (Ibn Sa'd) said: Kathir Ibn Zayd related to me on the authority of al-Muttalib Ibn 'Abd Allah Ibn Hantab; they said:

The Apostle of Allah, may Allah bless him, had seen his people departing from him. He was one day sitting alone when he expressed a desire: I wish, Allah had not revealed to me anything distasteful to them. Then the Apostle of Allah, may Allah bless him, approached them (Quraysh) and got close to them, and they also came near to him. One day he was sitting in their assembly near the Ka`bah, and he recited: "By the Star when it setteth", *(Qur'an, 53:1)* till he reached, "Have ye thought upon Al-Uzza and Manat, the third, the other". *(Qur'an, 53:19-20)* Satan made him repeat these two phrases: These idols are high and their intercession is expected. The Apostle of Allah, may Allah bless him, repeated them, and he went on reciting the whole surah and then fell in prostration, and the people also fell in prostration with him. Al-Walid Ibn al-Mughirah, who was an old man and could not prostrate, took a handful of dust to his forehead and prostrated on it. It is said: Abu Uhayhah Sa'id Ibn al-'As, being an old man, took dust and prostrated on it. Some people say: It was al-Walid who took the dust; others say: It was Abu Uhayhah; while others say: Both did it. They were pleased with what the Apostle of Allah, may Allah bless him, had uttered. They said: We know that Allah gives life and causes death. He creates and gives us provisions, but our deities will intercede with Him, and in what you have assigned to them, we are with you. These words pricked the Apostle of Allah, may Allah bless him. He was sitting in his house and when it was evening, Gabriel, may peace be on him, came to him and revised the surah. Then Gabriel said: Did I bring these two phrases. The Apostle of Allah, may Allah bless him, said: I ascribed to Allah, what He had not said.

108 Muḥammad at Mecca

↥
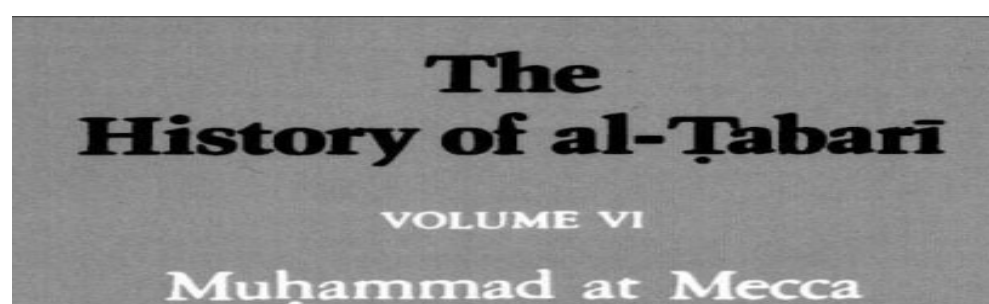
Ya'qūb b. Ibrāhīm—Muḥammad b. Isḥāq—Sa'īd b. Mīna the *mawlā* of Abū al-Bakhtarī:[168] Al-Walīd b. al-Mughīrah, al-'Āṣ b. Wā'il, al-Aswad b. al-Muṭṭalib, and Umayyah b. Khalaf met the Messenger of God and said, "Muḥammad, come and let us worship that which you worship and you worship that which we worship, and we shall make you a partner in all of our undertakings. If what you have brought is better than what we already have, we will be partners with you in it and take our share of it, and if what we have is better than what you have, you shall be partner with us in what we have, and you shall take your share of it." Then God revealed: "Say: O disbelievers ... (reciting) to the end of the sūrah.[169] [1192]

Satan Casts a False Revelation on the Messenger of God's Tongue

The Messenger of God was eager for the welfare of his people and wished to effect a reconciliation with them in whatever ways he could. It is said that he wanted to find a way to do this, and what happened was as follows.[170]

Ibn Ḥumayd—Salamah—Muḥammad b. Isḥāq—Yazīd b. Ziyād al-Madanī—Muḥammad b. Ka'b al-Quraẓī: When the Messenger of God saw how his tribe turned their backs on him and was grieved to see them shunning the message he had brought to them from God, he longed in his soul that something would come to him from God which would reconcile him with his tribe. With his love for his tribe and his eagerness for their welfare it would have delighted him if some of the difficulties which they made for him could have been smoothed out, and he debated with himself and fervently desired such an outcome. Then God revealed:[171]

> By the Star when it sets, your comrade does not err, nor is he deceived; nor does he speak out of (his own) desire ...

and when he came to the words:

> Have you thought upon al-Lāt and al-'Uzzā and Manāt, the third, the other?

Satan cast on his tongue, because of his inner debates and what he desired to bring to his people, the words:

> These are the high-flying cranes; verily their intercession is accepted with approval.[172]

When Quraysh heard this, they rejoiced and were happy and delighted at the way in which he spoke of their gods, and they listened to him, while the Muslims, having complete trust in their Prophet in respect of the messages which he brought from God, did not suspect him of error, illusion, or mistake. When he came to the prostration, having completed the sūrah, he prostrated himself and the Muslims did likewise, following their Prophet, trusting in the message which he had brought and following his example. Those polytheists of the Quraysh and others who were in the

↥

mosque[173] likewise prostrated themselves because of the reference to their gods which they had heard, so that there was no one in the mosque, believer or unbeliever, who did not prostrate himself. The one exception was al-Walīd b. al-Mughīrah, who was a very old man and could not prostrate himself; but he took a handful of soil from the valley in his hand and bowed over that. Then they all dispersed from the mosque. The Quraysh left delighted by the mention of their gods which they had heard, saying, "Muḥammad has mentioned our gods in the most favorable way possible, stating in his recitation that they are the high-flying cranes and that their intercession is received with approval." [1193]

The news of this prostration reached those of the Messenger of God's Companions who were in Abyssinia and people said, "The Quraysh have accepted Islam." Some rose up to return, while others remained behind. Then Gabriel came to the Messenger of God and said, "Muḥammad, what have you done? You have recited to the people that which I did not bring to you from God, and you have said that which was not said to you." Then the Messenger of God was much grieved and feared God greatly, but God sent down a revelation to him, for He was merciful to him, consoling him and making the matter light for him, informing him that there had never been a prophet or a messenger before him who desired as he desired and wished as he wished but that Satan had cast words into his recitation, as he had cast words on Muḥammad's tongue. Then God cancelled what Satan had thus cast, and established his verses by telling him that he was like other prophets and messengers, and revealed:

> Never did we send a messenger or a prophet before you but that when he recited (the Message) Satan cast words into his recitation *(umniyyah)*. God abrogates what Satan casts. Then God established his verses. God is knower, wise.[174]

Thus God removed the sorrow from his Messenger, reassured him about that which he had feared and cancelled the words [1194] which Satan had cast on his tongue, that their gods were the high-flying cranes whose intercession was accepted with approval. He now revealed, following the mention of "al-Lāt, al-ʿUzza and Manāt, the third, the other," the words:

> Are yours the males and his the females? That indeed were an unfair division! They are but names which you have named, you and your fathers . . .

to the words:

> to whom he wills and accepts.[175]

This means, how can the intercession of their gods avail with God?

When Muḥammad brought a revelation from God cancelling what Satan had cast on the tongue of His Prophet, the Quraysh said, "Muḥammad has repented of what he said concerning the position of your gods with God, and has altered it and brought something else." Those two phrases which Satan had cast on the tongue of the Messenger of God were in the mouth of every polytheists, and they became even more ill-disposed and more violent in their persecution of those of them who had accepted Islam and followed the Messenger of God.

Those of the Companions of the Messenger of God who had left Abyssinia upon hearing that Quraysh had accepted Islam by prostrating themselves with the Messenger of God now approached. When they were near Mecca, they heard that the report that the people of Mecca had accepted Islam was false. Not one of them entered Mecca without obtaining protection or entering secretly. Among those who came to Mecca and remained there until they emigrated to al-Madīnah and were present with the Prophet at Badr, were, from the Banū ʿAbd Shams b. ʿAbd Manāf b. Quṣayy, ʿUthmān b. ʿAffān b. Abī al-ʿĀs b. Umayyah, accompanied by his wife Ruqayyah the daughter of the Messenger of God; Abū Hudhayfah b. ʿUtbah b. Rabīʿah b. ʿAbd Shams, accompanied by his [1195] wife Sahlah bt. Suhayl; together with a number of others number-

175. 53:21-23,26, Ṭabarī explains *ḍīzā*, "unfair," as meaning *ʿawjā*, "crooked."

ing thirty-three men.

Al-Qāsim b. al-Ḥasan—al-Ḥusayn b. Dāūd—Ḥajjā—Abū Ma'shar—Muḥammad b. Ka'b al-Quraẓī and Muḥammad b. Qays: The Messenger of God was sitting in a large gathering of Quraysh, wishing that day that no revelation would come to him from God which would cause them to turn away from him. Then God revealed:

> By the Star when it sets, your comrade does not err, nor is he deceived . . .

and the Messenger of God recited it until he came to:

> Have you thought upon al-Lāt and al-'Uzzā and Manāt, the third, the other?

when Satan cast on his tongue two phrases:

> These are the high flying cranes; verily their intercession is to be desired.[176]

He uttered them and went on to complete the sūrah. When he prostrated himself at the end of the sūrah, the whole company prostrated themselves with him. Al-Walīd b. al-Mughīrah raised some dust to his forehead and bowed over that, since he was a very old man and could not prostrate himself. They were satisfied with what Muḥammad had uttered and said, "We recognize that it is God who gives life and death, who creates and who provides sustenance, but if these gods of ours intercede for us with him, and if you give them a share, we are with you."

That evening Gabriel came to him and reviewed the sūrah with him, and when he reached the two phrases which Satan had cast upon his tongue he said, "I did not bring you these two." Then the Messenger of God said, "I have fabricated things against God and have imputed to Him words which He has not spoken." Then God revealed to him:

> And they indeed strove hard to beguile you away from what we have revealed to you, that you should invent other than it against us . . .

176. Sūrah 53. This version of the false verses has *la-turjā*, "to be desired or hoped for."

to the words:

> and then you would have found no helper against us.[177]

He remained grief-stricken and anxious until the revelation of the verse:

[1196]

> Never did we send a messenger or a prophet before you . . . to the words . . . God is knower, wise.[178]

When those who had emigrated to Abyssinia heard that all the people of Mecca had accepted Islam, they returned to their clans, saying, "They are more dear to us"; but they found that the people had reversed their decision when God cancelled what Satan had cast upon the Messenger of God's tongue.

177. 17:73,75.
178. 22:52.

সূরা হজ্ব, আয়াত ৫২, ৫৩

আর আমি আপনার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি, সে যখনই (ওহীকৃত বাণী) পাঠ করেছে, শয়তান তার পাঠে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।

(তিনি এটা হতে দেন) এজন্য যে, যাতে তিনি শয়ত্বান যা মিশিয়ে দিয়েছে তা দ্বারা পরীক্ষা করতে পারেন তাদেরকে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এবং যারা শক্ত হৃদয়ের। নিশ্চয় যালিমরা দুস্তর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে।

৩৯২ তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, চতুর্থ খণ্ড [সপ্তদশ পারা]

٥٢. وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ هُوَ نَبِيٌّ أُمِرَ بِالتَّبْلِيْغِ وَلَا نَبِيٍّ أَيْ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيْغِ إِلَّآ إِذَا تَمَنّٰى قَرَأَ أَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ أُمْنِيَّتِهٖ ج قِرَاءَتِهٖ مَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِمَّا يَرْضَاهُ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ . وَقَدْ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سُوْرَةِ النَّجْمِ بِمَجْلِسٍ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ أَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى بِإِلْقَاءِ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٖ . "تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى * وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى" . فَفَرِحُوْا بِذٰلِكَ .

৫২. আমি আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল তিনি হলেন এমন নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিংবা নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে পড়েছে/ পড়তে চেয়েছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তার পাঠে যা কুরআন নয় এমন কিছু। যাতে যাদের নিকট তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তারা আনন্দিত হয়। একদা রাসূল ﷺ কুরাইশদের কোনো এক মজলিসে সূরা নাজমের এ আয়াত– أَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى পাঠ করার পর শয়তানের প্রক্ষেপণে পবিত্র রসনা থেকে একথা বেরিয়ে পড়ে যে– تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى * وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى [এ সকল উচ্চ মর্যাদাবান দেবতা অবশ্যই এদের সুপারিশের আশা করা যায়।] এতদ শ্রবণে কাফেররা খুবই আনন্দিত হয়।

ثُمَّ أَخْبَرَهُ جِبْرَئِيْلُ بِمَا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلٰى لِسَانِهٖ مِنْ ذٰلِكَ فَحَزِنَ فَسُلِّيَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ لِيَطْمَئِنَّ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ يُبْطِلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ط يُثْبِتُهَا وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِإِلْقَاءِ الشَّيْطَانِ مَا ذُكِرَ حَكِيْمٌ . فِيْ تَمْكِيْنِهٖ مِنْهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ .

অতঃপর হযরত জিবরীল (আ.) তাঁকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন যে, শয়তান আপনার অজান্তে মুখে একথা উচ্চারিত করে দিয়েছে। ফলে তিনি খুবই বিষণ্ণ হলেন। তখন তাঁকে পরবর্তী এই আয়াত দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করা হয়।, যেন তিনি শান্ত হন। আল্লাহ তা বিদূরিত করেন রহিত করেন শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুদৃঢ় করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয়ে যা উল্লেখ করা হলো। প্রজ্ঞাময় নিজের পক্ষ থেকে শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।

٥٣. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً مِحْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ شَكٌّ وَنِفَاقٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ أَيِ الْمُشْرِكِيْنَ عَنْ قَبُوْلِ الْحَقِّ وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ . خِلَافٍ طَوِيْلٍ مَعَ النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ جَرٰى عَلٰى لِسَانِهٖ ذِكْرُ اٰلِهَتِهِمْ بِمَا يُرْضِيْهِمْ ثُمَّ أَبْطَلَ ذٰلِكَ .

৫৩. এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তাকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে নেফাক ও সংশয় যারা পাষাণ হৃদয় অর্থাৎ মুশরিকরা সত্য গ্রহণ করা থেকে। নিশ্চয় জালিমরা কাফেররা দুস্তর মতভেদের মাঝে রয়েছে নবী ও মুমিনগণের সাথে মতভেদ রয়েছে, তাঁর পবিত্র মুখে কাফেরদের দেবতাদের পূর্বোক্ত কথা উচ্চারণের কারণে। যা তাদেরকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। অতঃপর তা বাতিল ও রহিত করেছেন।

যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা নগরীতে অবস্থান কালে একবার সূরা নাজ্ম পাঠ করিলেন, তিনি যখন (সূরা নাজ্ম ঃ ১৯-২০)

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّى وَمَنُوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى

পর্যন্ত পৌছিলেন, তখন শয়তান তাহার মুখ দ্বারা ইহা উচ্চারিত করাইল ঃ

تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْأُوْلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَى

মুশরিকরা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে আমাদের উপাস্য কোন প্রশংসা করেন নাই, কিন্তু আজ তিনি আমাদের প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সিজ্দা করিলেন তাহারা সেই সাথে সিজ্দা করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَنُ فِيْ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ أٰيٰتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

কাতাদাহ (র) বলেন, নবী করীম (সা) মাকামে ইব্রাহীমের নিকট সালাত পড়িতেছিলেন, সালাতে তিনি তন্দ্রাগ্রস্থ হইলেন এবং এই সময় শয়তান তাঁহার মুখ দ্বারা وان شفاعتهن لترجى উচ্চারিত করাইল। মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিল এবং মুখস্থ করিল। এবং ইহা প্রচার করিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে ইহা উচ্চারিত হইয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ الخ এবং শয়তান লাঞ্ছিত হইল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মূসা ইব্ন আবূ মূসা কূফী (র) ... ... ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'নাজম' যখন অবতীর্ণ হইল, তখন মুশরিকরা বলিতে লাগিল যদি এই লোকটি (মুহাম্মদ (সা)) আমাদের উপাস্যদের আলোচনা একটু ভালভাবে করিত, তবে আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার সাথী সঙ্গীকে গ্রহন করিয়া লইতাম। কিন্তু ইয়াহূদী ও নাসারা এবং যাহারা তাহার ধর্মের বিরোধিতা করে তাহাদের সকলের তুলনায় সে আমাদের উপাস্যদের বেশী গালমন্দ বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণের প্রতি মুশরিকরা চরম অত্যাচার অবিচার চালাইতেছিল। এবং তাহাদের কুফর ও শিরকের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চরমভাবে ব্যথিত হইতে ছিলেন। এবং তাহারা হিদায়েত লাভ করুক তিনি এই কামনা করিতেছিলেন। অতঃপর 'সূরা নাজ্ম' অবতীর্ণ হইল এবং তিনি

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّى وَمَنُوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى

পাঠ করিলেন, তখন মুশরিকদের দেব দেবতাদের উল্লেখকালে শয়তান কয়টি কথা ঢুকাইয়া দিল। এবং উচ্চারিত হইল,

وَإِنَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجٰى

ইহা ছিল শয়তানের মুখের ছন্দবদ্ধ কালাম। কিন্ত মক্কার প্রত্যেক মুশরিকদের অন্তরে বদ্ধমূল হইল এবং প্রত্যেকে ইহা মুখস্ত করিয়া ফেলিল। তাহারা বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সাবেক ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা 'নাজম'-এর শেষে সিজ্দা করিলেন, তখন তাহার নিকট উপস্থিত মুসলমাগণ ও মুশরিক সকলেই সিজ্দা অবনত হইল। কিন্তু অলীদ ইব্ন মুগীরা যেহেতু অত্যাধিক বৃদ্ধ ছিল, এ কারণে সে সিজ্দা করিতে পারিল না। বরং এক মুষ্টি মাটি হাতে লইয়া উহা স্বীয় মাথায় লাগাইল। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মুশরিকদের সিজ্দায় অবনত হইবার কারণে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। মুশরিকরা যেহেতু ইসলাম গ্রহন করেন নাই, অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহিত সিজ্দা করিবার কারণে মুসলমানদের আর বিস্ময়ের শেষ

↥

ছিল না। শয়তান মুশরিকদের কানে যে কথাটি ভরিয়া দিয়াছিল। বস্তুত মু'মিনগণ একবার শুনিতে পারেন নাই। কিন্তু মুশরিকরা উহা শুনিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইয়াছিল, শয়তান তাহাদিগকে ইহাও বলিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কালামে সূরার সহিত পাঠ করিয়াছেন, অতএব তাহারা সকলেই তাহাদের দেবতার সম্মানার্থে সিজ্দায় অবনত হইল। এই কথা অন্যান্য লোকের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল, এমন কি সুদূর হাবশায় পৌছিয়া গেল এবং তথায় অবস্থিত মুসলমানগণও জানিতে পারিলেন। উসমান ইব্ন মাজউন (রা) ও তাঁহার সাথী সঙ্গীগণ যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন যে, মক্কার মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই রাসুলুল্লাহ (সা) এর সহিত সালাত পড়িয়াছে। অলীদ ইব্ন মুগীরা হাতে মাটি উঠাইয়া মাথায় লাগাইয়াছে। তাঁহারা এই কথা জানিতে পারিল যে, মক্কার মুসলমানগণ এখন নিরাপদে! তাঁহারা বড়ই আনন্দের উৎফুল্লের সাথে মক্কা প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। শয়তান হকের সহিত যাহা কিছু বাতিল মিশ্রিত করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় আয়াতকে অধিকতর মযবুত করিয়াছিলেন।

ইরশাদ হইল ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْٓ اُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ .

উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর যখন ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যেই ছন্দযুক্ত কালাম আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কালাম নহে বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠের মাঝে শয়তান উহা ঢুকাইয়া দিয়াছিল। তখন মুশরিকরা আরো অধিক শক্তি লইয়া মুসলমানদের বিরোধিতা করিতে লাগিল। তাহারা মুসলমানদের সহিত আরো

৪৮৪ তাফসীরে ইবন কাছীর

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মিশ্রিত বিষয়কে দূরীভূত করে। النسخ। এর অর্থ হইল, দূরীভূত করা, রহিত করা। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মিশ্রিত বস্তুকে বাতিল করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন, জিব্রীল (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে শয়তানের মিশ্রিত বস্তুকে রহিত করিয়া দিলেন এবং আল্লাহ্র আয়াতকে মযবুত করেন।

তাফসীরে মাজহারী

সূরা হাজ্জঃ আয়াত ৫২

যোবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, রসুল স. তখন মক্কায়। অবতীর্ণ হলো সুরা আন্নজম। তিনি এক সমাবেশে তা আবৃত্তি করে শোনালেন। যখন পাঠ করলেন 'আফারাআইতুমুল্ লাতা ওয়াল উ'জ্জা ওয়া মানাতা ছ্ছালিছাতাল উখরা', তখন শয়তান তাঁর উচ্চারণের সঙ্গে সংযুক্ত করলো 'তিলকাল গারামীক্কু উ'লা ওয়া ইন্না শাফায়াতা হুন্না লা তুতাজ্বা'। মুশরিকেরা একথা শুনতে পেয়ে আনন্দিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ ইতোপূর্বে এভাবে আমাদের উপাস্যগুলো সম্পর্কে উত্তম আলোচনা করেনি। তেলাওয়াত শেষ হলে রসুল স. আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সেজদা করলেন। মুশরিকেরাও সেজদা করলো তাঁর সঙ্গে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, বহুসূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে অন্ততঃ এতটুকু আন্দাজ করা যায় যে, বিবরণটি অবশ্যই ভিত্তিবিবর্জিত নয়। এর মধ্যে আগেকার দু'টো অপরিণত সূত্রপরম্পরা বোখারী এবং মুসলিমের শর্তানুসারেও গ্রাহ্য। তন্মধ্যে তিবরানীর একটি সূত্র এরকমঃ ইউনুস ইবনে ইয়াজিদ—ইবনে

পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামিক আলেম শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ শয়তানের আয়াত সম্পর্কে কী বলেছেন তা জেনে নিই, Ibn Taymiyyah। Majmu' al-Fatawa:

''প্রাথমিক যুগের সালাফগণ সম্মিলিতভাবে শয়তানের আয়াতগুলোকে কোরআনের সাথে সম্পৃক্ত হিসেবে মেনে নিতেন। পরবর্তী সময়ে আগত আলেমদের (খালাফ) থেকে যারা প্রথম যুগের স্কলারদের মতামত অনুসরণ করেছিল, তারা বলেন যে, এই ঐতিহাসিক বিবরণগুলো বিশুদ্ধ বর্ণনার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এগুলি অস্বীকার করা অসম্ভব এবং কোরআন নিজেই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে''।

সহীহ বুখারী (ইফা)

২। হারিস ইবনু হিশাম (রা) রাসুলুল্লাহ সা কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? রাসুলুল্লাহ সা বললেনঃ কোন সময় তা **ঘন্টাধ্বনির ন্যায়** আমার নিকট আসে।

ঠিক একইসাথে, তিনি এটিও বলেছেন

সহীহ মুসলিম (ইফা)

৫৩৬৬। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **ঘন্টা হচ্ছে শয়তানের বাঁশি**।

কোরআন সংকলন, বিকৃতি ও পরিমার্জনের ইতিহাস

কোরআনের আয়াত নাযিল করে অনেকদিন পর তা ভুলে যেতেন নবী মুহাম্মদ। তাই এই লজ্জা থেকে বাঁচতে আরো একটা আয়াত নাযিল করেন- কোরআন, সূরা আ'লা, আয়াত ৮৭ঃ "আমি আপনাকে পড়িয়ে দেব অতঃপর আপনি ভুলবেন না"। কিন্তু এত সতর্কতার পরেও আয়াত ভুলে যেতেন নবী। অন্য কেউ বললে তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে যেতো আয়াতগুলো। নিচের হাদিসটি দেখি-

৬৩৩৫ নবী সা এক লোককে মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ তার উপর দয়া করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে, যা আমি অমুক অমুক সূরা থেকে ভুলে গিয়েছিলাম।

অনেকগুলো হাদিস রয়েছে, যেগুলোতে স্পষ্ট, কোরআনে আরো বেশ কিছু আয়াত ছিল, সেগুলো কেউ না কেউ মুছে ফেলেছে বা অন্তর্ভূক্ত করার সময় বাদ পড়ে গিয়েছে।

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) ৩৪৬৬, মুয়াত্তা ইমাম মালিক- রেওয়ায়ত ১৭ ।
আয়িশা (রাঃ) বলেন, কোরআনে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিলঃ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ 'দশবার দুধপানে হারাম সাবিত হয়।' তারপর তা রহিত হয়ে যায় خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ(পাঁচবার দুধপানের অবতীর্ণ আয়াত) এর নাযিলের দ্বারা। তারপর **রাসুলুল্লাহ সা ইন্তেকাল করেন** **অথচ ঐ আয়াতটি তখনও কোরআনের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা হত**।

প্রশ্ন হচ্ছে, মুহাম্মদের মৃত্যুর সময় যেই আয়াত তিলাওয়াত করা হতো, মুহাম্মদের মৃত্যুর পরে সেই আয়াত মানসুখ বা রহিত করলো কে?

সুনান ইবনু মাজাহ
১৯৪৪। আয়িশাহ্‌ (রা) বলেন, **রজম সম্পর্কিত আয়াত এবং বয়স্ক লোকেরও দশ ঢোক দুধপান সম্পর্কিত আয়াত** নাযিল হয়েছিল, যা একটি সহীফায় লিখিত আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সা ইন্তিকাল করেন এবং **আমরা তাঁর ইন্তিকালে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তখন একটি ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে**।

৭৩২৩ উমার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ সা-এর উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে 'রজম'-এর আয়াতও রয়েছে।

৬৮৩০, ৬৮২৯, সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত) ৪৪১৮।
উমর রা. বলেন- "আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, বুঝেছি, আয়ত্ত করেছি। **আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর কোন লোক এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহর কসম! আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর মেরে হত্যার আয়াত পাচ্ছি না। ফলে তারা এমন একটি ফরজ ত্যাগের কারণে পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন।** আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর পাথর মেরে হত্যা অবধারিত, যে বিবাহিত হবার পর যিনা করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী।
তেমনি আমরা আল্লাহর কিতাবে এও পড়তাম যে,- "তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। এটি তোমাদের জন্য কুফরী যে, তোমরা স্বীয় বাপ-দাদা থেকে বিমুখ হবে"।

[During the initial collection of the Quran when Umar brought the verse to the compilers' committee headed by Zayid, it was rejected because there was no other witness for its inclusion in the text of the Quran [As Suyuti, p. 385]

আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মুহাম্মদ নিজেই ইহুদীদের ভৎসনা করতেন এই বলে যে, তারা আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করে রজমের নির্দেশনা আর পালন করছে না। আল্লাহর কঠিন নির্দেশনা জেনাকারীর রজমকে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে বাদ দিয়ে মহাপাপ করেছে। মুহাম্মদ আল্লাহর সেই নীতিকে আবার পুনর্জীবন দান করেছেন। এই বলে ইহুদীদের ভৎসনা করা মুহাম্মদের কোরআনেই এখন আর রজমের আয়াতটি নেই।

♦ surah Fussilat 41/42 :: বাতিল_ এতে(কুরআনে) অনুপ্রবেশ করতে পারেনা, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।। [অর্থাৎ, সব দিক দিয়ে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে সুরক্ষিত। 'সম্মুখ হতে মিথ্যা' অর্থ হ্রাস এবং 'পশ্চাৎ হতে মিথ্যা' অর্থ, বৃদ্ধি। অর্থাৎ, বাতিল বা মিথ্যা তার সামনের দিক দিয়ে এসে না তা হতে কোন কিছু হ্রাস করতে পারবে, আর না তার পিছন দিক দিয়ে এসে তাতে কোন কিছু বৃদ্ধি সাধন করতে পারবে এবং না তাতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সফল হবে <Tafsir Ibn KATHIR]

♦ surah Hijr 15/9:: নিশ্চয় আমিই(আল্লাহ) কুরআন নাযিল করেছি আর ★অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক।। [আল্লাহ নিজেই তা অবতীর্ণ করেছেন। তিনি একে কোন প্রকার বাড়তি বা কমতি, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হওয়া থেকে হেফাযত করবেন< Tafsir Ibn kathir]

কোরআন ৬:৩৪, সূরা আল-আনাম আয়াত ১১৫। **আল্লাহর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই।**
তাফসীরে ইবনে কাসীর

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র বাণীকে ইহকাল ও পরকালে কেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে না। (যে যতই ষড়যন্ত্র ও কানাঘুষা করুক না কেন, আল্লাহ্র বাণী চিরন্তন ও শাশ্বত বাণী।) ইহকাল ও পরকালে সর্বত্র একই অবস্থায় থাকিবে। কেহই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

কোরআন ৮৫/২২। এটা মহান কোরআন, লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

- কোরআন লাওহে মাহফুযে তথা সুরক্ষিত ফলকে রয়েছেঃ অর্থাৎ এটি উচ্চ পরিষদ কর্তৃক সংযোজন, বিয়োজন, বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত।(তাফসিরে ইবনে কাসীর)
- ইবনুল কাইয়েম বলেনঃ
  এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শয়তানদের পক্ষে কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ কুরআন যে স্থানে রয়েছে সে স্থানটি শয়তান সেখানে পৌঁছা থেকে সংরক্ষিত। এবং কুরআন নিজেও সংরক্ষিত; কোন শয়তান এতে সংযোজন-বিয়োজন করার ক্ষমতা রাখে না।
  আল্লাহ্ তাআলা কুরআন যে আধারে রয়েছে সে আধার সংরক্ষণ করেছেন এবং কুরআনকেও যাবতীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন থেকে হেফাযত করেছেন। কুরআনের শব্দাবলি যেভাবে হেফাযত করেছেন অনুরূপভাবে কুরআনের অর্থকেও বিকৃতি থেকে হেফাযত করেছেন। কুরআনের কল্যাণে এমন কিছু ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেছেন যারা কোন প্রকার বাড়তি বা কমতি ছাড়া কুরআনের হরফগুলো মুখস্ত রাখে এবং এমন কিছু ব্যক্তি নিয়োজিত করেছেন যারা কুরআনের অর্থকে বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে হেফাযত করে।"(আত-তিবইয়ান ফি আকসামিল কুরআন, পৃষ্ঠা-৬২)

নিশ্চয়ই আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে। সূরা কদর, আয়াত ১

আল্লাহ পাক লাওহে মাহফুজে প্রথম কোরআন লিপিবদ্ধ করেন, এবং শবে কদরের রাতে তিনি একসাথে পুরো কোরআন প্রথম আসমানে নাজিল করেন। সেখান থেকে ধাপে ধাপে মুহাম্মদের কাছে জিব্রাইল ওহী নিয়ে আসতো। কিন্তু তাহলে, লাওহে মাহফুজ থেকে একবার কোরআনের আয়াত চলে আসার পরে সেটি আবারো সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন সম্ভব নয়। আল্লাহর পাঠানো আয়াত যে সংশোধিত, পরিমার্জিত, পরিশোধিত হয়েছে, নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলো সংস্কার করতে হয়েছে। খুবই ভয়াবহ সমস্যা।

ইবনে হাজর আসকালানী, ফাত-আল-বারি, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯
যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেছেনঃ "**নবী সা ইন্তেকাল করলেন এবং তখনও কোরআন শরীফ এক জায়গায় একত্র করা হয় নি।**"

তাফসীর দূররুল মানসুর,

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক থেকে এবং তিনি আহলে সুন্নার ইমাম সুফিয়ান সাওরি(র) হতে বর্ণনা করেছেন-
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري قال : بلغنا ان ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يقرأون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن
সুফিয়ান সাওরি(রা) বলেন- 'রসুল সা এর সাহাবাদের থেকে আমি এটা জেনেছি যে কুরআনের কারীগণ মুসাইলামা এর সাথে ইয়ামামার যুদ্ধের দিনে মারা গিয়েছিলেন, আর তাদের মৃত্যুর সাথে কুরআনের অনেক অক্ষরসমূহ হারিয়ে(**ذهب**) গিয়েছিল"।

কানযুল উম্মাল খণ্ড ২ পাতা ৫৭৪
عن الحسن ان عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان وقتل يوم اليمامة ، فقال إنا لله ، وأمر بالقرآن فجمع ، فكان أول من جمعه في المصحف
"উমার বিন খাত্তাব(রা) একটা আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল 'এটা যার সাথে ছিল সে ইয়ামামার (যুদ্ধের) দিনে মারা গিয়েছে'। উমার বলল 'ইন্না লিল্লাহ'। তারপর তিনি কুরআন সংগ্রহের ব্যাপারে বলেন।

৭১৯১ , মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) হাদিস নং ২২২০,
আবূ বকর (রা) বলেন- উমার (রা) আমার কাছে এসে বলেছেন যে, কুরআনের বহু হাফিয ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এজন্য **আমার ভয় হচ্ছে যে, আরো অনেক জায়গায় যদি কুরআনের হাফিযগণ এমন ব্যাপক হারে শহীদ হন তাহলে কুরআনের বহু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের আদেশ দিন। আমি বললাম, কী করে আমি এমন কাজ করব যা রাসূলুল্লাহ সা করেন নি(এবং করার জন্যও বলেননি)**। উমার (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা উত্তম কাজ। উমার (রা) আমাকে এ বিষয়ে বারবার বলছিলেন। এরপর আবূ বকর (রা), যায়দ (রা) কে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তুমি রাসূলুল্লাহ্ সা এর ওয়াহী লিখতে। কাজেই তুমি কুরআনের আয়াতগুলো খোঁজ কর এবং তা একত্রিত কর। যায়দ (রা) বলেন, **তারা যদি আমাকে পাহাড়সমূহের কোন একটিকে স্থানান্তরের দায়িত্ব অর্পণ করতেন তা-ও আমার জন্য কুরআন একত্র করার দায়িত্ব অপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য হত না**। আমি কুরআন খোঁজ করতে শুরু করলাম। খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়ার টুকরা, পশুর হাড়, সাদা পাথর ও মানুষের অন্তর থেকে আমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করতে লাগলাম। সূরা তাওবার শেষ অংশ 'لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ' হতে সূরার শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করলাম আবূ খুযাইমার কাছ থেকে। **এ অংশ আমি তার ছাড়া আর কারো কাছে পাইনি। আমি তা সূরার সঙ্গে জুড়ে দিলাম**।
যায়দ (রা) বলেন, কুরআনের এ সংকলিত সহীফাগুলো আবূ বকরের জীবনকাল পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। তারপর ছিল উমার (রা) এর কাছে তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত। তারপর তাঁর কন্যা হাফসা (রা) এর কাছে ছিল।

সহীহ বুখারী (ইফা)
৪৬২৩। যায়দ ইবনু সাবিত (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রাসূল সা এর ওহী লিখতে। সুতরাং **তুমি কুরআনের আয়াতগুলো অনুসন্ধান কর। এরপর আমি অনুসন্ধান করলাম। শেষ পর্যায়ে সূরা তওবার শেষ দুটো আয়াত আমি আবূ খুযায়মা (রা) এর কাছে পেলাম। তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি এর সন্ধান পায়নি।**

সহীহ বুখারী (ইফাঃ)
৩৪৮৭। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, **রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন- "তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর_ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), উবাই ইবনু কা'ব (রা), মু'আয ইবনু জাবাল (রা) ও সালিম (রা) থেকে"**।

Did Abu Bakr consult any one of the 4 great quran scholar that Muhammad personally chose? NO.
Abu Bakr instructed Zaid Ibn Thabit, who was a scribe, to do the job.
Did Zaid consult or request help from any one of the 4 men that Muhammad chose? NO.
Were the 4 great quran scholars UPSET that they were ignored and rejected? YES! They were FURIOUS! They already had their own Quran codices.
After Zaid ibn Thabit finished compiling the first official Quran without input from the four....
Ibn Umar, described the Quran: "**Let no one of you say that he has acquired the entire Quran, for how does he know that it is all**? Let him say, 'I have acquired of it what is available'" (As-Suyuti, Itqan, part 3, page 72)

↥

By the time the 3rd caliph, Uthman, came to power, there were many versions floating around. The books of the 4 men and other hafiz had spread throughout the empire and used widely and gained popularity. Uthman was concerned because there were Clear Differences. The Differences were So Great. Uthman and his companions feared- future dispute about the Qur'an and its contents.

So Uthman asked a committee (included- Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin al-as and harith bin hisham) & ordered the leader of the committee: Zaid bin Thabit **to Compile his Quran again**, which he had compiled years earlier under Abu Bakr. **But this time also did Uthman put any one of the 4 great quran scholar in the committee or did Zaid consult anyone with them in the process of compolation ? NO.** EVEN Uthman ordered to destroy- the mushafs(own quran compilations) of the 4 great teachers personally hand-picked by Muhammad –be Destroyed by burning!

[তারিখুল কোরআনিল কারিম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮], [উলুমুল কোরআন, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭], [তারীখে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৯]
আবু বকর এর নির্দেশে যায়েদ (রা) এর অধীনে যেই কোরআন সংকলিত হয়, তাকে আদি কোরআন বলা হয়। এই কোরআন মুহাম্মদ সা এর বর্ণিত ধারাক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। সূরার ক্রমধারা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। এই আদি কোরআনটি আবু বকরের পরে হযরত উমর এর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এরপরে সেটি আসে তার কন্যা হযরত হাফসা এর কাছে।
এরপরে হযরত উসমান কোরআন সংকলনের কাজে হাত দেন, যা ছিল আবু বকরের কোরআন থেকে অনেকটাই ভিন্ন। উসমানের কোরআনের সাথে আবু বকরের আদি কোরআনের পার্থক্য লক্ষ্য করে সেই সময়ে সেই আদি কোরআনটি জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

আল আহকাম ফি উসুল আল আহকাম' এর খন্ড ১ পাতা ৫২৮,
قال أبو محمد : فهذه صفة عمل عثمان رضي الله عنه ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم في نسخ المصاحف، و حرق ما أحرق منها مما غير عمداً و خطأً "আবু মুহাম্মাদ বলেছেনঃ ......এই হল উসমানের কার্য্যক্রমের বর্ননা। তিনি তাদের মুসহাফ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন"।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রা কুরআনের পুনঃসংকলনের পরে ঘোষণা দিলেন যে, যার কাছে যত কোরআন আছে সেগুলো সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যখন কুফা নগরীতে এ ঘোষণা আসল গেল যে, তাদের কাছে সংরক্ষিত সব কোরআনের আয়াত পুড়িয়ে দিয়ে শুধুমাত্র যায়েদ ইবন সাবেতের মুসহাফ এখন থেকে ব্যবহার করতে হবে, **আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) এর বিরোধিতা করলেন। এবং উসমানের হুকুম শুনে তিনি কুফা শহরে এইভাবে খুৎবা দিলেন-**
কোরআনের পাঠে লোকেরা ছলনার দোষে পড়েছে। আল্লাহ্র কসম! **আমি রাসূল সা এর মুখ থেকে সত্তরেরও বেশী সূরা শিখেছি যখন যায়েদ ইবন সাবেত যুবক ছিলেন, এর মাত্র দুইটি কেশপাশ চুল ছিল এবং যুবকদের সাথে তখন খেলা করতেন**।" [কিতাবুল তাবাকাত আল-কবির, ইবন সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৪]
"The people have been guilty of deceit in the reading of the Qur'an. I like it better to read according to the recitation of him (Prophet) whom I love more than that of Zayd Ibn Thabit," (Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, Vol. 2)

ইমাম তিরমিজি লিখেছেন,

যুহরী (র) বলেনঃ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উতবা (রা) বলেন, **আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যায়েদ ইবনে সাবিতের এ তৈরী কপি পছন্দ করেন নি। তিনি বলেছেনঃ "হে মুসলিম সম্প্রদায়!" কুরআনের মুসহাফ লিপিবদ্ধ করার কাজে আমাকে দূরে রাখা হয়েছে ! আর এর দায়িত্ব বহন করেছে এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্র শপথ আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন সে ছিল এক কাফিরের ঔরসে।** (এই কথা বলে তিনি যায়েদ ইবনে ছাবিতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন)। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেনঃ হে ইরাকবাসী! তোমাদের কাছে যে মুসহাফগুলো রয়েছে সেগুলো লুকিয়ে রাখ। [জামিউত তিরমিযী, পৃষ্ঠা ৮৫১, Jami' at-Tirmidhi Vol. 5, Book 44, Hadith 3104]

ইমাম আবু দাউদ লিখেছেন,
ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন- **আমি সরাসরি রাসূল (সা) থেকে সত্তর সূরা পেয়েছি যখন যায়েদ বিন সাবেত তখনও একজন বাচ্চা ছিল। এখন আমি কি ত্যাগ করব যেটা আমি আল্লাহ্র রাসূল থেকে সরাসরি পেয়েছি?!"** [কিতাবুল মাসাহিফ, ইবন আবি দাউদ, পৃষ্ঠা ১৫]

↥

‘Abdullah bin Mas’ud, who was a companion of Muhammad & who was one of the four men that Muhammad said people should learn the Quran from (Sahih Al-Bukhari 3806, 3808, 4999), said people should avoid Zaid’s Quran (Jami At-Tirmidhi 3104) & called his version of the Quran “deceit” because Zaid’s Quran was so much different then his (Ibn Sa'd, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, Vol. 2, p.444). ‘Abdullah bin Mas’ud was so against Zaid’s Quran that he urged Muslims to hide their Qurans when Uthman was gathering & burning all of the Quranic manuscripts that didn’t agree with Zaid’s version (Jami At-Tirmidhi 3104). Zaid’s Quran is what the modern-day Quran has descended from. So, according to ‘Abdullah bin Mas’ud, **today's Quran should be avoided & is “deceit”.**

৯৪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও তাঁর ফিকাহ

আছলামীর নাম উল্লেখযোগ্য। হযরত ওসমান (রা) স্বীয় খিলাফত কালে লক্ষ্য করলেন যে, নানাহ পদ্ধতিতে সংকলিত কুরআন পাকের বিভিন্ন কপি পাঠ করে মানুষের মাঝে বিশৃংখলার সৃষ্টি হচ্ছে. অতএব অনতিবিলম্বে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; তাই তিনি পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হযরত আবু বকর (রা) ও উমর ফারুক (রা) সম্মিলিতভাবে কুরআন পাকের যে সংকলন তৈরী করেছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রদেশে তাই প্রচার করা হবে এবং অবশিষ্ট সংকলন সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এই ব্যাপারে খলিফার সাথে একমত হতে পারেননি। সুতরাং হুযুর আকরাম (সা)-এর যুগে তিনি নিজ হাতে কুরআনের যে সংকলন তৈরী করেছিলেন তা খলিফার হস্তে সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এমনকি হযরত উসমান (রা)-এর প্রেরিত দূতদের সাথেও তিনি পুরোপুরি সৌজন্যতা রক্ষা করতে পারেন নি। এতে হযরত উসমান (রা)-এর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। উল্লেখ্য যে, হযরত ইবনে মাসউদের এই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন একেবারেই অযৌক্তিক ছিল না। কেননা তাঁর নিজস্ব সংকলিত কুরআনের কপিটি রাসূল করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই রচিত হয়েছিল। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় খিলাফত কালে যে কুরআন পাকের সংকলনটি তৈরী করেছিলেন তাতে হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা)-এর ভূমিকাই ছিল প্রধান। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল (সা)-এর সাহচর্যে যখন কুরআন পাকের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা) তখন নিতান্তই ছোট সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলায় দিন গুজরান করতেন।[১] হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর কুরআনী ইলমে যে গভীরতা ছিল অন্য কারুরই তা ছিল না। এ কথা পূর্বে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী উলামায়ে কিরাম তাঁর সম্পর্কে বলেন

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তো ছিলেন বয়ঃপ্রবীণ ও প্রাথমিক যুগের সাহাবাদেরই একজন। তিনি ছিলেন ফকীহ ও আইনজ্ঞ সাহাবাদের অন্যতম প্রধান। কুরআনে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন,

من اراد ان يسمع القران غضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد

যে ব্যক্তি শুদ্ধ ও সাবলীল ভাবে কুরআন পাককে অবিকল রূপে পাঠ করতে চায় সে যেন ইবনে উম্মে আবদ এর তিলাওয়াতের অনুসরণ করে।[২]

এই নববী সনদ প্রাপ্তির পর গৌরব উদ্ভাসিত ইবনে মাসউদ (রা)-এর উপরোক্ত মতানৈক্যকে কিছুতেই দূষণীয় ভাবা যায় না বরং যথার্থ ও যুক্তিযুক্তই ছিল। তিনি নির্দ্বিধায় আমীরুল মু'মিনীন এর নির্দেশ কেন নতশীরে মেনে নেননি এ অভিযোগ নিতান্তই অমূলক হবে। এতে তাঁর মর্যাদার এতটুকুও হানি হবে না। তিনি ইলম ও জ্ঞানের যে উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাসীন ছিলেন তাতে খলীফার নির্দেশ পালনের ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে গভীর চিন্তা করা তাঁর জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল।

উসমানের এই সংকলন অন্যদের কাছেও বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল না। অন্যান্য সাহাবীগণও উনার এই সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে একমত ছিলেন না। এবিষয়ে জানতে, আমাদের জানা দরকার, হযরত উসমানের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল।

৩৩২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ অগ্রসর হয়ে তাঁকে প্রহার করলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। নারীরা চিৎকার জুড়ে দেয়। তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গৃহত্যাগ করে। এ সময় খলীফা নিহত হয়েছেন মনে করে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর গৃহে প্রবেশ করেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, খলীফার জ্ঞান ফিরেছে তখন তিনি বললেন ঃ

হে বোকা বৃদ্ধ! তুমি কোন্ ধর্মের অনুসারী? তিনি জবাব দেন, 'আমি ইসলামের অনুসারী; তবে আমি বোকা বুড়ো নই; বরং আমি আমীরুল মু'মিনীন'। ইব্‌ন আবূ বকর বললেন ঃ 'তুমি কিতাবুল্লাহয় পরিবর্তন সাধন করেছ।'

ইব্‌ন আবূ বকর এগিয়ে যান এবং বলেন ঃ

'কিয়ামতের দিন আমরা যদি বলি– "হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা-কর্তাদের আনুগত্য করেছিলাম আর তারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে" তবে আমাদের কথা গৃহীত হবে না। (সূরা আহযাব ৩৩ ঃ ৬৭ আয়াত)। এই বলে তিনি খলীফাকে টানা-হেঁচড়া করে ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে আসেন।

মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে, খলিফা উসমানকে কিতাবুল্লাহ বা কোরআনে পরিবর্তনের অভিযোগে অভিযুক্ত কারী এই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর কে ছিলেন? তিনি ছিলেন **প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের সন্তান এবং অত্যান্ত ধার্মিক একজন মুসলিম হিসেবে যিনি ছিলেন বিখ্যাত**।

{শিয়াদের মতে, হযরত আলী (রা) যেই কোরআন লিপিবদ্ধকরেছিলেন, সেটিই অধিক সঠিক।
শিয়া আলেম নুরী আত-তাবারসী 'ফসলুল খিতাব' গ্রন্থে বলেন –
আমীরুল মুমিনীনের হযরত আলী(রা) এর কাছে একটি বিশেষ কুরআন ছিল, যা তিনি রাসূলুল্লাহ(ﷺ) ইন্তিকালের পর নিজেই সংকলন করেন এবং তা জনসমক্ষে পেশ করেন; কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করে। অতঃপর তিনি তা তাদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে রাখেন; আর তা তার বংশধরের নিকট সংরক্ষিত ছিল।}

বর্তমানে অধিকাংশ ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ মনে করেন, কোরআনের আয়াতের মোট সংখ্যা সেই আদিতে যা ছিল এখনো তাই আছে। তার সামান্যতম কোন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু সত্য হচ্ছে,
"কোরআনের আয়াতের সংখ্যা আসলে কত, তা নিয়ে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বিভিন্ন জনের মতামত অনুযায়ী এই সংখ্যাটি ৬০০০/ ৬২০৪/ ৬২১৪/ ৬২১৯/ ৬২২৫/ ৬২২৬/ ৬২৩৬/ ৬২১৬/ ৬২৫০/ ৬২১২/ ৬২১৮/৬২২১/ ৬৩৪৮, অর্থাৎ আয়াত ঠিক কয়টি, তা সেই সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। আয়াতের পাশাপাশি অক্ষর ও শব্দের সংখ্যা নিয়েও প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, এই নিয়ে ঘটে গেছে বহু রক্তারক্তি কাণ্ড। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯]

অধ্যায় ঃ সূরা ফাতিহা ১৭৯

প্রয়োজনীয় কথা

কুরআন মজীদের আয়াতের সংখ্যা সর্বসম্মতভাবে অন্যূন ছয় হাজার। তবে উহার সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, ছয় হাজার। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত চারিটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত চৌদ্দটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত উনিশটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত পঁচিশটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত ছাব্বিশটি। আবার কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত ছত্রিশটি।

আতা ইব্‌ন ইয়াসার হইতে ফযল ইব্‌ন শাযান কর্তৃক বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের শব্দ সংখ্যা হইতেছে সাতাত্তর হাজার চারিশত উনচল্লিশ।

মুজাহিদ হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাছীরের বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের অক্ষরের সংখ্যা হইতেছে তিন লক্ষ একুশ হাজার একশত আশি। ফযল ইব্‌ন আতা ইব্‌ন ইয়াসারের মতে উহার সংখ্যা হইতেছে তিন লক্ষ তেইশ হাজার পনের।

ইবনে কাসির তাঁর তাফসীর (খণ্ড ১,পাতা ৫০)-এ লিখেছেনঃ

↥

“কুরআন এ মোট ৬০০০ আয়াত আছে, বাকি আয়াতসমুহের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। এ সমন্ধে বেশ কিছু মতামত আছে। এর একটি মত ৬২০৪ টি আয়াত।

আল ইতকান ফি উলুম আল কুরাআন খন্ড ১,পাতা ১৪৭,
আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি, উসমান বিন সাইদ বিন উসমান আবু আমরূ আল ধানি (রহ) হতে বর্ণনা করেন,

“তাঁরা কুরআন এ ৬০০০ আয়াতের ব্যাপারে একমত কিন্তু বাকি আয়াতসমুহের ব্যাপারে মতভেদ আছে, কেউ কেউ এর বেশি আয়াত যোগ করেন নি, অন্যরা দু'শ চার টি যোগ করেছেন, আনেকে বলেছেন ২১৪ টি বেশি, যেখানে আরও আনেকে বলেছেন ২১৯ টি আয়াত বেশির কথা। কয়েকজন বলেছেন ২২৫টি আয়াত বেশি, অন্যান্যরা ২৩৬টি আয়াত বেশির কথা বলেছেন”।

কোরআনের নাযিল্ হওয়া শেষ সূরা, শেষ আয়াত কোনটি?

এ নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর বিতর্ক। তাদের অনেকের মতে, সূরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াতই হচ্ছে কোরআনের শেষ আয়াত, কারণ এখানে বলা হচ্ছে,
আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ***দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দেয়ার পরে আল্লাহ পাকের আবারো সূরা নাজিলের কেন প্রয়োজন হলো?*** *দ্বীন যদি ওই আয়াতের মাধ্যমে পুর্নাঙ্গই হয়ে গিয়ে থাকে, এর পরে আবার আয়াত নাজিল হওয়ার তো কথা নয়। অবতীর্ণ শেষ আয়াত নিয়ে বিভিন্ন সাহাবীর বিভিন্ন অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো।*

প্রথম অভিমতঃ রিবা বা সুদ বিষয়ক আয়াত সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত।

- ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: সর্বশেষে নাযিল-হওয়া আয়াত হলো আয়াতুর রিবা (সুদ বিষয়ক আয়াত) অর্থাৎ কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৮
- হজরত উমর (রাযি) বলেনঃ **আল কুরআনের সর্বশেষ যা নাযিল হয়েছে, তা হলো রিবা'র আয়াত। আর রাসূলুল্লাহ সা তা ব্যাখ্যা করার পূর্বেই পরলোকগত হন**। অতএব তোমরা সুদ ও সন্দেহ পরিত্যাগ করো।' [তাফসীরে তাবারী, খণ্ডঃ ৬, পৃঃ ৩৮]
- আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, উমর (রা) আমাদের উদ্দেশ্য করে খুতবা দিলেন, অতঃপর তিনি বললেন: নিশ্চয় সর্বশেষ নাযিল হওয়া কুরআন হলো রিবা'র আয়াত।' [সুয়ুতী, আল ইতকান, খণ্ড:৬, পৃ:৩৫]

দ্বিতীয় অভিমতঃ আল কুরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত হলো- কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮১

- ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আল কুরানের সর্বশেষ যা নাযিল হয়েছে, তা হলো- وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ [নাসাঈ; বায়হাকী], [তাবারী, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১], [আদ্দুররুল মানসুর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭০]

সূরা তওবা কী স্বতন্ত্র সূরা?

তাফসীরে ইবনে থেকে- **সূরা তওবা যে স্বতন্ত্র সূরা, এটি ছিল উসমানের ধারণা**। নবী সা এই বিষয়ে কিছু বলে যান নি। সূরা তওবার শুরুতে তাই বিসমিল্লাহও পড়া হয় না। এখন লাওহে মাহফুজের কোরআনে সূরা তওবা আলাদা সূরা নাকি তা সূরা আনফালের অংশ, তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১২-৫১৩

সূরা তাওবা

॥ ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকূ, মাদানী ॥

ইমাম তিরমিযী (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বরাতে মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, সূরা আনফাল যাহার আয়াতের সংখ্যা এক শতের নিম্নে এবং সূরা তাওবা যাহার আয়াতের সংখ্যা অন্যূন একশত —এই দুইটি সূরার মধ্যবর্তী স্থানে আপনারা 'বিসমমিল্লাহ্' লিখেন নাই কেন? এতদ্ব্যতীত উক্ত সূরাদ্বয়কে আপনারা যে 'দীর্ঘ সূরা সপ্তক (السبع الطول)'-এর মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন; উহার কারণ কি? উসমান (রা) বলিলেন : অনেক সময়ে এইরূপ ঘটিত যে, নবী

↥

করীম (সা)-এর প্রতি একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইবার পর অন্য একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইত। এইরূপ নবী করীম (সা)-এর উপর একটি সূরা নাযিল হওয়া শেষ হইবার পূর্বে অন্য একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইত। এমতাবস্থায় কোন আয়াত নাযিল হইলে তিনি কোন ওয়াহী লেখক সাহাবীকে ডাকিয়া বলিতেন : 'যে সূরায় এই এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই আয়াতটিকে উহার মধ্যে (অমুক স্থানে) স্থাপন কর।' সূরা-আনফাল হইতেছে মদীনায় অবতীর্ণ প্রথম সূরাসমূহের অন্যতম। পক্ষান্তরে, সূরা বারাআত (সূরা তাওবা) হইতেছে মদীনায় অবতীর্ণ শেষ সূরাসমূহের অন্যতম। কিন্তু, উভয় সূরায় বর্ণিত ঘটনা ও কাহিনী প্রায় একরূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধারণা করিলাম : 'সূরা বারাআত পৃথক কোন সূরা নহে; বরং উহা সূরা আনফাল-এর একটি অংশ।' অথচ নবী করীম (সা) এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই; উপরোক্ত কারণে আমি উহাদিগকে পরস্পর সন্নিহিত করিয়া স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে (সূরা তাওবার প্রথমে) বিসমিল্লাহ্ লিখি নাই। তেমনি উপরোক্ত কারণে উভয় সূরা মিলিয়া দীর্ঘ সূরার আকার গ্রহণ করে বলিয়া উহাদিগকে 'দীর্ঘ সূরা-সপ্তক'-এর মধ্যে স্থাপন করিয়াছি।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্ন হিব্বান এবং ইমাম হাকিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকিম (র) উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন : 'উহার সনদ সহীহ্;

সুনানু আবু দাউদ শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৭-৪২৮,

৭৮৬। আমর ইব্ন আওন--- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করি যে, আপনারা সূরা বারাআত-কে সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত করে আল-কুরআনের সাবউল মাছানী (সাতটি দীর্ঘ সূরা)-এর মধ্যে কিরূপে পরিগণিত করেন এবং উভয় সূরার মধ্যস্থলে বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম কেন লিখেন নাই? অথচ বারাআত সূরাটি মিইন-এর অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ যাতে ১০০-র অধিক আয়াত আছে এবং বারাআতে ১২৯ আয়াত আছে)। অপরপক্ষে সূরা আন্‌ফাল মাছানীর অন্তর্ভুক্ত (কেননা এতে ১০০-এর কম অর্থাৎ ৭৫ টি আয়াতআছে)।

উছমান (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর যখনই কোন আয়াত নাযিল হত, তখন তিনি ওহী লেখক সাহাবীদের ডেকে বলতেনঃ এই আয়াত অমুক সূরার অমুক স্থানে সন্নিবেশিত কর যার মধ্যে এই এই বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর তাঁর উপর যখন একটি বা দুটি আয়াত নাযিল হত, তখনও তিনি ঐরূপ বলতেন।[১]

সূরা আল্‌-আন্‌ফাল নবী করীম (স)-এর উপর মদীনায় আসার পরপরই নাযিলকৃত সূরাসমূহের অন্যতম এবং সূরা বারাআত অবতীর্ণ হয় কুরআন নাযিলের সমাপ্তিকালে। কিন্তু সূরা আন্‌ফালে বর্ণিত ঘটনাবলীর সংগে সূরা বারাআতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সাদৃশ্য রয়েছে। কাজেই আমি মনে মনে স্থির করি যে, এটি সূরা আন্‌ফালের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আমি দুটি সূরাকে একত্র সাবউত-তিওয়াল-এর অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং এ কারণেই এই দুইটি সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম লিপিবদ্ধ করিনি- (তিরমিযী)।

৭৮৭। যিয়াদ ইব্ন আইউব--- ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্য হতে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তিনি সূরা বারাআত সূরা আন্‌ফালের অন্তর্ভুক্ত কি না- এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছুই বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, শাবী, আবু মালিক, কাতাদা ও ছাবেত বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর সূরা নামূল অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত (কোন সূরার প্রারম্ভে) বিস্‌মিল্লাহ লিখেন নি।[১]

তাফসীর কুরতুবি খণ্ড ৮ পাতা ৬২ সূরা বারাআত। তাফসীর দুররুল মান্সুর, খণ্ড ৩ পাতা ২০৮ সূরা বারাত।

ইমাম মালিক বলেছেন, ইবনে কসিম আর ইবনে আব্দুল হাকিমের থেকে যে বর্ণনা এসেছে যে যখন সূরা বারাআত এর প্রথম অংশ হারিয়ে যায় তার সাথে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ও হারিয়ে যায়। ইবনে আলজান থেকে বরর্ণিত যে, সূরা বারাত সূরা বাকারার প্রায় সম দৈর্ঘ্যের ছিল, সুতারং অংশটা হারিয়েছে আর তার ফলে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' মাঝে লেখা হয়নি।(সুরা আনফাল ও সূরা তাওবার মাঝে লেখা হয় নি)।

- **হুজাইফা ইবনে ইয়ামান**

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) একজন বিশিষ্ট সাহাবী, যিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা সেনাপতি ও প্রখর জ্ঞানের অধিকারী। উনার বক্তব্য হচ্ছে, **বর্তমান কোরআনে যে সূরা বারাআত (সূরা তাওবা) আছে, তা প্রকৃত সূরার এক চতুর্থাংশ মাত্র।**

আল ইত্বকান, পৃষ্ঠা ১৫

15

The *'l-Mustadrak* contains a report from Hudhaifa where he says: "Of the chapter 'l-Bara'a you recite but one quarter."

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি মুহাদ্দিস তাবারানি, হাকিম ও ইবনে শাইবাহ, ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেন-

عن حذيفة رضي الله عنه قال : التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب والله ما تركت أحدا إلا نالت منه ولا تقرأون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها

"হুযাইফা (রা) বলেছেন **যে সূরাকে তোমরা তাওবা(বারাআত) বল সেটা আসলে সূরা আহযাব(শাস্তি), আর আমরা যা পড়তাম তার এক চতুর্থাংশ তোমরা এখন পড় মাত্র**"। –তাফসীরে দুররুল মানসুর খণ্ড ৩ পাতা ২০৮।

এবিষয়ে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি বলেন, একাধিক সহীহ সনদে সাহাবিদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে- সূরা তাওবা(বারাআ)ত সূরা বাকারাহ এর সমান দৈর্ঘ্য এর ছিল। আর বর্তমানে সূরা বাকারাহ এর আয়াত সংখ্যা হল ২৮০ এর অধিক, আর সুরাহ তাওবার আয়াত সংখ্যা ১৩০ এর মতো। সুতরাং সহিহ রেওয়াত অনুযায়ী- ১৫০ এর অধিক আয়াত সূরা তাওবা থেকে হারিয়ে গিয়েছে। যদি ভবিষতে কেউ মনগড়া গোঁয়ার্তুমি করে বলে যে- সূরা তাওবার ১৫০ টির মতো আয়াত মনসুখ হয়ে গিয়েছে _ তবে, সেটা হবে সুরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী, যেখানে আল্লাহ বলেছেন যে "আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি"। কেউ যদি মনগড়াভাবে একটা সুরা থেকে নযিরবিহীন এতগুলো আয়াতের মনসুখ হওয়ার ব্যাপারে যুক্তি দেয়ার স্পর্ধা করে তবে তাকে_ ঐ সূরার তার কল্পনাপ্রসূত রহিত হয়ে যাওয়া ১৫৭টি আয়াতের পরিবর্তে নাযিল হওয়া সমপরিমাণ আয়াত দেখাতে হবে।

ইদ্দতের আয়াত

ইদ্দতের সময়সীমা কতদিন হবে, আল্লাহ পাক এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রেরণ করলেন যে, তারা পূর্ণ একবছর স্বামীগৃহে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দতের সময়ে তাদের জন্য বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এই একবছর ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ঠ পরিমাণ সম্পদ যেন স্বামী তাদেরকে অসিয়ত করে যায়।

কোরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২৪০-২৪১: আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে।

পরবর্তীতে এই আয়াত বাদ দিয়ে নতুন আয়াত পাঠানো হলো। সেখানে বলা হলো, এক বছর ইদ্দত পালনের দরকার নেই, চার মাস দশ দিন করলেই হবে। মানে আগের নির্দেশটি রহিত বা মানসুখ করে নতুন বিধান দিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানসুখ বা রহিত হয়ে যাওয়া আয়াত কোরআনে এখনো রয়ে গেল কীভাবে? অন্যান্য অনেক রহিত আয়াত তো সংকলনের সময় বাদ দেয়া হলো, এটি কেন থাকলো?

৩১০ তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

ইব্‌ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবী মুলায়কা, হাবীব, ইয়াযীদ ইব্‌ন জাবির উমাইয়া ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন যুবাইর বলেনঃ আমি উছমান ইব্‌ন আফফানকে (র) বলিলাম, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا, এই আয়াতটি তো অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। আপনি এই আয়াতটি লিখিবেন না, বাদ রাখিয়া দিন। তদুত্তরে তিনি বলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! যে আয়াতটি আমি যেমন পাইয়াছি বা পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকিবে। ইহার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন অধিকার আমার নাই।

কথা হইল যে, ইব্‌ন জুবাইর হযরত উছমানকে (রা) প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, চার মাসের ইদ্দতের আয়াত দ্বারা যখন এই আয়াতটির হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে, তখন গতানুগতিক-ভাবে ইহাকে রাখার কোন অর্থ হইতে পারে কি ? অথচ হুকুম রহিত হইয়া যাওয়ার পর আয়াত অবশিষ্ট রাখিলে পরবর্তীকালে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উত্তরে উছমান (রা) বলেন, যদিও এই আয়াতটির হুকুম অকার্যকর হইয়াছে, কিন্তু আমি তো কপিতে লেখা পাইয়াছি। তাই পূর্ববর্তী কপির অপরিবর্তনীয় সংস্করণ হিসাবে আমিও লিখিয়া রাখিব।

সহীহ বুখারী (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ তাফসীর
৪১৭৪। আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রা) তিনি বলেন, আমি উসমান (রা) কে একটি আয়াতের সম্পর্কে বললাম যে, এ আয়াত তো অন্য আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। অতএব উক্ত আয়াত আপনি মুসহাফে লিখেছেন ! কেন বর্জন করছেন না ? তখন উসমান (রা) বললেন, হে ভাতিজা আমি মুসহাফের স্থান থেকে কোন জিনিস পরিবর্তন করব না।

সূরা নুরে ভুল শব্দ

তাফসীরে ইবনে কাসীর, **ইবনে আব্বাস (রা) এর মতে সূরা নূরের একটি শব্দ ভুল লেখা হয়েছে।** ইবনে আব্বাস নবী মুহাম্মদের বিখ্যাত কোরআনের পন্ডিত সাহাবী, যার থেকে নবী সাবাইকে কোরআন শিখতে বলেছেন।

৮৪ তাফসীরে ইবনে কাছীর

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইবন বাশশার (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا এর حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَتُسَلِّمُوْا হওয়া উচিৎ। ইহা ভুলে লিখিত হইয়াছে। হুসাইম (র) জা'ফর ইব্ন আয়াস, সাঈদ ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এখানে حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَتُسَلِّمُوْا পাঠ করিতেন। তিনি হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর

ইবনে আব্বাসের আরো বিরোধ
নবী মুহাম্মদের অত্যন্ত প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে আব্বাস বর্তমান কোরআনে আরো বেশ কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। যার একটি হচ্ছে, সূরা শুয়ারার ২১৪ নম্বর আয়াতের কথা, **যেই আয়াতে একটি বাক্য বর্তমান কোরআনে নেই**, অথচ ইবনে আব্বাসের মতে এই আয়াতে আরো একটি বাক্য ছিল।

আসুন প্রথমে কোরআনের আয়াতটি দেখে নিই,
সূরা শুয়ারা, আয়াত ২১৪। তোমার নিকট-আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।

এবারে দেখা যাক, **ইবনে আব্বাস এই আয়াতটি কীভাবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে "এবং তাদের মধ্য থেকে তোমার নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়কেও" বাক্যটি অতিরিক্ত যা বর্তমান কোরআনে নেই**।

ফাতহুল বারী সারাহ সাহিহ আল বুখারি খন্ড ৮ পাতা ৫০৬, সাহিহ ইবনে হিব্বান খন্ড ১৪ পাতা ৪৮৭, সুনান আল কুবরা বায়হাকী খন্ড ৯ পাতা ৭। **ইবনে আব্বাস(রা) বললেনঃ**وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ **এই আয়াত নাজিল হয়েছে।**

আসুন, হাদীস থেকে এর প্রমান দেখে নিই

সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৪০২। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল হয় "**তোমার নিকট-আত্নীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও,** (২৬: ২১৪) **এবং তাদের মধ্য থেকে তোমার নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়কেও**।" তখন রাসুলুল্লাহ সা বের হয়ে এলেন এবং সাফা পর্বতে উঠে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন........।

ইবনে আব্বাস (রা) আরো অনেক কোরআনের আয়াত যায়েদের ও পরবর্তীতে উসমানের সংকলিত কুরআনের থেকে ভিন্ন বলেছেন। আসুন ইবনে আব্বাসের আরো একটি ভিন্নভাবে কোরআনের আয়াত সূরা কাহফের ৭৯-৮০ নম্বর আয়াত পড়ার উদাহরণ দেখি।

সুরা কাহাফের ৭৯ ও ৮০ নং আয়াত **এখন আমরা কোরআনে এইরুপ দেখিঃ**
৭৯) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

অনুবাদঃ নৌকাটির ব্যাপারে-সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষন করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ক্রটিযুক্ত করে দেই। **তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত।**

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (৮০)

অনুবাদঃ **বালকটির ব্যাপারে, তার পিতামাতা ছিল ঈমানদার।** আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে।

কিন্তু ইবনে আব্বাস(রা) এর মতে এই আয়াতের বিকৃতি সাধন হয়েছে।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

৪৭২৫। সা'ঈদ ইবনু যুবায়র (রা) বলেন, **ইবনু আব্বাস (রা) এভাবে এ আয়াত পাঠ করতেন-**

وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةً غَصْبًا

এবং পরের আয়াতটি এভাবে পাঠ করতেন- وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ

৭৯ নং আয়াতের 'ভালো(صَالِحَةً)' শব্দটি এবং সেই সাথে ৮০ নং আয়াতে كَافِرًا বা কাফির এই শব্দটাও নেই উসমানের সংকলিত কুর'আনে।

সুনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত) ৩১৪৯।

সাঈদ ইবনু জুবাইর (রা) বলেন, ইবনু আব্বাস (রা) পাঠ করতেনঃ "তাদের সামনে ছিল এক বাদশাহ যে প্রতিটি ভালো নৌকা জোরপূর্বক কেড়ে নিত।" তিনি আরো পাঠ করতেনঃ "আর বালকটি ছিল কাফির"।

https://quran.com/al-kahf/60/tafsirs

about both of them.) Sa`id bin Jubayr said: "Ibn `Abbas used to recite Ayah no. 79 (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا) (There was a king before them who seized every good-conditioned ship by force) and Ayah no 80 (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ) (As for the boy, he was a disbeliever and his parents were believers.) Then (in another narration) Al-Bukhari recorded a similar account

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রা) এর কুরআনে আয়াতদুটি এইভাবে ছিলঃ

'এবং তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, সে বল প্রয়োগে প্রত্যেক **ভালো** নৌকা ছিনিয়ে নিচ্ছিল'(১৮:৭৯) এবং এই ভাবে পড়তেন 'এবং বালকটির ব্যাপারে সে ছিল **কাফের** এবং তার পিতামাতা ছিল ইমানদার' (১৮:৮০)।

মুসতাদরক আলা সাহিহাইন, খন্ড ২ পাতা হাদিস নং ৩০১৮ (মুল কিতাবের ২৪৪ নং পাতা, হাদিস নং ২৯৫৯)

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ : » وكان أمامهم ملك ، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه

"**ইবনে আব্বাস(রা) বলেন- 'নবী সা এইভাবে পড়তেনঃ** ''এবং তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, সে বল প্রয়োগে প্রত্যেক ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিচ্ছিল'।

তাফসীর দূররুল মনসুর সুরাহ কাহাফের ৭৯ আয়াতের ব্যখ্যা

"**উবাই ইবনে কা'ব (রা)** এই আয়াত এই ভাবে পাঠ করতেন '......প্রতিটি ভালো নৌকা জোর করে কেড়ে নিত'।

তাফসীরে তাবারী: অনলাইন লিংক হাদিস নং ১৭৫২১

কাতাদা(র) বর্ননা করেছেন যে, **ইবনে মাসুদ (রা)** এর কুরআনের এইরকম লেখা ছিল '......প্রতিটি ভালো/নিখুঁত নৌকা জোরকরে কেড়ে নিত'।

(এখানে কোনো ধরনের মনসুখ এর প্রশ্নই আসছে না কারণ ঐতিহাসিক খবর কখনো মনসুখ হতে পারে না- আল্লামা সুয়ুতি)

সাহিহ আল বুখারি, কিতাব আল তাফসীর।

لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যখন এই আয়াত নাজিল হলে "তুমি সতর্ক করে দাও তোমার কাছে আত্মীয়-স্বজনকে **এবং তাদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া একদলকে**"..........।

আয়াতের এই অংশ *"তুমি সতর্ক করে দাও তোমার কাছে আত্মীয়-স্বজনকে"* এটা কুরানে পাওয়া যায় (২৬:২১৪) **"এবং তাদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া একদলকে"** এই আয়াতটা বর্তমান কুরানে খুঁজে পাওয়া যায়না।

বর্তমানে কোরআনে সুরা রাদের ৩১ নং আয়াতে দেখিঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاء اللّهُ لَهَدَى أَفَلَمْ يَيْأَسِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا النَّاسَ جَمِيعًا وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

আল ইতকানে, আল্লামা সুয়ুতি সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন,

"ইবনে আব্বাস এই আয়াত এই ভাবে পড়লেন "***আফালাম ইয়াতবাইন আল্লাযীনা...***"। তাঁকে বলা হল যে এটা '***আফালাম ইয়াই আসিল্লাযীনা"***, তাতে ইবনে আব্বাস(রা) উত্তর দিলেন সংকলক "ইয়াই আসি ***يَيْأَسِ"*** লিখেছে, **আমার মনে হয় যে সে লেখার সময় জাগ্রত ছিল না"।**

ফাতহুল বারী সারাহা সাহিহ আল বুখারি। খন্ড ৮ পাতা ৩৭৩।...

وروى الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم من رجال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرؤها " أفلم يتبين " ويقول: كتبها الكاتب وهو ناعس

"ইমাম তাবারী সহিহ সনদে যারা প্রত্যেক রাবী বুখারীর, ইবনে আব্বাস(রা) থেকে বর্ননা করেছেন যে, তিনি পড়লেন "**আফালাম ইয়াতবাইন**" আর বললেন যে, লেখক 'ইয়াই আসি **يَيْأَسِ'** লিখেছে যখন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল"।

সূরা নুরের ২৭ নং আয়াতঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানু লা তাদখুলু বুউতান গাইরা বুউতিকুম হাত্তা **তাস্তানিসূ** ওয়া তা সাল্লিমু..........."।

ইমাম হাকিম আল মুসতাদরক 'আলা সাহিহহাইন', অন লাইন লিংকঃ

حدثنا أبو علي الحافظ أنبأ عبدان الأهوازي ثنا عمرو بن محمد الناقد ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن شعبة عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما : في قوله تعالى : { لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا } قال : أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا

মুজাহিদ(র) বর্ণনা করেছেনঃ "ইবনে আব্বাস (রা) কুরআনের এই আয়াত {ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানু লা তাদখুলু বুউতান গাইরা বুউতিকুম হাত্তা তাস্তানিসূ} সমন্ধে বলতেন এটা লেখকের ভুল, (আসলে) হবে তাসতাযিনু"।

ইমাম যাহাবি(র) ও হাদিসটিকে সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরীফের মানদন্ডে সহিহ বলেছেন।

ফাতহুল বারী সারাহ সাহিহ আল বুখারিতে, হাফিজ ইবনে হাজর আস্কালানি উল্লেখ করেছেনঃ

اخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي في الشعب بسند صحيح أن ابن عباس كان يقرأ حتى تستأذنوا ويقول أخطأ الكاتب

"সাইদ বিন মান্সুর, তাবারি এবং বাইহাকী তার শাইব এ সহিহ সনদ সহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে ইবনে আব্বাস পড়তেন ' হাত্তা তাস্তাযিনু' এবং বলতেন লেখক ভুল করেছেন"।

তফসীরে তাবারীতে, ইবনে আব্বাস থেকে সহিহ সনদে উল্লেখ রয়েছেঃ

حدثنا ابن بشار قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية { لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا } وقال إنما هي من خطأ الكاتب { حتى تستأذنوا وتسلموا

"........ইবনে আব্বাস এই আয়াত {"ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানু লা তাদখুলু বুউতান গাইরা বুউতিকুম হাত্তা তাস্তানিসূ ওয়া তা সাল্লিমু...} ব্যাপারে বলতেন এটা লেখকের ভুল, এটা হবে {"হাত্তা তাস্তাযিনু"}"।

আরও বিখ্যাত সালফে সালাফ তাবে'ঈ সাইদ বিন যুবাইর বলেছেনঃ

ولكنها سقط من الكاتب {تستأذنوا حدثنا ابن المثنى قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير بمثله غير أنه قال : إنما هي } حتى

"............ এটা হওয়া দরকার {"হাত্তা তাস্তাযিনু"} , কিন্তু লেখকের ভ্রান্তি" ।

এই একই ধরনের কথা বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাসউদ(রা), উবাই ইবনে কাব(রা) থেকে [তাফসীর দুররুল মানসুর, তাফসীর রুহুহুল মানি, তাফসীর আল কাবির, তাফসীর ফাতহুল কাদীর]।

তাফসীরে থালাবী থেকে তুলে ধরছিঃ

أخبرنا أبوبكر بن عبدوس وأبو عبدالله بن حامد قالا : حدثنا أبوالعباس الأصم قال حدثنا : محمد بن الجهم السمري قال حدثنا الفراء قال حدثني أبومعاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن قوله سبحانه في النساء { لكن الراسخون } { والمقيمين } وعن قوله في المائدة { إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون } وعن قوله { إن هذانِ لساحران } فقالت : يا بن أخي هذا خطأ من الكاتب

হিসাম বিন উরুয়া বলেন, আয়শা(রা) কে জিজ্ঞেস করা হল সুরা নিশা এর আয়াত (১৬২) "**লাকিনি আর-রাসিখুন**" এবং "**ওয়া আল-মুকীমিন**" আর তাঁর বানী মায়িদার (৬৯) "**ইন্না আল্লাযীনা আমানু ওয়াল্লাযীনা হাদু ওয়াস স্বেবেউন**" আর তাঁর বানী (ত্বহা ৬৩)"**ইন হাযানি লিসাহিরান**"। **আয়শা উত্তর দিল 'হে আমার বোনপো! এটা লেখকের ভুলের জন্য (এই রকম হয়েছে)"।**

আল ইতকান থেকে তুলে ধরা হচ্ছে যেখানে আল্লামা সুয়ুতি এই হাদিসকে সাহিহ বলেছেন।

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لَحْنِ الْقُرْآنِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} وَعَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} وَعَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} **فقالت: يا بن أَخِي هَذَا عَمَلُ الْكُتَّابِ أَخْطَئُوا فِي الْكِتَابِ** " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

উক্ত কিতাবের ৩৯২ এ আল্লামা সুয়ুতি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেনঃ

وبعد فهذه الأجوبة لا يصلح منها شيء عن حديث عائشة أما الجواب بالتضعيف فلأن إسناده صحيح كما ترى

"আয়িশার থেকে এই সনদ যইফ বলে সন্দেহ করার কোন ভিত্তি নেই। এর সনদ সহিহ"।

- **সূরা ইউনুসের একটি শব্দ**

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছিলেন একজন আরবী ভাষার শিক্ষক। তিনি হযরত উসমানের কোরআনের কিছু শব্দ পরিবর্তন করেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাফসীরে জালালাইনের গ্রন্থ থেকে সূরা ইউনুসের ২২ নম্বর আয়াতে । লক্ষ্য করে দেখুন, জালালাইনের তাফসীরে দুইটি শব্দের পাঠের কথা বর্ণিত রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, লাওহে মাহফুজের কোরআনে কোন শব্দটি আছে?

তাফসীরে জালালাইন (৩য় খণ্ড) : আরবি-বাংলা

٢٢. هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَنْشُرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ع السُّفُنِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ فِيْهِ الْتِفَاتٌ

২২. তিনিই তাদেরকে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করান يُسَيِّرُكُمْ অপর এক পাঠে রয়েছে يَنْشُرُكُمْ অর্থ তোমাদেরকে ছড়িয়ে দেন। এবং তোমরা যখন নৌকায় الْفُلْكِ অ... নৌকাসমূহ। আরোহণ কর আর এগুলো তাদে... [আরোহীদের] নিয়ে সুখকর নরম বাতাসে বয়ে যায়

Musnad Ahmad 21245

Narrated 'Aasim ibn Bahdalah, from Zirr, who said:

Ubayy ibn Ka'b said to me: How long is Soorat al-Ahzaab when you read it? Or how many verses do you think it is? I said to him: Seventy-three verses. He said: Only ?! It was as long as Soorat al-Baqarah.

তাফসীরে দুররুল মানসুর খণ্ড ৫ পাতা ১৮০, সূরা আহযাব।

قال لي أبي بن كعب : كيف تقرأ سورة الاحزاب أو كم تعدها ؟ قلت ثلاثا وسبعين آية فقال أبي : قد رأيتها وانها لتعادل سورة البقرة
"উবাই ইবনে কাব(রা) একজনকে জিজ্ঞেস করলেন '**সূরা আহযাবে** কত আয়াত আছে'? সে উত্তর দিল '৭২ বা ৭৩ টা আয়াত হবে'। উবাই ইবনে কাব(রা) বললে- '**আমি এই সুরাকে, সূরা বারাকার সমান বা বেশী দেখছি**'"।

তাফসীর কুরতুবি, খণ্ড ৭ পাতা ১১৩, সুরা আহযাব।
"আয়শা বর্ণনা করেছেন 'সূরা আহযাবে রাসূল সা এর জিব্দশায় ২০০ টা আয়াত ছিল, কিন্তু যখন কুরআন সংকলন করা হল আমরা মাত্র ঐ সংখ্যক আয়াত দেখি যেটা এখন দেখা যায়"।

তাফসীরে রুহুল মা'আনি পারা ২১ পাতা ১২১।
"**আয়শা(রা) বর্ণনা করেছেন 'রাসূল সা এর সময় আমরা সূরা আহযাবে ২০০ টা আয়াত পড়তাম, যখন উসমান(রা) আয়তগুলি একত্রে করল সে এর থেকে বেশী আয়াত পান নি** (৭৩ এর থেকে বেশী)"।

তাফসীরে দুররুল মানসুর খণ্ড ৫, সূরা আহযাব। অনলাইন এডিশনে দেখুন দুররুল মানসুর, খণ্ড ৬ পাতা ৫৬০
"আয়শা (রা) বর্ণনা করেছেন '**রাসূল সা এর জিবদ্দশায় সূরা আহযাবে ২০০ টা আয়াত পড়া হত, কিন্তু যখন উসমান(রা) বই আকারে সংকলন করেন সে মাত্র বর্তমান সংখ্যক আয়াত সংগ্রহ করতে সফল হয়**"।

- **আবদুল্লাহ ইবনে উমর এর বক্তব্য**

প্রখ্যাত সাহাবী এবং হাদিস ও ফিকহের অন্যতম বড় পন্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ছিলেন হযরত উমরের পুত্র। তিনি ১৬৩০টি নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন। নবী মুহাম্মদ তাকে 'সৎ লোক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন- "**রাসূলুল্লাহ সা এর সময়ে সূরা আহযাবের প্রায় দু'শটি আয়াত তেলাওয়াত করা হতো। কিন্তু কুরআন সংকলন করার সময় উসমান কেবলমাত্র যা বর্তমান কোরআনে বিদ্যমান তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন**"। [আল ইতকান, পৃষ্ঠা ১২-১৩]

12

He also said: "Ibn Abū Maryam reported to us from Ibn Lahī`a, from Abū 'l-Aswad, from `Urwa b. 'l-Zubair, that A'isha said: "During the time of the Prophet (s) two hundred verses of the chapter 'l-Aĥzāb were recited but when compiling the Qur'ān `Uthmān was only able to collect what now exists."

As-Suyuti, Itqan, part 3, page 72, তাফসীরে দুররুল মানসুর খন্ড ১ পাতা ১০৬, তাফসীর রুহুল মা'আনি খণ্ড ১ পাতা ২৫।
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليقل : قد أخذت منه ما ظهر منه
"ইসমাইল বিন ইব্রাহিম(র) বর্ণনা করেছেন আইউব থেকে তিনি নাফিই থেকে যে ইবনে উমার (রা) বলেছেন '**নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে লোকেরা বলবে যে সে কুরআনকে পেয়েছে, অথচ সে জানে না কুরআনের মোট পরিমাণ কত ছিল, বরং তার বলা উচিত যে সে ঐ কুরআন পেয়েছে যেটা সামনে আছে। কেননা কুরআনের অনেকাংশ হারিয়ে গিয়েছে**"।
হাদিসের মানঃ যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন- রেজাল শাস্ত্র থেকে প্রমাণিত, এই হাদিসের সব বর্ণনাকারী শিকা(বিশ্বস্ত)। ইসমাইল বিন ইব্রাহিম হলেন প্রমাণিত বিশ্বস্ত রাবী। আর আইয়ুব(র) হলেন উলামাদের উস্তাদ এবং একজন বিশ্বস্ত রাবী। আর নাফিই হলেন তাবেইনদের ইমাম। (তাকরিব আত তাহযিব খঃ১ পাতা ৯০)
সুতারং দেখা যাচ্ছে সব বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। উপরিউক্ত জালালুদ্দিন সুয়ুতি তাঁর তাফসীর এ কি বলেছেন সেটা মনে রাখা দরকারঃ "আলহামদুলিল্লাহ ....যিনি আমাকে তাঁর মহান কিতাবের তাফসীর উচ্চমান সনদ যুক্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে লেখার সামর্থ্য প্রদান করেছেন"। সুতরাং উপরের হাদিস যে সহিহ তা প্রমাণিত।
প্রশ্নঃ অনেক মডারেট ইসলামিক বক্তা দাবী করেন যে- উক্ত হাদিসে 'যাহাব' শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে, যাহাব মানে 'নষ্ট/লুপ্ত/হারিয়ে' নয় এর অর্থ নাকি 'রহিত' বা মনসুখ ?!
উত্তরঃ সম্পূর্ণ মনগড়া এ দাবিটির কোনো ভিত্তি নেই। ওসব বানোয়াট বক্তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া হল যে তারা একটা এরাবিক ডিকশনারি নিয়ে আসুক যাতে 'যাহাব' মানে 'মনসুখ- রহিত' বলে বলা হয়েছে।
সবচেয়ে বড় কথা- উমার বিন খাত্তাব (রা) এই যাহাব মানে 'মনসুখ' প্রপাগান্ডাকে রদ করে দিয়েছে।
সাহিহ বুখারিতে রয়েছেঃ

أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن في **ذهب** كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع

যায়দ ইবনু সাবিত (রা) বলেন, উমর (রা) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি, এমনিভাবে যদি কারীগণ শহীদ হয়ে যান, **তাহলে কুরআন শরীফের বহু অংশ হারিয়ে যাবে**। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন।....................”।

এই হাদিসে উমার (রা) ‘যাহাব’ শব্দ ব্যাবহার করেছেন যার পরিষ্কার অর্থ- “হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া”। কারণ ইয়ামামার যুদ্ধ নবী সা এর ইন্তেকালের পর হয়েছিল, **আর নবী সা এর ইন্তেকালের পরে কুরআনের বেশির ভাগ অংশ রহিত হয়ে যাবে সেটা শুধু কাদিয়ানিরাই বলতে পারে কারণ এরা নবী সা কে মানে না।**

যদি কোনো মুসলিম যাহাব মানে এক মুহূর্তের জন্যও ‘রহিত’ হিসাবে মনে করেন তবে তার মানে দাঁড়ায়- “ উমর (রা) বলেছেন, আমি আশংকা করছি, এমনিভাবে যদি কারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহলে কুরআন শরীফের বহু অংশ রহিত যাবে”। !! এটা যে কত বড় একটা ভয়ংকর গুনাহের চিন্তা আর তা বলার অপেক্ষ্যা রাখে না। যে কারী হাফেজদের মৃত্যুর সাথে কুরআন রহিত হয়ে যাবে।

সুতরাং ইবনে উমার (রা) এর ঐ হাদিসটিতে যাহাব মানে নষ্ট, লুপ্ত বা হারিয়ে যাওয়া অর্থেই ব্যাবহার হয়েছে- সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহের সুযোগ নেই।

- **আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)**

সহীহ বুখারী (ইফাঃ)

আম্বিয়া কিরাম (আ) ৩৫৭

৩৫৩৬ আবুল ওয়ালিদ (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর মজলিসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর আলোচনা চলছিল। তখন তিনি বললেন ; তিনি সে ব্যক্তি যাঁকে নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য শুনার পর থেকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। নবী ﷺ বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (সর্ব প্রথম তিনি এ নামটি বললেন)। সালিম

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

৫০০২। **আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, “আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাবের অবতীর্ণ প্রতিটি সূরা সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোন্ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত এবং সেখানে উট পৌঁছতে পারে, তাহলে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছে যেতাম”।**

কিন্তু উসমানের কোরআনে ছিল তাদের পঠন থেকে ভিন্ন কিছু, এখানে ঘটেছে সংযোজন বিয়োজন অথবা ঘটেছে বিকৃতি।

দুররুল মনসুর খণ্ড ৪, পাতা ৬৫৪:-

“ইবনে জারির(র)ও আবি মুনযির(র), উবাই ইবনে কা’ব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, **উবাই ইবনে কা’ব (রা) এই আয়াতটি পড়তেন- ‘যদি তোমরা সালাত কসর করো, যে কাফেররা ক্ষতি করতে পারে’, যদি তোমরা ভয় করো, إن خفتم এই অংশটি বাদ দিয়ে। অথচ উসমানের সংকলিত কুরআন এ আছে- ‘তোমরা সালাত কসর করো, যদি তোমরা ভয় করো যে কাফেররা ক্ষতি করতে পারে’**

একথা স্পস্ট যে সাহাবী উবাই বিন কাব “ যদি তোমরা ভয় করো, إن خفتم ” পড়তেন না। এ কথাও স্পষ্ট যে উসমানের মুসহাফ-এ এটা বাড়ানো হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর মতে- সূরা ফাতেহা এবং মাউযাতাইন (সূরা ফালাক এবং সুরা নাস) কোরআনের অংশই নয় । এজন্য তিনি তার মাসহাফে শেষোক্ত দুটি সুরা লিখতেন না । তিনি এই দুই সূরাকে নিজেই নিজের লিখিত কোরআনে অন্তর্ভূক্ত করেন নি।

তাফহীমুল কুরআন আল ফালাক, আন নাস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি এ সূরা দু'টিকে কুরআনের সূরা বলে মানতেন না এবং নিজের পাণ্ডুলিপিতে তিনি এ দু'টি সূরা সংযোজিত করেননি। ইমাম আহমাদ, বাযযার, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবু ইয়ালা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হুমাইদী, আবু নু'আইয, ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহীহ সনদের মাধ্যমে একথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসগুলোতে কেবল একথাই বলা হয়নি যে, তিনি এই সূরা দু'টিকে কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দিতেন বরং এই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি বলতেন : "কুরআনের সাথে এমন জিনিস মিশিয়ে ফেলো না যা কুরআনের অংশ নয়। এ সূরা দু'টি কুরআনের অন্তরভুক্ত নয়। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মাধ্যমে একটি হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, এ শব্দগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো বাড়তি বলা হয়েছে যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি পড়তেন না।

তারা সহজেই পেয়ে গেছে। কুরআনকে এ ধরনের দোষারোপ মুক্ত করার জন্য কাযী আবু বকর বাক্কেল্লানী ও কাযী ইয়ায ইবনে মাসউদের বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ইবনে মাসউদ সূরা ফালাক ও সূরা নাসের কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করতেন না বরং তিনি শুধু এ সূরা দু'টিকে কুরআনের পাতায় লিখে রাখতে অস্বীকার করতেন। কারণ তাঁর মতে কুরআনের পাতায় শুধুমাত্র তাই লিখে রাখা উচিত যা লিখার অনুমতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এ জবাব ও ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ ইবনে মাসউদ (রা) এ সূরা দু'টির কুরআনের সূরা হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন, একথা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত। ইমাম

When we come to the rest of the Qur'an, we find that there were numerous differences of reading between the texts of Zaid and Ibn Mas'ud. The records in Ibn Abu Dawud's Kitab al-Masahif fill up no less than nineteen pages. [Kitab al-Masahif, pp. 54-73]

Quran 2:275 begins with the words Allathiina yaakuluunar-ribaa laa yaquumuuna, meaning "those who devour usury will not stand". Ibn Mas'ud's text had the same introduction but after the last word there was added the expression yawmal qiyaamati, that is, they would not be able to stand on the "Day of Resurrection". [Kitab Fadhail al-Qur'an]

সহি আল বুখারির খণ্ড কিতাব 'তাফসির এ কোরআন' সুরা লাইল, বাব وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

"আবু দারদা (রা) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ-এর সাহাবীগণের কাছে এসেছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'তোমাদের মধ্যে কে আব্দুল্লাহর মতো কুরআন পড়তে পারো?' 'তোমাদের মধ্যে কে মুখস্থ জানে?' তাঁরা আলকামার দিকে ইঙ্গিত করল, তখন তিনি আলকামাকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদকে সুরা আল লাইল পড়তে কেমন শুনেছ?' আলকামা পড়লেন "والذكر والأنثى", আবু দারদা বললেন '**আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি নবী সা কে এই রকম পড়তে শুনেছি, কিন্তু লোকেরা চায় যে আমি এই রকম পড়ি وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى আল্লাহর কসম ! আমি ওদেরকে অনুসরণ করব না।**

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) এর সাহাবিগণ বা আবু দারদা(রা) ছাড়া আজ সারা মুসলিম জগত সুরা লাইল এর ৩ নং আয়াত এই রকম পড়ে وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

সুতরাং, একথা স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনে مَا خَلَقَ শব্দ দুটি যোগ করা হয়েছে!

- **উবাই ইবনে কাব**

উবাই ইবনে কাব (রা) ছিলেন সেই কজনের একজন যারা নবী এর মৃত্যুর পূর্বেই কুরআন হাফেজ ছিলেন, এবং নবী যে চারজনের থেকে কুরআন শিখতে বলেছেন তারমধ্যে তিনি অন্যতম। কিন্তু যায়েদের সংকলনে তার থেকে প্রাপ্ত অনেক আয়াত বাদ দেয়া হয়।

↥

- **আয়িশাহ বিনতে আবু বকর**

আল ইতকান, আল্লামা সুয়ুতি; তাফসীর দূররুল মানসুর; আল মুসাহিফ, ইবনে আবি দাউদ, যিকরে মুসহাফে আয়িশা।

“হামীদা বিন্তে ইউনুস(র) বর্ণনা করেছেনঃ ‘আমার পিতা ইউনুস(রা) যিনি ৮০ বছরের ছিল আমার জন্য সালাওয়াতের আয়াত আয়শা (রা)এর মুসহাফ থেকে এরকম পড়লেন- ‘আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর উপর দরুদ পাঠায় সুতরাং সে মুমিনগণ তোমরাও তাঁর উপর দরুদ পাঠ করো এবং যথাযোগ্য সালাম পেশ করো, **এবং তাদের উপর যারা প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে**’। **এই আয়াত আয়াত এই ভাবেই ছিল উসমান কুরানে পরিবর্তন করার আগে পর্যন্ত**”।

কুরআনে বর্তমান এ আয়াতটি- (৩৩:৫৬) ‘আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে দরুদ পেশ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর’।

আরো বিকৃতি

সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

১৩০৩। **আবূ ইউনূস (রা) বলেন, আয়িশা (রা) আমাকে তার জন্য কুরআন শরীফের একটি কপি লিখে দিতে আদেশ করলেন। এবং বললেন, যখন তুমি এই আয়াত, “যখন তুমি তোমার সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীত ভাবে দাঁড়াবে” (বাকারাঃ ২৩৮) এ পৌছবে তখন আমাকে জানাবে।** ইউনূস (রা) বলেন, **আমি উক্ত আয়াতে পৌছলে তাঁকে অবহিত করলাম, এবং তিনি আমাকে দিয়ে লিখালেনঃ তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাত ও আসরের সালাত এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীত ভাবে দাঁড়াবে।**” (বাকারাঃ ২৩৮) এরপর আয়িশা (রা) বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা থেকে এরুপ শুনেছি।

তাফসীরে দুররুল মানসুর, সুরা বাকারার ওই আয়াতের তাফসীরে; তাফসীর তাবারী উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে।

আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে(র) বর্না করেছেন ‘উম্মে সালামা আমাকে একটা কুরানের কপি লিখে দিতে বললেন এবং এই {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] আয়াতে পোঁছালে তাকে খবর দিতে বললেন। যখন আমি ওই আয়াতে পৌছালাম তাঁকে বলা হলে তিনি আমাকে এই ভাবে লিখতে বললেন (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ)

অনুরুপভাবে **ইবনে আব্বাস(রা) ও লিখেছেন ‘সালাতিল আসর’ এবং সাহাবী বারা ইবনে আযীব(রা)ও অনুরূপ বলেছেন** [সুনান আল কুবরা বাইহাকী, কিতাব আস সালাহ খন্ড ১ পাতা ৪৬২; মুস্তাদরক আল হাকীম; তাফসীর আত তাবারী)

লক্ষ্য করার বিষয়, ‘ও আসরের সালাত’ (ওয়া সালাতিল আসর) وَصَلَاةِ الْعَصْرِ এই অংশটা উসমানের সংকলিত কুরআনে নেই ! উম্মুল মোমেনিনরা নিজের কুরানে এই গুলি লিখিয়ে নিচ্ছিলেন এর থেকে প্রমান হয় উম্মুল মোমিনিরা কুরানে বিকৃতিতে ১০০ শতাংশ বিশ্বাস করতেন।

- **দু ‘টি অতিরিক্ত সূরা**

কোরআনে আরো দুইটি অতিরিক্ত সূরা ছিল, যা বর্তমান কোরআনে অনুপস্থিত। সাহাবী ও তাবেঈরা একথার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

তাফসীর দুররুল মান্সুর খণ্ড ৮ পাতা ৬৯৫। তাফসীর রুহুল মা’আনি- খণ্ড ১ পাতা ২৫।

উবাই(রা) এর মুসহাফে ছিল ১১৬টি(সূরা/অধ্যায়) এবং শেষ থেকে তিনি লিপিবদ্ধ করেন সূরা হাফদ এবং খাল’। [আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬]

Ubayy ibn Ka'b had 116 surahs in his, including two extra short surahs, al-Hafd (the Haste) and al-Khal' (the Separation), which he placed between what are surahs 103 and 104 in Uthman's Qur'an

al-Hafd:

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

O Allah, You alone we worship,

to You we pray and prostrate,

↥

and for Your sake we work and strive.
We hope for Your mercy and fear Your punishment,
for Your punishment will inevitably befall the disbelievers.

al-Khal': In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
O Allah, verily we seek Your help and Your forgiveness,
and we praise You and we are not ungrateful to You.
And we disavow and disown anyone who opposes You.

[al-Suyuti, Al-Itqan, p.152-153]

ঐ দুটি সূরা কুরআনে ছিল এবং সাহাবী ও তাবেঈরা একথার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

সূরা খুল"আ(খাল)ঃ

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك

"আল্লাহ আমরা তোমার থেকে সাহায্য চাই আর তোমার মাগফেরাত চাই। এবং আমারা তোমার প্রশংসা করি আর আমরা কাফের নই, আমরা অনৈতিকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখি"।

সুরাহ হাফদঃ

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجورحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار

"আল্লাহ আমরা তোমারই এবাদত করি, আর তোমার কাছে প্ররথনা করি তোমাকে সেজদা করি। আর তোমার দানকে নিয়ে তোমার বাধ্যাতার দিকে ছুটে যাই। আর তোমার রহমতের আশা করি এবং তোমার গজবের ভয় করি। তোমার আযাব কাফেরদের জন্য"।

আল ইতকান খণ্ড ১ পাতা ১৪১।

"উবাই ইবনে কাব (রা) এর মুসহাফে সূরা সমূহের যে ক্রম ছিল তা নিম্নরুপেঃ

[১] আল হামদ [২] আল বাকারাহ [৩] আলে ইমরান [৪] আল আন'আম [৫] আল আরাফ [৬]........................[৯৪] আত তাকাসসুর [৯৫] আল কদর [৯৬] সূরা আল খুল'আ [৯৭] সূরা হাকদ [৯৮]............"।

সূরা খুলআ' আর সূরা হাফদ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাঃ এর কুরানের সংকলনে ছিলঃ

তাফসীরে দুররুল মনসুর খণ্ড ৮ পাতা ৬৯৬

وزعم عبيد أنه بلغه أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود

"উবাইদ(র) বর্ণনা করেছেন, **এই দুটি কুরআনের সুরা ইবনে মাসুদের কুরআনের সংকলনে ছিল'।**

ইবনে আব্বাস (রা) তার কুরআনের সংকলনে সূরা খুলা' ও সূরা হাফদ লিখতেনঃ

আল ইতকান ফি উলুম আল কুরআন খণ্ড ১ পাতা ১৪৪।

"ইবনে আব্বাস (রা) এর কুরআনের সংকলনে, উবাই(রা) ও আবু মুসা(র) এর ক্বেরাত এই রকম ছিলঃ 'আল্লাহ আমরা তোমার থেকে সাহায্য চাই আর তোমার মাগফেরাত চাই।এবং আমারা তোমার প্রশংসা করি আর আমরা কাফের নই, আমরা অনৈতিকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখি'।

এবংঃ-

'আল্লাহ আমরা তোমারই এবাদত করি, আর তোমার কাছে প্ররথনা করি তোমাকে সেজদা করি।আর তোমার দানকে নিয়ে তোমার বাধ্যাতার দিকে ছুটে যাই। আর তোমার রহমতের আশা করি এবং তোমার গজবের ভয় করি। তোমার আযাব কাফেরদের জন্য'।"

আহলে সুন্নার মহান খলিফা এই দুটি সুরাকে নামাযে পড়তেনঃ

আল ইতকান খন্ড ১ পাতা ১৪৪

"উমার বিন খাত্তাব কুনুত করেছিলেন রুকুর পরে এবং পড়েছলেনঃ

'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আল্লাহ আমরা তোমার থেকে সাহায্য চাই আর তোমার মাগফেরাত চাই। এবং আমারা তোমার প্রশংসা করি আর আমরা কাফের নই, আমরা অনৈতিকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখি'।

'বিসমিল্লাহির রহমনির রাহিম

'আল্লাহ আমরা তোমারই এবাদত করি, আর তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমাকে সেজদা করি।
আর তোমার দানকে নিয়ে তোমার বাধ্যাতার দিকে ছুটে যাই। আর তোমার রহমতের আশা করি এবং তোমার গজবের ভয় করি। তোমার আযাব কাফেরদের জন্য'"।

ইতকান ফি উলুম আল কুরআন খণ্ড ১ পাতা ১৪৪। তাফসীরে দুররুল মানসুর খণ্ড ৮ পাতা ৬৯৫
"ইবনে আব্বাস(রা) এর কুরআনের সংকলনের, উবাই (রা) ও আবু মুসার ক্বেরাত এই রকম ছিলঃ 'আল্লাহ আমরা তোমার থেকে সাহায্য চাই আর তোমার মাগফেরাত চাই। এবং আমারা তোমার প্রশংসা করি আর আমরা কাফের নই, আমরা অনৈতিকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখি'। এবং-

'আল্লাহ আমরা তোমারই এবাদত করি, আর তোমার কাছে প্ররথনা করি তোমাকে সেজদা করি।
আর তোমার দানকে নিয়ে তোমার বাধ্যাতার দিকে ছুটে যাই। আর তোমার রহমতের আশা করি এবং তোমার গজবের ভয় করি। তোমার আযাব কাফেরদের জন্য'"।

মহান তাবেঈ উমায়া বিন আব্দুল্লাহ (মৃত্যু ৮৭ হিজরী) **দূটো সুরাই নামাযে পড়তেনঃ**
আল ইতকান খণ্ড ১ পাতা ১৪৪,
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَمَّنَا أُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ بِخُرَاسَانَ فَقَرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ
"তাবারানি সহিহ সনদ সহ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন 'খুরাসানে উমায়া বিন আব্দুল্লাহ বিন খালিদ বিন উসাইদ(র) নামাযে আমাদের ইমামতি করালেন আর এই দুটি সূরা (সুরাহ হাফদ ও সূরা খুলআ') পড়লেনঃ ইন্না নাস্তাইনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা'"।

- **আরো একটি হারানো সূরা**

সহীহ মুসলিম (ইফাঃ)
২২৯০। আবূ মূসা আশআরী (রা) কে বসরাবাসী ক্বারীগনের নিকট প্রেরণ করা হল। তিনি তথায় গিয়ে এমন তিনশ লোকের সাক্ষাৎ পেলেন, যারা কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা বসরা শহরের সম্ভ্রান্ত লোক এবং আল কুরআনের ক্বারী, **আপনারা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকুন। বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে আপনাদের মন যেন কঠিন না হয়ে যায়, যেমন পূর্বেকার লোকদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আমি একটি সূরা পাঠ করতাম যা দৈর্ঘ ও কাঠিন্যের দিক থেকে সূরা (বারা-আত) তাওবার অনুরূপ। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে**। **তবে তার থেকে এ কথাটি আমার স্মরণ আছে "যদি আদম সন্তানের জন্য দুই মাঠ পরিপূর্ণ ধন-দৌলত হয়, তবে সে তৃতীয় মাঠ অবশ্যই খুজে বেড়াবে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছু আদম সন্তানের পেট পুরা করতে পারবে না"**।
আমি অন্য একটি সূরাও পাঠ করতাম যা কোন একটি মুশাববিহতের সম পরিমাণ (দৈর্ঘ্য)। আমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তা থেকে আমার এতটুকু মুখস্থ আছেঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল"? বললে তা সাক্ষ্য তা সাক্ষ্য স্বরুপ তোমাদের গর্দানে লিখে দেওয়া হবে এবং এ বিষয়ে কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

মুস্তাদরক আল হাকিম, খণ্ড ২ পাতা ২২৪, কিতাব আল তাফসীর।
উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রসুল সাঃ বলেছেনঃ " নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমাদের সামনে আমি কুরআন পড়ি, এবং **রসুল সা পড়লেন- 'আহলে কিতাবদের মধ্যে কাফের ও যদি আদম সন্তান মাঠ পরিপূর্ণ ধন-দৌলত চায় , আর যদি তাকে সেটা দেওয়া হয় সে আরও একটি চাইবে, এবং যদি সেটাও দেওয়া হয় সে তৃতিয় মাঠ চাইবে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছু আদম সন্তানের পেট পুরা করতে পারবে না। আল্লাহ তাওবা কারিদের তওবা কবুল করে। আল্লাহের কাছে দ্বীন হল হানাফিয়া (ইসলাম), ইহুদিয়া বা নাসারি নয়। আর যে ভাল কাজ করে তার ভাল কাজকে অস্বীকার করা হবে না'"**।

সাহাবীদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধঃ

↥

৬২৬ তাফসীরে ইব্ন কাছীর

জারীরের গ্রন্থে রাবীর বর্ণনা নিম্নোক্ত রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। কাসিম ইব্ন রবীআহ বলেন, একদা আমি হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে مَا نَنْسَخْ مِنْ ايَةٍ اَوْ نَنْسَأْهَا এইরূপে পড়িতে শুনিয়া বলিলাম– সাইদ ইব্ন মুসাইয়্যেব উহাকে مَا نَنْسَخْ مِنْ ايَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এইরূপে পড়িয়া থাকেন।

Al-Tabari's tafsir for verse 4:24 includes narrations saying that Ibn 'Abbas, Ubayy ibn Ka'b, and Sa'id ibn Jubayr (others too in other tafsirs) included the words 'until a prescribed period' ('ila ajal musamma') after the words 'whom you profit by'.

Quran 4:24

Uthman recitation:	Recitation of Ibn Masud, Ubai ibn Kab, Ibn Abbas, Talha, Muqatil, Sayd Jubayr and Al-Sadi:
فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا	فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ إلى أجلِ مسمى فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
So when you have derived benefit from them then give them their dowers. There is no sin on you for whatever you agree to after this. Indeed, Allah is Knowing, Wise.	So when you have derived benefit from them for a prescribed period then give them their dowers. There is no sin on you for whatever you agree to after this. Indeed, Allah is Knowing, Wise.

Sources: Tafsir Tabari 5/18, Tafsir Thalabi 3/286, Tafsir Samarqandi 1/320, Tafsir Manthur 2/140-141, Nawawis Sharh Muslim 9/179

For example, in the first verse of Baqara one reads, " *Thilikal Kitaabu laa rayba fiih,* 'This is the Scripture of which there is no doubt'. Yet Ibn Masood (who was the Prophet's favorite reciter) along with several others recorded this as *" Tanziilul Kitabu laa rayba fiih,* '[This is] the Scripture sent down of which there is no doubt."

Today's Qur'ān:

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Ibn Masood Reading #1:

وَالْعَصْرِ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ لَخُسْرٍ
وَإِنَّهُ فِيهِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالتَّقْوَى
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

↥

Fig. 1: An example of variants in Sura al-Asr
(Source: Kitab al-Masahif, pp.192, 111, 55)

At the end of verse 198 of Baqara Ibn Masood included the extra phrase *fi Mawasemel hajj* (in the season of pilgrimage) after *an tabteghu fadhlen merrabekum* . Similarly, in the present Qur'ān , Surah Al-Imran 19 reads *Innaddina inddallaahil islamm* (the religion before God is Islam), but Ibn Masood's text had the word *al-Hanifiyya* instead of the word Islam.

In Sura Al-Imran the last part of verse 43 reads, *wasjudi warkai ma-arrke-ein,* 'prostrate thyself and bow with those who bow", but Ibn Masood's reading was, *warkai wasjudi fes-sajedeen ,* (bow thyself and prostrate among those who prostrate."[4]

↥

Chronology of the Quran
Muhammad
The Quran was not written when Muhammed died in 632 AD, according to Sahih al-Bukhari 8:81:817
632-34 AD
Abu Bakr
Abu Bakr ordered the Quran to be written down around 632-34 AD, according to Sahih al-Bukhari 6:61:509 and 8:81:817, with the compiler Zaid ibn Thabit
Unknown
Unknown
Unknown
Ibn Masud (Kufa) 111 chapters
Ubayy (Damascus) 115 chapters
Abu Musa (Basrah) 116 chapters
7 ahrufs
650-52 AD
Uthman
The Quranic manuscripts differed in different regions, so Uthman made a new Quran, and ordered the old to be burned, according to Sahih al-Bukhari 6:61:510. He made 9 copies sent to nine diferent cities
934 AD
Ibn Mujahid
Arabic dialect got developed and Qurans with different dialects got created. Ibn Mujahid introduced 7 new Qurans with dialects, and ordered the previous Quranic manuscripts to be illegitimate
1429 AD
Al-Jazari
800 years after Muhammad supposedly died, Al-Jazari added another 3 Qurans with dialect. Those were from the reciters: Abu Ja'far (Medina) Ya'qub al-Yamani (Basrah), Khalaf (Kufa)
30 Qira'at (dialect)
Nafi (Medina)
Ibn Kathir (Mecca)
Ibn 'Amir (Damascus)
Abu 'Amr (Basrah)
Aasim (Kufa)
Hamzah (Kufa)
al-Kisai (Kufa)
Abu Ja'far (d. 748 AD)
Ya'qub (d. 821 AD)
Khalaf (d. 844 AD)
Qalun (835 AD)
Al-Bazzi (d. 864 AD)
Al-Duri (d. 860 AD)
Hisham (859 AD)
Shu'bah (d. 809 AD)
Khalaf (d. 844 AD)
Al-Layth (d. 854 AD)
'Isa ibn Wardan (d. 777 AD)
Ruways (d. 853 AD)
Ishaq (d. 899 AD)
Warsh (812 AD)
Qunbul (d. 904 AD)
Al-Susi (d. 874 AD)
Ibn Dhakwan (d. 857 AD)
Hafs (d. 796 AD)
Khallad (d. 835 AD)
Al-Duri (d. 860 AD)
Ibn Jummaz (d. 787 AD)
Rawh (d. 849 AD)
Idris (d. 905 AD)
1924 AD
Cairo, Egypt
With 30 different Qurans, it was decided in 1924 in Al-Azhar University, Cairo that the Hafs should be the standard Quran to use in Egypt and later in the entire world.

Former Turkish Muslim Hatun Tash of DCCI ministries & her team in London have found over 30 Arabic Qurans around the world (not English translations of the Quran, but Arabic Qurans), & between them they have discovered approximately 93,000 differences.

www.daralfiker.com

دار الفكر
ناشرون وموزعون
Dar AL-Fiker
Publishers & Distributers

Al Al Hajeeri Complex,
Rashid Al Madfai St A3,
Amman 11118, Jordan

24 Arabic versions of the Qur'an

Hafs with Shu'bah
Khalaf with Khallad
al-Dūri with al-Sūsi
Warsh via al-Asbahani
Warsh via al-Azraq
Hafs with Qalūn
Hafs with Ibn Kathir
Ibn Jamaz with Ibn Wardan
Hafs with Ya'qūb
Rūh with Ruwais
Khalaf
Shu'bah
Hafs with Ibn 'Amir
Hafs with Ibn Ja'far
Hisham with Ibn Dhakwan
Hafs with Khalaf
Hafs with al-Sūsi
Al-Bazzi with Qunbul
Assessment of the merged versions
TEN VERSIONS together
al-Laith with al-Kisai
Hafs with Ibn 'amro

↥

The Corruption of the Quran

Source: QuranGateway.org

৯৫০ শতাব্দীর পর কুরআনের নিম্নোক্ত সংকলন হয়-

১) Nafi` লিপিবদ্ধ করেছেন-

ক) Warsh — যা **আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনিশিয়ার একাংশ , ওয়েস্ট আফ্রিকা এবং সুদানে প্রচলিত** ।

খ) Qalun — যা **লিবিয়া, তিউনিশিয়া এবং কাতারের একাংশে প্রচলিত** ।

২) Ibn Kathir লিপিবদ্ধ করেছেন

ক) al-Bazzi এবং

খ) Qunbul

৩) Abu `Amr al-‘Ala’ লিপিবদ্ধ করেছেন

ক) al-Duri — যা **সুদান এবং ওয়েস্ট আফ্রিকার র কিছু অংশে প্রচলিত** ।

খ) al-Suri

৪) Ibn `Amir লিপিবদ্ধ করেছেন-
ক) Hisham এবং
খ) Ibn Dhakwan — **Yemen এর একাংশে প্রচলিত** ।

৫) Hamzah লিপিবদ্ধ করেছেন
ক) Khalaf এবং
খ) Khallad

৬) al-Kisa'i লিপিবদ্ধ করেছেন
ক) al-Duri এবং
খ) Abu'l-Harith

৭) Abu Bakr `Asim লিপিবদ্ধ করেছেন
ক) Hafs —**এ ভার্সনই সাধারনত মুসলিম বিশ্বে অধিক প্রচলিত** ।
খ) Ibn `Ayyash

8) Abu Ja`far লিপিবদ্ধ করেছেন-
ক) Ibn Wardan এবং খ) Ibn Jamaz

9) Ya`qub al-Hashimi লিপিবদ্ধ করেছেন-
ক) Ruways এবং
খ) Rawh

10) Khalaf al-Bazzar লিপিবদ্ধ করেছেন-
ক) Ishaq এবং
খ) Idris al-Haddad

দেখা যাচ্ছে কোরআনের ২০ টির মত ভার্সন ছিল একসময়ে। একাধিক ভার্সন যেহেতু আছে ,একটির সাথে অন্যটির পার্থক্যও নিশ্চয় আছে। এবার আমরা তুলনামূলক পার্থক্য দেখব-

হাফস কোরআনে ৯১:১৫ এ দেখতে পাবেন ওয়ালা-ইয়াখা-ফু (وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا)
অনুবাদ:- "এবং তিনি ভীত নন..." =)ওয়ারশ কোরআনে ৯১:15 দেখতে পাবেন ফালা-ইয়াখা-ফু (فلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا) অনুবাদ:- "অতপরঃ তিনি ভীত নন..."

হাফস ৩:১৪৬ ক্বা-তালা (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ)
অনুবাদ:- " আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে হত্যা করেছে... "
=)ওয়ারশ ৩:১৪৬ ক্বুতিলা (قُتِلَ)
অনুবাদ:- " আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করা হয়েছে ..."

হাফস কোরআনে ২১:৪ দেখতে পাবেন ক্ব-লা (قَالَ رب يعلم)
অনুবাদ: – "সে বলল : পালনকর্তা জানেন..."
=) ওয়ারশ কোরআনে ২১:৪ দেখতে পাবেন ক্বুল (قُلْ رب يعلم) "তুমি বল : পালনকর্তা জানেন..."।

হাফস ২৮:৪৮ সিহরা-নি...(قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ) অনুবাদ:- " তারা বলেছিল, উভয়ইটিই জাদু"
=)ওয়ারশ ২৮:৪৮ সা-হিরা-নি (قَالُوا سَٰحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ) অনুবাদ:- " তারা বলেছিল, উভয়ই জাদুকর"

The writing of the Quran according to Hafs
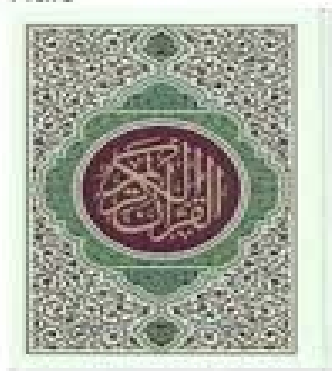
The writing of the Quran according to Warsh
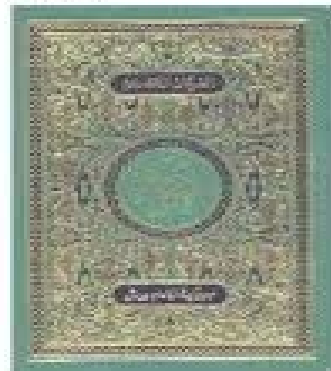
يَرْتَدَّ

surah *5:54* (yartad**da**)

يَرْتَدِدْ

surah *5:54* (yarta**did**)

وَلَا يَخَافُ

surah *91:15* (**wa** la yakhaafu)

surah *91:15* (**fa** la yakhaafu)

surah *2:132* (wawassaa)

surah *2:132* (wa'awsaa)

Hafs version Q.2:48

عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٨﴾
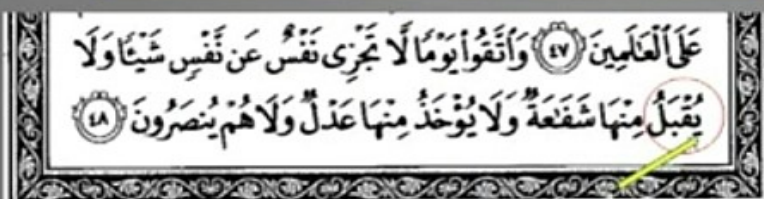
And fear a Day when no soul will not avail another, nor will an intercession (f.) ***BE ACCEPTED (m.)*** *of it [the soul]*

(Note : the Hafs version is grammatically incorrect in this verse, since it has a feminine noun 'intercession' with a masculine verb. The Ruh version below corrects this error, by changing the verb to a feminine verb.)

Ruh version Q.2:48

عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤٧﴾
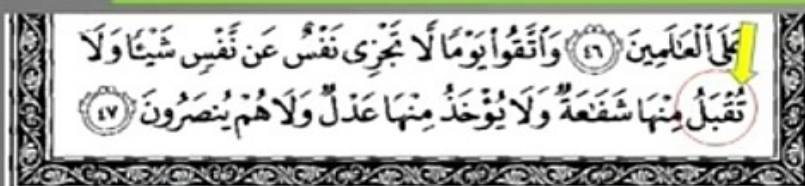
And fear a Day when no soul will not avail another, nor will an intercession (f.) ***BE ACCEPTED (f.)*** *of it [the soul]*

Hafs version Q.2:140

وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ
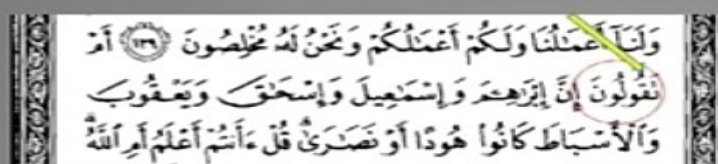
"Or do **YOU (pl.) SAY** that Abraham and Isma'il and Isaac and Jacob and the tribes of Israel

Warsh version Q.2:140

وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ آنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ
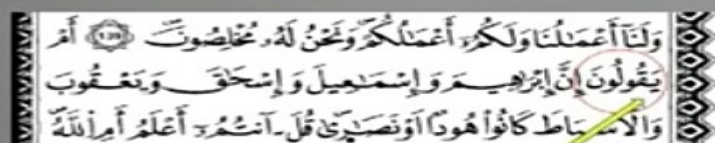
"Or do **THEY (pl.) SAY** that Abraham and Isma'il and Isaac and Jacob and the tribes of Israel

SURAH MAIDAH 5:6

HAFS 'ARJUL*A*KUM'

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن
كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ
أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

O you who have believed, when you rise to [perform] prayer, wash your faces and your forearms to the elbows and wipe over your heads and ***wash your feet*** to the ankles. And if you are in a state of janabah, then purify yourselves......

SUSI 'ARJUL*I*KUM'

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن
كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَا أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ
أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

O you who believe! When you stand up for the prayer, then wash your faces and your hands till the elbows and ***wipe your heads and your feet*** till the ankles. But if you are (in) a state of ceremonial impurity then purify yourselves.....

SURAH BAQARAH 2:259

HAFS ``NUNSHIZUHA``

كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ
عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَـٰذِهِ ٱللَّهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ
فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ
حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى
ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا
تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

WARSH ``NUNSHIRUHA``

اَ۬لظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٧﴾ أَوْ كَالذِے مَرَّ عَلَيٰ قَرْيَةٍ وَهْيَ خَاوِيَةٌ عَلَيٰ عُرُوشِهَا قَالَ
أَنّ۪يٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ اِ۬للَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اُ۬للَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ قَالَ
كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ
فَانظُرِ اِلَيٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرِ اِلَيٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرِ اِلَى اَ۬لْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اَ۬للَّهَ عَلَيٰ كُلِّ شَےْءٖ قَدِيرٌ ﴿٢٥٨﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ

SURAH IMRAN 3:13

HAFS ``YARAUNAHUM``

وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ
لَكُمْ ءَايَةٌ فِى فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَـٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ
يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِى
ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴿١٣﴾ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ

WARSH ``TARAUNAHUM``

﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِے فِئَتَيْنِ اِ۬لْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِے سَبِيلِ اِ۬للَّهِ
وَأُخْر۪يٰ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ اَ۬لْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ
مَن يَشَآءُ إِنَّ فِے ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِے اِ۬لْأَبْصٰرِ ﴿١٣﴾ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ

Warsh version	Hafs version	Hafs	Warsh	Surah
يَعْمَلُونَ	تَعْمَلُونَ	you do	they do	Al-Baqara 2:85
مَا تُنَزِّلُ	مَا نُنَزِّلُ	we did not send down	you did not send down	Al-Hijr 15:8
قُل	قَالَ	he said	say!	Al-Anbiyā' 21:4

↥

প্রিয় মুসলিম ভাই/বোন, আপনি যদি উপরোক্ত সম্পূর্ণ আর্টিকেলটি মনযোগ সহকারে বুঝে পড়ে থাকেন, তবে – " ইসলাম মানবরচিত(নবী মুহাম্মদের তৈরী) নয় " – এ সম্বন্ধে জন্মগতভাবে পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবে আপনার মনে তৈরী হওয়া এতকালের দৃঢ় বিশ্বাস _ভেঙে চুরে খান খান হয়ে গিয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপনি যদি আপনার মনের কাছে সৎ হন তবে এটা আপনি মানুষের ভয়ের কারণে মুখে না বললেও অস্বীকার করতে পারবেন না।

তবে আপনি যে ইসলামের হিপোক্রেসি বুঝতে পেরে , ইসলাম সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস উঠে গেছে- তা কিন্তু ভুলেও আশেপাশের/পরিচিত কোন মুমিনের সাথে শেয়ার করতে যেয়েন না!! তাহলে দেখবেন পরদিন আপনার ঘাড় থেকে মাথা আলাদা করে দিয়েছে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে।

মানুষদের ইসলামে আকৃষ্ট করার জন্য যুদ্ধবন্দী নারী ও সম্পদের প্রলোভন, এবং পরকালের অসীম প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখানো

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

৩৯৮৫। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আমাদের পূর্বে কারো জন্য গনীমাতের মাল (ভোগ করা) জায়িয ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে তা আমাদের জন্য জায়িয করে দিয়েছেন।

৪০৩০ আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ কিছু কিছু খেজুর গাছ নবী সা এর জন্য(হাদিয়া) নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। অবশেষে বনু কুরায়যা ও বনু নাযীর জয় করা হলে তিনি ঐ খেজুর গাছগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন।

৭৫৩০ মুগীরাহ (রা.) বলেন, আমাদের নবী সা আমাদেরকে আমাদের রবের বার্তা সম্পর্কে জানিয়েছেন যে আমাদের মধ্য থেকে যে, নিহত হবে, সে জান্নাতে চলে যাবে।

৪৬১৫ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন, আমরা নবী সা এর সঙ্গে যুদ্ধে বের হতাম, তখন আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকত না, তখন আমরা বলতাম আমরা কি খাসি হয়ে যাব না?

তিনি আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং কাপড়ের বিনিময়ে হলেও মহিলাদেরকে বিয়ে করার অর্থাৎ মুত'আ বিয়ের অনুমতি দিলেন।

৪২১৬ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মুত'আহ বিবাহ বলা হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ক্ষেত্র বিশেষে যেমন যুদ্ধ চলাকালীন সময় ও সফরে বৈধ ছিল। পরে খায়বারের যুদ্ধে এ ধরনের বিবাহকে হারাম ঘোষণা করা হয়। অতঃপর অষ্টম হিজরীতে মক্কাহ বিজয়ের আবার তিন দিনের জন্য তা বৈধ করা হয়েছিল। এরপর তা চিরতরে হারাম করা হয়।

৫১১৭ জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমরা কোন এক সেনাবাহিনীতে ছিলাম এবং রাসূল সা আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমাদেরকে মুত'আহ বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা মুত'আহ করতে পার।

৫১১৯ নবী সা বর্ণনা করেন, যে কোন পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে মুত'আহ করতে একমত হলে তাদের পরস্পরের এ সম্পর্ক তিন রাতের জন্য গণ্য হবে। এরপর তারা ইচ্ছে করলে এর চেয়ে অধিক সময় স্থায়ী করতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

৬১৮৪ আলী (রা.) বলেন, আমি সা'দ (রা.) ছাড়া আর কারো ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা কে এ কথা বলতে শুনিনি যে, আমার মাতা-পিতা তোমার প্রতি কুরবান। আমি তাঁকে উহুদের যুদ্ধে বলতে শুনেছিঃ হে সাদ! তুমি তীর চালাও। আমার মাতা-পিতা তোমার প্রতি কুরবান।

কুরআন 59:6। আল্লাহ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তোমরা তার জন্য কোন ঘোড়া বা উটে আরোহণ করে অভিযান পরিচালনা করনি।

৪২৪৮ জিহাদে পরাজিত শত্রুর সমস্ত সম্পদই গানীমত নয়। শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদই গানীমত। আর **ভূসম্পত্তি ও ঘর-বাড়ী 'ফায়' এর অন্তর্ভুক্ত**।

৪৮৮৫ উমার (রা.) বলেন, বনু নযীরের সকল বিষয়-সম্পত্তি আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে 'ফায়' হিসেবে দিয়েছেন (এ জন্য যে মুসলিমদের যুদ্ধ করা লাগেনি)। সুতরাং এটা খাস ছিল রাসূল সা এর জন্য। এর থেকে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরব্যাপী খরচ করেছেন। এরপর বাকিটা তিনি অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া সংগ্রহের পিছনে ব্যয় করেছেন জিহাদের প্রস্তুতি হিসেবে।

[গণীমত/যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও বন্দী ব্যতীত, কারণ গণীমতের ২ পনচমাংশ আল্লাহ ও রাসূলের, বাকিটা মুসলিম যোদ্ধাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল]

৭৪৫৭ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নিয়্যতে যে লোক বের হয়, এমন লোকের জন্য আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার হয়ে যান। হয়তো তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, নচেৎ যে জায়গা থেকে সে বের হয়েছিল সওয়াব ও গনীমতসহ তাকে সে জায়গায় ফিরিয়ে আনবেন।

৪৩২১ **যুদ্ধের পর নবী সা ঘোষণা দেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে তাঁকে তার (নিহত কাফির ব্যক্তির) পরিত্যক্ত সকল সম্পদ দেয়া হবে।**

৪৩৫০ নবী সা আলী (রা.)-কে খুমুস (গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ) নিয়ে আসার জন্য খালিদ (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। বুরাইদাহ রা. বলেন- আমি আলী (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট, আর **তিনি গোসলও করেছেন(গণীমতের বন্দীর সাথে সঙ্গম করে)**। তাই আমি খালিদ (রা.) কে বললাম, আপনি কি তার দিকে দেখছেন না? এরপর আমরা নবী সা-এর কাছে এসে আমি তার বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি বললেন, হে বুরাইদাহ! তুমি কি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট? আমি বললাম, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, **তার উপর অসন্তুষ্ট থেকো না। কারণ খুমুসে** তার প্রাপ্য এর চেয়েও অধিক আছে।

পাঠক লক্ষ্য করুন, যুদ্ধবন্দী নারীর সাথে যৌন কর্মের পরে গোছলের কথাটিকে বাঙলায় অনুবাদ করা হয়েছে শুধু গোছল হিসেবে। যুদ্ধবন্দী নারীর সাথে নবী জামাতা আলী সেক্স করতেন তা গোপন করার জন্য। খুব কৌশলে আলীর চরিত্র রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে একই হাদিসের ইংরেজি অনুবাদে সেটি পাওয়া যায়। Narrated Buraida: The Prophet (ﷺ) sent `Ali to Khalid to bring the Khumus (of the booty) and I hated `Ali, and `Ali **had taken a bath (after a sexual act with a slave-girl from the Khumus)**. I said to Khalid, "Don't you see this (i.e. `Ali)?" When we reached the Prophet (ﷺ) I mentioned that to him. He said, "O Buraida! Do you hate `Ali?" I said, "Yes." He said, "Do you hate him, for he deserves more than that from the Khumlus."

সহি বুখারিঃ ভলিউম-৫, বুক নং-৫৯, হাদিস নং-৬৩৭: ।
বুরাইদা (রা) কর্তৃক বর্ণিতঃ নবী আলীকে 'খুমুস' আনতে খালিদের নিকট পাঠালেন (যুদ্ধলব্ধ মালের নাম খুমুস)। আলীর উপর আমার খুব হিংসা হচ্ছিল, **সে (খুমুসের ভাগ হিসেবে প্রাপ্ত একজন যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যৌনসঙ্গমের পর) গোসল সেরে নিয়েছে।** আমি খালিদ (রা) কে বললাম- "তুমি এসব দেখ না"? নবীর কাছে পৌছলে বিষয়টি আমি তাকে জানালাম। তিনি বললেন- "বুরাইদা, আলীর উপর কি তোমার হিংসা হচ্ছে"? আমি বললাম-"হ্যাঁ, হচ্ছে"। তিনি বললেন-"তুমি অহেতুক ইর্ষা করছ, কারণ খুমুসের যেটুকু ভাগ সে পেয়েছে তার চেয়ে আরও বেশী পাওয়ার যোগ্য সে"।

শরহে বুখারী (মাগাযী ও তাফসীর অংশ) ২২৭

আল্লামা খাত্তাবী বলেন, এ হাদীসের উপর দু'টি প্রশ্ন হয়। (১) গর্ভমুক্ততা যাচাই (ইস্তেবরা) ব্যতিরেকে বাঁদীর সাথে সহবাস কিভাবে বৈধ হল? (২) বাঁদীকে নিজের জন্য নির্বাচন করা কিভাবে বৈধ হল?

প্রশ্নের দু'জওয়াব : (১) বাঁদীটি নাবালেগা ছিল, বিধায় গর্ভমুক্ততা যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়নি। (২) হযরত আলী তাকে নির্বাচনকালে তার মিন্স (হায়েজ) চলছিল। এর একদিন এক রাতের পর সে হায়েজ থেকে পবিত্র হলে তিনি তার সাথে সহবাস করেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব হলো, গনীমতের মাল প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন ও আমীরের নিজের জন্য মাল নির্বাচন করে নেয়া যেরূপভাবে আমীরের জন্য জায়েয, তদ্রূপ নায়েবে আমীরের জন্যও জায়েয।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৯১

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চিঠি পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, (নবী করীম সা.) আমাদের কাছে আলী (রা)-কে পাঠালেন। বন্দীদের মাঝে সেরা বন্দীনী এক তরুণী ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আলী 'খুমুস' বুঝে নিলেন এবং ভাগবাটোয়ারা করলেন এবং (সকালে) যখন বের হলেন তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল। আমরা বললাম, আবুল হাসান![1] একী ব্যাপার? তিনি বললেন, তোমরা কি বন্দীনীদের মাঝে সে কিশোরীটিকে দেখ নি? বাটোয়ারা 'খুমুস' উসুল করলে আমি সেটি 'খুমুসের' অন্তর্ভুক্ত করি। পরবর্তী বণ্টনে সেটি নবী পরিবারের অংশে[2] পড়ে এবং সে সূত্রে তা আমার ভাগে পড়ে এবং রাতে আমি তাকে 'ব্যবহার' করি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন দলনেতা নবী করীম (সা)-এর কাছে চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। আমি বলতে থাকলাম 'যথার্থ লিখেছেন'। বর্ণনাকারী বলেন, চিঠি পাঠের এক পর্যায়ে নবী করীম (সা) আমার হাত ও চিঠিটি থামিয়ে ধরে বললেন, اتبغض عليا 'তুমি কি আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর?' আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বললেন–

↥

"না, তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না! হ্যাঁ, তাঁর প্রতি ভালবাসা রেখে থাকলে তার ভালবাসা আরো বাড়িয়ে দাও! কেননা, যাঁর অধিকারে মুহাম্মদের জীবন তাঁর শপথ! গনীমতের পঞ্চমাংশে আলী পরিবারের প্রাপ্য অংশ অবশ্যই একটি কিশোরী বাঁদীর চাইতে বেশী। বর্ণনাকারী (বুরায়দা রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর এ উক্তির পরে মানবকুলের মাঝে আলী (রা)-এর চাইতে অধিকতর প্রিয় আমার কাছে আর কেউ ছিল না।

সাদকা সংগ্রহ করিয়া দিবে। আবার কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে সাদকার মাল দান করা হয় যে, উহার ফলে তাহার ন্যায় অপরাপর ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান হইবে। উপরোক্ত প্রকারের লোকগণও الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ —যাহাদিগকে মুসলমানদের প্রতি বিনীত অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে—এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহ্ শাস্ত্রের বড় বড় গ্রন্থে এতদ্‌সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

এইরূপ লোকগণ—যাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অন্তর মুসলমানদের প্রতি বিনীত হইবে অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) তাহারা কয়েক প্রকারে বিভক্ত। তাহাদের এক প্রকার হইতেছে এই সকল লোক—যাহাদিগকে মাল দান করিলে তাহাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যেমন নবী করীম (সা) সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন। উক্ত সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া মুশরিক থাকা অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া বলেন : এক সময়ে নবী করীম (সা) আমার নিকট অধিকতম বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এই অবস্থায় তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ অর্থ দান করিতে থাকিলেন। উহার ফলে এক সময়ে তিনি আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি হইয়া গেলেন।

ইমাম আহমদ (র) ... ... সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) আমাকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে আমাকে উক্ত মাল দান করিয়াছিলেন, সে সময়ে আমার নিকট তিনি ছিলন বিদ্বিষ্টতম ব্যক্তি। নবী করীম (সা) আমাকে পুনঃ পুনঃ অর্থ দান করিতে লাগিলেন। উহার ফলে এক সময়ে তিনি আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি হইয়া গেলেন।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম এবং ইমাম তিরমিযী রাবী ইউনুসের সূত্রে যুহরী হইতে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আরেক প্রকার হইতেছে এইরূপ দুর্বল ঈমানের মুসলমান—যাহাদিগকে মাল দান করিলে তাহাদের ইসলামের উৎকৃষ্ট হইবে এবং তাহাদের ঈমান মযবুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নবী করীম (সা) মক্কার দুর্বল ঈমানের নও-মুসলিমগণ যাহাদিগকে তিনি মক্কা বিজয়ের পর হত্যা না করিয়া এবং অন্য কোনরূপ শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহাদের নেতৃবৃন্দকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি বিরাট অংশ দান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের একেকজনকে একশত করিয়া উট দান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—আমি কখনো কখনো এইরূপ লোককে যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়, অর্থ দান না করিয়া এইরূপ লোককে অর্থ দান করি যে আমার নিকট অল্পতর প্রিয়। আমি উহা এই আশংকায় করিয়া থাকি যে, সে ব্যক্তি অর্থ না পাইলে ইসলাম ত্যাগ করিবে ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উলটামুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : একদা আলী (রা) ইয়ামান হইতে নবী করীম (সা)-এর নিকট একখণ্ড স্বর্ণ—যাহার সহিত উহার খনির মাটি মিশ্রিত ছিল—পাঠাইলেন। নবী করীম (সা) উহাকে চারিজন লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন : আকরা ইব্ন হাবিস, উইয়াইনা ইব্ন বদর, আলকামা ইব্ন আলাসাহ্ এবং যায়েদ আল-খায়ের। নবী করীম (সা) বলিলেন-'আমি তাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিয়া তাহাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি অধিকতর মহব্বত সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছি।

↥

৭৩৫৪ আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, **বাজারের বেচাকেনা মুহাজিরদেরকে ব্যস্ত রাখত। আর আনসারগণকে ব্যস্ত রাখত তাঁদের ধন-মালের প্রতিষ্ঠা**।

৭৩৬৪ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক, যতক্ষণ এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর** যখন তোমাদের মনে বিকর্ষণ দেখা দেয় **তখন তাথেকে উঠে যাও**।

সহীহ মুসলিম (ইফা)

৪৪৯০। আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সা যখন ওহুদ যুদ্ধের দিন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং প্রতিপক্ষ তাকে বেষ্টন করে ফেলে, তখন নবী সা বললেনঃ **কে আমার পক্ষ থেকে শত্রুদের প্রতিহত করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।** তখন আনসারদের মধ্যকার একব্যক্তি অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ শুরু করল এবং পরিশেষে শহীদ হন। তারপর পুনরায় প্রতিপক্ষ তাঁকে ঘিরে ফেললো এবং অনুরূপভাবে সাতজনই শহীদ হলো। তখন রাসুলুল্লাহ সা তার অন্যান্য সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেনঃ আমরা সঙ্গীদের প্রতি সুবিচার করিনি। (আমরা বেঁচে রইলাম, অথচ তারা শহীদ হলেন।)

৪২২৯ জুবায়র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং উসমান (রা.) নবী সা-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি খাইবারের প্রাপ্ত খুমুস থেকে বানু মুত্তালিবকে অংশ দিয়েছেন, আমাদেরকে দেননি। অথচ আমরা ও তারা সম্পর্কের দিক থেকে আপনার কাছে একই পর্যায়ের। তখন নবী সা বললেন, নিঃসন্দেহে বানী হাশিম এবং বানু মুত্তালিব সম-মর্যাদার অধিকারী। যুবায়র (রা.) বলেন, **নবী সা বনু শাম্স ও বনু নাওফিলকে খাইবার যুদ্ধের খুমুস থেকে কিছুই বণ্টন করেননি।** [খুমুস মানে গণীমত]

৪৩৩১,৩২,৩৭ আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, যখন রাসূল সা হাওয়াযিন গোত্রের সম্পদ(যুদ্ধলব্ধ)থেকে গানীমত হিসেবে যতটুকু দান করতে চাইছেন দান করলেন, এরপর নবী সা কতিপয় লোককে(তার নিজ বংশ কুরাইশদের) একশ করে উট দান করলেন। এ অবস্থা দেখে আনসারদের কিছুসংখ্যক লোক বলে ফেললেন- **আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সা-কে ক্ষমা করুন, তিনি কুরায়শদেরকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে বাদ দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে এখনো কাফেরদের রক্ত টপটপ করে পড়ছে।** একথা শোনার পর নবী সা তাঁদের একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে জমায়েত করলেন এবং তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে থাকতে অনুমতি দিলেন না। এরপর তাঁরা সবাই জমায়েত হলে নবী সা বললেন- "**আমি অবশ্য এমন কিছু লোককে দিচ্ছি যারা সবেমাত্র কুফর ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আর তা এ জন্যে যেন তাদের মনকে আমি ঈমানের উপর সুদৃঢ় করতে পারি**।"

৪৩৩৪ নবী সা আনসারদের লোকজনকে জমায়েত করে বললেন, কুরাইশরা সবেমাত্র জাহিলীয়্যাত ছেড়েছে আর তারা দুর্দশাগ্রস্ত। **তাই আমি তাদেরকে অনুদান দিয়ে তাদের মন জয় করার ইচ্ছা করেছি**।

৪২১ আনাস (রা.) বলেন, নবী সা এর নিকট বাহরাইন হতে অঢেল সম্পদ এলো। নবী সা এর নিকট এ যাবত যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল পরিমাণে সবচেয়ে বেশী। তিনি আমাদের সাহাবীদের যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে আব্বাস (রা.) এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকেও কিছু দিন। রাসূল সাঃ তাকে বললেনঃ নিয়ে যান। তিনি তা কাপড়ে ভরে নিলেন। অতঃপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন না। আব্বাস (রা.) বললেনঃ তাহলে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেনঃ না। অতঃপর আব্বাস (রা.) তা হতে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। এবারও তুলতে না পেরে আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূল সা তাঁর এই লোভ দেখে এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি আব্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি চোখের আড়াল হলেন।

৭১৬৩ **উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা একবার আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার হতে এ মালের প্রয়োজন যার অধিক তাকে দিন। তখন নবী সা বললেনঃ এটা নিয়ে মালদার হও এবং বৃদ্ধি করে তা থেকে সদকা কর**। আর এ মাল-ধনের যা কিছু তোমার নিকট এভাবে আসে, তুমি যার অধিকারী নও বা প্রার্থী নও তা গ্রহণ করো।

৭৪৩১ আলী (রা.) ইয়ামানে অবস্থানকালে নবী সা-এর কাছে কিছু স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। নবী সা- বনূ মুজাশি গোত্রের আকরা ইবনু হাবিস,...... ও বনূ কিলাবের একজন এবং বনু নাবহান গোত্রের যায়দ আল খায়ল এর মধ্যে তা বন্টন করে দেন। এ কারণে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, নবী সা নাজদবাসী সরদারদেরকে দিচ্ছেন। আর আমাদেরকে বঞ্চিত করছেন।
এ প্রেক্ষিতে নবী সা বললেনঃ **আমি তাদের অন্তর জয়ের চেষ্টা করছি। তখন এক লোক সামনে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করো।**

৪৩৩৪ গ্রন্থঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

৫৭/১৯. **নবী সা ইসলামের দিকে যাদের মন আকৃষ্ট করতে চাইতেন তাদেরকে খুমুস বা তদ্রূপ মাল থেকে দান করতেন**।

৩১৪৫। আমর (রা) বলেন, রাসূল সা-এর নিকট কিছু মালামাল, বন্দী আনা হয়, তখন তিনি তা বণ্টন করেন। রাসূলুল্লাহ্ সা এক দলকে দিলেন আর অন্য দলকে দিলেন না। তারা যেন এতে মনোক্ষুণ্ণ হলেন। রাসূল সা বললেন, **আমি এমন লোকদের দেই, যাদের সম্পর্কে বিগড়ে যাওয়া কিংবা ধৈর্যচ্যুত হবার আশঙ্কা করি**।

সহীহ বুখারী (ইফা) অধ্যায়ঃ যুদ্ধাভিযান

৩৭৪৮। বারা (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমরা মুশরিকদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলে নবী সা তীরন্দাজ বাহিনীকে নির্ধারিত এক স্থানে মোতায়েন করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা দেখ আমরা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছি, তাহলেও তোমরা এখান থেকে সরবে না। এরপর আমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তারা পালাতে আরম্ভ করল। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম যে, **মহিলাগণ দ্রুত দৌড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা বস্ত্র পায়ের গোছা থেকে টেনে তুলছে, ফলে পায়ের অলংকারগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ছে। এ সময় তারা (তীরন্দাজ বাহিনীর সাহাবীরা) বলতে লাগলেন,** এই গনীমত-গনীমত ! তখন আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, তোমরা যেন এ স্থান না ছাড় এ ব্যাপারে নাবী সা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা এ কথা অগ্রাহ্য করল(গনিমত নেয়ার আগাম লোভে)।

শহীদদের জন্য মৃত্যুর পর এক্সট্রা ডজন ডজন হুর দেওয়ার লোভ , সুডোল স্তনের কামউদ্দীপক হুরের প্রলোভন(scam)

সুরা নাবা, আয়াত ৩৩। (Indeed, the righteous will have salvation—) **full-breasted maidens** of equal age

https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=5705

৭৮:৩৩ وَّكَوَاعِبَ اَتۡرَابًا ﴿۳۳﴾

৩৩। এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা সমবয়স্কা তরুণীগণ। [1]

[1] كواعب শব্দটি كاعب-এর বহুবচন। যার অর্থ হল পায়ের গাঁট। যেমন গাঁট উঁচু হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি তাদের স্তনগুলিও অনুরূপ উঁচু উঁচু হবে; যা তাদের রূপ-সৌন্দর্যের একটি সুদৃশ্য। (অর্থাৎ তারা সদ্য উদ্ভিন্ন স্তনের ষোড়শী তরুণী হবে।) أتراب শব্দের অর্থ হল সমবয়স্ক।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

حَدَائِقَ বলা হয় খেজুর ইত্যাদির বাগানকে। এই পুণ্যবান ও পরহেযগার লোকগুলো উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী অর্থাৎ হূর লাভ করবে, যারা হবে উঁচু ও স্ফীত বক্ষের অধিকারিণী এবং সমবয়স্কা। যেমন সূরায়ে ওয়াকিআ'র তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা গত হয়েছে।

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

সূরা নাবা ৩৯৫

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে সাফল্য। ইহারা জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। حدائق অর্থাৎ খর্জুর এবং বৃক্ষের উদ্যান। اعنابا অর্থ– আঙ্গুর বা দ্রাক্ষা। كَوَاعِبَ اَتْرَابًا অর্থ উন্নত বক্ষ বিশিষ্টা নবযৌবনা সমবয়স্কা হুর। অর্থাৎ জান্নাতে মুত্তাকীদিগকে এইসব দেওয়া হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলেন, كواعب অর্থ نواعب অর্থাৎ উন্নত সুডৌল স্তন বিশিষ্টা। সূরা ওয়াকিয়ায় হুরদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই প্রকাশ পাইবে জান্নাতীদের পোশাকে এবং মেঘমালা তাহাদেরকে আসিয়া বলিবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা কি বর্ষণের আকাঙ্ক্ষাকারী, তখন وَكَأْسًا دِهَاقًا সমবয়স্কা সুডৌল স্তন বিশিষ্টা হুর বর্ষণ করিবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, وَكَأْسًا دِهَاقًا অর্থ পরিপূর্ণ পানপাত্র।

মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, সুনানে আল-তিরমিজী খণ্ড ৩, বহি ২০, হাদিস ১৬৬৩

"মহান আল্লাহর নিকট শহীদগণ মোট ছয়টি মর্যাদার অধিকারী হবেন। তারমধ্যে একটি হল-বেহেশতে তাঁকে **৭২ জন আয়তলোচনা হুরীর** সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে।

রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন) তাওহীদ পাব্লি, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য জান্নাতের মধ্যে যা প্রস্তুত রেখেছেন

১৮৯৪। আবূ মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, নবী সা বলেছেন, "নিশ্চয় জান্নাতে মুমীনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ মোতির তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর মধ্যে মুমীনদের জন্য একাধিক স্ত্রী থাকবে। যাদের সকলের সাথে মুমিন সহবাস করবে।

৩২৪৩ নবী সা বলেছেন, জান্নাতে মোতির তাঁবু থাকবে যার উচ্চতা ত্রিশ মাইল। এর প্র**তিটি কোণে মুমিনদের জন্য** এমন **স্ত্রী থাকবে** যাদেরকে অন্যরা কখনো দেখেনি।

ইবনে মাজাহ, আল বা'থ ওয়াল নুশুর এ আল বায়হাকী এবং কামিল এ ইবনে আ'দি দ্বারা জ্ঞাপিত, আল-জামি' আল-সাগির (৭৯৮৯) এ আল সুয়ুতি নিম্নোক্ত হাদিসটিকে **হাসান হাদিস** হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আবু উমামা (রহঃ) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি থাকবেন না, যাকে মহান আল্লাহ তায়ালা ৭২ জন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবেন না। উক্ত **৭২ জনের** মধ্যে দু'জন হবেন আয়তলোচনা বেহেশতী হুরী আর **৭০ জন** হবেন জাহান্নামীদের থেকে ওয়ারিসী সুত্রে প্রাপ্ত। উক্ত নারীগণের আকর্ষণ কখনোই নিঃশেষ হবে না এবং পুরুষদের যৌনাকাঙ্ক্ষা ও কখনোই হ্রাস পাবে না।"

৬৫৪ সুনানু ইবনে মাজাহ্

৪৩৩৭ হিশাম ইবন খালিদ আযদাক আবূ মারওয়ান দিমাশ্‌কী (র)...... আবূ উমামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন, তাদের প্রত্যেককেই ৭২ জন স্ত্রীর সংগে বিবাহ্ করিয়ে দেবেন। তন্মধ্যে দু'জন হবে আয়তলোচনা হুর এবং অবশিষ্ট ৭০ জন হবে জাহান্নামীদের থেকে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের প্রত্যেকের লজ্জাস্থান হবে অত্যন্ত সৌষ্ঠব এবং তার পুরুষাংগ হবে অত্যন্ত সুদৃঢ় মযবুত যা কখনো টলবে না।

↥

সিফাত আল-জান্নাহ, দু'আফা' এ আল-উকাইলি এবং আবু বকর আল-বাজার এর মুসনাদ, ইবনে আবি শায়বা, ইবনে হিব্বান এবং আল হাকিম নিম্নোক্ত হাদিসটিকে **সহিহ** বলে ঘোষনা করেছেন।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সা বলেছেন, "আল্লাহর মনোনীত বান্দাদেরকে বেহেশতে **৭০ জন** নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসুল, উক্ত ব্যক্তি কি এরুপ সহ্য করতে সক্ষম হবেন? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে একশত জন পুরুষের সমপরিমান শক্তি প্রদান করা হবে।

আল-ইতকান ফি উলুম আল-কোরআন, পৃষ্ঠা ৩৫১

'যতবারই আমরা হুরীদের শয্যাশায়ী হবো; ততবারই আমরা তাদেরকে কুমারী অবস্থায় পাবো। পাশাপাশি বেহেশতের জন্যে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের শিশ্ন কখনোই নেতিয়ে পড়বে না। তাদের এই উত্থিত অবস্থা হবে অনন্তকাল ধরে বিরাজমান; যতবারই তারা প্রনয়ে লিপ্ত হবে, ততবারই তাদের কাছে তা তৃপ্তিদায়ক বলে মনে হবে ; সেটা এমনই এক অনুভুতি যে দুনিয়ায় থাকাকালীন অবস্থায় তারা কখনো যদি এই অভিজ্ঞতা লাভ করতো, তাহলে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়তো। বেহেশতের জন্যে মনোনীত প্রতিটি পুরুষ ব্যক্তি কে তার পৃথিবীতে অবস্থানকালীন স্ত্রীসহ ৭০ জন হুরীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই যৌনসুখবর্ধক যৌনাঙ্গ বিশিষ্ট হবে।'

১৫৯৬ রাসূল সা বলেছেনঃ হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কাবা ঘর ধ্বংস করবে।

২১১৮ রাসূল সা বলেছেন, পরবর্তী যামানায় একদল সৈন্য কাবাঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অভিযান চালাবে। যখন তারা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন তাদের আগের পিছের সকলকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আয়িশাহ রা বলেন- "আমি বললাম, হে নবী সা! সকলকে কেন ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, অথচ তাদের আগেপিছে এমন লোকও থাকবে যারা তাদের দলভুক্ত নয়"। নবী সা বললেন, **তাদের আগের পিছের সকলকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।**

সূনান আবু দাউদ (ইফা), ১৮/ বিচার, পরিচ্ছেদঃ শহরবাসীদের উপর গ্রামবাসীদের সাক্ষ্যদান।
৩৫৬৩। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, **শহরবাসীদের উপর গ্রামবাসীদের সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়।**

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
৭১৩৯। **কুরাইশগণ হলেন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি।**

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)
পরিচ্ছেদঃ কুরাইশদের মর্যাদা
৩৯০৫। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ যে কেউ কুরাইশদেরকে অপদস্ত করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন।

৩৫০১ পরিচ্ছেদঃ আমীর কুরাইশদের থেকে হবে
নবী সা বলেন, **খিলাফত ও শাসনক্ষমতা সর্বদাই কুরাইশদের হাতে থাকবে, যতদিন তাদের দুজন লোকও বেঁচে থাকবে।**

সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী)
প্রশাসন ও নেতৃত্ব, পরিচ্ছেদঃ জনগণ কুরায়শদের অনুগামী এবং **খিলাফত কুরায়শদের মধ্যে সীমিত**
৪৫৯৭। নবী সা বলেছেনঃ লোকজন ভাল-মন্দ উভয় ব্যাপারেই কুরায়শদের অনুসারী।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)
৩৬৬৮। আবু বকর(রা) নবী সা এর ইন্তিকালের ঘোষণা দেবার পর, আনসারগণ ইবনু উবাইদাহ (রা)-এর নিকট সমবেত হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবেন। আবূ বাকর (রা), উমার ইবনু খাত্তাব(রা) আনসারদের নিকট গমন করলেন। আবূ বকর (রা বললেন, **আমীর আমাদের মধ্য হতে একজন হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে হবেন উযীর।** তখন ইবনু মুনযির (র) বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা এমন করব না বরং আমাদের মধ্যে একজন ও আপনাদের মধ্যে একজন আমীর হবেন। আবূ বকর (রা) বললেন- **না, তা হয় না। আমাদের মধ্য হতে খলীফা এবং তোমাদের মধ্য হতে উযীর হবেন। কেননা কুরাইশ গোত্র অবস্থানের দিক দিয়ে যেমন আরবের মধ্যস্থানে, বংশ ও রক্তের দিকে থেকেও তারা তেমনি শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতায় সবার শীর্ষে।**..............তারপর জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলেন, আপনারা ইবনু উবাইদাহ (রা)কে মেরে ফেললেন? উমার (রা) বললেন, আল্লাহ তাকে মেরে ফেলেছেন।

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)
৩৯৩৬। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ রাজত্ব কুরাইশদের মাঝে, বিচার-বিধান আনসারদের মধ্যে।

৫৩০১ **রাসূলুল্লাহ সা শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি মিলিত করলেন এবং বললেন- আমার আগমন এবং কিয়ামতের মাঝে দূরত্ব এ আঙ্গুল থেকে এ আঙ্গুলের দূরত্বের মত।**

৭৪৬৭ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ তোমাদের আগের উম্মাতদের তুলনায় তোমাদের অবস্থানের সময়কাল আসরের সালাত ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়'। তাওরাতের ধারকদেরকে তাওরাত দেয়া হলে তারা সে মোতাবেক আমল করল, তবে দুপুর হলে তারা অপারগ হয়ে গেল। অতঃপর ইঞ্জিলের ধারকদেরকে ইঞ্জিল দেয়া হলো, তারা সে মোতাবেক আমল করল আসরের সালাত পর্যন্ত, তারপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ল। অতঃপর তোমাদেরকে কুরআন দেয়া হলো। ফলে এ কুরআন মোতাবেক তোমরা আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করবে।

৬১৬৭ আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, এক গ্রাম্য লোক নবী সা এর খিদমাতে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেনঃ তোমার জন্য আক্ষেপ, তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? আনাস (রা.) বলেন, এ সময় মুগীরাহ রা. এর একটি যুবক বয়সের ছেলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ছিল আমার বয়সী। নবী সা **বললেনঃ যদি এ যুবকটি অধিক দিন বেঁচে থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হবার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে**।

৭০৫৯,৫২৯৩ একবার নবী সা রক্তবর্ণ চেহারা নিয়ে ঘুম থেকে জাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্'! নিকটবর্তী এক দুর্যোগে আরব ধ্বংস হয়ে যাবে। ইয়াজূজ-মাজূজের (প্রতিরোধ) প্রাচীর আজ এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। এই বলে তিনি নব্বই কিংবা একশ'র রেখায় আঙ্গুল রেখে গিঁট বানিয়ে দেখালেন।

সহীহ বুখারী (ইফা)
পরিচ্ছেদঃ প্লেগ রোগের বর্ণনা
৫৩২০। রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **মদিনা নগরীতে প্রবেশ করতে পারবে না** দাজ্জাল, আর না মহামারী(প্লেগ)।
১৭৫৯,৬৬৪৮। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন রাসুলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **মদিনা**র প্রবেশ পথ সমূহে ফেরেশতা-নিয়োজিত রয়েছে। অতএব **সেখানে প্লেগ** ও দাজ্জাল **প্রবেশ করবে না**। সহীহ মুসলিম (ইফা) ৩২২০

Throughout its history, Medina, a key city in the early Islamic period, experienced several instances of plague. Historical records indicate that the city of Medina experienced several instances of plague and other epidemics throughout its history. Here is an overview of some notable plague outbreaks in Medina, along with historical references:

1. Plague of al-Jarif (688-689 CE)

- **Details:** This plague struck during the reign of Caliph Abd al-Malik ibn Marwan and significantly affected the Arabian Peninsula, including Medina.
- **Impact on Medina:** The outbreak led to high mortality rates and caused considerable distress in Medina. It disrupted social and economic life and further strained the resources of the city.
- **References:** Al-Tabari's "Tarikh al-Rusul wa al-Muluk", Michael Lecker's historical analyses

2. Plague during the Umayyad Caliphate (700-701 CE)

- **Details:** Another plague occurred during the early 8th century, affecting the Arabian Peninsula and surrounding regions.
- **Impact on Medina:** The city experienced significant mortality, and the outbreak exacerbated existing political and social challenges. This period saw a series of health crises that strained the early Islamic state.
- **References:** Al-Tabari's "Tarikh al-Rusul wa al-Muluk", Ibn Kathir's "Al-Bidaya wa'l-Nihaya"

3. Plague of 749 CE

- **Details:** This outbreak struck during the later Umayyad period, contributing to the period's political instability.
- **Impact on Medina:** The city, already dealing with political and social upheavals, faced additional challenges due to the high mortality rate and economic disruption caused by the plague.
- **References:** Al-Tabari's "Tarikh al-Rusul wa al-Muluk", Modern historical studies on the Umayyad period

4. Plague during the Abbasid Caliphate (Late 9th Century)

- **Details:** Medina experienced several outbreaks during the Abbasid period, notably in the late 9th century.

- **Impact on Medina:** These outbreaks further impacted the city's demography and economy, contributing to the broader challenges faced by the Abbasid Caliphate.
- **References:** Al-Masudi's "Muruj al-Dhahab" (The Meadows of Gold), Ibn Kathir's "Al-Bidaya wa'l-Nihaya"

5. And so on…

These records demonstrate that Medina, as a significant urban and religious center, was repeatedly affected by plague outbreaks.

তোষামোদপ্রিয় নবী ও আল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্য

কোরআন ৪৫:৩৬। অতএব সকল প্রশংসা ও ধন্যবাদ আল্লাহর উপরে বর্ষিত হোক, কারণ তিনিই জগতের প্রভু।

৭৪০৩ নবী সা বলেছেনঃ এমন কেউ নেই যে, আত্মপ্রশংসা আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালবাসে।

১৫ রাসূলুল্লাহ্ সা বলেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।

৩৩৬৯ সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ সা বললেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সা-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের উপর। [(প্রতি নামাযে বাধ্যতামূলকভাবে দরূদ পাঠ করতে হয়)]

তিরমিজি: ৩৫৪৫
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা এই অভিশাপ দিলেন যে, 'সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না।'

ইবনে হিব্বান হাদিস নং ৯০৮ ; আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৬৪৬
রাসুলুল্লাহ সা বলেন, জিবরাইল (আ.) বললেন, **ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক; যার সামনে আমার নাম আলোচিত বা উচ্চারিত হয় অথচ সে আমার ওপর দরুদ পেশ করে না। আমি তার বক্তব্যকে সমর্থন করে 'আমিন' বললাম।**

৩৮৬৯ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয় তখন আমরা নবী সা সঙ্গে মিনায় ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। তখন আমরা দেখলাম, চাঁদের একটি খন্ড হেরা পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

৪৮৬৪ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল সা-এর সময় চাঁদ খন্ডিত হয়েছে। এর এক খন্ড পর্বতের উপর এবং অপর খন্ড পর্বতের নিচে পড়েছিল। তখন রাসূল সা বলেছেন, তোমরা সাক্ষী থাক। (হাদিসটির উপর ক্লিক করে ঘটনার লুকোনো সত্য জেনে আসুন)

৬১৮১ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ **আল্লাহ বলেন**- মানুষ আগামীকালকে গালি দেয়, অথচ আমিই কাল (এর নিয়ন্ত্রণের মালিক)।

আল্লাহর হাত-পা

৭৪১০ আল্লাহর বাণীঃ যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি। (সূরাহ সোয়াদ ৩৮/৭৫)
এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বাস্তব বা প্রকৃত হাত রয়েছে তা প্রমাণিত হয়। এটা অস্বীকার করা বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না। যেমন বলা হয়, হাত দ্বারা উদ্দেশ্য শক্তি, রাজত্ব, নি'আমাত, অঙ্গীকার ইত্যাদী। আবার বলা হয় কুদরতী হাত। এসব মনগড়া ব্যাখ্যা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ'র পরিপন্থী। সুতরাং তার প্রকৃত হাত রয়েছে, কুদরতী হাত নয়।

৪৯১৯ নবী সা বলেছেন-আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর **পায়ের গোড়া**লির জ্যোতি বিকীর্ণ করবেন, তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাকে সিজদা করবে।

৪৮৫০ আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী সা বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্ক করে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে আমি অনুগ্রহ করব। আর তিনি জাহান্নামকে বলবেন, তুমি হলে আযাব। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেব। জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে পূর্ণতা। তবে জাহান্নাম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নিজ পা তাতে রাখবেন। তখন সে বলবে, বাস, বাস। তখন জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে।

৭৩৮৪,৭৪৪৯ রাসূলুল্লাহ সা বলেন, জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো বেশি আছে কি? আর শেষে আল্লাহ্ তায়ালা, তাঁর পা জাহান্নামে রাখবেন। তখন এটি বলবে- আপনার ইয্যত ও করমের কসম! যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাতেরও কিছু জায়গা শূন্য থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ সেই শূন্য জায়গার জন্য নতুন কিছু মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং জান্নাতের সেই খালি জায়গায় এদের বসতি করে দেবেন।

৭৪৪৯ রাসূলুল্লাহ সা বলেন, অমুসলিমদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? জাহান্নামে আরো নিক্ষেপ করা হবে, তখনো বলবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি? এভাবে তিনবার বলবে। **অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর পা জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিলে তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে**। তখন জাহান্নামের একটি অংশ অন্য অংশকে এ উত্তর করবে- আর নয়, আর নয়, আর নয়।

৭৪১৯ রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আল্লাহর ডান হাত পূর্ণ, রাত দিনের খরচেও তা কমে না। তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির সূচনা থেকে তিনি কত খরচ করে যাচ্ছেন, তবুও তাঁর ডান হাতের কিছুই কমেনি। তাঁর আরশ পানির ওপর আছে। তাঁর অন্য হাতে আছে দেয়া আর নেয়া। তা তিনি উঠান ও নামান।

৭৪২৭ নবী সা বলেনঃ কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। আমার হুঁশ ফিরলে তখন আমি মূসা (আঃ)-কে **আরশের একটি পায়া ধরে দাঁড়ানো দেখতে পাব**।

৭৩৮২ নবী সা বলেন, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন পৃথিবী আপন মুঠোয় ধারণ করবেন এবং আসমানকে তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নিবেন।

৬৫২০ নবী সা বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সারা জগৎ একটি রুটি হয়ে যাবে। আর আল্লাহ জান্নাতীদের মেহমানদারীর জন্য সেটিকে হাতের মধ্যে নিয়ে এমনভাবে উল্টা পাল্টা করবেন, যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ সফরের সময় তাড়াহুড়া করে এ হাতে সে হাতে নিয়ে রুটি প্রস্তুত করে।

৪০ তিরমিযী শরীফ

সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলিমগণ এ অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু জাহামীয়্যা[১] সম্প্রদায় এই সমস্ত রিওয়ায়াত অস্বীকার করে ; তারা বলে, এগুলো তো হল উপমাবোধক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজিদে বিভিন্ন স্থানে 'اَلْيَدُ' (হাত) 'اَلسَّمْعُ' (কর্ণ) ' اَلْبَصَرُ ' (চক্ষু) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। জাহমিয়্যা সম্প্রদায় এই আয়াতসমূহের রূপক অর্থ করে থাকে এবং আলিমদের ব্যাখ্যার বিপরীত এগুলোর ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর হাত দিয়ে বানাননি। তারা বলে এখানে 'হাত' অর্থ হল 'শক্তি'। ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.) বলেন, যদি (মানুষের) হাতের মত (আল্লাহ্র) হাত বা হাতের অনুরূপ হাত কিংবা (মানুষের) কানের মত (আল্লাহ্র) কান বা কানের অনুরূপ বলা হত তবে তা আল্লাহর সঙ্গে (সৃষ্টি বিষয়ের) উপমা প্রদান বলে গণ্য হত। কিন্তু আল্লাহ্ যখন বলেন 'يَدٌ' (হাত) 'سَمْعٌ' (কর্ণ), 'بَصَرٌ' (চক্ষু), তখন তা সাদৃশ বলে বিবেচিত হয় না। কারণ এখানে এর রকম বা অনুরূপ বা মত এই কথা বলা হয়নি। এটি এমন, যেমন আল্লাহ্

আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ২৬৩

৮. ২. অবতরণ

মহান আল্লাহর অন্য একটি বিশেষণ 'নুযূল' বা অবতরণ। এ অর্থের একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ

"প্রতি রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের মহিমান্বিত মহা-কল্যাণময় প্রতিপালক নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। তিনি বলেন: আমাকে ডাকার কেউ আছ কি? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে প্রদান করব। আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[৬০]

এ বিশেষণও জাহমী-মু'তাযিলীগণ অস্বীকার করেন। তারা বলেন, স্থান পরিবর্তন আল্লাহর অতুলনীয়ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি আরশ থেকে অবতরণ করলে আরশ কি শূন্য থাকে? তাঁরা বলেন: অবতরণ অর্থ নৈকট্য বা বিশেষ করুণা। কিন্তু প্রশ্ন হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো অনেক স্থানেই নৈকট্য ও করুণা শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নৈকট্য বা করুণা না বলে অবতরণ বললেন কেন? আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য বিশ্বাসকে কঠিন ও জটিল করতে চান? না সহজ করতে চান?

মুহাম্মদ ওরফে আল্লাহ তাআলা- একটি বদরাগী অসুখী চরিত্র

আল্লাহ ক্ষেপে গেলে হুমকিধামকি দেয়া শুরু করেন! **সামান্য মানুষের চুল ধরে টেনে হিচড়ে নেয়ার হুমকি দেন !** এটা কি কোনো মহান সৃষ্টিকর্তা তো দূর, ভদ্র কোনো মানুষের আচারণ হতে পারে !

- যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি(আল্লাহ) তার মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই– কোরআন ৯৬/১৫-১৬
- আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। কোরআন ৬৮:১৬
- আর **আল্লাহ হচ্ছেন** পরাক্রমশীল, **প্রতিশোধ গ্রহণকারী**। কুরআন ৩:৪

অনেক নারীর জামাই মরে যাওয়ার পর নবীর জন্য সেসব পুরুষের বউদের বিয়ে করা আল্লাহর কাছে কোনো পাপ না, কিন্তু........ সূরা আহজাব, আয়াত ৫৩: আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং **তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা** কখনো তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। নিশ্চয় **এটি আল্লাহর কাছে গুরুতর পাপ**।

মুসলিম হতে হলে হাদিস মানা বাধ্যতামূলক

বর্তমান সময়ে অনলাইন ফেইসবুক ইউটিউবের কল্যানে ইসলামের খুবই ব্যাসিক জ্ঞানহীন কিছু মডারেট মুমিনের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদেরকে কোরআন শব্দটির অর্থ জিজ্ঞেস করলে তারা পারেন না, অথচ তারা হাদিস অস্বীকার করে বসে আছেন। তারা তাদের অনুসারীদের বলেন, হাদিস মানা জরুরি নয়। কারণ হিসেবে তারা বলতে চান, হাদিস নাকি ২০০ বছর পরে লিখিত হয়েছে ! এরকম মূর্খ কথা একমাত্র ইসলাম সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও যাদের নেই, তাদের পক্ষেই বলা সম্ভব। এইসকল কথা শুধু যে মিথ্যা তাই নয়, অজ্ঞতাপ্রসূত বোকামিও বটে। কারণ, নবী মুহাম্মদের জীবদ্দশাতেই হাদিস লিখিত হয়েছে।

যারা বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের পূর্ণাংগ ইতিহাস জানতে চান, তাদেরকে নিচের বইটা ডাউনলোড করে একটু কষ্ট করে পড়তে হবে। কারণ এর ইতিহাস এতই বিশাল যা এখানে লিখতে গেলে এই পিডিএফটা অনেক বড় হয়ে যাবে।
হাদীস সংকলনের ইতিহাস (https://bjilibrary.info/pdf/higher_study/23_hadis_songkoloner_itihas.pdf)

সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
পরিচ্ছেদঃ ইলম লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে।
৩৬০৭। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি যা কিছু রাসূলুল্লাহ সা -এর নিকট হতে শ্রবণ করতাম, তা লিখে রাখতাম।

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পরিচ্ছেদঃ ইলম লিপিবদ্ধ করা
হাদিস নং ১১৪। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সা এর সাহাবীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে আমার চাইতে বেশী হাদীস নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন।
হাদিস নং ১১৯। আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সা এর সঙ্গে লেগে থাকত। তাই তারা(অন্যান্য সাহাবীরা) যখন উপস্থিত থাকত না, তখন সে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা মুখস্থ করত না সে তা মুখস্থ রাখত।

এমনকি, নবী মুহাম্মদের অন্যতম প্রিয় সাহাবী হযরত আলীও হাদিস লিখে রাখতেন যাকে সহীফা বলা হয়
সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
১৭৪৯। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট কুরআন এবং নবী সা থেকে বর্ণিত এই সহীফা রয়েছে।

সহিহ, হাসান, জইফ, জাল হাদীসঃ
আলোচনার শুরুতেই যেই বিষয়টি আমাদের জেনে নেয়া জরুরি, সেটি হচ্ছে, সহিহ হাদিস কাকে বলে, হাসান এবং জইফ হাদিস কাকে বলে, জাল হাদিসই বা কাকে বলে।

৪৬ হাদীস সংকলনের ইতিহাস

১। যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ধারাবাহিক রহিয়াছে, সনদের প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সঠিকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণনাকারিগণ সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত— সিকাহ, যাঁহাদের স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যাঁহাদের সংখ্যা কোন স্তরেই মাত্র একজন হয় নাই, এইরূপ হাদীসকে পরিভাষায় 'হাদীসে সহীহ' (حديث صحيح) বলা হয়।

ইমাম নববী লিখিয়াছেনঃ

اَلصَّحِيْحُ فَهُوَ مَا اِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُوْلِ الضَّابِطِيْنَ مِنْ شَذٍّ وَذُوْلَا غِلَّةِ-

যে হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরূপে সংরক্ষণকারী বর্ণনাকারীদের সংযোজনে পরম্পরাপূর্ণ ও যাহাতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী একজনও নাই, তাহাই 'হাদীসে সহীহ'।[৫১]

اَلْحَسَنُ مَاعُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاَشْتَهَرَ رِجَالُهُ-

যে হাদীসের উৎস সর্বজনজ্ঞাত ও যাহার বর্ণনাকারীগণ প্রখ্যাত, তাহাই হাদীসে হাসান।[৫২]

৩। উপরিউক্ত সবরকমের গুণই যদি বর্ণনাকারিদের মধ্যে কম মাত্রায় পাওয়া যায়, তবে তাহাদের বর্ণিত হাদীসকে 'হাদীসে যয়ীফ' حدث ضعيف বলা হয়।[৫৩]

❖ **হাদিস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা**। নবী সা কুরআনের আয়াত দ্বারা কী বুঝেছেন, সাহাবীদের কীভাবে কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করেছেন, সেইসব না জানা থাকলে এক একজন কুরআনের আয়াতের এক এক অর্থ বের করতে পারে। শুধুমাত্র নবী সা তার সাহাবীগণই সঠিকভাবে বলতে পারবেন, কোন প্রেক্ষাপটে কী কারণে একটি আয়াত নাজিল হয়েছিল। যেগুলো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া হাদিস ছাড়া কোরআন অপূর্ণাংগ। যেমনঃ কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব" (কুরআন ৫/৩, ২/১৭৩) আয়াত দুটি থেকে স্পষ্ট, মরা প্রাণীকে খাওয়া কোরআনে হারাম ঘোষনা করা হয়েছে। **তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত মাছ খাওয়া কী হালাল নাকি হারাম**। এই বিষয়ে কুরআনে বলা হচ্ছে, "তোমাদের জন্য সমুদ্র শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে" (কুরআন ৫/৯৬)। লক্ষ্য করে দেখুন, এখানে শুধুমাত্র সমুদ্রে শিকার হালাল করা হয়েছে। মৃত মাছ খাওয়া কিন্তু হালাল করা হয় নি। **তাহলে আহলে কুরআনের অনুসারীগণ কী মৃত মাছ খান না?** মৃত মাছ বা গরু ছাগলের কলিজা খেতে হলে অবশ্যই সহীহ হাদিসের শরণাপন্ন হতে হবে। শুধুমাত্র হাদিসেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা আছে। যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বরঃ 3314, রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ "তোমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব ও দু' ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দু'টি হলো মাছ ও টিড্ডি এবং দু' প্রকারের রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা"।

এছাড়াও কুরআনের অনেক আয়াত রহিত, রদ বা বাতিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে আছে, "আমি কোনো আয়াত রহিত করলে.........তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?"(কুরআন 2:106)। যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন (কুরআন 16:101)। **তাই, কোন আয়াত রহিত হয়ে নতুন কোন আয়াত নাজিল হয়েছে, নাজিলের ক্রমানুসারে সূরাগুলোর ক্রম জানতেও হাদিস, তাফসীর, সিরাত ও ইতিহাসগ্রন্থগুলো লাগবেই**।

কেউ যদি সহিহ হাদিসসমূহ, তাফসীর(ইবনে কাসির, জালালাইন, মাযহারী), ইতিহাসগ্রন্থ (আল তাবারি, ইবন ইসহাক, আল মাগাযী) বাদ দেয় তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলাম একসময় মুছে যাবে। অনেক ধরনের প্রশ্ন চলে আসবে যার কোন উত্তর পাওয়া যাবেনা। যেমন 'ঈসা কে? আবু লাহাব কে?' এধরনের সাধারণ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারবেনা শুধু কুরান নির্ভর মুসলমানেরা।

কুরআন 16/44 : **তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে**। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে কুরআনের আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে দেয়ার দায়িত্বও রাসূলের উপরই ছিল। তাই তার কথাকে অস্বীকার করার অর্থ কুরআনকেই অস্বীকার করা।

ইসলামের ৫ স্তম্ভ

সহিহ বুখারী (ইফা), হাদিস নং 7। রাসুলুল্লাহ সা বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। তারমধ্যে রয়েছে- সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হাজ্জ করা এবং রামাযান এর সিয়াম পালন করা।

সালাতঃ হাদিসে ৫ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ আছে। সময়সূচী নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু কুরআনে ওয়াক্ত, সময় কোনটাই নির্দিষ্ট নেই। সাথে নামাজ পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কেও বর্ণনা নেই। শুধুমাত্র কুরানিষ্টদের অনেকেরই এই নিয়ে দ্বিমত আসলে কয় ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। বিভিন্ন আহলে কুরান আলেম ৩-৫ ওয়াক্তের কথা উল্লেখ করে ফতোয়া প্রদান করেছেন।

যাকাতঃ কুরআনে যাকাতের সুস্পষ্ট বিধান উল্লেখ নেই।

হজ্জঃ সামর্থ্য থাকলে হজ্জ ফরজ। কিন্তু হজ্জ এর পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে গেলে হাদিসের আশ্রয় নেয়াই লাগবে।

রোজাঃ ইসলামের এই একটি স্তম্ভই কুরআনে মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা আছে। যদিও এর বর্ণনা হাদিস বাদেই কুরআনে পাওয়া যায় কিন্তু ইসহাকের বর্ণনার আগে কেউ রোজার গুরুত্ব সম্পর্কে জানত না। পরবর্তী বুখারী, মুসলিম এবং তাবারী একই পদ্ধতি অনুকরণ করেছেন।

হাদিস এবং সুন্নাহ ব্যতীত ইসলামকে কল্পনাই করা যায়না। শরীয়তের অসংখ্য বিষয় সরাসরি হাদিসের ওপর নির্ভরশীল। সহিহ হাদিস অস্বীকার করা আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করারই মত। হাদিস অস্বীকার করলে ইসলামের পাচ ভিত্তির চারটিকেই অস্বীকার করা হয়ে যাবে। তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ ব্যতীত কুরআন শুধুমাত্র একটি প্রাচীন আরব সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সহিহ হাদিস সেটা যতই অবৈজ্ঞানিক, অমানবিক বা হাস্যকর হোক না কেন একজন মুসলমানের অবশ্যই হাদিস নিয়ে কোনরুপ সন্দেহ থাকা যাবেনা। সুন্নাহ অস্বীকার করা মানে মহানবীকেই অস্বীকার করা। অর্থাৎ, কাফের ও মুরতাদে পরিণত হওয়া।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিলে, কোনো ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো ভিন্ন সিদ্ধান্তের সুযোগ/অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো । সুরা আহযাব: ৩৬

তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে। / তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কোরআন ১৬ঃ৪৪

রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাক। কোরআন ৫৯:৭

যে রসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। কোরআন ৪/৮০

আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং **রাসূলের আনুগত্য কর**। কোরআন ৪৭/৩৩, ২৮/৫৪, ৬৪/১২, ৫/৯২

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং **আনুগত্য কর রাসূলের (রাসূলকে মেনে চল)**। কোরআন ৫/৯২

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে তাঁর প্রশংসা করে বলেন: নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী। সূরা কলাম: আয়াত ৪

হে নবী! লোকদের বলে দাও। **তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর,**
তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহসমূহ মাফ করে দেবেন। সূরা আল-ইমরান: ৩১

আর যে আল্লাহ ও **তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।** কোরআন ৭২/২৩

আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। সূরা নিসা: ৬৫

৭০৭৮ নবী সা বলেন, উপস্থিত ব্যক্তি যেন আমার বাণী অনুপস্থিতের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।

৪৬০৫। নবী সা বলেনঃ অচিরেই তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি তার গদি আঁটা আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকাবস্থায় তার নিকট আমার নির্দেশিত কোনো কর্তব্য বা নিষেধাজ্ঞা পৌঁছবে, তখন সে বলবে, আমরা যা আল্লাহর কিতাবে পাবো শুধু তারই অনুসরণ করবো।

সুনান ইবনু মাজাহ
পরিচ্ছেদঃ **রসূলুল্লাহ সা -এর হাদীসের প্রতি** সম্মান প্রদর্শন এবং তার **বিরুদ্ধবাদীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ**।
২/১৩। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ **আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না পাই যে, আমার প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা আমার প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা তার নিকট পৌঁছলে সে বলবে, আমি কিছু জানি না, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পাবো তার অনুসরণ করবো**।

সুনান ইবনু মাজাহ
পরিচ্ছেদঃ ২. রসূলুল্লাহ সা-এর হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার বিরুদ্ধবাদীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ।
১/১২। রাসূলুল্লাহ সা বলেনঃ অচিরেই কোন ব্যাক্তি তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং **তার সামনে আমার হাদীস থেকে বর্ণনা করা হবে**, তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট !
নবী সা বলেন, **সাবধান! নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সা যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ।**

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)
পরিচ্ছেদঃ **রাসূলুল্লাহ সা-এর হাদীসের ব্যাপারে যা বলা নিষেধ**

২৬৬৩। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আমি যেন তোমাদের মধ্যে কাউকে এমন অবস্থায় না পাই যে, তার নিকট যখন আমার আদিষ্ট কোন বিষয় অথবা আমার নিষেধ সম্বলিত কোন হাদীস উত্থাপিত হবে তখন সে (তাচ্ছিল্যভরে) বলবে, আমি তা জানি না, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে আমরা যা পাই, তারই অনুসরণ করবো।

হাদীস সম্ভার
১৩/ সুন্নাহ
পরিচ্ছেদঃ সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব ও তার আদব প্রসঙ্গে
১৪৯৯। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, শোন! আমাকে কুরআন দান করা হয়েছে এবং তারই সাথে তারই মতো সুন্নাহ দান করা হয়েছে। শোন! সম্ভবতঃ নিজ গদিতে বসে থাকা কোন পরিতৃপ্ত লোক বলবে, 'তোমরা এই কুরআনের অনুসরণ কর; তাতে যা হালাল পাও, তাই হালাল মনে কর এবং তাতে যা হারাম পাও, তাই হারাম মনে কর। **সতর্ক হও! আল্লাহর রসূল যা হালাক-হারাম করেন, তাও আল্লাহর হালাল-হারাম করার মতোই**।

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৩৫/ সুন্নাহ
পরিচ্ছেদঃ **সুন্নাতের অনুসরণ আবশ্যক**

হাদীস সম্ভার
পরিচ্ছেদঃ সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব ও তার কিছু আদব প্রসঙ্গে
১৫০১। বিদায়ী হজ্জে রসূল সা ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ(হাদীস)।

হাদীস সম্ভার
পরিচ্ছেদঃ সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব ও তার কিছু আদব প্রসঙ্গে
১৫০৩। রসূল সা বলেন, প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গণ্ডির ভিতরেই থাকে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নাত বর্জনে) অতিক্রম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

হাদীস সম্ভার
১৩/ সুন্নাহ
পরিচ্ছেদঃ সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব ও তার কিছু আদব প্রসঙ্গে
১৫০৪। রসূল সা বলেন, **যে আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়**।

সহীহ বুখারী (ইফা)
৫৯৮৬। নবী সা বলেছেনঃ **শ্রেষ্ঠ হল আমার যমানার লোক। তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক তারপর উত্তম হল এদের পরবর্তী যমানার লোক**।

সহীহ মুসলিম (ইফা)
৬২৪২। নবী সা বলেছেনঃ **সর্বাপেক্ষা উত্তম মানুষ আমার যুগে (অর্থাৎ সাহাবীগণ) এরপর যারা তাদের সাথে সংযুক্ত (অর্থাৎ তাবীঈগণ) এরপর যারা তাদের সাথে সংযুক্ত (অর্থাৎ তাবে-তাবেঈগন)**।

সূনান আত তিরমিজী (তাহকীককৃত)
৪৬/ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণের মর্যাদা
পরিচ্ছেদঃ যে লোক রাসূলুল্লাহ সাকে দেখেছেন এবং তার সাহচর্য লাভ করেছেন তার মর্যাদা।
৩৮৫৯। রাসূলুল্লাহ সা বলেছেনঃ আমার যুগের ব্যক্তিরাই উত্তম। তারপর তাদের পরবর্তীগণ, তারপর তার পরবর্তীগণ।

যারা হাদীস মানেন না তাদের ব্যাপারে ইসলামের সর্বোচ্চ আলেমদের বক্তব্য

Ruling on one who rejects a saheeh hadith - Islam Question & Answer (islamqa.info), Publication : 02-03-2016

বঙ্গানুবাদঃ প্রশ্ন ১১৫১২৫:

কেউ যদি সহীহ হাদিস অস্বীকার করে তাহলে কি সে অবিশ্বাসী তে পরিণত হয়? একজন ভাই বুখারী, মুসলিম এবং অন্যত্র বর্ণিত কিছু সংখ্যক সহীহ হাদীস বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হবার কারণে তা অস্বীকার করেন। সহীহ হাদিস অস্বীকার কারীর ব্যাপারে ফয়সালা কি?

উত্তরঃ

প্রথমত:

ইসলামিক শরীয়াহর দ্বিতীয় উৎস হল নবীর সুন্নাহ। নবীর (সা:) কাছে সেই রূপে সুন্নাহর মাধ্যমে বাণী এসেছে, ঠিক যে রূপে এসেছে কোরআনের মাধ্যমে। আল্লাহর নিজের বাণী ই তার প্রমাণ:

"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না।তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়।" [আন- নাজম ৫৩:৩-৪]

আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপর নবীর কথা, হাদীস এবং নির্দেশনা সমূহ এমন ভাবে গ্রহণ করতে বলেছেন যে; তিনি তার পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেন, যে কেউ নবীর কথা শ্রবণ করে, তারপর সেটা প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদেরকে স্বীকার করে নেয় না তাদের বিশ্বাস করা না করায় কিছু যায় আসে না। তিনি বলেন:

"কিন্তু না, আপনার রবের শপথ তারা মুমিন হবে না যতক্ষন পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।" [আন নিসা ৪:৬৫]

এ কারণে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ঐক্যমত্য ছিল যে, যদি কেউ এটা সাধারণ ভাবে অস্বীকার করে যে সুন্নাহ শরীয়তের একটি দালিলিক উৎস, অথবা নবীর কোনো হাদিস প্রত্যাখ্যান করে এটা জানা সত্ত্বেও যে সেটা নবীর বাণী–তবে সে একজন অবিশ্বাসী, যে কিনা ইসলামের এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের নিম্নতম স্তরেও পৌঁছাতে পারেনি।

ইমাম ইস- হাক ইব্দ রহাওয়াহ বলেনঃ

যদি কেউ আল্লাহর রাসূলের বর্ণিত কিছু শোনে এবং যদি সেটা সে হাদিসটি সহিহ হওয়ার কথা স্বীকার করে, তারপর সেটা প্রত্যাখ্যান করে, কোন রকম অভিনয় না করে (যখন কোন হুমকির কারণে তার অন্য কোন উপায় না থাকে) তাহলে সে একজন অবিশ্বাসী।

আস- সুয়ূতী বলেনঃ

এটা বুঝতে হবে যে, যদি কেউ এটা অস্বীকার করে যে নবীর হাদিস শরীয়াহর একটি প্রামাণ্য দলিল- যদি সে এমন কোন বিবরণ অস্বীকার করে যেটা এমন কিছু বর্ণনা করে যা নবী বলেছেন বা করেছেন, যদি সেই হাদিস টা হাদিসের উসুলের শর্ত সমূহ পূরণ করে- তাহলে সে একজন অবিশ্বাসীর ন্যায় আচরণ করলো যা তাকে ইসলামের গণ্ডির বাইরে নিক্ষেপ করে এবং সে ইহুদি এবং খ্রিস্টান দের দলভুক্ত হবে (কিয়ামতের দিন) অথবা অন্য যে কোন অবিশ্বাসী দলের সাথে যার সাথে আল্লাহ চান। [মিফতাহ আল-জান্নাহ ফী' ইহতিযাজ বি'স – সুন্নাহ (পৃষ্ঠা ১৪)]

আল- ' আল্লামাহ ইবন আল- ওয়াজির বলেনঃ

যখন কেউ জেনে শুনে আল্লাহর রাসূলের হাদিস অস্বীকার করে এটা ভয়ংকর অবিশ্বাসের সামিল। [আল-' আওয়াসিম ওয়া'ল – কাওয়াসিম (২/২৭৪)]

ফাতাওয়া আল – লাজনাহ আদ – দা ' ইমাহ তে বলা হয়েছে:

যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করে যে, আমাদের সুন্নাহ্ মেনে চলা উচিৎ তাহলে সে একজন অবিশ্বাসী, কারন সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপন করছে এবং সমগ্র মুসলিমদের ঐক্যমত কে পরিত্যাগ করছে। [ফাতাওয়া আল – লাজনাহ আদ – দা ' ইমাহ (ভল.২,৩/১৯৪)

দ্বিতীয়ত:

আর যে ব্যক্তি কোন হাদিস স্বীকার না করে তা পরিত্যাগ করে এ জন্য যে তা আসলে নবীর কথা নয়, সে প্রথম শ্রেণীভুক্ত মানুষদের মত নয়। আমরা এটা বুঝি যে নতুন "যুক্তিবাদী জ্ঞানালোকিত" ধারার অনেক অনুসারী আছেন- যারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ধ্যান ধারণা দিয়ে নবীর সুন্নাহ কে বিচার করছেন – তারা আসলে নতুন কিছুই করছেন না। উপরন্তু তারা তাদের পূর্ববর্তী বিদআতীদের ই অনুসারী, যাদের অসার দাবিকে বিশেষজ্ঞ গন তাদের যুক্তি দ্বারাই খণ্ডন করেছেন।

যেখানে আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ হাদিসের গ্রহণ যোগ্যতার উপর ঐক্যমত পোষণ করেন এবং এর উপর মন্তব্য করেন, ব্যাখ্যা করেন, প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং এর উপর আমল করেন।

যুক্তিসংগত চিন্তাধারা (যেটাকে তারা তাদের যুক্তির ভিত্তি বলে দাবি করে) কি এটাই নির্দেশ করে না যে তারা বিশেষজ্ঞদের সেই বিষয়ের উপর ঐক্যমত্যকে সম্মান করবে যেটা তাদের বিশেষ জ্ঞানের কেন্দ্রীয় অংশ।

উদাহরণ স্বরূপ কেউ কি এমন কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে যে পদার্থবিদগণ, রসায়নবিদগণ, গণিতবিদগণ, শিক্ষাবিদগণ অথবা অর্থনীতিবিদরা একটি ভুল করে ফেলেছেন যদি তারা কোন বিষয়ের উপর একমত হন – বিশেষত যখন সেই ব্যক্তি যিনি তাদের উপর অভিযোগ করছেন নিজেই ওই বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ না হন; বরঞ্চ যেটা বলা যেতে পারে যে তিনি ওই বিষয়ে কয়েকটি নিবন্ধ পড়েছেন মাত্র অথবা বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু শিক্ষানবিস বই অথবা বিজ্ঞান বিষয়ক 'The complete idiot's guide' (যে বইগুলো কোন বিষয়ের উপর একেবারে প্রাথমিক ধারণা দেয়)।

এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু একাডেমিক মূলনীতি উদ্ধৃত করে, যেটা তিনি তার বিভিন্ন কিতাবে প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করেছেন- ইমাম আশ- শাফা ' ই বলেন – (যার মধ্যে কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করেছি) – তিনি যা বলেছেন তা শুধুমাত্র অল্প কয়েক জন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী নয়, অথবা তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নয়, বরঞ্চ এগুলো সেই সব মূলনীতি যার উপরে আলেমগণের ঐকমত্য ছিল যারা তার আগে এসেছেন।

এবং তাদের কেউই অন্যদের সাথে এ ব্যপারে ভিন্নমত করেন নি। তারা বলেছেনঃ এটা হল আল্লাহর নবীর সাহাবী, তাবিয়ীন এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের আলেমগণের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও তাই। আমাদেরকে মতে, যে এই পথ থেকে বিচ্যুত হয় সে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের এবং তার পর হতে আজ পর্যন্ত আগত আলেমগণের পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং সে মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। এবং তাদের সবাই বলেছেন: আমরা সমগ্র অঞ্চলের আলেমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য ব্যতীত আর কিছুই দেখি না, সর্বসম্মতি ক্রমে তাকে মূর্খ হিসেবে অভিহিত করতে যে এই পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে । এবং তারা অথবা তাদের মধ্যে অধিকাংশই আরো অগ্রসর হয়ে যারা এই পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের ব্যাপারে আরো কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে উদ্ধৃত করার কোন প্রয়োজন নেই।

[ইখতিলাফ আল-হাদিস, আল- উম্ম (১০/২১)। আরো দেখুন: আর- রিসালাহ (প্যারা ১২৩৬-১২৪৯)]

ইমাম আহমাদ বলেছেন: যে আল্লাহর রাসূলের হাদিস কে প্রত্যাখ্যান করে সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত।

আল- হাসান ইবন ' আলী আল- বর্বাহারি বলেছেনঃ

যদি তুমি কোন মানুষকে কোন হাদিসের উপর বিষোদগার করতে অথবা অস্বীকার করতে শোন অথবা হাদিসের উপরে অন্য কিছুকে অগ্রাধিকার দিতে দেখ , তাহলে ইসলামের প্রতি তার অঙ্গীকারকে সন্দেহ করো, সে সন্দেহাতীত ভাবে খেয়াল খুশি মত নিজের ইচ্ছা এবং বিদআতের অনুসরণ করছে।

যখন তুমি কোন হাদিস উদ্ধৃত করো যদি দেখো কেও তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না এই কারণে যে সে শুধুমাত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃতি শুনতে আগ্রহী, তাহলে তুমি কোন সন্দেহ পোষণ করবে না যে সেই ব্যক্তি পথভ্রষ্টদের পথ অনুসরণ করছে। অতএব তাকে ত্যাগ করো এবং তাকে বিদায় জানিয়ে দাও।

শরহে আস- সুন্নাহ (১১৩-১১৯)।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেছেনঃ

রাসূল তার রবের কাছ থেকে যা কিছুই বর্ণনা করেন তা বিশ্বাস করা বাধ্যামূলক, আমরা তার অর্থ বুঝি আর না বুঝি, কারণ তিনি সর্বাধিক সত্যবাদী। কুরআন এবং সুন্নাহ তে যা কিছুই বলা আছে, প্রত্যেক বিশ্বাসী কে তাতে বিশ্বাস রাখতে হবে, যদি সে এটার অর্থ না ও বোঝে।

মাজমু ' আল ফাতাওয়া (৩/৪১)

সেই নিকৃষ্ট মানুষটির সমালোচনা করায় ইতিহাসের জঘন্যতম অনার কিলিং

সহীহ বুখারী (তাওহীদ)

পরিচ্ছেদঃ আহযাব যুদ্ধ থেকে নাবী সা -এর প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর বনূ কুরাইযাহ অভিযান ও তাদেরকে অবরোধ।

৪১২৪। নবী সা বনু কুরাইযার সঙ্গে যুদ্ধের দিন হাস্সান ইবনু সাবিত (রা) কে বলেছিলেন- **কবিতা আবৃত্তি করে মুশরিকদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধর**।

সূনান নাসাঈ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

পরিচ্ছেদঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মন্দ বলার শাস্তি

৪০৭২. আবু বারযা আসালামী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দীক (রা) কে মন্দ বললে, আমি বললামঃ আমি কি তাকে হত্যা করবো? তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেনঃ এই মর্যাদা রাসূলুল্লাহ্ সা ব্যতীত আর কারো নেই।

(জামেউল আহাদীস, হাদীস নং-২২৩৬৬, জামেউল জাওয়ামে, হাদীস নং-৫০৯৭)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন- "যে ব্যক্তি আমাকে মন্দ বলে, তাকে হত্যা কর। আর যে আমার সাহাবীকে মন্দ বলে, তাকে প্রহার কর।"

(ফাতহুল কাদীর, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭)

"রাসূল (ﷺ) এর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং যে কটূক্তিকারী, সে তো আরো আগেই মুরতাদ হয়ে যাবে। আমাদের মতে, এমন ব্যক্তিকে শাস্তি হিসেবে হত্যা করা জরুরী। তার হত্যা মাফ করা যাবে না।"

ইমাম আবু হানিফা (রহিঃ), ইমাম মালেক (রহিঃ) এর মাযহাব: (তাম্বিহুল উলাতি ওয়াল হুক্কাম, পৃষ্ঠা ৩২৮)

রাসূলের অবমাননাকারীদের সর্বাবস্থায় হত্যা করা জরুরী। তার ক্ষমা প্রার্থনা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। এই মাসআলায় কোনো মুসলমানের মতভেদ কল্পনাও করা যায় না।

(আস সারিমুল মাসলুল 'আলা শাতিমির রাসূল)

ইমাম মালেক (রহি) বর্ণনা করেন, **যে রাসূল (ﷺ) এর বদনাম করবে, দোষ-ত্রুটি বের করবে। তাকে হত্যা করা হবে, চাই সে কাফের হোক বা মুসলমান**, তার কাছে তওবা তলব করা হবে না।"

(আস সারিমুল মাসলুল 'আলা শাতিমির রাসূল)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিঃ) বলেন, "যদি কোনো জিম্মি বা জিযিয়া প্রদানকারী কাফির ও রাসূলকে অবমাননা করে তাহলেও তাকে হত্যা করা হবে। কারণ তখন রাসূল সা কে অবমাননা করার কারণে তার সাথে কৃত অঙ্গীকারনামা বাতিল হয়ে যাবে।

শায়েখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ, islamqa.info

"নবী মুহাম্মদ সা কে কেউ কটূক্তি করলে সকল আলিমই এই বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন যে, তাকে হত্যা করতে হবে। সে তওবা করলেও তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। উম্মতের(নবীর অনুসারীদের) অধিকার হচ্ছে তাকে কতল করা"।

কবিতা আবৃত্তি করত। তার ৩০ জন পুত্র সন্তান ছিল। তাদেরকে সে রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিত। এসব কারণে রাসূল (সা.) তাকে হত্যা করার আদেশ দেন। —আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবা'আ

মুরতাদ যদি তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করতে হবে এবং তাকে হত্যা করা যাবে না।

কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি রাসূল (সা.)-কে গালি দেয়ার কারণে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার তওবা কবুল হবে না। তওবা কবুল করলেও তাকে হত্যা করতে হবে।

এমনকি কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারণে মুরতাদ হয়ে মুরতাদ অবস্থায় রাসূল (সা.)-কে গালি দেয় অতঃপর তওবা করে মুসলমান হয়ে যায় তথাপি তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা এটা আল্লাহর একটি দণ্ড বিধান। যা মওকুফ হওয়ার নয়।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি আল্লাহকে গালি দিয়ে পরে তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল হবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়াটা যুক্তির নিরিখে সুপ্রমাণিত। পক্ষান্তরে রাসূল (সা.)-এর দোষমুক্ত হওয়াটা যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত নয় বরং সরাসরি আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী (সংবাদের) ভিত্তিতে প্রমাণিত। সুতরাং আল্লাহর ওহী অস্বীকার করায় এর অপরাধ অনেক বেশি।

৮

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, আল্লাহ্রই পানাহ্, মুরতাদ্দ হয়ে যায় তার স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। তারপর ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে পুনরায় নতুনভাবে বিবাহ্ করা যাবে। ইতোপূর্বে কুফরী কলেমা বলার পর কৃত সঙ্গমের ফলে যে সন্তান হবে সে হারামী (জারজ) হবে। আর এ ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে কলেমা-ই শাহাদত পড়তে থাকলেও কোন লাভ হবে না; যতক্ষণ না নিজের কুফর থেকে তাওবা করবে। কারণ, মুরতাদ্দ অভ্যাসগতভাবে কলেমা পড়তে থাকলে তার কুফর দূরীভূত হয় না। আর যে লোকটি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন নবীর শানে বেয়াদবী করে, দুনিয়ায় তাওবার পরও তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এমনকি যদি নেশার কারণে বেঁহুশ অবস্থায় বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা বলে থাকে, তবুও ক্ষমা করা হবে না।

ফাত্হুল ক্বাদীর: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ৪০৭-এ আছে-

সাত. যে ব্যক্তি নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নিজের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে, সে মুরতাদ। (সুতরাং) তাঁকে গালিদাতা তো অধিকতর স্পষ্ট পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার উপযোগী। অতঃপর

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলেমা পড়ুয়া হয়ে হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলে অথবা মিথ্যারোপ করে, অথবা কোন দোষ-ত্রুটি আরোপ করে অথবা মানহানি করে সে নি:সন্দেহে কাফির এবং তার স্ত্রী তার বিবাহ্ বন্ধন থেকে বের হয়ে গেছে।

১০

অর্থাৎ নেশার কারণে বেহুঁশ অবস্থায় যদি কারো মুখ থেকে কুফরের কোন কথা বের হয়ে যায়, তাকে, বেহুঁশ হবার কারণে, কাফির বলবে না, কুফরের শাস্তি দেবে না; কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে আক্বদাসে বেয়াদবী করা এমন জঘন্য কুফর যে, নেশার কারণে বেহুঁশ হওয়ার অবস্থায়ও যদি তা সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে তাকে ক্ষমা করা যাবে না। আর, আল্লাহরই পানাহ্, মুরতাদ্দ হওয়ার বিধান হচ্ছে- তার স্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে তার বিবাহ্ বন্ধন থেকে বের হয়ে যাবে। (সে পরে ইসলাম গ্রহণ করলেও স্ত্রী তার বিবাহে ফিরে আসবে না। (সূত্র: গামাযুল 'উয়ূন)। আর যদি সে ওই মুরতাদ্দ অবস্থায় মরে যায়, তবে আল্লাহরই পানাহ্, তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি নেই, না কোন মিল্লাতধারী, যেমন- ইহুদী কিংবা খ্রিস্টানের কবরস্থানেও। তাকে তো কুকুরের মতো কোন গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। মুরতাদ্দের কুফর আসল কাফিরের কুফর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। আর যদি কোন মুসলমানের বিপক্ষে 'আদিল' (মুত্তাকী ও

↥

১৪

কিতাব, সুন্নাহ্, ইজমা'-ই উম্মাহ্ ও দ্বীনের ইমামগণের স্পষ্ট বর্ণনাদি অনুসারে পরম সম্মানিত নবী ও রসূলের মানহানির শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। রসূল-ই পাকের স্পষ্ট বিরোধিতা রসূল-ই পাকের মানহানির শামিল। ক্বোরআন-ই করীম এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলেছে। এতদ্‌ভিত্তিতেই কাফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে-

ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

তরজমাঃ (কাফিরদেরকে মৃত্যুদ) এজন্য দেয়া হবে যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলের স্পষ্ট বিরোধিতা করে, আল্লাহ্ ও রসূলের মানহানি করেছিলো; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তবে আল্লাহর শাস্তি কঠিন।[১]

১৮

চার. ইমাম আবূ বকর ইবনে মুনযির বলেছেন, আম ওলামা-ই ইসলামের এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় (মন্দ বলে), তাকে কতল করা হবে। এ

পাঁচ. এমন প্রতিটি লোকই, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়েছে অথবা হুযূরের দিকে কোন দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক রচনা করেছে, অথবা হুযূর-ই আকরামের পবিত্র সত্তা, তাঁর বংশ, তাঁর দ্বীন অথবা তাঁর কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে কোন ত্রুটির সম্পর্ক রচনা করে, অথবা তাঁর সমালোচনা করে, অথবা যে কেউ অশালীনতা, মানহানি অথবা তাঁর শান মুবারকের জন্য ক্ষতিকর অথবা তাঁর যাত-ই মুক্বাদ্দাসার প্রতি কোন দোষ-ত্রুটি আরোপ করার জন্য হুযূর-ই আক্রামকে কোন জিনিষের সাথে তুলনা করে, সে বস্তুতঃ হুযূর-ই আক্রামকে প্রকাশ্যে গালিদাতা। তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। আমরা এ হুকুম থেকে কোন কিছুকে মোটেই বাইরে রাখিনা, আমরা তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহও করি না- চাই প্রকাশ্যে মানহানি করুক অথবা ইঙ্গিতে করুক অথবা কথার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচে করুক। এটা উম্মতের সমস্ত আলিম ও সকল ফাত্ওয়া বিশারদের ইজমা' বা ঐকমত্য। সাহাবা-ই কেরামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত সকলেরই এ ইজমা' (ঐকমত্য)। (রাদ্বিয়াল্লাহু

যাবে। ইমাম আবূ হাফস কবীর (হানাফী) থেকে উদ্ধৃত, যদি কেউ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একটি মাত্র চুল মুবারককেও ত্রুটিযুক্ত বলে, সেও কাফির হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ আলায়হির রহমাহ্ 'মাবসূত্ব'-এ বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে অশালীন কথা বলা কুফর।[১৩]

দশ. কোন মুসলমানের এতে দ্বিমত নেই যে, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করেছে ও তাঁকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেছে আর সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, সে মুরতাদ্দ কতলের উপযোগী অপরাধী।[১৪]

সুতরাং বুঝা গেলো যে, কিতাব (ক্বোরআন), সুন্নাহ্, ইজমা'-ই উম্মাহ্ ও বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরামের অভিমতসমূহ অনুসারে রসূলে পাকের শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারীর শাস্তি হচ্ছে- শরীয়তে নির্দ্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) হিসেবে তাকে কতল করা হবে।

২১

চার. এখানে আরেকটা সংশয়ের অপনোদনও জরুরী মনে করি। তা হচ্ছে যদি প্রশ্ন করা হয়- 'রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মানহানির শাস্তি যদি শরীয়তের নির্দ্ধারিত শাস্তি হিসেবে 'মৃত্যুদণ্ড' প্রদান করাই হয়, তাহলে কোন কোন মুনাফিক্ব হুযূর-ই আক্রামের শানে প্রকাশ্যে মানহানি করেছিলো, কখনো কখনো সাহাবা-ই কেরাম তাৎক্ষণিকভাবে ওই বেয়াদব মুনাফিক্বকে হত্যা করার অনুমতি চাইতেন;

কিন্তু হুযূর-ই করীম অনুমতি দেননি, এর কারণ কি?' তবে এর একাধিক জবাব বিজ্ঞ ইমামগণ দিয়েছেন। এমনকি ইবনে তাইমিয়াও এর কতিপয় জবাব দিয়েছেন। জবাবগুলো নিম্নরূপঃ

ক. তখন ইসলামের প্রাথমিক যুগ ছিলো। ওই সময় 'হদ্দ' তথা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বিভিন্নমুখী ফ্যাসাদের কারণ ছিলো। তাই তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুদণ্ড না দিলে তাদের মানহানিকর কথা শুনে ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয় ছিলো।

খ. মুনাফিক্বগণ রসূলে পাকের শানে প্রকাশ্যভাবে মানহানি করতো না; বরং পরস্পরের মধ্যে গোপনে হুযূর-ই আকরামের শানে মানহানিকর কথাবার্তা বলতো।

গ. মুনাফিক্বগণ শানে রিসালতে মানহানিরূপী অপরাধ করলে সম্মানিত সাহাবীগণ হুযূর-ই আকরামের দরবারে তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি চাওয়া এ কথার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, সাহাবা-ই কেরাম জানতেন যে, রসূলে পাকের শানে বেয়াদবী করার শাস্তি হচ্ছে 'কতল' (মৃত্যুদণ্ড)।

উল্লেখ্য যে, রসূলে পাকের শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী আবূ রাফি' ইহুদী ও কা'ব ইবনে আশ্‌রাফকে হত্যার নির্দেশ রসূলে করীম দিয়েছিলেন। এ নির্দেশের ভিত্তিতে সাহাবা-ই কেরাম জানতেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী অপরাধী।

প্রিয়নবী সা. কে অবমাননার শাস্তি ২২

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রা. তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য একটি পরিকল্পনা করলেন। এজন্য রাসূলের কাছে একটি বিষয়ের অনুমতি চাইলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে তাহলে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার অনুমতি দিতে হবে।" [পরিকল্পনার বিষয় হলো যে, আমাকে আপনার ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলতে হবে] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এ ব্যাপারে তোমাকে অনুমতি দেয়া হলো।"

এবার মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রা. আনসারদের মধ্যকার আওস গোত্র থেকে অল্প কয়েকজনকে নিয়ে ছোট একটি জামাত গঠন করলেন। যাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবূ নায়লা। কথিত আছে যে আবূ নায়লা ছিলেন কা'ব বিন আশরাফের সৎভাই। তাঁরা কা'ব ইবন আশরাফের জন্য একটি ফাঁদ পাতলেন।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. তাঁর ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে কা'ব ইবন আশরাফের সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। কা'ব এর সাথে দেখা হলে পরিকল্পনা অনুযায়ী আল্লাহর রাসূলের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি কা'বকে বললেন, "এই লোকটি আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা ও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে একটি দুর্যোগ এবং তাঁর জন্যই পূরো আরব আমাদের শত্রু হয়ে গেছে এবং আমাদের সাথে লড়াই করছে।"

কা'ব বললো, "আমি তো এটি জানতাম। তাই তো তোমাদের আগেই বলেছি এবং সামনে তোমরা আরও বিপদে পড়বে, খারাপ সময় দেখবে।"

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, "আমরা অপেক্ষা করতে চাই এবং দেখতে চাই এর শেষ কিভাবে হয়।"

তিনি এখন কা'বের সাথে একটি ভাব তৈরী করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, কা'ব, লোকটার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটছে, আর্থিকভাবে একটু সমস্যায় পরে গেছি। তোমার কাছ থেকে আমরা কিছু অর্থ ধার নিতে চাই, যার বিনিময়ে প্রয়োজনে তোমার নিকট কিছু জামানাতও রাখতে রাজি আছি।"

↥

আমরা আমাদের অস্ত্রগুলো তোমার নিকট বন্ধক রেখে যেতে পারি।"

সে বলল, "ঠিক আছে, এটি হতে পারে।"

মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ কা'বের জন্য এভাবে ফাঁদ পাতলেন। যাতে তার কাছে পরের বার অস্ত্র আনতে গেলে সে সন্দেহ না করে। তিনি পরবর্তী সাক্ষাতের জন্য রাতের একটি মুহূর্তকে নির্ধারণ করলেন এবং নির্ধারিত সেই সময়ে, গভীর রাতের উপযুক্ত এবং সঠিক সময়ে তার কাছে ফিরে এলেন। ঘরের বাইরে থেকে এবার তিনি কা'বকে ডাক দিলেন।

কাবের স্ত্রী সেই আওয়াজ শুনে বলল, "আমি এই ডাকের মধ্যে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি।"

কা'ব বলল, চিন্তা করো না, "এটি হচ্ছে আমার বন্ধু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবু নায়লা।"

এতে বুঝা যায় যে, তাদের মাঝে জাহেলিয়াতের সময় থেকেই সুসম্পর্ক ছিলো, বন্ধুত্ব ছিলো।

অতঃপর সে নিচে গেলো মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রা. ও তাঁর সাথীদের সাথে দেখা করতে। ইতোমধ্যে তাঁরা একটি সংকেত ঠিক করে নিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ তাঁদের বললেন, "আমি কৌশলে ওর মাথা ধরবো। যখন তোমরা আমাকে ওর মাথা ধরতে দেখবে, তখনই তালোয়ার দিয়ে তাকে শেষ করে দেবে।" এটাই ছিল তাদের সংকেত।

এবার তিনি তার মাথার চুল গুলোকে ভালোভাবে ধরলেন এবং তালোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকলেন। সাথে আসা আওসের সাহাবীরাও এগিয়ে এলেন। কিন্তু সেগুলো তাকে মারার জন্য যথেষ্ট ছিল না এবং সে সাহায্যে জন্য চিৎকার করে উঠল। তাৎক্ষণিকভাবে সবগুলো দূর্গতে আলো জ্বলে ওঠল। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন,"আমার মনে পড়ল যে আমার কাছে একটি ছুরি আছে। তাই আমি সেটা বের করে তা দিয়ে তার তলপেটে আঘাত করলাম। একেবারে নিম্নাংশের হাড় পর্যন্ত সেটি গেঁথে দিলাম এবং কাজ শেষ করে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করলাম।" [৩]

ওয়াকিদি রহ. বলেন, "সকালে ইহুদীরা মুশরিকদের সাথে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমাদের মধ্যে শীর্ষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তিকে গত রাতে হত্যা করা হয়েছে।"

তারা বলল, "কুতিলা গিলাহ" এবং গিলাহ মানে হচ্ছে গুপ্তহত্যা। এই শব্দটির সাথে নেতিবাচক অর্থ জড়িত কারণ এর মানে হচ্ছে এই ব্যক্তি খুন হয়েছে এবং তা হয়েছে আকস্মিকভাবে। সে এই ব্যাপারে জানত না। এটি দ্বিপাক্ষিক ছিল না, একে অপরের বিরুদ্ধে ছিল না, তাকে গোপনে তার অবগতির বাইরে হত্যা করা হয়েছে।

তারা বলল, "তাকে কোন অপবাদ ছাড়াই হত্যা করা হয়েছে।" কেন তাকে হত্যা করা হল, এটাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রশ্ন।

কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইহুদীদের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল। সীরাতে এটি ভালোভাবেই উল্লেখ আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁর সাথে সকল ইহুদীদের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। এখন কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করা হয়েছে, কেন? এটা কেন হল?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما قتل. ولاكنه نال منا الأذى

وهجانا بشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف

অর্থ: "সে যদি সেই ব্যক্তিদের মতো শান্ত হয়ে যেত, যারা তার মতামত অনুসরণ করে অথবা একই মত পোষণ করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হত না। কিন্তু সে আমাদের ক্ষতি করেছে, তার কবিতা দিয়ে আমাদের মানহানি করেছে। আর তোমাদের মধ্যে যে এই কাজটি করবে আমরা তালোয়ার দিয়ে এর বোঝাপড়া করবো।"[৪]

এরপর তিনি ইহুদীদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার করে দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন ইহুদী বা মুশরিক যদি কথার মাধ্যমে, কবিতা বা মিডিয়ার মাধ্যমে আমার মানহানি করার চেষ্টা করো, তাহলে আমরা তাকে এভাবেই দেখে নেবো। তোমাদের আর আমাদের মধ্যে তালোয়ার ব্যতীত আর কিছুই করার থাকবে না! সেখানে কোন সংলাপ হবে না, কোন ক্ষমা করা হবে না, কোন সহমর্মিতা থাকবে না, মীমাংসার কোন উদ্যোগ নেয়া হবে না। আমার আর তোমাদের মধ্যে তখন থাকবে শুধুই তলোয়ার।

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, না! তাকে হত্যা করা হয়েছে তার কবিতার জন্য, যেটি তার মক্কায় যাওয়ার পূর্বে ছিল। তাই তার মক্কায় যাওয়া এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে উৎসাহিত করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, স্পষ্টরূপে এই সিদ্ধান্তটি তার কবিতার জন্যই দেয়া হয়েছিল। তারপর তিনি বলেন, কা'ব ইবনে আশরাফ যা করেছিল তার সবকিছুই ছিল আকর্ষণীয় কথার দ্বারা ইসলামের ক্ষতিসাধন। হত্যাকৃত কাফিরদের প্রতি তার শোক প্রকাশ এবং তাদের যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করা, তার অভিশাপ, অপবাদ, ইসলামকে প্রকাশ্যে কটাক্ষ করা, ছোট করে দেখা এবং কাফিরদের ধর্মকে অগ্রাধিকার দেয়া - এসব কিছুই ছিল তার মুখ থেকে বের হওয়া কাব্যিক ছন্দের কারসাজি।

সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে শারিরীক যুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিলো না। জড়িতছিল মুখ নিসৃত সাহিত্য আর সাংস্কৃতিক যুদ্ধে। তার আক্রমণ ছিলো আকর্ষণীয় শব্দাবলীল মাধ্যমে। সে মাধুর্যপূর্ণ বাক্যবিন্যাসের দ্বারা রচিত কাব্য দিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করছিলো।

আর এটিই হচ্ছে একটি হুজ্জাহ - এটি একটি প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধেও যারা এই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের অবমাননা করবে। এটি পরিস্কার, যে ব্যক্তি কবিতা ও অপবাদ দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্ষতি করবে, তার রক্ত কোনভাবেই সুরক্ষিত থাকেব না।

'ইবনে সাদের বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম (ইসলামের দুশমন পাপিষ্ঠ কাব বিন আশরাফকে হত্যা করে) যখন বাকিউল গারকাদে পৌঁছলেন, তখন সবাই "আল্লাহু আকবার" বলে ধ্বনি দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে রাতে নামাজে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি যখন তাঁদের তাকবির-ধ্বনি শুনতে পেলেন, তিনিও তাকবির-ধ্বনি দিলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা তাকে হত্যা করে ফেলেছে। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, সফল হোক (তোমাদের) চেহারাগুলো। তাঁরা প্রতিউত্তরে বললেন, এবং আপনার চেহারাও (সফল হোক), হে আল্লাহর রাসুল। তাঁরা তার (কর্তিত) মাথা তাঁর সামনে ফেললে তিনি তার নিহত হওয়ায় আল্লাহর প্রশংসা করলেন।'

আবু রাফে' -এর হত্যার ঘটনাঃ

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রা. ইহুদী সর্দার আবূ রাফে'কে হত্যার উদ্দেশ্যে তার অবস্থানকারী দূর্গে প্রবেশের চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে একটি কৌশল অবলম্বন করে তিনি তাদের দূর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন।

অতঃপর আবূ রাফের শয্যাঘরে পৌছে গেলেন। কারণ তিনি চাবিগুলো হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন। সেটি ছিলো গভীর রাত। পুরোপুরি অন্ধকার থাকার কারণে তিনি আবূ রাফে'কে দেখতে পাচ্ছিলেন না। ভাবতে লাগলেন এখন তিনি কি করবেন?

অবশেষে তিনি একটি বুদ্ধি বের করতে সক্ষম হলেন। তিনি "আবু রাফে!" বলে আবু রাফেকে ডাক দিলেন।

তিনি সরাসরি প্রবেশ করে ডাকলেন, আবু রাফে তুমি কোথায়? আবু রাফে আওয়াজ করে জবাব দিলো। আব্দুল্লাহ বিন আতিক বলেন, আমি শব্দের উৎসের দিকে আঘাত করতে থাকলাম। আমি তাকে আঘাত করলাম কিন্তু হত্যা করতে পারলাম না এবং সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠল।

মাশাআল্লাহ! আব্দুল্লাহ বিন আতিক উপস্থিত বুদ্ধিতে খুব চতুর ছিলেন। তিনি সাথে সাথে পিছু হটে আবার ফিরে আসলেন এবং সাহায্যকারী সেজে আওয়াজ পরিবর্তন করে এসে বললেন, "আবু রা'ফে! তোমার কি হয়েছে?" আবু রা'ফে বললো, "তোমার মায়ের উপর অভিশাপ, এখানে কেউ আছে যে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে!

তিনি বললেন, আমি এবার আরো তীক্ষ্ণভাবে আওয়াজের উৎসের দিকে আঘাত করলাম কিন্তু এবারও তাকে হত্যা করতে পারলাম না। সে আবারো সাহায্যে জন্য চিৎকার করলো!

তিনি আরেকবার পিছু হঠলেন এবং ফিরে এলেন গলা পরিবর্তন করে। এবার আবু রা'ফে আগে থেকে উপুড় হয়ে শোয়া ছিলো কারণ তাকে আগে দুইবার আঘাত করা হয়েছিলো। তাই আব্দুল্লাহ বিন আতিক বলেন, "আমি আমার তলোয়ারটি তার পেটের মধ্যে গেঁথে দিলাম এবং ততক্ষণ ঠেলতে লাগলাম যতক্ষণ না হাড় ভাঙ্গার শব্দ পেলাম। হাড় ভাঙ্গা শব্দের মানে হচ্ছে তার মেরুদন্ড ভেঙ্গে আলাদা হয়ে গেছে এবং এতেই সে মৃত্যু মুখে পতিত হল।

এরপর আব্দুল্লাহ বিন আতিক একটি সিঁড়ি অথবা মই বেয়ে নিচে নেমে এলেন। তিনি বলেন, উত্তেজনার বশে আমি ভাবলাম যে আমি সিঁড়ি পার হয়ে এসেছি কিন্তু একটি ধাপ বাকী ছিলো। তাই দ্রুত করতে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম। সিঁড়ি থেকে পরে যাবার কারণে আমার পা মচকে গেলো। অনেক কষ্টে আমি আমার সাথীদের কাছে ফিরে এলাম। তাদের বললাম যে আমি তাকে হত্যা করেছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। তাই আমি এখানে অপেক্ষা করবো। তোমরা গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদ পৌছে দাও। আমি এখানে থাকবো আর ঘোষণা শুনার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো!

ফজরের সময় খবর প্রকাশ হলো যে হিজাজের ব্যবসায়ী আবু রা'ফে খুন হয়েছে!

আব্দুল্লাহ বিন আতিক বললেন, "যখন অমি আবু রাফে'র খুন হওয়ার সংবাদ শুনলাম, আমি শপথ করে বলছি এর চেয়ে সুমিষ্ট কথা আমি আমার জীবনে আর কখনো শুনিনি।" -এটাই ছিলো আব্দুল্লাহ বিন আতিকের কথা।

তারা এভাবেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসতেন। তারপর তিনি মদীনার দিকে ছুটে গেলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে বললেন,

أفلح الوجه

"সাফল্যে উদ্ভাসিত হোক তোমার জীবন!"

প্রতি উত্তরে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সাফল্যে উদ্ভাসিত হোক আপনার জীবনও![৫]

এভাবেই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাহাবাদের এমন নিবেদিতপ্রাণ আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল প্রমুখের হত্যার ঘটনাঃ

এটি হলো সেই ঘটনা, যা মক্কা বিজয়ের পর সংঘটিত হয়েছিলো। মক্কা বিজয়ের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল ও তার দুই নর্তকী দাসীকে প্রকাশ্যে হত্যা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন, এমনকি যদি তারা কা'বার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকে, তাহলেও তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন।

দুনিয়ার সবচাইতে পবিত্র স্থান হচ্ছে মক্কা এবং মক্কার মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ছিলো আল-হারাম। আর কেউ যদি কা'বার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকতো তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হতো। এটি ছিলো জাহেলিয়াতের সময় থেকেই মুশরিকীনদের প্রচলিত আইন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন কিছু লোকদের ব্যাপারে বললেন,

অর্থ: "তাদেরকে হত্যা করো, যদি তারা কা'বার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকে তবুও।"[৬]

এরা কারা ছিলো?

এই তালিকার মধ্যে কিছু নাম ছিলো যার মধ্যে ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল নামে এক লোক এবং তার দুই ক্রীতদাসী এবং আবু লাহাবের ক্রীতদাসী সারা।

এদের অপরাধ কি ছিলো?

আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল এবং তার দুই মেয়ে ক্রীতদাসী আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে গান গাইতো। আবু লাহাবের স্বত্বাধীন একটি মেয়ে ক্রীতদাসীর সাথে এই দুটো মেয়েও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালের কথাই বলা যাক।

সে প্রকৃতই কা'বার গিলাফ ধরে ঝুলে ছিলো। একজন সাহাবী তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করেন!

দ্বিতীয়ত: আমরা জানি যে, নারীরা যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যায়। কিন্তু এই নারীরা তো যুদ্ধ করেছিলো না এবং কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণও করেনি। বরং তারা পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করার মতো পরিস্থিতির মধ্যে ছিলো!

আসুন মেয়ে ক্রীতদাসীগুলোর কৌতুহল উদ্দীপক ঘটনাটা আমরা পর্যালোচনা করি।

এরা স্বাধীন নারী ছিলো না বরং ছিলো ক্রীতদাস। আর ইসলামে শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার একটি প্রভাব আছে। যেহেতু, ক্রীতদাসদের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই, সেহেতু তাদের শাস্তিও কম হয়। এই নারীদের আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধের গান গাওয়া বা না গাওয়ার স্বাধীনতা ছিলো না। কিন্তু আবু লাহাব এবং আব্দুল্লাহ বিন খাতাল, তাদের মনিব, তাদের এই কাজটি করতে আদেশ দিয়েছে, কিন্তু তারপরও তাদের আলাদা করা হয়েছে এবং হত্যা করতে বলা হয়েছে।

এদের পরে কালো তালিকায় ছিলো আরেকটি লোক। যার নাম ছিলো আল হুয়াইরিদ বিন লুকাইদ। সেও তার সাহিত্য ও ভাষার মাধ্যমে নিজ মুখ দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আঘাত করতো। সে তার বাসায় লুকিয়ে ছিলো। আলী ইবনে আবী তালিব রা. তার বাসায় এসে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে জানানো হলো যে, সে সেখানে নেই এবং মক্কার বাহিরে বাদীআয় চলে গেছে। একথা শুনে আলী রা. সেখান থেকে চলে যাওয়ার ভান করলেন। আলী রা. বাসার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন।

এরপর হুওয়ারিদকে তারা জানালো যে, আলী ইবনে আবী তালিব তাকে খুঁজতে এসেছিলো। যখন হুওয়ারিদ বাসা থেকে বের হয়ে আরেক জায়গায় পালাতে যাচ্ছিলো, আলী রাজিয়াল্লাহু আনহু তখন সামনে এসে তাকে হত্যা করে ফেললেন।[৭]

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে কা'ব ইবনে জুহাইর। সেও ছিলো একজন কবি। তার ভাইও ছিলো কবি এবং তার বাবা জুহাইর বিন আবী সালমা ছিলো শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। আরবরা শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোকে কা'বায় ঝুলানোর মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করতো। এটি ছিলো এই কাজের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। জুহাইর বিন আবী সালমা ছিলেন এমন একজন যার কবিতা কা'বায় ঝুলানো ছিলো। তার পুত্র কা'ব এবং বুজায়ের দুজনেই ছিলো কবি। কিন্তু বুজায়ের ছিলো মুসলিম আর কা'ব ছিলো অমুসলিম।

কা'ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করতো। তাই যখন মুসলিমরা মক্কায় প্রবেশ করলেন, বুজায়ের তার ভাইকে একটি চিঠি লিখে জানালো যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় সেই সব লোকদের হত্যা করছেন যারা তার বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করতো। কা'ব সে সময় মক্কায় ছিলো না কিন্তু তার ভাই আগে থেকেই সাবধান করে দিয়ে তাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলো। যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সব লোকদের হত্যা করছেন যারা তার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলো।

এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনে জাবারিয়া এবং মুগীরাহ ইবনে আবী ওয়াহাব এর মতো লোকদেরকেও হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এদের যারা বাকী ছিলো তারা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেছে।কারণ রাসূলুল্লাহ আদেশ করেছেন এমন সবাইকে হত্যা করতে যারা তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে!

উকবা ইবনে আবী মুয়িদ এবং নাদার ইবনে আবী হারিছের হত্যার ঘটনাঃ

এরপর আমাদের আছে উকবা ইবনে আবী মুয়িদ এবং নাদার ইবনে আবী হারিছের ঘটনা।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের কাফিরদের মধ্যে সত্তর জন যুদ্ধবন্দী ছিলো। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উপস্থিত করতে বললেন যাতে তিনি একে একে প্রত্যেককে দেখতে পারেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাদার ইবনে হারিছের দিকে তাকিয়েছিলেন। নাদার ইবনে আবী হারিছ আল্লাহর রাসূলের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলো। সে তার পাশের লোকটিকে বললো, "শোন, আমাকে হত্যা করা হবে। আমি আল্লাহর রাসূলের চোখে আমার মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি!"

লোকটি তাকে বললো, "না, তুমি বাড়িয়ে বলছো। তুমি খুব বেশী ভয় পাচ্ছো। তুমি আতঙ্কগ্রস্থ!"

সে বললো, "না। আমি বলছি তোমাকে। আমি আল্লাহর রাসূলের চোখে মৃত্যু দেখেছি।"

এরপর নাদার ইবনে হারিছ তার আত্নীয় মুসআব ইবনে উমায়েরকে ডেকে বললো, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাও এবং বলো তিনি যেন আমার সাথে অন্য সময়ের মতো আচরণ করেন, আমার লোকদের মতো আমার সাথে আচরণ করেন। তিনি যদি তাদেরকে হত্যা করেন, তাহলে যেনো আমাকেও হত্যা করেন, তিনি যদি তাদের ক্ষমা করেন তাহলে আমাকেও যেন ক্ষমা করেন!"

মুসআব ইবনে উমায়ের তাকে বললেন, "তুমি সেই যে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলেছো এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধে কথা বলেছো।"

নাদার বিন হারিছ ছিল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাসূলের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য তার পাশে হালাকা করতো। সে পারস্যে গিয়েছিলো অলিক

কল্প-কাহিনী শিখে আসতে। ফিরে এসে কাফিরদের বলতো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে কাহিনী বলছে। তার চেয়ে ভালো কাহিনী আছে আমার কাছে। আসো, এবার আমার কাছ থেকে শোনো।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাদার বিন হারিছকে ধরে আনতে বললেন এবং আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন তাকে হত্যা করতে। তাকে আলাদা করে রাখা হয়েছিলো!
সে সময় তাঁরা মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন। যখন তারা একটি বিশেষ এলাকায় পৌছলেন তখন তিনি নাদার ইবন হারিছকে হত্যা করলেন।
আর কিছুদূর যাওয়ার পরেই আদেশ করলেন, যে উকবা ইবন আবী মুয়িদকে হত্যা করা হোক।

উকবা বললো, অভিশাপ আমার উপর! আমাকে কেন হত্যা করার জন্য আলাদা করা হচ্ছে! আমার সাথে সব লোকেরাই তোমার শত্রু। সবাই তোমার সাথে যুদ্ধ করেছে, সবাই তোমার সাথে লড়াই করেছে, সবাই আমার গোত্র কুরাইশ থেকে, আমাকে কেন আলাদা করে দেখছো?
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لعداوتك لله ورسوله

অর্থ: "এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে তোমার বিদ্বেষ!"

সে বললো, "হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সাথে আমার লোকদের মত আচরণ করো। তাদেরকে যদি হত্যা করো তবে আমাকেও হত্যা করো। তাদেরকে মুক্তি দিলে আমাকেও মুক্তি দাও তাদের থেকে যদি মুক্তিপণ নাও তাহলে আমার থেকেও যা চাও নাও!"
আর তারপর সে বললো, "হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার সন্তানদের কে দেখবে?"
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "জাহান্নামের আগুন! ও আসিব, একে নিয়ে যাও এবং এর গর্দানটা উড়িয়ে দাও।"

এরপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بئس الرجل كنت! والله ما علمت كافرا بالله وبكتابه وبرسوله مؤذيا لنبيه.

فأحمد الله الذى هو قتلك وأقر عينى منك.

অর্থ: "কত খারাপ লোক তুমি! আমি তোমার মতো কোন লোককে চিনি না যে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলের উপর অবিশ্বাস করেছে! তুমি আল্লাহর নবীর অবমাননা করেছো, তাই আমি আল্লাহর প্রশংসা করি যিনি তোমাকে হত্যা করেছেন এবং তোমাকে মরতে দেখে আমার চোখে তৃপ্তি দান করেছেন!" [৮]

সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)
৪৩৬১। ইবনু আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। জনৈক অন্ধ লোকের একটি উম্মু ওয়ালাদ' ক্রীতদাসী ছিলো। সে নবী সা কে গালি দিতো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতো। অন্ধ লোকটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত হতো না। সে তাকে ভৎর্সনা করতো; কিন্তু তাতেও সে বিরত হতো না। এক রাতে সে যখন নবী সা গালি দিতে শুরু করলো এবং তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে লাগলো, **সে একটি একটি ধারালো ছোরা নিয়ে তার পেটে ঢুকিয়ে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করলো। তার দু' পায়ের মাঝখানে একটি শিশু পতিত হয়ে রক্তে রঞ্জিত হলো**। ভোরবেলা অন্ধ লোকটি মানুষের ভিড় ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে সামনে অগ্রসর হয়ে নবী সা এর সামনে এসে বসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই নিহত দাসীর মনিব। গত রাতে সে আপনাকে গালাগালি শুরু করে এবং আপনার সম্পর্কে অপমানজনক কথা বললে, আমি তখন একটি ধারালো ছুরি নিয়ে তার পেটে স্থাপন করে তাতে চাপ দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলি। নবী সা বলেনঃ শিশুটির রক্ত বৃথা গেলো।

উম্মু ওয়ালাদ নামক এক দাসী হত্যার ঘটনাঃ

আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, একজন অন্ধ সাহাবীর অধীনে একজন দাসী ছিল, দাসীটি ছিলো তাঁর 'উম্মু ওয়ালাদ'। 'উম্মু ওয়ালাদ' বলা হয় এমন দাসীকে যে মনীবের বাচ্চা জন্ম দেয়। এ ধরণের দাসীকে 'উম্মু ওয়ালাদ' বা সন্তানের মাতা বলা হতো এবং তার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি প্রযোজ্য হয়। এই ব্যক্তির উম্মু ওয়ালাদ থেকে দু'জন সন্তান হয়েছিলো। কিন্তু এই মহিলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতো এবং তাকে তিনি সাবধান করার পরেও সে বিরত হতো না!
এক রাতে সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিয়েই যাচ্ছিলো। তখন তিনি একটি ছুরি নিয়ে তার পেটে বিদ্ধ করলেন এবং ভিতরে চাপ দিতে থাকলেন যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়!

সকালে আল্লাহর রাসূলের নিকট খবর পৌছল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে একত্র করে বললেন, আমি আল্লাহর নামে তোমাদের আদেশ করছি যে কাজটি করেছো উঠে দাঁড়াও। অন্ধ ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়ালেন এবং হেঁটে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এসে বসে পড়ে বললেন,
"হে আল্লাহর রাসূল! আমিই সেই ব্যক্তি যে কাজটি করেছে। সে আপনাকে অভিশাপ দিতো এবং তাকে বিরত থাকার কথা বলার পরও সে বিরত হতো না! তার হতে আমার মুক্তার মতো সন্তান আছে এবং সে আমার প্রতি খুব সদয় ছিলো। কিন্তু গত রাতে সে আপনাকে অভিশাপ দিতে লাগলো। তাই আমি একটি ছুরি নিয়ে তাকে আঘাত করলাম এবং তাকে মেরে ফেললাম!"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,
"জেনে রেখো যে তার রক্তের কোন মূল্য নেই।" অর্থাৎ, তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নেই এবং যে তাকে হত্যা করেছে তারও কোন শাস্তি নেই! "

১৪৪ সীরাতুল মুস্তফা (সা)

ইয়াহূদী মহিলা আসমাকে হত্যা (২৬ রমযানুল মুবারক, দ্বিতীয় হি.)

আসমা ছিল এক ইয়াহূদী স্ত্রীলোক, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা রচনা করত এবং তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিত। মানুষকে নবী (সা) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলত। নবী (সা) বদর থেকে তখনো ফেরেননি, পুনরায় সে এ ধরনের কবিতা বলল। এতে হযরত উমায়র ইবন আদী (রা)-এর জিদ চেপে গেল। তিনি মান্নত করলেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহে যদি রাসূলুল্লাহ (সা) নিরাপদে বদর থেকে ফিরে আসেন, তা হলে আমি একে হত্যা করব।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদর থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থভাবে ও নিরাপদে ফিরে এলেন, তখন উমায়র (রা) রাত্রিকালে তরবারি নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করলেন। যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন, সেহেতু হাতড়িয়ে আসমার আশেপাশে থাকা শিশুদের সরিয়ে দিলেন এবং তার বুকের উপর তরবারি রেখে এত জোরে চাপ দিলেন যে, তা পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মান্নত পূর্ণ করে তিনি ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁকে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), এ জন্যে আমার কোন জরিমানা তো হবে না? তিনি বললেন, না। لا ينتطح فيها عنزان "এ ব্যাপারে দু'টি মেষও মাথা দিয়ে গুঁতোগুঁতি করবে না।" অর্থাৎ এটা এমন কোন কাজই নয়, যে ব্যাপারে কেউ মতপার্থক্য বা প্রতিবাদ করতে পারে।

মোটকথা, হযরত উমায়র (রা)-এর এ কাজে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই খুশি হন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন : اذا احببتم ان تنظرا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدى "যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখতে চায়, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গোপনে সাহায্য করে, তা হলে যেন উমায়র ইবন আদীকে দেখে।"

আসমা বিনতে মারওয়ান নাম্নী এক মহিলাকে হত্যার ঘটনা:

এই মহিলার নাম ছিলো আসমা বিনতে মারওয়ান। সে আনসারদের মধ্যে একজন ভালো কবি ছিলো। কিন্তু সে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলতো এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতো আর লোকদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করতো। সে বলতো, "এই লোক আমাদের মধ্য থেকে নয়, এই লোক তো আমাদের গোত্রের নয়। তাহলে কেন আমরা তাকে আতিথ্য দিচ্ছি এবং নিজেদের উপর এই সকল বিপদ ডেকে আনছি, আমরা কেন তাকে আমাদের মাঝে থেকে নিরাপত্তা দিচ্ছি! তাকে বের করে দাও!"

তাঁর পরিবার থেকে উমায়েদ বিন আলী নামক এক অন্ধ ব্যক্তি বলেন, "আল্লাহর নামে আমি শপথ করছি, যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি মদীনায় ফিরে আসেন আমি আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করবো!"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় বদরে ছিলেন। যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসলেন, উমায়ের বিন আলী মধ্য রাতে সরাসরি আসমা বিনতে মারওয়ানের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

তাকে ঘিরে ছিলো তার সন্তানেরা এবং একজন তার বুকের দুধ পান করছিলো। তিনি হাতিয়ে দেখলেন যে সে এই বাচ্চাটিকে ধরে রেখেছে। তাই তিনি হাত দিয়ে বাচ্চাটিকে সরিয়ে তার পাশে রাখলেন এবং তার তালোয়ারটি আসমার বুকে বিদ্ধ করে দিলেন।

এরপর তিনি ফযরের সালাত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আদায় করলেন। যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করলেন, তিনি উমায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কি মারওয়ানের মেয়েকে হত্যা করেছো?"

তিনি বললেন, "জি, আমি আমার বাবাকেও আপনার জন্য উৎসর্গ করে দেবো।"

উমায়ের চিন্তিত ছিলেন যে তিনি ভুল কিছু করেছেন এবং তাঁর উচিত ছিলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি নেয়া। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ওয়ালিউল আমর। তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি কি কোন ভুল করেছি?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বললেন?
তিনি কি বললেন, "যে আমার অনুমতি নেয়া তোমার উচিত ছিলো?"
না, বরং তিনি বললেন, "দুটো ছাগলও তাকে নিয়ে ঝগড়া করবে না।'

বনু বকর গোত্রের এক কবি হত্যার ঘটনা:

এবার আসা যাক বানু বকর গোত্রের এক কবির ঘটনায়। বনু বকর ছিলো কুরাইশের মিত্র। অপরদিকে, খুজায়া নামে মুশরিকদের এক গোত্র যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে খুজায়া গোত্র আল্লাহর রাসূল এর সাথে জোটবদ্ধ হল আর বনু বকর কুরাইশদের সাথে গেল। বনু বকর গোত্রের মধ্যে এক কবি ছিলো যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে কথা বলতো। খুজায়া গোত্রের এক যুবক একদা বনু বকর গোত্রের সেই কবিকে আঘাত করলো। যার ফলে সে ব্যাথা পেলো কিন্তু মারা গেলো না। বনু বকরের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে এই ঘটনা তাকে অবহিত করলো। তিনি বললেন, তার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তাকে হত্যা করো।

প্রিয়নবী সা. কে অবমাননার শাস্তি ৫০

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেনঃ "যে কেউ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে- সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, তাকে হত্যা করতে হবে।"

তিনি আরো বলেন: "এই রায়ের বিষয়ে সকল আলিমগণের মধ্যে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে।"

কাজী ই'য়াজ রহ.'আশ শিফা' নামক কিতাবে বলেন, "যে কেউ এমন কোন কথা বলল যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিন্দা করে বলা হয়, কোন ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই তার মৃত্যু দন্ডাদেশ দেয়া হবে।"

ইমাম মালিক রহ. বলেন, "যদি কেউ বলে থাকে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামার বোতামটাও ময়লা, তাহলে তাকেও মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়া উচিত।"

এমনকি যদি এটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন কথা বলার মত হয়, তারপরও তাকে দন্ডাদেশ দেয়া উচিত।

প্রিয়নবী সা. কে অবমাননার শাস্তি ৫২

ইমাম মালিক রহ.বলেন, "মুসলিম হোক আর কাফির হোক, কোন তফাত নেই (যে আল্লাহর রাসূললকে গালি দিবে অথবা নিন্দা করবে) তাকে কোন সতর্কতা ছাড়াই হত্যা করতে হবে।"

ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, "যদি কেউ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলা ওয়াজিব, এটা আবশ্যক।

মক্কা বিজয়ের পর নবি সা যে কয়জন কাফেরকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নবির ওহী লেখক আব্দুল্লাহ ইবন সাদ ইবন আবি সারাহ যিনি লক্ষ্য করেন যে নবির ওহীর শব্দ ,বাক্য অনেক্ষেত্রেই আবি সারাহর পরামর্শ অনুযায়ী নবি পরিবর্তন করেন। এর ফলে আবি সারাহর মনে নবির নুবুয়ত নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয় এবং তিনি ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান এবং এ কথা কুরাইশদের বলে দেন যে মোহাম্মাদ সা কিছুতেই আল্লাহর নবি হতে পারেন না।

হুদাইবিয়ার চুক্তি

নবির সাথে কুরাইশদের কথিত চুক্তিনামা

পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ হয়, এতে মক্কার কুরাইশরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে অন্যান্য আরব গোত্রের সমন্বয়ে মদিনায় মুসলিমদের উদ্দেশে অভিযান চালায়। তবে নবির প্রখ্যাত পার্সিয়ান সাহাবি সালমান ফারসির পরামর্শে খন্দক খনন করার ফলে মক্কার সৈনিকরা মদিনা আক্রমন করতে পারে নি, তাই প্রায় বিনা যুদ্ধে এই অভিযান সমাপ্ত হয় ও কুরাইশরা মক্কায় ফেরত যায়। যারা কুরাইশ কর্তৃক মুসলমান বাহিনীদের উপর আক্রমনের প্রকৃত কারন সম্পর্কে অবহিত নন, তাদের জ্ঞাতার্থে- এই সব আক্রমনের মুল কারন অর্থনৈতিক। মুসলমানরা নিয়মিত মক্কার বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমন করে লুটতরাজ , হত্যাকাণ্ড, অপহরন করে মুক্তিপন আদায় ইত্যাদি চালাত, যা ছিল মক্কার বাণিজ্য ও হজ্জ নির্ভর অর্থনীতির উপর চরম আঘাত। প্রাক ইসলামিক যুগ থেকেই মক্কা মদিনা সহ আশেপাশের সকল পেগান গোত্রই হজ্জ পালন করত। নবি সা মদিনায় হিজরতের ১৮ মাস পরে ইয়াহুদিদের পবিত্র জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদ থেকে কিবলা কাবার দিকে পরিবর্তন করেন। এর মুল কারণ, নবি সা অনেক চেষ্টা করেও মদিনার ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের কাছে নিজেকে নবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কাজেই পরিবর্তিত কিবলা কাবায় হজ্জ করা নবী সা ও মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এমতাবস্থায়, নবি সা উমরা করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। নবি ভালভাবেই জানতেন সেই পরিস্থিতিতে কুরাইশরা তার দলকে কাবায় প্রবেশে বাধা প্রদান করবে। নবি ৭০ টি কোরবানির জন্য চিহ্নিত পশু (গলায় জুতা ঝুলিয়ে, অনেকটা যেভাবে বর্তমানে কোরবানির গরুর গলায় মালা পরানো হয়) সহ ১৪০০ সঙ্গী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নবির আগমন রুদ্ধ করতে কুরাইশরাও অবস্থান নেয়, যার খবর নবি বেদুইনদের মাধ্যমে জানতে পারেন এবং মক্কায় হুদাইবিয়া নামক স্থানে ঘাঁটি গাড়েন। কুরাইশরাও এই মুসলিম দলের কাবায় প্রবেশ ঠেকাতে অবস্থান নেয়, এমনি একটি অশ্বারোহী দলের নেতৃত্বে ছিলেন খালেদ বিন ওয়ালিদ। বিগত যুদ্ধসমূহতে জান মালের ক্ষয় ক্ষতির কারনে মক্কার কুরাইশরা কোনভাবেই মুসলিম দলকে কাবায় ঢুকতে দিতে রাজি ছিলনা। এই দুই দলের মধ্যে অনেকটা দুতের মাধ্যমে এক ধরনের সমঝোতার চেষ্টা চলতে থাকে। নবি সা এই মর্মে কুরাইশদের খবর পাঠান যে উনি ও উনার দল শুধু হজ্জের উদ্দেশে এসেছেন, যুদ্ধের জন্য আসেননি। পরিশেষে কুরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল বিন আমর এর সাথে নবি মোহাম্মাদ (দঃ) এর বিখ্যাত হুদাইবিয়ার চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

হুদাইবিয়ার চুক্তির শর্ত সমুহঃ

চুক্তির মূল বিষয় হল আগামী ১০ বছরের উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ ও সহিংসতা বন্ধ থাকবে। মুসলমানরা পরের বছর থেকে কাবায় হজ্জ করতে পারবে। হজ্জের সময় তারা ৩ দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে ও খাপবদ্ধ তরবারি বহন করতে পারবে। যে কোন গোত্র ইচ্ছা করলে মোহাম্মাদের সাথে চুক্তি বদ্ধ হতে পারবে অনুরূপ যে কেও কুরাইশদের সাথেও চুক্তি বদ্ধ হতে পারবে। (এসময় বানু খুযায়া নবি মোহাম্মাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন ও বানু বকর কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। (সিরাত ইবন ইসহাক) পরবর্তী বিভিন্ন তাফসীর ও আধুনাকালের বর্ণনায় আরেকটি ধারার সংযোজন দেখা যায় যেখানে উল্লেখ করা হয় যে কুরাইশ বা মুহাম্মদের সাথে চুক্তিবদ্ধ মিত্র গোত্ররা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করলে কুরাইশ বা মুহাম্মদ কারো পক্ষ নিয়ে সাহায্য করবে না। মুল ইবনে ইসহাক ও আল তাবারিতে হুদাইবিয়ার চুক্তির শর্ত সমুহে এই ধারাটির উল্লেখ নাই। বানু খুযায়া ও বানু বকরের মধ্যে সহিংসতাকে চুক্তি ভঙ্গের অজুহাত হিসাবে নবি মোহাম্মাদ (দঃ) পরবর্তীতে মক্কা আক্রমন করেন, তার বৈধতা দিতে গিয়ে, এই ধারাটির উল্লেখ করা হয়।

হুদাইবিয়ার চুক্তির শর্তে নবির বাধ্য হয়ে রাজি হওয়া ও নবির প্রতিশ্রুতি মত কাবাতে হজ্জ না করতে পারায় বহু সাহাবীই ক্ষুব্ধ হন। উমর এই চুক্তির পর মুশরিকদের রক্তকে কুকুরের রক্তের সমতুল্য বলেছেন। উমর রা সরাসরি নবিকে জিজ্ঞাসা করে বসেন যে উনি আসলেই আল্লাহর নবি কিনা? এই চুক্তির সাথে সাথেই নবি হজ্জের নিয়ম অনুযায়ি পশু করবানি ও মস্তক মুণ্ডনের নির্দেশ তিনবার দেওয়া সত্ত্বেও কেওই তা পালন করছিলেন না। পরিশেষে নবি তার তাঁবুতে ঢুকে বিবি উম্মে সালামার কাছে এই অভিযোগ করলে, উনার বিবি নবিকে পরামর্শ দেন যেন উনি নিজেই পশু করবানি ও মস্তক মুণ্ডন করেন তাতে অন্যরা নবিকে অনুসরন করবে। এই বুদ্ধিটি সফল হয়েছিল। হুদাইবিয়ার চুক্তি নিয়ে অসন্তুষ্ট সাহাবাদের অন্তর ঠাণ্ডা করতে বিপুল গনিমতের মাল লাভের লোভ দেখিয়ে সুরা ফাতাহ বা "বিজয়" নাজিল হয়। আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। (সুরা ফাতাহ ৪৮:২০) [সিরাত ইবন ইসহাক, তাফসীর আল তাবারি]

হুবায়বিয়া থেকে ফিরে নবি সা ইয়াহুদি বসতি খাইবার বিনা উস্কানিতে আক্রমন করে বিপুল পরিমান মালে গনিমত লাভ করেন ও বহু ইয়াহুদি হত্যা করেন ও সুন্দরী ইয়াহুদি গোত্র প্রধানের কন্যা সাফিয়াকে বিবাহ করেন, তার স্বামী , পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়দের হত্যা করার পর। তবে, বনু কুরাইযার মত নবি খাইবারের সকল ইয়াহুদিদের হত্যা না করে বরং জিজিয়া করের আওতায় নিয়ে আসেন, এর ফলে **খাইবারের বেঁচে যাওয়া ইয়াহুদিরা তাদের উৎপাদিত খেজুরের ৫০ ভাগ মুসলিমদের জিজিয়া দিতে থাকে।** খাইবারের ইয়াহুদিরা সেঁচের মাধ্যমে কৃষিকাজে পারদর্শী ছিল যে কাজ নবির মুসলিম উম্মতরা (মুলত জিহাদে পারদর্শী) পারবে না বিধায় নবি এই বাবস্থা নেন। তবে নবি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম ছাড়া সকল ধর্মের মানুষকে আরবভুমি থেকে উচ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়ে যান, যার বাস্তবায়নে উমর তার শাসন আমলে খাইবারের অবশিষ্ট ইয়াহুদিদের বিতাড়িত করেন। হুবায়বিয়া চুক্তিতে নাখোশ সাহাবীদের মন রক্ষা করতে খাইবারের মালে গনিমতের ভাগ শুধুমাত্র হুবায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবীরাই পেয়েছিলেন। [সিরাত ইবন ইসহাক, তাফসীর আল তাবারি]

তাফসীরে জালালাইন ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ১১৬

খায়বর কখন বিজিত হয় : নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর দশ দিন মতান্তরে বিশ দিন মদীনায় অবস্থান করত সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে খায়বর আক্রমণ করলেন। আল্লাহ তা'আলার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নবী করীম ﷺ -এর সাথে উক্ত যুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁরাই অংশগ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁর সাথে হুদায়বিয়ায় শরিক ছিলেন।

কথিত চুক্তিভঙ্গের প্রকৃত ঘটনাঃ

ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়ার ১০ বছর মেয়াদি অনাক্রমণ চুক্তি করার মাত্র ২ বছরের কম সময়ের মধ্যে নবি সা অতর্কিত হামলায় মক্কা দখল করে নেন। নবি সা মদিনায় তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের পথে প্রধান বাধা ইহুদী সম্প্রদায় বানু কাইনুকা, বানু নাদিরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ ও বানু কুরাইজা গোত্রের ৯০০ পুরুষ হত্যা করার মাধ্যমে নির্মূল করেন। উপরুন্ত, হুদাইবিয়ার ১০ বছর মেয়াদি অনাক্রমণ চুক্তির ফলে, কুরাইশদেরদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের আশঙ্কা না থাকায়, বিনা বাধায় নবি সা সহজেই খাইবার আক্রমন করে সেখানকার ইহুদী সম্প্রদায়কে হত্যা ও জিজিয়া করের আওতায় নিয়ে আসেন। বলাবাহুল্য, এই সব জিহাদের ফলে নবি ও তার সাহাবিগন বিপুল পরিমান গনিমতের মাল লাভ করেন। এ ছাড়াও হুদাইবিয়ার চুক্তির পর নবি সা এর নির্দেশে তাঁর সাহাবিরা মদিনায় আশেপাশের সকল বসতি ও গোত্রের উপর বহু অভিযান চালান ও ইসলামের তরবাবির আওতায় নিয়ে আসেন (এক দশকেরও বেশি সময় নিয়ে মক্কায় শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচার করে যেখানে মুসলিম ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ছিল কয়েকশত, মদিনা জীবনে তরবারির মাধ্যমে জিহাদ করে অল্প কয়েক বছরে লক্ষাধিক লোক মসলমান হতে বাধ্য হয়। যারা মনে করেন যে এই সকল আক্রমণ,যুদ্ধে ইসলামের কথা শুনে সকলে স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে কলেমা পড়ে যোগ দিয়েছিল, তারা দয়া করে আদি সিরাত যেমন ইবন ইসহাক, আল তাবারি ও ওয়াকিদির কিতাব আল মাঘাযি পড়ে দেখবেন এবং প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবেন)। এই পরিস্থিতিতে নবি সা সামরিক ভাবে মক্কার কুরাইশদের পরাজিত করার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেন। যুদ্ধ ও লুটপাটের মাধ্যমে মালে গনিমত লাভ করা তৎকালীন মুসলিম উম্মার প্রধানতম পেশায় পরিনত হয়েছিল। বস্তুত, হাদিস- কোরানে যতই বেহেস্তের মদের নহর আর স্ফীত স্তনের যৌবনা হুরের লোভ দেখানো হোক না কেন, তৎকালীন মুসলিম উম্মাহ যে গনিমতের মাল ও যুদ্ধবন্দী পরনারী আর দাস-দাসি লাভে বেশী আগ্রহী ছিলেন সেটা নবি সা নিজে খুব ভালো করে জানতেন।

উপরে বর্ণিত সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে, বানু খুযায়া (নবির সাথে মিত্রতার চুক্তিবদ্ধ) ও বানু বকরের (কুরাইশদের সাথে মিত্রতার চুক্তিবদ্ধ) মধ্যে ঘটে যাওয়া সহিংসতাকে চুক্তি ভঙ্গের অজুহাত হিসাবে মক্কা আক্রমনের সুবর্ণ সুযোগ নবি সা এর নিকট চলে আসে। এর ফলে, উনি হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি বাতিল করে মক্কা আক্রমনের সুযোগ পেয়ে যান, একই সঙ্গে এই বাধ্য হয়ে আপোষমূলক চুক্তির অসন্মান থেকে নিজেকে উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে যাওয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যান।

বানু খুযায়া ও বানু বকরের মধ্যে ঘটে যাওয়া সহিংসতার বিবরন

যদিও নবির মিত্র গোত্র বানু খুযায়ার উপর বানু বকরের আক্রমনে কুরাইশদের সহযোগিতার অভিযোগে নবি হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি বাতিল করে মক্কা আক্রমন করেন **তবে এই সহিংসতার সূচনা করে নবির মিত্র গোত্র বানু খুযায়া।** কিন্তু সম্প্রতি লেখা প্রায় সকল তাফসির, অনলাইন ইসলামি লেকচার বা সকল ইসলামিস্ট প্রকৃত সিরাত ভিত্তিক ইতিহাসকে খণ্ডিতভাবে নিজেদের স্বার্থে উপস্থাপন করেন। প্রকৃত বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ

ইসলামপূর্ব তথাকথিত জাহেলিয়াতের সময় থেকেই বানু খুযায়া ও বানু বকরের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এর সূচনা হয় যখন নবির মিত্র গোত্র বানু খুযায়া বানু বকরের সাথে নিরাপত্তার চুক্তিবদ্ধ মালিক বিন আব্বাদ নামের এক ব্যাবসায়ীকে তার বাণিজ্য পথে আক্রমন করে হত্যা করে ও তার মালামাল লুটে নেয়। এর প্রতিশোধে বানু বকর, বানু খুযায়ার একজনকে হত্যা করে এবং এই হত্যার বদলায় বানু খুযায়া,- বানু বকরের আলদিল উপগোত্রের দলপতির তিন পুত্র সালমা, কুলথুম ও

↥

ধুয়াইবকে আরাফায়(হত্যা নিষিদ্ধ পবিত্রভুমিতে) হত্যা করে। এই তিন সন্তান তাদের গোত্রের মান্যগণ্য বলে বিবেচিত ছিলেন। এই হত্যার বিচার বা রক্তপন ইসলাম আসার পর অমীমাংসিত ছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে, বানু বকরের আলদিল উপগোত্রের নেতা নাওফাল বিন মুয়াওয়িয়া, বানু খুযায়াকে রাতের বেলা আক্রমন করে, এই আক্রমনে কিছু কুরাইশ বানু বকরের এই উপগোত্রকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল, এ ছাড়াও কুরাইশদের কয়েকজন রাতের অন্ধকারে সরাসরি আক্রমনে অংশ নিয়েছিলেন এই ভেবে যে তাদের কেও চিনতে পারবে না। **উল্লেখ্য যে মুল কুরাইশ নেতৃত্ব তথা তাদের নেতা আবু সুফিয়ান এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না**। এই যুদ্ধে আলদিল উপগোত্রের নেতা নাওফাল বিন মুয়াওয়িয়া, বানু খুযায়ার বেশ কিছু সদস্যকে পবিত্রভুমিতে আশ্রয় নেওয়ার পরও হত্যা করে। বানু খুযায়া এই খবর মদিনায় নবি সা এর নিকট পৌছে দেয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে হুদাইবিয়ার চুক্তি বাতিল করে মক্কা আক্রমন করা হয়। এখানে মুল বক্তব্য হল নবির মিত্র গোত্র বানু খুযায়া ও কুরাইশদের মিত্র বানু বকরের সহিংসতার শুরু করে বানু খুযায়া এবং এই কোন সঠিক বিচার বা তদন্ত না করেই নবি সা এই ঘটনাটিকে নিজ স্বার্থে বাবহার করেন।

তথ্যসুত্রঃ The History of Al-Tabari, Vol VIII, Chapter: The conquest of Mecca, page 160-163

আবু সুফিয়ান কর্তৃক সমঝোতা প্রস্তাব মোহাম্মাদ (দঃ) এর প্রত্যাখ্যান

বানু খুযায়া ও বানু বকরের ঘটনার সুরাহা ও হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি বহাল রাখার লক্ষ্য নিয়ে আবু সুফিয়ান মদিনায় নবি সা এর নিকট যান তবে এই উদ্যোগে নবি কোন সাড়া দেওয়া তো দুরের উনি আবু সুফিয়ানের সাথে কোন কথাই বলেন নি। আবু সুফিয়ান একে একে নবির প্রধান সাহাবিগন যেমন, আবু বকর, উমর ও আলির কাছে নবির সাথে সমঝোতার জন্য মধ্যস্ততা করার অনুরোধ করে ব্যার্থ হন (সাহাবিদের মধ্যে উমর দুরব্যাবহার করেন), সিরাতে বর্ণনায় এও আছে যে যখন আবু সুফিয়ান আলির বাসায় যান তখন আবু আবু সুফিয়ান নবি কন্যা ফাতেমাকে এই বলে অনুরোধ করেন যেন ফাতেমা শিশু হাসানকে শান্তির মধ্যস্ততা করতে বলেন। ফাতেমা বলেন যে শিশু হাসান সেই বয়সে পৌছাননি আর কেওই নবির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেন না। আবু সুফিয়ান ব্যার্থ হয়ে মক্কায় ফেরত যান। **যেহেতু বানু খুযায়া ও বানু বকরের ঘটনার কুরাইশদের কিছু লোক বিচ্ছিন্নভাবে বানু বকরকে সাহায্য করেছিলেন যার সাথে কুরাইশদের সামগ্রিক নেতৃত্বের কোন সম্পর্ক ছিলনা সেই কারনে আবু সুফিয়ান সহিংসতা পরিহার করার জন্যই শান্তির প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন।** তবে নবি মোহাম্মাদ সা তত দিনে মক্কা দখলের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছিলেন বিধায় তিনি আবু সুফিয়ানের শান্তি প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

আবু সুফিয়ানের এই মদিনা সফরের একটি ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করছি। মদিনায় পৌঁছে আবু সুফিয়ান প্রথমে তার কন্যা, নবির স্ত্রীদের একজন উম্মে হাবিবার বাসায় যান, যখন পিতা আবু সুফিয়ান কন্যা উম্মে হাবিবার খাটে বসতে যান, উম্মে হাবিবা বিছানার চাদর গুটিয়ে নেন। এতে আশ্চর্য হয়ে আবু সুফিয়ান বলেন " তুমি কি এই জন্য চাদর গুটিয়ে নিচ্ছ যে চাদরটি আমার উপযুক্ত নয় নাকি আমি চাদরটি র উপযুক্ত নই" । কন্যা উম্মে হাবিবা এই বলে পিতাকে উত্তর দেন যে উনি একজন অপবিত্র মুশরিক আর এই চাদরে নবি সা শয্যা গ্রহন করেন। এই উত্তরে পিতা আবু সুফিয়ান ব্যাথিত হয়ে বলেন "হে আমার কন্যা, আল্লাহর দোহাই (মক্কার কাফিরদের কাছেও আল্লাহ প্রধান দেবতা ছিলেন) আমাদের ত্যাগ করার পর তোমার উপর অশুভ ভর করেছে"। যদিও অপ্রাসঙ্গিক, এটি উল্লেখ করার কারন, নিজের নিকট আত্মীয় এমনকি রক্তের সম্পর্কের হলেও মুসলিম না হলে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা ইসলামের বিধান ও শুধুমাত্র ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যের কারনে পিতা ও কন্যার সম্পর্কের ভিতরেও কি বিপুল পরিমান ঘৃণা করাকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে বিধান করা হয়েছে – সেটা উল্লেখ করা। এই ধারাটি জিহাদিদের পরিভাষায় মিল্লাতে ইব্রাহিম বলা হয়। এই সংক্রান্ত আয়াতগুলো নিম্নরূপঃ

আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সুরা তাওবা ৯:১১৪)

নবি সা কর্তৃক প্রথমে হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ

হুদাইবিয়ার চুক্তির একটি শর্ত হল কেও যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কুরাইশদের মধ্য থেকে মুহাম্মদের দলে যোগ দেয়, তবে তাকে তার পরিবারের কাছে ফেরত পাঠাবে। তবে মুহাম্মদের দল থেকে কেও কুরাইশদের কাছে ফেরত গেলে তাকে মুহাম্মদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে না। বানু খুযায়া ও বানু বকরের ঘটনার বহু আগেই নবি হুদাইবিয়ার চুক্তির বর্ণিত শর্তটি ভঙ্গ করেন যার বর্ণনা আপনার কোরানের আল মুমতাহিনা সুরায় পেয়ে যাবেন।

মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা

দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান। (সুরা মুমতাহিনা ৬০:১০)

নবি মোহাম্মাদ সা হুদাইবিয়ার চুক্তির বরখেলাপ করে ইসলাম গ্রহণকারী মুমিনা নারিদের মক্কায় তার স্বামী বা অভিভাবকদের কাছে ফেরত পাঠান নি। উপরুন্তু তিনি এই সব নারিদের কাফের স্বামীর সাথে বিবাহ বাতিল করে দিয়েছেন এমনকি যেসব হিজরত করা সাহাবি নবির সাথে মদিনায় ছিলেন তাদের মক্কায় অবস্থানরত কাফের স্ত্রীদেরও হারাম করে দেন, **এর ভিত্তিতে উমর রা মক্কায় তার দুই কাফের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেন**। নবি সা কর্তৃক হুদাইবিয়ার চুক্তির এই শর্ত ভঙ্গের দুটি অজুহাত বর্তমানে অনেক লেখায় পাওয়া যায়, যা অত্যন্ত হাস্যকর, যুক্তিটির বর্ণনায় জাকির নায়েকের দাহাহা মানে উটপাখির ডিম এই জাতীয় শব্দের খেলা খেলে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে শর্তের "কোন ব্যাক্তি" আরবিতে শুধুমাত্র পুরুষবাচক বুঝায় ইত্যাদি মনগড়া ব্যকরণ।

উপরে বর্ণিত নারীদের বেলায় চুক্তি ভঙ্গের পূর্বে আবু বশির নামের আরেকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় নবির দলে যোগ দিতে আসে। তবে এই ঘটনায় নবি চুক্তি মোতাবেক আবু বশিরকে নিতে আসা মক্কার দুইজনের কাছে হস্তান্তর করেন। তবে পথিমধ্যে আবু বশির এই দুই মক্কাবাসীর একজনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার তরবারির ধার পরীক্ষা করার কথা বলে সেই তরবারির আঘাতে হত্যা করে। নিহতের সঙ্গী আবু বশিরের থেকে পালিয়ে মদিনায় নবির কাছে এই ঘটনা জানায়। ইতোমধ্যে আবু বশির মৃত মক্কাবাসির মালামাল লুট করে মালের এক পঞ্চমাংশ নবিকে দেওয়ার জন্য হাজির হয় (ইসলামের বিধান অনুযায়ী সকল গনিমতের মালের পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর নবির প্রাপ্য, যেহেতু আল্লাহ নিজে কোন মাল গ্রহন করেননা, তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে নবি সেই মালে গনিমতের অংশ নিয়ে থাকেন – সুরা আনফাল দ্রষ্টব্য)। তবে এই ক্ষেত্রে নবি সা এই খুনের কোন বিচার করেন নি। মক্কায় সোহাইল বিন আমর যখন তার গোত্রের মক্কাবাসির হত্যাকাণ্ড জানতে পারেন, তখন এই হত্যার রক্তপনের জন্য কুরাইশ নেতাদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। **কিন্তু কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান এই ঘটনায় নবি মোহাম্মাদকে দায় মুক্তি দেন ও আবু বাশির মুসলিম হলেও রক্তপনের দায় নবি সা এর উপর বর্তায় না বলে রায় দেন।**
আবু বশির আল-ইস নামের এক স্থানে আশ্রয় গ্রহন করে যা ছিল মক্কা থেকে সিরিয়ার বাণিজ্য পথের মধ্যে। এই স্থানে আবু বশির মক্কা থেকে পালিয়ে আসা আরও ৭০ জন মুসলিমদের নিয়ে এক ডাকাত দল গঠন করে আর নিয়মিত মক্কার বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমন চালিয়ে ব্যাপক খুন খারাবি ও লুটতরাজ করতে থাকে। এই কাজে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কাবাসি নবিকে এই ডাকাত দলকে মদিনায় ফেরত নিতে বলেন।
তথ্যসূত্রঃ Al-Waqidi's Kitab Al-Maghazi, Page 10327-10399

উপরের বর্ণিত ইসলাম গ্রহণ করা আবু বশিরের ঘটনার সাথে বানু খুযায়া ও বানু বকরের ঘটনার তুলনা করলে দেখা যায়, একই রকম ঘটনায় কুরাইশরা নবির বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ তোলেন নি, যেখানে নবি সা বানু খুযায়া ও বানু বকরের ঘটনায় গুটিকয়েক কুরাইশদের যুক্ত থাকার অভিযোগে হুদাইবিয়ার চুক্তি ভেঙ্গে মক্কা আক্রমন করেন এমনকি এই বিষয়ে নবি আবু সুফিয়ানের সমঝোতা প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। যেখানে আবু বশিরের ঘটনা ছাড়াও নবিই প্রথম হুদাইবিয়ার চুক্তির বরখেলাপ করেছেন মক্কা থেকে পালিয়ে আসা নারিদের তাদের স্বামী বা অভিভাবকের কাছে ফেরত না দিয়ে।

ইসলামী অ্যাাপলজিস্টগণ ঢালাওভাবে কাফের বা ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে কথিত চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে তাদেরকে গণহারে জবাই করার যে অদ্ভুত বৈধতা দিয়ে থাকেন তার একটি বস্তুনিষ্ঠ জবাব দেয়ার জন্য এই চুক্তি ও চুক্তিভঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করা জরুরি ছিল। প্রায় একই উপায়ে ইসলামী অ্যাাপলজিস্টগন বানু কুরাইজার ৯০০ এর অধিক সাবালক পুরুষকে একদিনে জবাই করার বৈধতা দিয়ে থাকেন।

তওবার আয়াতকে মানবিক ও যৌক্তিক প্রমান করতে বর্তমান যুগের ইসলামিস্টদের নির্লজ্জ মিথ্যাচারঃ

১। তরবারির আয়াতটি যুদ্ধকালিন আয়াত কাজেই "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও" এটিকে যুদ্ধের প্রেক্ষিতে না দেখে ইসলাম বিরোধীরা এটির ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। বিভিন্ন বক্তা এটি বর্ণনা করতে গিয়ে এও বলেন যে " যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করবে নাকি শত্রুকে আদর-সোহাগ করবে? এটি বলার সাথে উনারা আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্র যে যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে হত্যা এই উদাহরন দিয়ে বিপুল করতালি অর্জন করেন।
তরবারির আয়াতটি যে মোটেও যুদ্ধকালিন নয় এবং মক্কা সম্পূর্ণ নবির দখলে ও শান্তিপূর্ণ থাকা অবস্থায় অযুদ্ধরত কাফের-মুশরিকদের প্রতি এক তরফা ঘোষণা, তা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আর যে কথাটি জাকির নায়েক সাহেবরা আপনাদের বলেন না বা কথার মার প্যাচে আপনারা ভাবেন না, সেটা হল- যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমরসজ্জায় সজ্জিত দুটি পক্ষ থাকে। সুরা তাওবার কাফের- মুশরিকরা কি নবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল? না তারা ঢাল তলোয়ার নিয়ে অবস্থান নিয়ে ছিল? তৎকালীন মক্কার কাফেররা নবি কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর কোন বিদ্রোহ – আন্দোলন করেছিল এমন কোন ঘটনাও জানা যায় না। এই সকল ইসলামবাজদের ক্রমাগত মিথ্যাচারের ফলে কোন সাধারন মুসলমানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করা।

অন্যান্য যে সব দাবি করা হয়, সে গুলো একত্র করলে মোটামুটি নীচে বর্ণিত বিষয়গুলোর মধ্যে পড়ে।

২। "তরবারির আয়াতের হত্যার বিধান শুধুমাত্র হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য"।
এটিও সর্বইব মিথ্যা যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মুল কথা হল কারো সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকুক বা না থাকুক, দুইটি গোত্র বাদে সকল কাফের- মুশরিকদের ৪ মাসের আল্টিমেটাম বেঁধে দেওয়া হয়। তবে বনু কিনানার দুটি গোত্র বনু যমারা ও বনু মুদলাজকে তাদের সাথে করা চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া হয় (৯ মাস চুক্তির মেয়াদ বাকি ছিল), যেহেতু তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধ কোন গোত্রকে সাহায্য করে নি। তবে এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে এরাও তরবারির আয়াতের হত্যার বিধানের আওতায় চলে আসবে। সকল কাফের- মুশরিকরাই এক সময়ে এই তরবারির আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর বাস্তব প্রমান এই যে নবির জীবদ্দশায়ই আরব উপদ্বীপে আর কোন কাফের-মুশরিক (পেগান ধর্মের) অবশিষ্ট ছিল না। আর বহুল উচ্চারিত তথাকথিত চুক্তি ভঙ্গের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে প্রথম চুক্তি ভঙ্গকারী স্বয়ং নবি নিজে, সেটাও আলোচনা করা হয়েছে। উপরুন্তু, কাফের- মুশরিকদের চুক্তি ভঙ্গকারী হিসাবে ধরে নিলেও কোন চুক্তি ভঙ্গ করলেই যে ঐ পুরো জাতি-গোষ্ঠীকে নির্বিচারে হত্যা যাদের কাছে বৈধ/জাস্টিফাইড- তারা হিংস্র-বর্বর-অসভ্য মরুদস্যু ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৩। সুরা তওবার ৬ নং আয়াতকে অনেকেই ৫ নং আয়াতের হত্যার হুমকির বিপরীতে যুক্তি হিসাবে পেশ করে থাকেন। "আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।" (সুরা তাওবা ৯:৬)

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই ৬ নং আয়াত নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের একটি পূর্বশর্ত বা কৌশল মাত্র। এটি কোন কাফির মুশরিকদের ধর্ম পালনের অধিকারের ঘোষণা নয় যে, আশ্রয় প্রার্থনা করলে বিনা বাধায় নিজ ধর্ম পালন করতে দেওয়া হবে। এই আশ্রয় দেওয়াটি শর্তহীনও নয়। এখানে শর্ত হল- আল্লাহর কালাম শুনে যাতে সে বা তার গোত্রের লোকেরা ইসলাম ও তার নবি মোহাম্মাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় অথবা ইসলাম গ্রহন করার সুবিধা আর গ্রহন না করলে কি অসুবিধা এই খবর তার নিজ গোত্রের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, শুধুমাত্র এই শর্তেই কোন মুশরিক মুসলিমদের কাছে আশ্রয় চাইতে পারে।
তরবারির আয়াতের আওতায় ৪ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মুশরিকদের হাতে তিনটি রাস্তা খোলা থাকে- হয় ইসলাম গ্রহণ অথবা আরবভুমি ত্যাগ করে চলে যাওয়া অথবা নিজ ধর্মে বহাল থেকে মুসলিমদের হাতে নিহত বা বন্দি হওয়া, এই ক্ষেত্রে নবি তথা মুসলমানদের কোন বিরোধিতা না করে ঘরে লুকিয়ে থাকলেও রক্ষা নেই কারন তরবারির আয়াতে বলা আছে "তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক।" অর্থাৎ কোন ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ না নিলেও কাফির মুশরিকদের পাড়া মহল্লায় খুঁজে বের করে হত্যা করা হবে।

যদিও তরবারির আয়াতটি সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজমান অবস্থায় নবি মোহাম্মাদের (দঃ) নিয়ন্ত্রনে থাকা মক্কার অযুদ্ধরত কাফির মুশরিকদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তথাপি অসৎ মডারেট ইসলামিস্টগন এই ৬ নং আয়াতে আল্লাহর কালাম শোনার পর কাফির মুশরিকদের নিরাপদ স্থানে পৌছে দেওয়ার বিধানকে- যুদ্ধকালিন তুলনাহীন ইসলামি দয়ার উদাহরন হিসাবে পেশ করে থাকেন। তবে ইতিহাসে বা সমসাময়িক বহু যুদ্ধে প্রতিপক্ষের প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করলে সাধারন ক্ষমা ঘোষণা করার উদাহরন প্রচুর এবং রক্তপাত এড়াতে প্রায় সকল যুদ্ধেই প্রথমে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়, কাজেই ৬ নং আয়াতের বিধানকে যুদ্ধের বিধান হিসাবে ধরে নিলেও, এটি মোটেও নজিরবিহীন কোন ঘটনা নয়। ১৯৭১ সালে আত্মসমর্পণ করা প্রায় ৯০,০০০ পাকিস্তানী সেনাদের নিরাপদেই তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল কোন শর্ত আরোপ ছাড়াই। ৬ নং আয়াতের তাফসির নিচে উল্লেখ করা হল।

বিখ্যাত মালেকি স্কলার আস সাউই তার তাফসির গ্রন্থ হাসিয়াত আল সাউই আলা আল- জালালাইনে বলেছেন, কোন কাফির মুশরিক আল্লাহর কালাম শোনার পরও যদি ইসলাম গ্রহন না করে তবে তাকে নিজ গোত্রের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ হবে এবং তাকে যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও সে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেনি, এটা তার বিরুদ্ধে প্রমান স্বরূপ ব্যবহার করা যাবে।

↥

সারকথা ৬ নং আয়াতের যে শর্তসাপেক্ষ আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে তা কোন ভাবেই তার পূর্ববর্তী তরবারির আয়াতের কতল করার বিধানকে বাতিল করে না। কোন তাফসিরকারকও এ কথা **বলেননি। ৬ নং আয়াতের বিধানটিকে এই অর্থে কাফির মুশরিকদের জন্য কিছুটা ছাড় হিসাবে ধরা যেতে পারে যে, কোন কাফির মুশরিকের মনে যদি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসা থাকে তবে তাকে সেটি জানার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।** এর ফলে ইসলাম গ্রহন করলে সে কি সুবিধা পাবে আর না গ্রহন করলে তার ও তার গোত্র বা পরিবারের ভাগ্যে কি আছে এটা জেনে সেই কাফির মুশরিক ও তাদের গোত্র একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবে। এই সুযোগ রাখার ফলে আরও বেশি বেশি গোত্র ইসলাম ও তার নবির ঘোষণা সম্বন্ধে জানতে পারবে ও হয় ইসলাম গ্রহন করবে অথবা বর্জন করে এর ফলাফল ভোগ করবে।

৪। চতুর্থ এই যুক্তিটি মুল ধারার ইসলামি বক্তারা সাধারণত করেন না, যেহেতু এটি নবি সা এর করে যাওয়া উদাহরনের বিপরীত। এই যুক্তিটি আমি শুধুমাত্র ইয়াসির কাদিরের(বর্তমান যুগের মডারেট ইসলামিস্ট) বক্তব্যে পেয়েছি। যুক্তিটি হল, তরবারির আয়াতটি শুধুমাত্র তৎকালীন মক্কার মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য। এই যুক্তির সমস্যা হল এতে কোরআনের আয়াতকে কালের ও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য বেঁধে ফেলা, এতে কোরানের সার্বজনীনতা খর্ব করা হয়। অর্থাৎ কোরানের আয়াত তথা বিধি-বিধান সর্বকালের সকলের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। নবি সা তার জীবনকালে জয় করা সকল অঞ্চলেই কাফের মুশরিকদের হয় কতল করেছেন অথবা তারা বাধ্য হয়ে অথবা নিজ স্বার্থে ইসলাম গ্রহন করেছে। নবি সা শুধুমাত্র আহলে কিতাব বা ইয়াহুদি-নাসারাদের থেকে জিজিয়া নিয়েছেন। পারস্য বিজয়ের পর উমর অগ্নি উপাসক যা জরথ্রুস্ত্রদেরও জিজিয়ার আওতায় নিয়ে আসেন।

যদিও তরবারির আয়াতটি কোন যুদ্ধের বা যুদ্ধকালিন আয়াত নয় তবুও তর্কের খাতিরে সেরকম ধরে নিলেও এই আয়াতের বর্বরতার ও স্বেচ্ছাচারিতার কোন কমতি করা দুষ্কর। যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমনের কিছু সুনির্দিষ্ট কারন উল্লেখ করা হয় যার মধ্যে প্রধানতম হল অপরপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বা তার আশঙ্কা দেখা দেওয়া। মক্কা বিজয়ের পর তারই শাসনাধীন মক্কার কাফির- মুশরিকরা নবির বিরুদ্ধে কোন আক্রমন,অস্ত্রধারন, সৈন্য সমাবেশ কিছুই করেনি, তারা তাদের যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করা পৌত্তলিক ধর্ম পালন করে আসছিল, অন্য কারও ধর্ম পালনে বাধা না দিয়ে। তাদের উপর তরবারির আয়াত নেমে আসার একমাত্র কারন হিসাবে সুরা তওবায় উল্লেখিত হয়েছে ইসলাম ধর্ম গ্রহন না করা। এমনকি যে কাবা শরীফে তারা ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের বহু আগে থেকেই যে হজ্জ পালন করে আসছিল সেই ধর্ম পালনের অধিকারটিও হরন করা হয়। এর কারন হিসাবে সুরা তওবার ২৮ নং আয়াতে কাফির- মুশরিকদের অপবিত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবনে আব্বাসের মত প্রধান সাহাবী ও সবচেয়ে বেশী কোরানের জ্ঞান সম্পন্ন তাফসীরকারী মুশরিকদের কুকুরের চেয়ে অপবিত্র বলেছেন, যা ইবনে কাসীরের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশ্বের শতকরা নব্বই ভাগ তথাকথিত “মোডারেট মুসলিম” হয়ত তরবাবির আয়াতের প্রকৃত সত্য জানেন না অথবা জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। যারা এই তরবাবির আয়াতটি ১৪০০ বছর আগের সালাফদের অনুসরণ করে বর্তমান দুনিয়ায় প্রয়োগ করেন সেই সব আইসিস, আল কায়েদা, বকো হারাম, আন্সারুল্লাহদের জেহাদি কর্মকাণ্ড এই সব “মোডারেট মুসলিম”দের বিচলিত করে না, কারন উনারা হাদিস- কোরান না পড়েই সব জেনে গেছেন তাই সহজেই এই জেহাদিদের হাতে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষের প্রানহানিতেও তাঁরা বিজ্ঞের মত বলতে পারেন “ এরা সহি মুসলিম নয়, ইসলাম সন্ত্রাস সমর্থন করে না” আর কেও যদি কষ্ট করে ইসলামি জ্ঞান লাভ করতে চান – চিন্তা নেই, সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন হযরত জাকির নায়েকের মুখে। ইসলামের গোলমেলে যে কোন বিষয়কে রসগোল্লা বানিয়ে খাইয়ে দেবেন এই জাকির নায়েক, আহমাদুল্লাহ সাহেবরা, আর তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে “মোডারেট মুসলিম” ভাই-বোনেরা তার নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে আত্মতৃপ্তি নিয়ে ঘুমুতে যাবেন আর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে যাবেন এই তরবারির আয়াতের জল্লাদদের।

কুরআনের অসঙ্গতিসমূহ

আল্লাহ ওরফে মোহাম্মদের লুঙ্গি বাঁচানোর চেষ্টা নীতিঃ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে কুরআন বিরোধী আউল নীতি **তথা ফাউল নীতি**

আসুন প্রথমে কোরআনে কি আছে দেখে নিই,

সূরা নিসা আয়াত **১১-১২**: আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, ১ ছেলের জন্য ২ মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার ২/৩; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতাপিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ১/৬ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতাপিতা তখন তার মাতার জন্য ১/৩। আর যদি তার ভাইবোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ১/৬। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য ১/৪। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে ১/৪, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য ১/৮। আর যদি মাতাপিতা এবং সন্তান নাই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ১/৬। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই ১/৩ এর মধ্যে সমঅংশীদার হবে।

কোন **মৃত পুরুষের সম্পত্তি তার তিন কন্যা, বাবা-মা এবং স্ত্রীর মধ্যে কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী ভাগ করে দেয়া যায় না**।
উদাহরণস্বরূপ- কোন মৃত পুরুষের যদি ৭২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাকে, তাহলে তার সম্পত্তি তার জীবিত তিন কন্যা বাবা-মা এবং স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া যায় না।
যদি আপনি তাদের মধ্যে কুরআন অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ করেন তাহলে এমন হবে,

- তিন কন্যা পাবে = ২/৩ বা ১৬/২৪ অংশ
- বাবা পাবে= ১/৬ বা ৪/২৪ অংশ
- মা পাবে= ১/৬ বা ৪/২৪ অংশ
- স্ত্রী পাবে= ১/৮ বা ৩/২৪ অংশ
- তাদের সম্পত্তির যোগফল= ১৬/২৪ + ৪/২৪ + ৪/২৪ + ৩/২৪ = ২৭/২৪ অংশ।
- কিন্তু সর্বোচ্চ সম্পত্তি যেখানে ২৪ অংশ সেখানে ২৭ অংশ দেবেন কি করে ?!

কোন কিছু ভাগ করার সময় ভগ্নাংশগুলোর যোগফল সর্বদাই ১ হতে হবে। এর এর কম বা বেশি হওয়া যাবে না। কারণ সম্পূর্ণ সম্পত্তিকেই এক হিসেবে ধরে ভাগ করা হয়। এগুলো স্কুলজীবনেই মানুষ পাটিগণিত করলে শিখে যায়।

এরকম গাণিতিক ভুল সামান্য গণিত না জানা আল্লাহ ওরফে মুহাম্মদ করে রেখে গেছে অথচ আপনি এতদিন জানতেন ই না !
নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর সাহাবীরা নবীর এ নিয়মে সম্পত্তি বন্টন করতে যেয়ে এই ভয়াবহ ভুল খেয়াল করেন। এ নিয়ে তারা প্রচন্ড বিব্রতবোধ করেন। এবং এরকম স্পষ্ট ভুল ও সমস্যা ধামাচাপা দেয়ার জন্য তারা তড়িঘড়ি করে একটা গোঁজামিল পদ্ধতি বের করেন, যার নাম দেন তারা আউল নীতি। এই আউল নীতি অনুসরণ করলে কোরআনের আয়াত সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় না। আবার, ইবনে আব্বাস আরেকটি পদ্ধতিতে সম্পত্তি ভাগ করতে বলতেন, যেটি কোরআনের নিয়ম অনুসরণ করে বটে, কিন্তু সেখানে যেই সমস্যাটি হয়, তা হচ্ছে পরে আর সম্পত্তির কোন অংশ থাকে না। শেষের দিকে যারা থাকেন, তারা আর কোন অংশ পান না।
এ গোঁজামিল আউল পদ্ধতিতে কুরআনে বর্ণিত সম্পত্তি বন্টনের ভগ্নাংশগুলোর লবকে হরে পরিণত করে তারা কুরআনের অবমাননা করতে বাধ্য হন। এবং সকল উত্তরাধিকারীকে কুরআনের নির্ধারিত সম্পত্তির অংশ থেকে কম পরিমাণ সম্পত্তি দেওয়া হয়।
অর্থাৎ এ নিয়মে ২৭/২৪ এর লব ২৭ কে হরে পরিণত করা হয় এবং প্রত্যেক উত্তরাধিকারীকে তাদের পূর্বের প্রাপ্য লব লব অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ করে দেয়া হয়।
এর ফলে ফাউল এ পদ্ধতিতে সম্পত্তি এভাবে ভাগ করা হয়:

৩ কন্যা পাবে= ১৬/২৭ অংশ,, বাবা পাবে= ৪/২৭ অংশ
মা পাবে= ৪/২৭ অংশ, স্ত্রী পাবে= ৩/২৭ অংশ

ফাউল এই আউল পদ্ধতি দিয়ে যেকোনো ভুল ও মূর্খতাকে সংশোধন করা সম্ভব। যেমন সামান্য গণিত না জানা কোন পুরুষ মারা যাওয়ার আগে যদি তার সম্পত্তি তার জীবিত তিন কন্যা, বাবা-মা এবং স্ত্রীর মধ্যে এমন ভাবে ভাগ করে দেয় যে,

তার-

তিন কন্যা পাবে তার সম্পত্তির ৪/৫ অংশ,

বাবা পাবে তার সম্পত্তির ৩/৫ অংশ,

মা পাবে তার সম্পত্তির ৩/৫ অংশ,

স্ত্রী পাবে তার সম্পত্তির ২/৫ অংশ......

তাহলে ঐ পুরুষকে মুর্খ বা পাগল ছাড়া আপনি আর কি বলবেন ?!

কারণ তার নিয়মে এই ভাগ করে দেয়া সম্পত্তির অংশগুলো যোগফল= ৪/৫ + ৩/৫ + ৩/৫ + ২/৫ = ১২/৫ অংশ !

কিন্তু, এখন ফাউল ঐ আউল পদ্ধতিতে লব উল্টিয়ে দিয়ে এটাকেও ভাগ করে দেয়া সম্ভব! যেমন:

৪/১২ + ৩/১২ + ৩/১২ + ২/১২ = ১২/১২ অংশ।

এভাবে যেকোনো অশিক্ষিত মূর্খ বা পাগলের হিসাবকে ফাউল এই আউল পদ্ধতি দিয়ে গোঁজামিল দিয়ে মিলিয়ে দেয়া যাবে। **তাতে করে কি সেই মূর্খের ভুল হিসাবের নিয়ম ঠিক হয়ে গেল ?!** কখনোই না। যদি না আপনার মাথায় মাথায় ব্রেনের যায়গায় অন্য কিছু না থেকে থাকে।।

যদি এই মহাবিশ্বে কোনো সৃষ্টিকর্তা থেকেই থাকে, তবে যেহেতু কোনো ভুল করতে পারেন না, সেহেতু এই সামান্য গণিতের জ্ঞান না থাকায় যে এত বড় ভুল করে বসে আছে, তাকে আপনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কল্পনা করে বসে আছেন, আপনার ব্রেইন কি তাহলে পরাজিত আপনার অন্ধভক্তি, অন্ধবিশ্বাসের কাছে ?

যাদের কাছে অংশ দিয়ে হিসাবটা এখনো ক্লিয়ার হয়নি, তাদের বোঝার সুবিধার জন্য উদাহরণটি টাকার মাধ্যমে নিচে দেয়া হলো-

ধরেন, আপনার প্রতিবেশী জনাব আবুল মিয়ার পরিবারে রয়েছে তার বৃদ্ধ পিতা মাতা, তার স্ত্রী, এবং তিন কন্যা। আবুল মিয়া মারা গেলেন, এবং উনার সম্পত্তি কোরআনের উপরের আয়াত মোতাবেক ভাগ বাটোয়ারা করা হবে। হিসেব করার সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি আবুল মিয়া ১০০ টাকার সম্পত্তি রেখে গেছেন। এখন ভাগ বাটোয়ারা কীভাবে করবো?

১।" মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের সন্তান থাকে।"

- এই আয়াত অনুসারে যেহেতু মৃতের সন্তান আছে, তাই তার বৃদ্ধ পিতামাতা প্রত্যেকে পাবেন ছয় ভাগের এক ভাগ করে। অর্থাৎ এক একজন পাবেন (১০০÷৬ = ১৬.৬৬) টাকা করে। দুইজন মিলে পাবেন ১৬.৬৬×২ = ৩৩.৩৩ টাকা।

২। "একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু`এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক।"

- এবারে আসুন তার তিন কন্যা কতটুকু সম্পত্তি পাবে তার হিসেবে। উপরের আয়াত থেকে বোঝা যায়, আবুল সাহেবের তিন কন্যা পাবে মালের তিনভাগের দুই ভাগ। অর্থাৎ (১০০× ২/৩ = ৬৬.৬৭) টাকা।

৩।" স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ।"

- এবারে মৃত আবুল মিয়ার স্ত্রীর হিসেব। উপরের আয়াত মোতাবেক তিনি পাবেন আট ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ (১০০÷৮ = ১২.৫০) টাকা।

এভাবে আসুন হিসেব করি। আবুল সাহেব মোট ১০০ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে কোরআনের এই নিয়ম অনুসারে

যারা পাবেন	যত পাবেন
পিতামাতা	৩৩.৩৩ টাকা
তিন কন্যা	৬৬.৬৭ টাকা
স্ত্রী	১২.৫০ টাকা
মোট	**৩৩.৩৩ + ৬৬.৬৭ + ১২.৫০ = ১১২.৫০ টাকা**

কিন্তু টাকাগুলো ভাগ করে দেয়ার সময় দেখা যাছে, ১২.৫০ টাকা কম হয়ে যাচ্ছে। মোট টাকা আছে ১০০, অথচ সবাইকে দিতে হবে ১১২.৫০। এই বাড়তি ১২.৫০ টাকা কোথা থেকে আসবে? আল্লাহ পাক নাজিল করবেন?

মুহাম্মদ সামান্য গণিত পারলে আজ এভাবে তাকে এক্সপোজ হতে হতোনা ! মিরাজের গল্পে সে বিজোড় সংখ্যার সামান্য গনিতেও তালগোল পাকায়ে ভুল করে ফেলছে:

৫০ ওয়াক্তের অর্ধেক হচ্ছে ২৫। এর অর্ধেক হচ্ছে ১২.৫। কিন্তু এভাবে নামাজ আদায় করা তো অসম্ভব। কেউ কি ১২.৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে? তাহলে আল্লাহ কোন আক্কেলে এরকম সংখ্যক নামাজের বিধান দিয়েছিলেন? আল্লাহই যে নবী মুহাম্মদের ফেইক আইডি, যারা এখন জানেন না তাদের এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে- নবী না হয় মূর্খ ছিলেন, গণিত শেখেননি। কিন্তু আল্লাহ এরকম ভুল কীভাবে করলেন? আমার এই পিডিএফটা যদি আপনি পুরোটা পড়ে থাকেন তাহলে সব ধরনের প্রশ্ন,কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যাইহোক, আসুন হাদিসটি পড়ি

সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ৩৩৪২।

> ইবনু হাযম (রহ.) এবং আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তখন আল্লাহ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। অতঃপর আমি এ নির্দেশ নিয়ে ফিরে আসলাম। যখন মূসা (আঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রব আপনার উম্মাত উপর কী ফরজ করেছেন? আমি বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছে। তিনি বললেন, পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মাতের তা পালন করার সামর্থ্য রাখে না। তখন ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার জন্য আবেদন করলাম। তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে পুনরায় কমাবার আবেদন করুন এবং তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্বের অনুরূপ কথা আবার উল্লেখ করলেন। এবার তিনি (আল্লাহ) তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তিনি পূর্বের মত বললেন। আমি তা করলাম। তখন আল্লাহ তার এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি পুনরায় মূসা (আঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আরো কমাবার আরয করুন। কেননা আপনার উম্মাতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাকী রইল। আর তা সাওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি এবারও বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আবেদন করুন। আমি বললাম, এবার আমার রবের সম্মুখীন হতে আমি লজ্জাবোধ করছি। এবার জিবরাঈল (আঃ) চললেন এবং অবশেষে আমাকে সাথে নিয়ে সিদ্রাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখলাম তা এমন চমৎকার রঙে পরিপূর্ণ যা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হল। দেখলাম এর ইট মোতির তৈরী আর এর মাটি মিসক বা কস্তুরীর মত সুগন্ধময়। (৩৪৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩০৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩১০৩)
> হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
> বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

পরের অংশে যাওয়ার আগে, যারা জানেন না, তাদের অবগত করার জন্য একটি বিষয় উল্লেখ করাটা জরুরি।

[**"বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদে ব্রাকেটে শুধুমাত্র এতটুকু সংযুক্ত করা যায়েজ যে-** যদি কার বা কি বিষয়ে আগে থেকে কথা হচ্ছে_ যেমনঃ তিনি(মুসা) বললেন, কিন্তু সে(ফিরআউন) বলেছিল, আর সেটি(লাঠি) সাপ হয়ে গেল, যখন তারা(মুশরিকরা) নিহত হলো, আর তিনি(আল্লাহ) মুশরিকদের ক্ষমা করেননা, কিন্তু সেটি(সূর্য)ও অস্ত গেল,.........এরকম হুবহু ঐ একই বিষয়টি নির্দেশক/সমার্থক শব্দ_ পাঠকের বুঝার সুবিধার জন্য। **এর বাইরে কুরআনে যে শব্দ নেই তা যদি ব্রাকেটেও সংযুক্ত করা হয় তবে সেটাকে যদি কেউ কুরআনের অনুবাদ বলে দাবী করে- তবে সে কুরআনকে অপূর্ণাংগ হিসেবে আখ্যায়িত করা এবং কুরআন জাল করার মতো ভয়াবহ গুনাহের সামিল হবে**।"। - আল্লামা ইবনে কাসীর (র)।

তাই কোনো অনুবাদক যদি এরকম গর্হিত কাজ করে- তবে সেই গুনাহের দায় শুধু তার উপরই বর্তাবে, এবং অবশ্যই ইসলামে তার এই অনুবাদের অংশটুকু কুরআনের হুবহু অনুবাদ হিসাবে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবেনা।__ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ {গ্র্যান্ড মুফতি, সৌদি আরব}]

কুরআনের ভুল এবং অসংগতিসমূহের আরো একটি সামান্য তালিকা

[যারা শুরুতেই এই শিরোনাম থেকে পড়া শুরু করেছেন, বা যারা আগের সবগুলো অধ্যায় পুরোটা এখনো পড়েননি_ সেইসব পাঠকের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এই বিষয়ের অর্ধেকের বেশিরভাগ অংশ –'ইসলাম এবং বিজ্ঞান' অধ্যায়ে এবং অন্যান্য অধ্যায়েও কিছু অংশ রয়েছে। আর কিছু এখানে দেওয়া হচ্ছে.......]

- আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছি। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের আযাব। কোরআন ৬৭/৫।
- নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং **চারদিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।** কোরআন ৩৭/৬-১০

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)
৪৬০০। রাসূল সা বলেন, ... অনেক সময় এমন হয় যে, ঐ কথাটি পৌঁছার পূর্বেই তা তাদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়। আবার কখনো তারকা নিক্ষেপ হওয়ার পূর্বেই তা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে যায়।

https://sunnah.com/muslim:2229a।
নবী সাল্লাল্লাহু আ এর সাহাবীগণ এক রাতে নবী সা এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একটি তারকা নিক্ষিপ্ত হল, এবং তা জ্বলে উঠল। রাসূল সা বললেন, আসমানসমূহের বাসিন্দারা একে অপরকে খবর আদান প্রদান করে। অবশেষে এই নিকটবর্তী আসমানে খবর পৌছে। তখন জ্বীনেরা অতর্কিতে (গোপন সংবাদটি) শুনে নেয় .... And **when the Angels see the jinn they attack them with meteors.**

কদরের রাতে উল্কাপাত হয় না !
আহমদ ইবনে হানবল থেকে একটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, শবে কদরের রাতে উল্কাপাত হয় না।

www.islamweb.net
Islamweb Fatwas

Fatwa Title : Signs of the night of Power (Laylatul Qadr)
Fatwa No. : 83532

The Signs that occur during that night are described in the following Hadeeth. Ubadah Ibn As-Saamit, may Allaah be pleased with him, narrated that the Prophet, sallallaahu 'alayhi wa sallam, said: "*The Night of Decree is a clear and shining night as if there were a bright moon in it. It is calm and quiet. It is* [*neither cold nor hot and no shooting stars are thrown in it till the morning.*" [Ahmad

Moreover, Abu Hurayrah, may Allaah be pleased with him, said: "*We were talking about Laylatul-Qadr in the presence of the Messenger of Allah, sallallaahu 'alayhi*

উল্কাপাত আসলে কী?

উল্কা (ইংরেজিতে meteoroid) হল কোন ধূমকেতুর অংশবিশেষ যেগুলো কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে **পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে বায়ুমণ্ডলের সাথে সেটির ঘর্ষণে জ্বলে উঠে**। এগুলোকেই উল্কা বলা হয়। এটি মহাকাশে পরিভ্রমণরত পাথর বা ধাতু দ্বারা গঠিত ছোট মহাজাগতিক বস্তু যা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুর সংঘর্ষে জ্বলে উঠে। এই ঘটনাকে উল্কাপাত বলে।

- আল্লাহ সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময়। কোরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫
- আল্লাহ চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন আলোরূপে। কোরআন, সূরা নূহ, আয়াত ১৬
- (কিয়ামতের দিন) চাঁদ আলোহীন হয়ে পড়বে। কোরআন, সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত ৮

আপনি চাঁদে অবতরণ করে চাঁদকে কোনোভাবে আলোকময় হিসেবে দেখতে পাবেন না। কারণ চাদের নিজের আলো নেই।

২০০ তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা, সপ্তম খণ্ড [২৯তম পারা]

٨. وخسف القمر اظلم و ذهب ضوءه ‎ ৮. এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং তার জ্যোতি লোপ পাবে।

٩. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَطَلَعَا مِنَ الْمَغْرِبِ أَوْ ذَهَبَ ضَوْءُهُمَا وَ ذٰلِكَ فِيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ. ‎ ৯. আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে তখন তারা পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে অথবা তাদের আলো লোপ পাবে। আর এরূপ কিয়ামতের দিনে হবে।

সহীহ বুখারী (ইফাঃ)
অধ্যায়ঃ ৪৯/ সৃষ্টির সূচনা
পরিচ্ছদঃ ১৯৮৬. চন্দ্র ও সূর্য উভয়ে নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে। এর জন্য মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, উভয়ের আবর্তন চাকার আবর্তনের অনুরূপ। আর অন্যেরা বলেন, উভয় এমন এক নির্দিষ্ট হিসাব ও স্থানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা তারা অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য লঙ্ঘন করতে পারে না। حُسْبَانٌ হল حِسَابٍ শব্দের বহুবচন, যেমন شِهَابٍ এর বহুবচন شُهْبَانٍ – ضُحَاهَا এর অর্থ জ্যোতি। أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ চন্দ্র সূর্যের একটির জ্যোতি অপরটিকে ঢাকতে পারে না, আর তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। سَابِقُ النَّهَارِ রাত দিনকে দ্রুত অতিক্রম করে। উভয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে চায়। نَسْلَخُ আমি উভয়ের একটিকে অপরটি হতে বের করে আনি আর তাদের প্রতিটি চালিত করা হয় وَاهِيَةٌ এবং وَهْيُهَا এর অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া। أَرْجَائِهَا তার সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি আর তারা তার উভয় পার্শ্বে থাকবে। যেমন তোমার উক্তি عَلَى أَرْجَاءِ الْبِئْرِ কূপের তীরে أَغْطَشَ وَجَنَّ অন্ধকার ছেয়ে গেল। হাসান বসরী বলেন كُوِّرَتْ অর্থ লেপটিয়ে দেয়া হবে, যাতে তার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর বলা হয়ে থাকে وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ এর অর্থ আর শপথ রজনীর এবং তার যে জীবজন্তু একত্রিত করল। اتَّسَقَ বরাবর হল। بُرُوجًا চন্দ্র সূর্যের কক্ষ ও নির্ধারিত স্থান। الْحَرُورُ গরম বাতাস যা দিনের বেলায় সূর্যের সাথে প্রবাহিত হয়। ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, حَرُورُ রাত্রিবেলার আর سَمُومُ দিনের বেলার লু হাওয়া। বলা হয় يُولِجُ অর্থ প্রবিষ্ট করে বা করবে وَلِيجَةً অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু যা তুমি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়েছ।

তারকা উপরে নাকি চন্দ্র-সূর্য?

- কুরআন ৩৭/৬। নিশ্চয় আমি **নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজি**র সৌন্দর্যে সুশোভিত করেছি।
- কুরআন ৭১/১৫-১৬। তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কীভাবে **আল্লাহ স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন? আর তাদের(সপ্তাকাশের) মধ্যে চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন আলো আর সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন প্রদীপরূপে**।

নক্ষত্র অস্ত যায়?

- কুরআন

An-Najm 53:1 ...
কসম নক্ষত্রের, যখন তা অস্ত যায়।
NOT - কসম নক্ষত্রের, যখন তা *তোমরা অস্ত যেতে দেখ *

যেটা সত্য না বরং মানুষের দেখার ভ্রম, এরকম বিষয়ে যদি কেউ শপথ করে তাহলে হয় সে পাগল নাহয় সে জানেনা এটা সত্য নয় বরং ভ্রম। অটোটিউন ইউজ করলে ছাগলের ডাকও শ্রুতিমধুর শোনাবে, এখন যদি কেউ এটা শুনে বলে- শ্রুতিমধুর ছাগলের ডাকের কসম। তাহলে নির্ঘাত পাগল/নেশাখোর অথবা অটোটিউন নামক ইলিউশনের ব্যাপারে জানেইনা_ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখন চলুন কুরআনে দেখি,

- কুরআন ৫৬:৭৫। **আমি কসম করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের**। [তাফসীরঃ অস্তাচল অর্থাৎ অস্তের সময়। এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে]

চাঁদ পরিপূর্ণ হয় !? এটা যে আমাদের দেখার ভ্রম তা সেই আমলে নবি মুহাম্মদ বুঝতে পারেননি।

- কুরআন ৮৪:১৮। আর **চাঁদের কসম, যখন তা পরিপূর্ণ হয়**।
- কুরআন ৩৬:৩৯। চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিল(দশা)সমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়।

There are no places on earth where sun is set up/down.

- কুরআন ১৮:৯০। **চলতে চলতে সে(যুলকারনাইন) সূর্যোদয়ের স্থানে পৌঁছল/** he came to the rising of the sun।
- কুরআন ৭০:৪০। আমি **উদয়স্থল ও অস্তাচলসমূহের** রবের কসম করছি যে, আমি অবশ্যই সক্ষম!

- কুরআন ৯১:২। শপথ চাঁদের যখন তা সূর্যের পিছনে আসে the moon follows the sun

- কুরআন ৯১:৪। শপথ রাতের যখন তা **সূর্যকে ঢেকে নেয়** the night when it covers the sun

মেরু অঞ্চলে টানা কয়েক মাস সূর্য উঠে না, যে মানুষ এ ব্যাপারে অজ্ঞ শুধু সে ই এ ধরনের নির্দেশ দিতে পারে। গোটা কোরআন, হাদিসের কোথাও মেরু অঞ্চলের মানুষদের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা নেই। কারণ মুহাম্মদের ধারণাও ছিলনা যে ভূপৃষ্ঠে এরকম কোনো যায়গা থাকতে পারে।

- কুরআন ১৭:৭৮। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা কর।

[Sky is a solid material !!

- An-Naba’ 78:12-13: **আমি(আল্লাহ)- তোমাদের উপরে বানিয়েছি *সাতটি মজবুত আকাশ।* আর আমি সৃষ্টি করেছি *উজ্জ্বল একটি প্রদীপ*।** (আর সাত আসমানের মধ্যে একটা মাত্র প্রদীপ ! অথচ সূর্য বাকিসব নক্ষত্রের মতই একটি, বাকিগুলো অনেক দূরে বিধায় মুহাম্মদের সেগুলোকে প্রদিপ হিসেবে মনে হয়নি)

- Qaf 50:6 **তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তাতে কোন ফাটল নেই**।

- Al-Hajj 22:65 যমীনে যা কিছু আছে এবং নৌযানগুলো যা তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণ করে সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। আর **তিনিই আসমানকে আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তা যমীনের উপর পড়ে না যায়**।

- Ash-Shura 42:5 **উপর থেকে আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হয়**; আর (তখন) ফেরেশতারা তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে।

আসমানের দরজা !

- ♦ Al-Qamar 54:11 ফলে আমি বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিলাম।
- Sad 38:10 আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তার মালিকানা কি তাদের? (যদি তাদের হয়) তাহলে তারা আরোহণ করুক (আসমানে উঠার) কোন উপায় অবলম্বন করে।
- Al-Hijr 15:14 যদি আমি তাদের(অবিশ্বাসী) জন্য আসমানের কোন দরজা খুলে দিতাম, তারপর তারা তাতে আরোহণ করতে থাকত ।
- Al-A'raf 7:40 নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না।]

আল-আদাবুল মুফরাদ
পরিচ্ছেদঃ ছায়াপথ।
৭৭১। ইবনুল কাওয়া (রহ) আলী (রা)-কে ছায়াপথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তা হলো আসমানের প্রবেশদ্বার এবং নূহের বন্যায় প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আকাশের ঐ দ্বারই খুলে দেয়া হয়েছিল (৫৪ঃ ১১ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)।

আল-আদাবুল মুফরাদ
পরিচ্ছেদঃ ছায়াপথ।
৭৭২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রংধনু হলো পৃথিবীবাসীর জন্য মহাপ্লাবনের পর নিরাপত্তার প্রতীক এবং ছায়াপথ হলো আকাশের একটি দরজা, যা থেকে আকাশ বিদীর্ণ হবে।

[Author of Quran says- সপ্তাকাশ is visible to human eye

- Al-Mulk 67:3 যিনি সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?
- Yusuf 12:105 আসমানসমূহে কত নিদর্শন রয়েছে, যা তারা অতিক্রম করে(প্রত্যক্ষ করে) চলে যায়, অথচ সেগুলো থেকে তারা বিমুখ।
- Luqman 31:10 তিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখছ।
- Nuh 71:15-16 'তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কীভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন'?]

According to author of quran - The age of earth is much than all of the stars, galaxies !

- কুরআন ২:২৯। তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর আসমানের প্রতি খেয়াল করলেন এবং তাকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করলেন।

পৃথিবী সৃষ্টি হতে যে সময় লেগেছে, সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে ঐ একই সময় লেগেছে !

- যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর তাতে চারদিনে প্রার্থীদের জন্য সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। (কোরআন ৪১:৯) তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া। তারপর তিনি দু'দিনে আসমানসমূহকে সাত আসমানে পরিণত করলেন। (কোরআন ৪১:১১-১২)

সূর্যের আগেই গাছপালা সৃষ্টি !

বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থীর কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।
তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন-পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।
অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।
অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।
কুরআন ৪১:৯-১২

[*আসমান/আকাশ* (السماء) = same   প্রমাণঃ

- brahim 14:32 তিনি **আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।**
- Al-Baqarah 2:22 যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, **আসমানকে করেছেন ছাদ।**]

[[কোরআনে أَرْض (আরদ) = শুধুমাত্র যমীনকে বোঝানো হয়েছে, কিন্তু কোনো গোলকাকৃতির পৃথিবীকে বুঝানো হয়নি]] প্রমাণঃ-

- **Sura TaHa 20:6= لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ অনুবাদ: যা আছে(مَا) যমীনে(ٱلْأَرْضِ) স্থানে এবং যা আছে মাটির নিচে(وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ) সব তাঁরই।]]**

There wouldn't be any problem of earth stability_ if there is no mountains. { Though This ayat is not talking about earthquakes, but if anyone pretend to mean this, then for their kind information- on earth where there are many mountains several major earthquake also happens there. So if you take this meaning the ayat is proven false instantly. Also mountains created by means of earthquakes.}
Many planets that've no mountains which are moving totally smoothly. Example - eggshell planets,. So, the below ayat is another scientific error

- ১৬:১৫। তিনি জমিনে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, **যাতে তোমাদের নিয়ে জমিন(পৃথিবী) হেলে না যায়**। ("হেলে পড়া" শুধুমাত্র সমতল পৃষ্ঠ ছাড়া, গোলাকার ঘুর্ণনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।)

কোরআনে খুব পরিষ্কারভাবেই **পৃথিবীকে স্থির এবং নড়াচড়া করে না** বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আসুন দেখা যাক, পৃথিবী ঘুর্ণায়মান নাকি স্থির, এই বিষয়ে ইসলাম কী বলে

- নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিন**(পৃথিবী) কে ধরে রাখেন যাতে এগুলো স্থানচ্যুত না হয়**।

মানুষ চিন্তা করে কি বক্ষস্থিত হৃদপিণ্ড দিয়ে নাকি মস্তিষ্ক দিয়ে ?

- জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহর নিকট হতে লুকাতে পারে। নিশ্চয় তিনি জানেন যা কিছু **কলবসমূহে** নিহিত রয়েছে। কোরআন, সূরা হুদ, আয়াত ৫
- তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা **জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়** ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত: চক্ষু তো অন্ধ হয় না, বরং **বক্ষস্থিত হৃদয়/অন্তর(কলব)**ই অন্ধ হয়। কোরআন, সূরা হাজ্জ, আয়াত ৪৬
- কাফেরদের **কলব রয়েছে, তারা এর দ্বারা বিবেচনা করে না**। তাদের কান রয়েছে, তারা এর দ্বারা শোনে না। কোরআন, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৭৯
- **আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন** এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন। কোরআন, সূরা আন'আম, আয়াত ১২৫

আল্লাহ কার কাছে দোয়া করেন ?!

- কুরআন ৬৩/৪। এরাই শত্রু, অতএব এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। **আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন**। তারা কিভাবে সত্য থেকে ফিরে যাচ্ছে!

গণীমতের মাল আল্লাহর লাগবে কেন !

- কুরআন ৮/৪১। **তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে লাভ কর, নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ** ও রাসূলের জন্য,.........
- কুরআন ৮/১। লোকেরা তোমাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; **বল, গনীমতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের জন্য**।

আল্লাহ ওরফে নবী মুহাম্মদ কল্পনাই করতে পারেনি যে একদিন মানুষ যমীন ছেড়ে বিমান/রকেট আবিষ্কার করে উপরে আরোহণ করতে পারবে। Already we've made it, & by crossing the first sky al already went to moon, mars.

- কুরআন ৩৮/১০। নাকি তাদের কর্তৃত্ব আছে আসমানসমূহ ও যমীন এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর উপর? থাকলে, তারা কোন উপায় অবলম্বন করে আরোহণ করুক!

নবী মুহাম্মদ কখনো ভাবতেই পারেনি যে, মানুষ বন্ধ্যাত্ব রোগের একসময় চিকিৎসা বের করে ফেলবে। এখন আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে মৃত মুহাম্মদ ওরফে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছড়ি ঘুরাতে পারি। Now we've the power through science to choose our baby(to be a girl/boy) & By using artificial fertilization & through artificial womb we can make a girl able to give child. Then she is not infertile at that consequences when she is producing child, doesn't matter whatever technology being used.
Here the writer of quran stated- he can make anyone infertile, Now we have the power to make them fertile, & prove the statement wrong

- কুরআন ৪২/৫০। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং **আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন**। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।
- [Quran,42:49] "তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।"

বিজ্ঞানীরা এখন বিভিন্ন জেন্ডার সিলেকশন মেথড,যেমন: sperm-shorting,micro-short,PGD,LLC এর মাধ্যমে ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম দিতে পারে! PGD মেথড এ সফলতার হার ৯৯.৯৯%। **বন্ধ্যা নারীরা আজ আল্লাহকে মিথ্যা প্রমাণিত করে সন্তান জন্ম দিচ্ছেন**! বিজ্ঞানীদের কাছে আল্লাহ পরাজিত হচ্ছেন অসহায়ভাবে!

- [Quran,16:78] "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন।"

বিজ্ঞানীরা ectogenesis এত মাধ্যমে আগামীতে মায়ের দেহের বাইরেই ভ্রূণ থেকে সন্তান উৎপন্ন করার জন্য কাজ করছেন! সমস্যা একটাই আইনের কড়াকড়ি খুব বেশি! বিজ্ঞানীরা মানুষের ভ্রূণকে দেহের বাইরে ১৩ দিন বড় করেছেন! কিন্তু এর পর এটাকে মেরে ফেলতে হয়েছে, আইনের কড়াকড়ির জন্য, ১৪ দিনের বেশি অনুমতি নেই!

- [Quran,86:5-7] "তিনি মানবকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। [16:4] "অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃষ্ট হয়েছে। সে সৃষ্ট হয়েছে সবেগে স্খলিত তরল থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে।

বিজ্ঞানীরা বীর্য ছাড়াই মানুষ সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন (Human cloning)। ক্লোন মানব তৈরিতে বীর্য তো দুরের কথা, কোন পুরুষেরই দরকার নেই! একটি ডিম্বাণুর DNA কে স্পার্মের বদলে দেহকোষ থেকে সংগৃহীত DNA দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে মানুষ জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছে।

- বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[Quran,67:23]

>> বিজ্ঞানীরা বহু জন্মান্ধকেই দৃষ্টি দিয়েছেন, যাদেরকে আল্লাহ দৃষ্টি দিতে পারেনি! এরও আগে থেকে বিজ্ঞানীরা শ্রবণশক্তি দিতে সক্ষম হচ্ছেন, যাকে আল্লাহ শ্রবণশক্তি দেন নাই!! এছাড়াও বহু জন্মগত বিকলাংগ, এক মাথা দুই শরীর নিয়ে জন্মানোসহ ভয়াবহ বিকৃত শিশুর শরীরকে স্বাভাবিক শরীরে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। যেখানে বিজ্ঞানী ডাক্তাররাই ঈশ্বর হিসেবে মানুষের কাছে স্থান পেয়েছে, আর ইচ্ছা করে ওসব অসুস্থ-বিকৃত শরীর তৈরী করা কালপ্রিট কাল্পনিক আল্লাহকে মানুষ ঝামা ঘষে মন থেকে বিদায় করেছে।

- "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সুমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে"! [5:96]

>> আল্লাহ এখানে অজ্ঞতাবশত তার বান্দাদের কুপরামর্শ দিয়েছেন! বিজ্ঞানীদের দ্বারা আমরা এখন জানি যে সমুদ্রে বিষাক্ত মাছেরও অভাব নেই! বিজ্ঞান অমান্য কইরা আল্লাহর কথায় সব মাছ খাইতে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু!

- "তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত (বর্ধিত,extend) করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। [25:45-46]

ছায়াকে বর্ধিত-সংকোচিত করার জন্য এখন তো আর সুর্যের দরকার নাই! কোন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লাইট সোর্স দিয়াও দিনের বেলাতেই, এমনকি সুর্যের দিকেই বস্তুর ছায়া সৃষ্টি করা যাবে! বর্ধিত-সংকুচিত করা তো আরো সোজা"

- [36:37] "তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়"

আল্লাহ দিনকে অপসারিত করলেও, এখন আমরা আর অন্ধকারে থাকিনা! আল্লাহ, বিদ্যুত আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ও তা রাতে সার্বক্ষণিক সরবরাহ করার প্রযুক্তির কাছে এখানেও পরাজিত!

- [Quran,10:5] "তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিশালী ও চন্দ্রকে আলোকময় এবং তার মঞ্জিলও ঠিকমত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তার সাহায্যে বছর গণনা ও তারিখ হিসেব করতে পারো

বছর আর তারিখ গনণার জন্য এখন কি আর চাদ-সুর্যের দরকার আছে?? আরবীয়রা অবশ্য এখনো চাঁদ দেইখা মাস হিসাব করে,,কিন্তু বাকিদের দরকার নাই! বিজ্ঞান বহু আগেই বিকল্প ব্যবস্থা করে ফেলছে!

- আর তিনিই তারকাগুলোকে বানিয়েছেন তোমাদের জন্য পৃথিবী ও সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে পথের দিশা জানার মাধ্যম। দেখো, আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। [Quran,6:97]

>> এখন আর তারকা দেখে পথ চেনা দরকার নাই! মানুষ তো এখন স্যাটেলাইট জিপিএস দিয়া আরো নির্ভুলভাবে পথ চিনতে পারে!! আল্লাহ আবার বিজ্ঞানের কাছে পরাজিত!

মুহাম্মদ কল্পনাই করতে পারেনি যে, একসময় মানুষের জাহাজ চালানোর জন্য পাল টানানো বা বায়ুপ্রবাহের প্রয়োজন হবেনা। The author of quran never could thought - one day human would make technology to be able to run a water-vehicle without help of wind !

- কুরআন ৪২/৩৩। **আল্লাহ যদি চান বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। ফলে জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে গতিহীন হয়ে পড়বে।** নিশ্চয় এতে পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

- কুরআন ৫৬:৬৯। **বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে তোমরা কি তা বর্ষণ কর, না আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী?**

বর্তমানে চাইনিজ বিজ্ঞানীরা মেঘের মধ্যে কেমিকেল ছিটিয়ে প্রতিবছর ৫৫ বিলিয়ন টন বৃষ্টিপাত ঘটান!

আল্লাহ সাহায্যের জন্য মানুষের তার প্রতি করা দোয়ার ইমেজ ঠিক রাখতে, তা বাস্তবায়ন করার জন্য সাহাবীদের কাছে কাকুতি মিনতি করত !

- কুরআন ৪/৭৫। **তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।'**

নবী নিজের নামে নিন্দা শুনে তেড়েফুঁড়ে আল্লাহর নাম করে ঐ একই নিন্দা ছুড়ে মারত, তা ছিল অযৌক্তিক, কারণ কাফেরদের ছেলে সন্তান বড় হত, বংশ বজায় থাকত।

- কুরআন ১০৮/৩। নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ।

নবী কি আল্লাহকে ধরে/আটকায়ে রাখত ? এখানে কে নবী কে আল্লাহ ?

- কুরআন ৭৩/১১। **আর ছেড়ে দাও আমাকে** এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে। আর তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দাও।

আল্লাহর মনেও প্রতিশোধের আগুন ! কোনো kind hearted, humble মানুষও যেখানে প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভাবতে চায়না, সেখানে ....!

- কুরআন ৫/৯৫। যে পুনরায় করবে **আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন**। **আর আল্লাহ** মহাপরাক্রমশালী, **প্রতিশোধ গ্রহণকারী।**

ক্ষতিকর প্রাণী, সাপ, বিচ্ছু মানুষের অধীন ? ৫০০০ কোটি আলোবর্ষ দূরের কোনো গ্যালাক্সি মানুষের কোন কল্যাণে লাগে ? সত্য হচ্ছে নবী মুহাম্মদ নিজের বানানো সাত আসমান(আসমানমূহ) বলতে এদের মধ্যে শুধু চন্দ্র,সূর্য আর উল্কা,তারা এর বাইরে আর কিছু আছে জানতেও পারেনি। আর এগুলো সেসময়ে মানুষের দিনরাতের আলোর উৎস, দিক বের করতে, মাস গননায় ব্যবহৃত হত_ যার সাপেক্ষে নবী নিজের আয়াতটি নাযিল করে-

- কুরআন ৪৫/১৩। আর **যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে**, তার **সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন**, তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন।

আল্লাহ পূর্ববর্তী মানুষদের উপর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন !

- কুরআন ২/২৮৬। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

at the time of writer of quran, the science was not so developed, so that they could know about that- A dog when he is not tired at all, also give out of his tongue for releasing heat(because they don't have sweat pores in skin). **Anyone who doesn't know that scientific fact- must think that- without any tiredness the dog is Gasping**।

- কুরআন ৭:১৭৬। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে **কুকুরে**র মত। **যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহবা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে**।

কোরআনের ভয়াবহ এক মেডিক্যাল/বায়োলজিক্যাল ভুল ! আফসোস বর্তমানের মুমিন ডাক্তারেরা পুরো কুরআন নিজের ভাষায় পড়েনা।

- কুরআন ৭৫:৩৭, ২৩:১৩

তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।
(মাতৃগর্ভে)

সহীহ বুখারী 318,3333,6495, সহীহ মুসলিম ৬৪৮৯

নবী সা বলেন- "বলেনঃ আল্লাহ মাতৃগর্ভের জন্য একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি পর্যায়ক্রমে বলতে থাকেন, **হে রব! এখন বীর্য(نطف/semen drop) আকারে আছে**। হে রব! এখন জমাট রক্তে পরিণত হয়েছে।..................

সহীহ মুসলিম ৬৮৯৬,৬৪৮৭, ৬৪৮৪

নবী সা বলেছেন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের_ **বীর্য(نطف/semen drop) আকারে যখন ৪২ দিন অতিবাহিত হয়**, তখন আল্লাহ তার প্রতি একটি ফেরেশতা প্রেরণ করেন।..........................

কুরআন যে নবী নাযিল করত সেটা এক মিনিটের মধ্যে বুঝতে চান ? মানুষ মাত্রই ভুল, বেখেয়ালি, আর মুহাম্মদও তার ব্যতিক্রম ছিলনা। নিচে পড়লেই বুঝতে পারবেন।

- কুরআন ৬/৯৯। **আর তিনিই আসমান থেকে বর্ষণ করেছেন বৃষ্টি**। **অতঃপর আমি এ দ্বারা উৎপন্ন করেছি সব জাতের উদ্ভিদ**। অতঃপর আমি তা থেকে বের করেছি সবুজ ডালপালা।

- কুরআন ৪২/৯-১০। **তারা কি তাঁকে বাদ দিয়ে বহু অভিভাবক গ্রহণ করেছে?** কিন্তু আল্লাহ হলেন প্রকৃত অভিভাবক; আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বক্ষমতাবান। **আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই।**

- কুরআন ৬/১১৪। **আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব?** অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন। **আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম** তারা জানত যে, তা তোমার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত।

- কুরআন ২/২৮৫। রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, **আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না**। তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম।

- আর যারা মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে; তাদেরকে বলা হবে 'তোমরা যে আমল করেছ তারই প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হল'। আমাকে তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই শহরের রব-এর ইবাদাত করতে। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই।

- কুরআন ৯/৩০। ইয়াহূদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। **এটা তাদের মুখের কথা, তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতঃপূর্বে কুফরী করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে এদেরকে ?**

- কুরআন ৬৯/৪০। **নিশ্চয়ই** এটি(কোরআন) **এক সম্মানিত রাসূলের বাণী।**

- কুরআন ২/২৫২-২৫৩। **এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার উপর যথাযথভাবে তিলাওয়াত করি।** আর নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। ঐ রাসূলগণ, **আমি তাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি**, তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন।

- কুরআন ৫১/৪৯-৫০। প্রত্যেক বস্তু থেকে **আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।**

সবজান্তা [আলিমুল গায়িব] আল্লাহ (ওরফে নবী মুহাম্মদ) যখন নিজেই জানেনা !

- কুরআন ৬৬/৫। নবী যদি তোমাদেরকে তালাক দেয়, তবে **আশা করা যায় তার রব তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী তাকে দিবেন।**

- কুরআন ২১:৬। তাদের পূর্বে যে জনপদ ঈমান আনেনি তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি । **তবে কি এরা ঈমান আনবে?**

- কুরআন ৩৭:১৫৫। তাহলে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? [আল্লাহর মুখ দিয়ে ভয়-হুমকি দেখিয়েও লাভ না হওয়ায়, মুহাম্মদের বিরক্তিমাখা নিরাশ প্রশ্নকেও যখন তার সাহাবীরা কুরআনের আয়াত মনে করে লিখে নেয়]

- কুরআন ২:১৮৬। তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। **আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।**

- কুরআন ৩:১২৩। **আশা করা যায়, তোমরা শোকরগুজার হবে।**

- কুরআন ৭:১৬৪। **তারা বলল**, 'তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। **আশা করা যায় তারা সাবধান হবে**'।
- কুরআন ২৮:৯। **ফিরআউনের স্ত্রী বলল**, 'এ শিশুটি নয়ন প্রীতিকর, তাকে হত্যা করো না। **আশা করা যায়, সে আমাদের কোন উপকারে আসবে।** [এই ধরনের কথা অর্থাৎ অনুমান- যে ভবিষ্যত সম্পর্কে স্পষ্ট জানতে না পারা মানুষের পক্ষেই বলা সম্ভব তা কুরআন থেকেই দেখুন]

- কুরআন ৫১:৪৯। প্রত্যেক বস্তু থেকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। **আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।**

- কুরআন ৬০:৭। যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা করছ, **আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।**

- কুরআন ৫৭:১৭। **আমি** নিদর্শনসমূহ **তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, আশা করা যায় তোমরা বুঝতে পারবে।**

- কুরআন ৪২:১৭। আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, **হয়তো কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী !**

- কুরআন ১৮:৬। **হয়তো তুমি তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে, দুঃখে নিজকে শেষ করে দেবে**।
- কুরআন ২৬:৩। **তারা মুমিন হচ্ছেনা বলে তুমি(নবী) হয়তো এ দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে/নিজের প্রাণনাশ করবে**।
- কুরআন ৭:১৬৮। **হয়তো তারা ফিরে আসবে**।
- কুরআন ৩৭:১৪৭। তাকে আমি **এক লক্ষ বা তার চেয়েও বেশী** লোকের কাছে পাঠালাম।
- কুরআন ৫৩:৯। **ফলে তাদের([নবী ও জিবরাঈলের মাঝে) মধ্যে ব্যবধান রইল, দুই ধনুকের পরিমাণ অথবা তারও কম**।
- কুরআন ৩:১৬৬। **তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল দুই দল মুখোমুখি হওয়ার দিন তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে, যাতে তিনি মুমিনদেরকে জেনে নেন**।
- কুরআন ২:১৪৩। আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের উপর। আর যে কিবলার উপর তুমি ছিলে, তাকে কেবল এ জন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, **যাতে আমি জেনে নেই যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে এবং কে তার পেছনে ফিরে যায়**।
- কুরআন ৭২:২৮। **যাতে তিনি(আল্লাহ) এটা জানতে পারেন যে,** রাসূলগণ তাদের রবের রিসালাত পৌঁছিয়েছে কিনা।
- কুরআন ১৮:১২। তারপর আমি তাদেরকে জাগালাম, **যাতে আমি জানতে পারি, যতটুকু সময় তারা অবস্থান করেছিল, দু'দলের মধ্যে কে তা অধিক নির্ণয়কারী**।
- কুরআন ৫৭:২৫। আর **যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে**।
- কুরআন ৩:১৪২। **তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে**।

কোরআন এক অপূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

মুহাম্মদ থুক্কু আল্লাহর দাবী-

- আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি **প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ**। An-Nahl 16:89
- আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। Al-An'am 6:55
- **তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন**। Al-An'am 6:114
- আর আমি তার জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি **প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা**। Al-A'raf 7:145
- **প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ**। Yusuf 12:111
- **আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি**। Al-Isra' 17:12
- আর তারা তোমার কাছে যে কোন বিষয়ই নিয়ে আসুক না কেন, আমি এর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। Al-Furqan 25:33
- নিশ্চয় আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। Az-Zumar 39:27
- আর **আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি**। Al-Isra' 17:12
- আজ আমি তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। Al Maidah 5:3

চলুন এ ব্যাপারে সামান্য কিছু উদাহরন দেখি-

- হিজড়াদের সম্পর্কে তো সবাই জানেন। কোরানের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কারও ছেলে সন্তান পাবে মেয়ে সন্তানের দ্বিগুন সম্পত্তি। তো কোরান অনুযায়ী হিজড়া সন্তানের মাঝে কিভাবে সম্পত্তি বন্টন করে দিবেন? তাদের কতগুন দিবেন? আবার, কোরান অনুযায়ী একজন পুরুষ স্বাক্ষী সমান দুজন নারী স্বাক্ষী। হিজড়াদের স্বাক্ষ্য কিভাবে মুল্যায়ন করবেন? কয়জন হিজড়া সাক্ষ্য দিলে তা সহিহ হবে?

- আপনি মুসলিম নভোচারী হয়ে চাঁদে গেলেন, সেখানে ফজর,যোহর,আসর,মাগরিব নামজের ওয়াক্ত কহিভাবে হিসাব করবেন, বা কিবলা কোনদিক হবে- এ নিয়ে নবী মুহাম্মদ ওরফে আল্লাহর কোনো নিরর্দেশনা নেই কারন মানুষ যে একদিন চাদে চলে যাবে সেটা সে ১৪০০ বছর ধারণাই করতে পারেনি, বা চিন্তা তার মাতথাতেই আসেনি।

- কুরান লিখিত হয়েছে আরবি ভাষায় [কোরআন ১২:২ **নিশ্চয় আমি একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার**] । পৃথিবীর মাত্র ৪ শতাংশ মানুষের ভাষা আরবি। বাকি ৯৬ শতাংশ মানুষ আরবি বুঝে না; সুতরাং এই ৯৬ শতাংশ মানুষ কুরান থেকে সরাসরি উপদেশ নিতে পারছে না। নির্ভর করতে হচ্ছে অনুবাদের উপর। কুরান কোন সবজান্তা সৃষ্টিকর্তার বাণী নয়। মুহাম্মদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গ কর্তৃক নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কুরান লিখা অসম্ভব ছিল। তাছাড়া, মুহাম্মদ তখন জানতোই না যে, ভবিষ্যতে কোন একটি ভাষা আন্তর্জাতিক অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কুরান কোন সবজান্তা ঈশ্বর থেকে প্রেরিত হলে তিনি কুরানকে আন্তর্জাতিক ভাষা অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি মানুষের বোধগম্য ভাষায় লিখিত করার ব্যবস্থা করতেন।

- র্বকালের সকল মানব জাতির জন্যে রচিত গ্রন্থ কোরানে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বৃহৎ ধর্ম সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয়নি। যেমনঃ হিন্দু ধর্ম, চৈনিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে কোরানের একটা আয়াতেও উল্লেখ নেই। অপরপক্ষে, আরবের এক বিলুপ্ত ধর্ম সাবিয়ান সম্পর্কে বলা হয়েছে ৩ টি আয়াতে। কেন এমনটি হলো? কারন একটাই, নবীজির সময়ে আরবে যেসকল ধর্ম বিদ্যমান ছিল সেগুলোই কোরানে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষ কে কি ধর্ম পালন করছে, তা নবী মুহাম্মদের জানা ছিল না। জানলে ঐসব ধর্মেরও নাম উল্লেখ করে সেসব ধর্মালম্বীদের ভয় দেখিয়ে রাখতেন !

- কোরানে পিপড়া, মৌমাছি, উট, গরু কুকুর, সাপ, ঘোড়া, গাধাসহ সর্বমোট ৩৫ টি প্রানীর কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এদের সবাইকে আরব অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় । আরব দেশে বাসস্থান নয় এমন কোন প্রানীর উল্লেখ কোরানে নেই। থাকবেই বা কিভাবে? সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়ে ক্যাঙ্গারু, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার কিংবা এন্টার্কটিকাতে গিয়ে পেঙ্গুইন দেখে আসা তো সম্ভব ছিল না।

এভাবে একের পর এক টপিক নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকবে। কোরানের অপুর্ণাঙ্গতা লিখে শেষ করা যাবে না। কোরান সর্বকালের সকল মানুষের পথ প্রদর্শক হলে এতে সবকিছুই থাকার কথা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, **কোরানে কত কত গুরুত্বপূর্ন বিষয় বাদ দিয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে নবীর জীবন সংশ্লিষ্ট ঘরোয়া কথাবার্তা,** নাবীর ঘরোয়া সমস্যা মিটানোর জন্য। **নবীর বাসায় দাওয়াত খেয়ে তাড়াতাড়ি মেহমান বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েও আয়াত এসেছে**, আয়াত এসেছে নবীর বউদের তালাকের হুমকি ধামকি কিংবা আবু লাহাবের আর তার বউয়ের উপর অভিশাপ দিয়ে। অথচ কোরানে নেই ভবিষ্যত বিশ্ব উষ্ণায়ন কিংবা জনসংখ্যা সমস্যার মত বিষয়। এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ন বিষয় কোরানে নেই। পক্ষান্তরে অনেক অনেক অপ্রয়োজনীয়/তুচ্ছ/অমানবিক আয়াতে ভরপুর পুরো কোরান। যেমনঃ কোরান জুড়ে হাজারখানেক আয়াতে আল্লাহ শুধু নিজের তোষামোদি আর নিজের নার্সিস্টিক প্রশংসা করে ভাসিয়ে দিয়েছে, আর রহমান সূরায় এক কথা এক লাইন পর পর একশবার বলেছে, ৪০০ টি আয়াতে ইহুদি কাফেরদের ঘৃণা করতে বলা হয়েছে, ১৬৪ টি আয়াতে ইসলামী জিহাদ খুনোখুনি যুদ্ধের ডাক দেয়া হয়েছে!

কুরানের অধিকাংশটাই ব্যয় করা হয়েছে নবীর ব্যক্তিগত জীবন, যুদ্ধবিগ্রহ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও কিচ্ছা কাহিনী আলোচনা করে। নবীর জীবদ্দশার সময়কাল ও আরব অঞ্চলটাই প্রাধান্য পেয়েছে; তাই কোরান সর্বকালের জন্যে নয়, সকল মানবজাতির জন্যে নয়। **নবি মুহাম্মদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যতটুকু জানতো, কোরানে ততটুকুই রয়েছে।** এসব থেকে একটা জিনিসই প্রমাণিত হয় যে, এই কোরান কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয়।

↥

যারা আরো জানতে ও পড়তে চান তাদের জন্য (Library)

[এই অধ্যায়টিতে প্রত্যেকটি বই এবং ফাইলের নামের উপর ক্লিক করলে সেগুলো ওপেন হয়ে যাবে।]

1. ♦♦ **নবী মুহাম্মদের ২৩ বছর**

2. ♦♦ **ইসলামের অজানা অধ্যায়ঃ**

প্রথম খন্ড । দ্বিতীয় খন্ড । তৃতীয় খন্ড । চতুর্থ খন্ড । পঞ্চম খন্ড । ষষ্ঠ খন্ড । সপ্তম খন্ড । অষ্টম খন্ড ।

3. ইসলামের আদি উৎস
4. শয়তান
5. ★ **প্যারাডক্স এবং বায়েজিদ**
6. ★ হাদীসের প্রথম পাঠ
7. ★ সংক্ষিপ্ত কোরআন
8. ★ কোরআনে জিহাদ ও আক্রমণের আহবান
9. ★ কোরআনে বৈপরিত্য
10. ★ কোরআন এর বক্তার পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান
11. ★ ইসলামে বর্বরতাঃ নারী অধ্যায়
12. ★ ইসলামে কাম ও কামকেলি
13. ★ ইসলাম, নারী এবং যৌনতা
14. ★ জান্নাত: মুক্তির সন্ধানে নারী
15. ★ তাকদির
16. ★ ইসলামের নয়কাহন
17. ★ ইসলাম, কিছু জিজ্ঞাসা ও অবিশ্বাসের কারণ
18. ♦★ যে সত্য বলা হয়নি
19. ★ যে ঈশ্বর- ঘৃণা করে!
20. ★ ঈশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

44. ★ বারট্রান্ড রাসেল সমগ্র ১

45. ★ এ ব্রিফ হিস্টোরি অব টাইমঃ কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

46. ★ শূন্য থেকে মহাবিশ্ব

47. ★ প্রাণের উৎস সন্ধানে: মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে

48. ★★ **পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি কীভাবে হলো?**

49. .★ প্রাচীন পৃথিবী

50. ★ বিবর্তন

51. ★ **বিবর্তনের পথ ধরে**

52. মানুষ হলাম কি করে

53. .★ আত্মীয়তার প্রমাণাদি

54. ★ বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান: মানবপ্রকৃতির জৈববিজ্ঞনীয় ভাবনা

55. ★ ডারউইন- একুশ শতকের প্রাসিঙ্গকতা

56. ★ জীববিবর্তন তত্ত্ব ও নানা জিজ্ঞাসা

57. ★ যে অজ্ঞতার কারণে বিবর্তনকে ভুয়া বলেন আপনি!

58. ★ জীব বিবর্তন সাধারণ পাঠ

59. সেপিয়েন্স: মানুষের ইতিহাস

60. ★ ভালোবাসা কারে কয়

61. দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন

62. ★ দ্য গড ডিলিউশন

63. ★ দ্য সেলফিশ জিন

64. ★ মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি

65. **'যুক্তি'**(বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোট কাগজ) - ১ম সংখ্যা । ২য় সংখ্যা । ৩য় সংখ্যা । ৪র্থ সংখ্যা

66. 'মুক্তান্বেষা'- ১ম সংখ্যা । ৫ম সংখ্যা

67. সীরাত ইবনে আল্লামা ইসহাক রহ. (সীরাত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ, সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য এবং সবচেয়ে উন্নতমানের গ্রন্থ হলো সীরাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক। ইবনে ইসহাক রহ. এর পর আসেন ইবনে হিশাম। তিনি নবীর অনেক ঘটনা লুকোনোর জন্য এই সীরাত গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করে পেশ করেন। গ্রন্থের শুরুতে তিনি তা অকপটে স্বীকারও করেছেন এভাবে, "আমি সেইসব বিষয় বাদ দিয়েছি যার বর্ণনা অনেকের কাছে অপ্রীতিকর লাগবে"। সীরাতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক পুরো গ্রন্থটি এখনো বাংলায় অনুবাদ হয়নি, ইংরেজিতে করা হয়েছে)।

1. ★ an Encyclopedia Of Arabic Literature
2. ★ The Origin of the Quran
3. ★ In Search of the original Quran: The True History Of The Revealed Text
4. ★ Quranic Allusions: The Qumranian, Biblical and Pre-Islamic Background to the Quran
5. ★ Corruption In the Text & Context Of the Quran
6. ★ mapping a new country: TEXTUAL CRITICISM & Quran Manuscripts
7. ★ Textual Criticism & Quran Manuscripts
8. ★ Syntax Errors in the Quran
9. ★ Linguistic Error in the Quran (**main Arabic Eddition**)
10. ★ The Linguistic & Grammatical Errors of the Quran
11. ★ 1000+ Errors & Mistakes of the Quran
12. ★ Some Contradictions of the Quran
13. ★ The Foreign(non-Arabic) vocabularies of the Quran !! [vol 3]
14. ★ The Complete Infidels guide to the Quran
15. ★ Is Quran Infallible ?
16. ★ What the Quran Really Says: Language, Text & Commentary
17. ★ What the Quran Really Says (part II)
18. ★ The Generous Quran
19. An Inquiry Into Islam's Obscure Origins

20. ★ The Quest for the Historical Muhammad

21. The life of Muammad (Kitab al Maghazi)

22. ★ Understanding Muhammad

23. Psychology of Mohammed: Inside the Brain of a Prophet

24. The Truth about Muhammad: Founder of the world's most intolerant religion

25. It's All About Muhammad: **A Biography of the World's Most Notorious Prophet**

26. ★ The **Deception of Allah(Imaginary God of Islam)**

27. ISLAM Unveiled

28. The Caged Virgin

29. Why we left Islam- Former Muslims speak out

30. Leaving Islam: Apostates speak out

31. The Apostates: When Muslims leave Islam

32. The end of faith, terror

33. Why I'm not a Muslim

34. Why I left Islam

35. Infidel

36. The history of Jihad: From Muhammad to ISIS

37. Islam & Terrorism: The truth about ISIS, the middle-east and Islamic Jihad

38. The Islam in Islam terrorism : The importance of Belief, Ideas and Ideology

39. The legacy of Jihad: Islamic_Holy_War and the fate of non-muslims

40. Islamic Jihad: legacy of forced conversion, imperialism and Slavery

41. An Introduction to Real Islam and Jihad

42. Who Authored the Qur'an?

43. The Root of Terrorism a la Islamic style

44. The Root of Terrorism a la Islamic style

45. Women in Islam: An exegesis

46. Muhammad & Islam: Stories not told before

47. Behind the Veil

48. The Challenge of Islam

49. Qur'an and Embryology

50. The Codification of the Qur'an Text

51. Understanding Islam Through Hadith

52. Islamic History Source Book

53. Religion 101

54. Religions of the world: Comprehensive encyclopedia of Belief & Practice

55. How all religions are false and harmful

56. How religion poisons everything

57. Why we left religion: Testimonies by ex-Believers

58. ★ The Greatest Show on Earth: Evidence for Evolution

59. ★ The Blind Watch_maker

60. ★ Why evolution Is true

61. The Selfish Gene

62. ★★ EVOLUTION:THE HUMAN STORY

63. The First Humans(Origin and early evolution of the genus Homo)

64. Evolution- what the fossils say and why it matters

65. Prehistoric Life (evolution & the fossil record)

66. The Ancestors

67. ★ Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-billion-years' History of the human body

68. The Evolution of the Genome

69. ★ A Crack in creation: Gene editing and the unthinkable power to controle Evolution

70. The Universe before Big Bang: cosmology & String theory

71. Why There is No God

- আপনি কি জানেন OBJECTIVE TRUTH কাকে বলে? আপনি কি আপনার ধর্মের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক_ সায়েন্টিফিক এভিডেন্স (অবজেক্টিভ ট্রুথ) এ বিশ্বাস করেন ? (লেখার উপরে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখে নিন)

❖ **ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন(I.D.), ফাইন টিউনিং, কালাম কসমোলজি, ক্রিয়েশনিজম....এর অসারতা এবং আর্গুমেন্ট ফ্রম ফেইথ/বিলিফ, স্যুডোসায়েন্স এবং অজানা কিছু তথ্য।**

- মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিকাশ
- বিবর্তন (Evolution)
- 29+ Evidencess for MACRO_Evolution : The Scientific Case for Common Descent
- **Clear conception on evolution of life of the earth:** http://www.onezoom.org/life.html
- Human evolution documentary videos
- Human evolution: Scientific Classification of Primates
- **Human(Homo) origins, evolution fossils**
- ফিবোনাচি ক্রম ও সোনালি অনুপাত: প্রকৃতির স্বাভাবিকতা এবং সৌন্দর্য!
- এককোষী থেকে বহুকোষী জীবের বিবর্তন এবং অন্যান্য বিবর্তন নিয়ে কিছু তথ্যপ্রমাণ
- **চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন ! "মানুষের বিবর্তন হচ্ছে?" —— "জ্বি, হচ্ছে"**
- History & the timeline of evolutions on & of – the Earth.

বিবর্তনের আর্কাইভ, প্রশ্নোত্তরে বিবর্তন: বিবর্তন নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলোর উত্তর

বিজ্ঞানের তত্ত্ব

বিবর্তনের সাক্ষ্যপ্রমাণ

প্রাকৃতিক নির্বাচন, পরিব্যক্তি, প্রকারণ ও অন্যান্য

- প্রাকৃতিক নির্বাচন চক্রাকার যুক্তির উপর স্থাপিত- যারা বেঁচে থাকে তারা যোগ্যতম, আবার যোগ্যতমরাই বেঁচে থাকে।
- বেশিরভাগ পরিব্যক্তি বা মিউটেশনই ক্ষতিকর।
- বিবর্তন-প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণীকূল প্রতিনিয়তই উন্নত হচ্ছে।
- সাগর বা হ্রদের পানির নীচের মাছগুলো অত অপরূপ রঙীন হতে গেল কেন?
- মাইক্রোবিবর্তন এবং ম্যাক্রোবিবর্তন সম্পূর্ণ আলাদা।

জীবাশ্মবিদ্যা ও ভুতত্ত্ব

- দু'চারটা আংশিক ফসিল বা হাড়গোড় পেয়েই বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের স্বপক্ষে বড় বড় সিদ্ধান্ত টেনে ফেলেন।
- বিবর্তন যদি সঠিকই হবে তাহলে ফসিল রেকর্ডে এত গ্যাপ রয়েছে কেন?
- বিবর্তনবাদীরা অর্ধেক সরীসৃপ অর্ধেক পাখি - এরকম কোন মধ্যবর্তী জীবাশ্ম দেখাতে পারে না।
- তেজস্ক্রিয় ডেটিং দিয়ে কীভাবে ফসিলের সঠিক বয়স নির্ধারণ করা যায়?

মানব বিবর্তন

- মানুষ কি বানর থেকে এসেছে?
- মানুষ যদি বানর থেকে বিবর্তিত হয় তাহলে বানরগুলো এখনও পৃথিবীতে রয়ে গেলো কি করে?
- যদি বানর সদৃশ জীব থেকে একসময় মানুষের বিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে এখন কেনো তা আর ঘটছে না?
- আর্ডির সাম্প্রতিক ফসিল প্রমাণ করেছে যে বিবর্তনতত্ত্ব ভুল।
- মাইটোকণ্ড্রিয়াল ইভের অস্তিত্ব আবিস্কৃত হয়েছে। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আদম হাওয়ার কাহিনি তাহলে সত্যি।

যৌনতা, প্রবৃত্তি, নৈতিকতা ইত্যাদি

- বিবর্তন যৌনতা বা সেক্সের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।
- বিবর্তন সমকামিতার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।
- বিবর্তন মানব-সমাজে নৈতিকতার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।
- বিবর্তন মানে কি কেবল মারামারি-কাটাকাটি?
- বিবর্তনবাদ সামাজিক ডারউইনবাদ বা সোশাল ডারউইনিজম প্রমোট করে
- বিবর্তনবাদ ইউজেনিক্সের জন্ম দিয়েছে।
- বিবর্তন অজাচার শিক্ষা দেয়

প্রাণের উৎপত্তি এবং অজৈবজনি

- লুই পাস্তর প্রমাণ করেছিলেন যে জড় থেকে জীবের উদ্ভব হতে পারে না, শুধু জীব থেকেই জীবের উদ্ভব হয়।
- সম্ভাবনার নিরিখে প্রাণের উদ্ভব খুব বিরল ঘটনা।
- জড় পদার্থ থেকে প্রাথমিক জীবের উদ্ভব হলে এখন হচ্ছে না কেন?
- বিবর্তন প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারে না।
- অজৈবজনি ছাড়া বিবর্তন তত্ত্ব অচল।
- প্রথম কোষ দৈব প্রক্রিয়ায় তৈরি হতে পারে না।
- পৃথিবীতে কেন কেবল কার্বন-ভিত্তিক প্রাণেরই উদ্ভব ঘটল, কেন সিলিকন-ভিত্তিক প্রাণ নয়?

সৃষ্টিবাদ, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন এবং আনুষঙ্গিক

- আদালতে বিবর্তন : কিটজ্‌মিলার বনাম ডোভার কেইস
- জাকির নায়েক তার বক্তৃতায় প্রমাণ করেছেন যে বিবর্তন ভুল।
- বিবর্তনের পাশাপাশি স্কুল কলেজের বিজ্ঞান কারিকুলামে ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ব বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন পড়ানো উচিত।
- ঘড়ির যেমন কারিগর লাগে, তেমনি মহাবিশ্ব তৈরির পেছনেও কারিগর লাগবে।
- ঘড়ির যেমন কারিগর লাগে, তেমনি জটিল জীবজগত তৈরির পেছনেও কারিগর লাগবে।

- সরল অবস্থা থেকে এত জটিল জীবজগতের উদ্ভব ঘটা জাঙ্ক ইয়ার্ডে ফেলে রাখা জঞ্জাল থেকে এক ঘূর্নিঝড়ের মাধ্যমে এক বোয়িং বিমান তৈরি হয়ে যাওয়ার মতই অসম্ভব।
- কিছু জৈববৈজ্ঞানিক সিস্টেম অহ্রাসযোগ্য জটিল, বিবর্তন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।
- নূহের মহাপ্লাবনের পর কেমন করে জীব-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হলো?
- মহাবিশ্ব জীবনের জন্য সূক্ষ্ম-ভাবে সমন্বিত।
- এই মহাবিশ্ব কিংবা আমদের জীবদেহ দেখলেই বোঝা যায় এগুলো নিখুঁতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, এরা বিবর্তিত হয়নি।
- ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।
- মানব মস্তিষ্ক স্রষ্টার নিখুঁত ডিজাইন, এর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই।
- পদার্থের উৎপত্তি, শৃঙ্খলার সূচনা কিংবা মহাবিশ্বের উৎপত্তিকে পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।
- সব কিছুর পেছনেই কারণ আছে, মহাবিশ্বের উৎপত্তির একটি আদি কারণ রয়েছে, সেই কারণটিই ঈশ্বর।
- আল্লাহ সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।
- বিবর্তন এবং নাস্তিকতা সমার্থক।
- পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিখুঁত সৃষ্টিতে কোন ধরণের নিষ্ঠুরতা নেই।
- বিজ্ঞান ও ধর্ম সাংঘর্ষিক নয় বরং একে অপরের পরিপূরক।

এই যুগে মডারেট মুমিনদের (যারা একবারও কিনা নিজের ভাষায় কোরআন পড়েই নি, কোরআনে কি লেখা আছে জানেনা) মুখে প্রায়ই শুনা যায় যে,- "কোরআনেই সকল বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে , আল্লাহ ডিরেক্টলি বলে দেননি যাতে আমরা বেশি বেশি কোরআনের আয়াত ও শব্দ নিয়ে রিসার্চ ও চিন্তা করে নতুন বিষয় জানতে ও আবিষ্কার করতে পারি"।
চলুন এবার তাদের আবিষ্কার জেনে আসি,

আপনি কি যেকোনো সাধারণ বাক্যকে বিজ্ঞানময়/মিরাকল হিসাবে ব্যাখ্যা করতে চান ?! তাহলে এখনই যেকোন বিজ্ঞানমনস্ক ধার্মিকের কাছ থেকে ত্যানাবাজির দক্ষতা অর্জনে লেগে পড়ুন

- কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন শত বৎসর আগে–> "বিশ্বটাকে দেখবো আমি হাতের মুঠোয় ভরে।" **সেটা আজ সত্য প্রমাণীত হয়েছে!** এখন আপনি এন্ড্রয়েড স্মার্ট ফোন হাতে নিয়ে গোটা দুনিয়ার সব কিছুই দেখতে পারে। এই প্রযুক্তির কথা শত বৎসর আগে কাজী নজরুল ইসলাম বলে গেছেন! অতএব, আমাদের সর্বশেষ নবী কাজী নজরুল ইসলাম! তার বাণীতো কোনো সাধারন কথা নয় বরং মুজিজা ও সৃষ্টিকর্তার অলৌকিক বাণী।

কোরানে বিজ্ঞান আবিষ্কার ও গোবরকে চকলেটে রুপান্তরের কৌশল

কিছুদিন আগে টেলিভিশনে সংবাদ দেখছিলাম মরণোত্তর অঙ্গদান নিয়ে। মোল্লারা মরনোত্তর অঙ্গদানের বিপক্ষে আন্দোলন করছে, এটা নাকি ইসলামসম্মত নয়। আমি তো অবাক! মরনোত্তর অঙ্গদান ইসলামসম্মত নয়, এটা মোল্লারা কোথায় পেলো?? আদিম যুগের ওসব কোরান হাদিসে তো অর্গান ডোনেশন নিয়ে কিছু থাকার কথা নয়। কৌতুহলবশত ঘাটাঘাটি করে দেখলাম। আমার ধারনাই সত্যি হলো। অর্গান ডোনেশনের মত আধুনিক চিকিৎসাব্যাবস্থা মুহাম্মদের যুগে ছিলো না, তাই কোরান হাদিসেও এটা নেই। এমনটাই যৌক্তিক।

ওহ, তাহলে ঐ আন্দোলনরত মোল্লাদের আন্দোলনের ভিত্তি কি ছিলো? সেটা ছিলো ইজমা কিয়াস নামক পাওয়ার অব অ্যাটর্নি। কোরান হাদিসে তো অনেক কিছুই পাওয়া যায় না, যাবে না। তখন মোল্লারা এই পাওয়ারটা কাজে লাগায়। এর উপকারিতা ও অপকারিতা উভয়ই আছে। যেমন, একদলের মত অনুযায়ী অর্গান ডোনেশন হারাম, তো অন্যদলের মতে হালাল। ধরুন, কোরানে হয়তো লেখা থাকবে, "নিজের ক্ষতি করিও না"। এই আয়াত থেকে একদল মোল্লা আবিষ্কার করে ফেলবে অর্গান ডোনেশন হারাম। আবার, অন্য কোন সুরায় পাওয়া গেলো, "মানুষের উপকার করো"। এই আয়াত দিয়ে আরেকদল মোল্লা বুঝে নিবে অর্গান ডোনেশন হালাল। ***আমি এই প্রসঙ্গটা টানলাম আপনাদের এটা বুঝাতে যে, কোরানে সাধারন দৃষ্টিকোন থেকে কিছু একটা লেখা থাকলেও ইসলামি পন্ডিতরা তা থেকে অসাধারন কিছু আবিষ্কার করবে। এই পদ্ধতিতেই জাকির নায়েকের মত কিছু ধান্ধাবাজ কোরানের অতি সাধারন অর্থবহ আয়াত, এমনকি ভুলভাল আয়াত থেকেও – বিজ্ঞান উৎপাদন করে।***

অর্গান ডোনেশন নিয়ে সংবাদটা দেখার সময়ই আমি বলে দিতে পেরেছিলাম যে, এটা কোরান হাদিসে থাকবে না সিওর। ঠিক এভাবেই, আপনিও একটু চিন্তা করলেই বলে দিতে পারবেন "সর্বযুগের জীবনব্যাবস্থা" ও "বিজ্ঞানীদের তথ্যের সোর্স" কোরানে কি আছে আর কি নেই। চিন্তা করার সময় শুধু খেয়াল রাখবেন মুহাম্মদ ও তার যুগের কিংবা অতীত যুগের লোকেরা বিষয়টা জানতো কিনা। চলুন, এ নিয়ে কয়েকটা কুইজ দেখিঃ

@ কোরানে কি আছে—

#নিউক্লিয়ার পাওয়ারের কথা?
আপনার ধারনাঃ নেই।

রকেট ও মহাকাশ সম্পর্কে তথ্য?
আপনার ধারনাঃ নেই।

বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন সম্পর্কে কোন তথ্য?
আপনার ধারনাঃ নেই।

মরুভুমির উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রাকৃতিক কৌশল?
আপনার ধারনাঃ থাকা উচিত।

এই টপিকগুলো নিয়ে আপনি কিন্তু ঘেটে দেখেননি একটা একটা করে। আন্দাজ করেছেন মাত্র। এভাবে কোরান না দেখে যেকোন টপিকে আপনি চিন্তা করে বলে দিতে পারবেন সেটা কোরানে আছে কি নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার আন্দাজ সঠিক বলে প্রমানিত হবে। তার জন্য **সুত্র** কিন্তু **একটাইঃ**

সেটা হল-

বিষয়টা মুহাম্মদের যুগে জানা ছিলো = কোরানে উল্লেখ থাকতেও পারে,

বিষয়টা মুহাম্মদের যুগে জানার কথা নয় = কোরানে থাকবে না

এই সুত্রটা যদি সঠিক হয়, তাহলে এরকম একটা আদিম যুগের গ্রন্থ থেকে বিজ্ঞান পাওয়া যায় কিভাবে?

হ্যাঁ, এমন আদিম গ্রন্থ থেকেও বিজ্ঞান পাওয়া যেতে পারে। **কোরান থেকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে চাইলে আপনার কিছু গুন থাকতে হবে।** যেমনঃ

- **কথার অর্থ টুইস্ট/বিকৃত করা।**
- **সাধারন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা একটা কথার অসাধারন ব্যাখ্যা করে কথাটাকে অলৌকিক করে তোলা।**
- **তিলকে তাল বানানো।**____ *নরমাল কথাবার্তাকে চুইংগামের মত টেনে বর্ধিত করতে করতে সেটাকে বিজ্ঞান পর্যন্ত পৌছে দেয়া।* ***তবে এজন্য আপনাকে বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন টার্ম/শব্দাবলিও জানতে হবে।**
- **ভুল কথার ভুলটা অস্বীকার করে বরং সেটাকেই সঠিকে রুপান্তরিত করা।**

আমার স্পষ্ট মনে আছে, একুশে বইমেলা থেকে আমি পকেটের টাকা খরচ করে সর্বপ্রথম যে বইটা কিনেছিলাম, সেটার নাম ছিলো "**আল-কুরআনে বিজ্ঞান**"। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত। বইটি মূলত "Scientific Indications in the Holy Quran" নামক আরেকটি ইংলিশ বইয়ের বাংলা অনুবাদ। যাহোক, এই বইটি পড়তে গিয়েই কোরান নিয়ে আমার টুকটাক সন্দেহের সুত্রপাত হয়েছিলো। আমার ধারনা ছিলো কোরানে বিজ্ঞান ভালোভাবেই রয়েছে এবং সেটা স্পষ্ট ভাষায়। জানার আগ্রহ থেকেই বইটি কিনেছিলাম। কিন্তু কোরানীয় বিজ্ঞানের আসল রুপটা আমাকে হতাশ করেছিলো। আমার আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে কিছু মিলছিলো না। আমি খেয়াল করলাম, অতি সাধারন সব কথাবার্তাকে চতুর ব্যাখ্যা দ্বারা সেটাকে বিজ্ঞানময় বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। **যদিও আমি তখন খাঁটি ঈমানদার ছিলাম, তবুও, কোরআনে বিজ্ঞান রয়েছে তা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিলো।

দু'একটি উদাহরন দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করিঃ

- কোরানের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আর বৃষ্টির ফলে শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এই কথা থেকেই ইসলামি পন্ডিতরা কোরানে "পানিচক্রের নিখুঁত বর্ণনা" পেয়ে যান। অথচ, কোরানে উল্লেখ নেই পানিচক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ধাপ পানির বাষ্পীভবন (Water Evaporation) সম্পর্কে। কেননা, মুহাম্মদের যুগে পানির বাষ্পীভবন সম্পর্কে কারও জানার কথা না। আকাশ থেকে পানি পড়ে এবং ফসল ফলে... এতটুকুই জানার কথা এবং এটুকুই রয়েছে কোরানে।

- সন্তান উৎপাদনে পুরুষের বীর্যের অবদানের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে কোরানে। কিন্তু একটিবারও বলা হয়নি স্ত্রী ডিম্বাণুর কথা। কেননা, ডিম্বাণু মুহাম্মদ কিংবা তার সাঙ্গপাঙ্গ কখনও চোখে দেখে নি। তাই কোরানেও নেই। ডিম্বাণু শব্দটা কোরানে উল্লেখ না থাকলেও কোরানে রয়েছে "ভ্রূণবিদ্যার আধুনিক ব্যাখ্যা"।

- কোরানে রয়েছে "গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথে ঘূর্ণন বিষয়ক সঠিক তথ্য"। যদিও পুরো কোরানে "গ্রহ" শব্দটাই নেই। পুরো কোরান ঘেটে একটি আয়াতও পাবেন না যেটা বলছে, পৃথিবী ঘোরে। এমনকি, পৃথিবী গোল, তাও পাবেন না।

- কোরানে রয়েছে বিগ ব্যাং থিওরি। একটি আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাপাক আকাশ ও পৃথিবীকে আলাদা করে দিলেন। ব্যাস, উক্ত আয়াতে বিগ ব্যাং এর গন্ধ পেয়ে গেলো ইসলামী বিগ্যানীরা। যদিও বিজ্ঞান বলে বিগ ব্যাং সংগঠিত হয়ে যাওয়ার ৯.৩ বিলিয়ন বছর পরে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। তবুও, ইসলামী বিগ্যান অনুযায়ী, আকাশ আর পৃথিবী আলাদা হয়ে যাওয়া মানেই বিগ ব্যাং!

এরকম বহু উদাহরণ দেয়া যায়__ কিভাবে ইসলামী পন্ডিতরা কোরান থেকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করে। কোরানের অতি সাধারণ, অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা থেকে কিভাবে বিজ্ঞান আবিষ্কার করা যেতে পারে, সেটা নিয়ে একটা হাস্যরসাত্মক অথচ বাস্তবধর্মী উদাহরণ না দিলেই নয়।

"শ্রোডিঞ্জারের বিড়াল" নামক এক নাস্তিকের উপর ওহী নাযিল হয়েছে। ওহীর শিরোনাম "কাব্যিক ঝোপঝাড়"। তো, এই নাস্তিক শ্রোডিঞ্জারের বিড়াল তার উপর নাযিল হওয়া কাব্যিক ঝোপঝাড় এর মধ্যে ব্যাপক বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছেন এবং কাব্যিক ঝোপঝাড় কে তিনি ঐশি বাণী বলে প্রচারণা চালাচ্ছেন শিক্ষিত যুবকদের মাঝে।

কাব্যিক ঝোপঝাড়:

১) একদা আমি মলত্যাগ করিতে বসিলাম ঝোপঝাড়ে।

২) আর বিমোহিত হইতে ছিলাম মৃদু বাতাসের গন্ধে।

৩) হঠাৎ যৌনাঙ্গে তীব্র ব্যথানুভব করিলাম মশার কামড়ে।

৪) মুহুর্তেই সজোরে থাপ্পর দিয়া হত্যা করিলাম তারে!

৫) অতঃপর পানিদ্বারা কার্যসম্পন্ন করিলাম পরে!

অতঃপর এই "কাব্যিক ঝোপঝাড়" সুরা থেকে উক্ত নাস্তিক যেসকল বিজ্ঞান আবিষ্কার করলোঃ

১) প্রথম চরণে ঝোপঝাড়ে হাগু করার কথা বলা হয়েছে!! আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, বিষ্টা উত্তম জৈবসার, যা ঝোপঝাড়ের গাছের জন্য উপকারী।

২) দ্বিতীয় চরণে আছে, "”বাতাসের গন্ধে"! অবিশ্বাসীরা বলবে বাতাসের কি কোন গন্ধ আছে? হাহা... কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে বাতাসে ফুলের অসংখ্য পরাগরণু ঘুরে বেড়ায়। এসব রেণু ব্যাপন (diffusion) প্রকৃয়ার ফুল থেকে বাতাসে মিশে বাতাস কে সুগন্ধ করে তোলে!! আর একই চরণে উল্লেখিত "”মৃদু"" বাতাস সে ব্যাপন প্রকৃয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। আর ঝোপঝাড়ের আশেপাশে ফুল গাছ থাকাই স্বাভাবিক।

৩) তৃতীয় চরণে আছে "”যৌনাঙ্গে তীব্র ব্যথা"। আচ্ছা, সামান্য মশার কামড়ে যৌনাঙ্গে তীব্র ব্যথা অনুভুত হল কেন? আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় যৌনাঙ্গে অধিক ব্যথাগ্রাহী স্নায়ু(pain receptor) থাকে, যার ফলে ব্যথার তীব্রতা ও বেশি ছিল।

৪) ৪র্থ চরণটিতে আছে, মুহুর্তেই থাপ্পর দিয়া মশাকে হত্যা করা হল। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মাশা খুব কম সময়ের মধ্যে প্রতিকৃয়া জানাতে পারে। সুতরাং "মুহুর্তেই সজোরে থাপ্পর" না মারা হলে মশাটিকে হত্যা করা যেত না!!

৫) ৫নং চরণে আছে মশা মারার পর সে পানি ব্যবহার করল। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মশার দেহে বিভিন্ন রোগের জীবাণু থাকে। সুতরাং মশা মেরে হাত পানি দিয়ে না ধুলে ভয়ংকর রোগ ছড়াতে পারে।

কাব্যিক ঝোপঝাড়ে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি বিড়াল সাহেব। দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম ইসলাম এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগলেন তিনি। কোরান থেকে বিজ্ঞানের টুকিটাকি ভুল বের করে সবাইকে দেখাতে লাগলেন। বিড়াল সাহেব জানালেন, তার এই কোরানে ভুল ধরার মিশন অব্যাহত থাকবে।।

ডিম নিয়ে গবেষণারত কতিপয় মুসলিম বিগ্যানী

- **“ভেঙে মোর ঘরের চাবি” গানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– আসলে পাসওয়ার্ডের কথা বুঝিয়েছেন।**

যেসময়ে কোনো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, তারও বহু যুগ আগে নবী রবীন্দ্রনাথ পাসওয়ার্ডের কথা কইভাবে জানলেন ! রাসূল রবীন্দ্রনাথের বাণীতেই লুকিয়ে রয়েছে সব আধুনিক বিজ্ঞান ! যা দেখে বিজ্ঞানীদের মাথা হেট হয়ে গেল ! সুবহানাল্লাহ !

যেভাবে ত্যানাবাজি করে ব্যাখ্যা করে কুরআনে,বাইবেলে, তোরাহতে, গীতাতে মিরাকল, মোজেজা, বিজ্ঞান বা বিগ ব্যাং থিওরি- বের করা/ খুঁজে পাওয়া/বিজ্ঞানের সাথে সামনজস্য করা যায়, সেই একই ধারায় **ক্লাস ওয়ানের বাংলা বইয়ের কবিতায়ও বিগ ব্যাং থিওরির বর্ণনা পাওয়া যায়**। যেমন:

“আম পাতা জোড়া জোড়া,
মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া।
উরে বুবু সরে দাঁড়া,
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া খেপেছে,
চাবুক ছুড়ে মেরেছে।

১)আম পাতা জোড়া জোড়া :

মহাবিশ্বের যত কিছুর অস্তিত্ব আছে সবকিছুর ক্রিয়া বিক্রিয়া আছে অর্থাৎ জোড়া জোড়া।

এর অন্য আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে জোড়া জোড়া মানে বিগ ব্যাং এর আগে সবকিছু একত্রে জড়ানো ছিল !

২)মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া :

অর্থাৎ ভগবান জড়ানো এনার্জির উপর চাবুক মারার পর (বিগব্যাং) এনার্জি গুলি ঘোড়ার মতো চরে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ ইউনিভার্স, গ্যালাক্সি, গ্রহ, নক্ষত্র, হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৩)ওরে বুবু সরে দাঁড়া :

চাবুক মারার পরে (বিগ ব্যাং) বিস্ফোরিত হয়েছে এই জন্য জিন ফেরেশতাদের বা দেবদূতদের বা এন্জেলদের যেন কোনো ক্ষতি না হয় তাই জিন,এন্জেল, দেবদূত, ফেরেশতাদেরকে সরে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

৪)আসছে আমার পাগলা ঘোড়া :

অর্থাৎ বিগ ব্যাং এর ফলে যে এনারজি লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছে সেটা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫)পাগলা ঘোড়া খেপেছে :

অতএব সেই এনারর্জিগুলি যখন ক্ষেপে যাবে অর্থাৎ অবসান ঘটবে অথবা নেতিবাচক বিক্রিয়া ঘটবে।

৬)চাবুক ছুড়ে মেরেছে :

তখনই পুনরায় আবার সবকিছু একসাথে গুটিয়ে নেওয়া হবে, অর্থাৎ চাবুক ছুরে দেয়া হবে (কেয়ামত) ।।।

হে অন্ধবিশবাসী ধার্মিকগণ ! তবুও কি তোমরা কুরআনে, বাইবেলে, তোরাতে, গীতাতে মিরাকল বা বিজ্ঞান খুঁজে নিজেরদেরকে অপদস্থ করবে ?!!

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে '**ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান**' আবিষ্কারের একটা **ফ্যাশন** চালু হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের (Evidenced based knowledge) এই স্বর্ণযুগে, যখন মানুষ ১৪ কোটি মাইল দূরবর্তী মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান পাঠাচ্ছেন; কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সির খুঁটিনাটির কিনারা করছেন; এই চমকপ্রদ (magnificent) মহাবিশ্ব উৎপত্তির একদম আদিতে কী ঘটেছিল এবং পরবর্তী ১৩৫০ কোটি বছরে কী রূপে তার বিকাশ ঘটেছে - ইত্যাদি বিষয়ের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করছেন; সেই একই যুগে অবস্থান করে একদল মানুষ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, বিজ্ঞানের অবমাননা ও শ্লীলতাহানি করে 'ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান' প্রচার করে সাধারণ সরলপ্রাণ অজ্ঞ মানুষদের প্রতারিত করে চলেছেন। এই অপকর্মে তাঁরা যে-পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন, তাকে "জল পড়ে পাতা নড়ে" পদ্ধতি বলা যেতে পারে। নমুনা:

'"জল পড়ে পাতা নড়ে" এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারের 'ইঙ্গিত'!

*১) এখানে "**জল**" অর্থে জলের উপাদান 'হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন' বোঝানো হয়েছে। 'বিগ ব্যাং (Big Bang)' এর পরে 'হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম' ছিলো সৃষ্টির আদি অ্যাটম (Atom)। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুর আদি উপকরণ হলো অ্যাটম। পরবর্তীতে সৃষ্ট অন্যান্য সকল অ্যাটম সৃষ্টি হয়েছে এই 'হাইড্রোজেন' থেকে। আর 'অক্সিজেন' আমাদের বেঁচে থাকার এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।*

*২) এখানে "**পড়ে**" অর্থে Gravitational force বোঝানো হয়েছে, যা না হলে গ্রহ-নক্ষত্র-গ্যালাক্সি কোনোকিছুই সৃষ্টি হতো না। গ্রহ সৃষ্টি না হলে কোনো জীবের সৃষ্টি হতো না, আমরাও সৃষ্টি হতাম না। আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানের এই **ইঙ্গিতটি** লেখক কীভাবে জেনেছেন? সত্যিই আশ্চর্য!*

*৩) এখানে "**পাতা**" অর্থে সালোক সংশ্লেষণ (Photosynthesis) বোঝানো হয়েছে, যার ফলে উৎপাদন হয় অক্সিজেন। অক্সিজেনের অভাব হলে আমরা কি বাঁচতে পারতাম? "জল পড়ে পাতা নড়ে"-এর এক একটি "শব্দ" বিজ্ঞানের এক একটি অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ইঙ্গিত! কী আশ্চর্য!*

*৪) আর "**নড়ে**" এর মধ্যেই আছে বিজ্ঞানের দু'টি বিশাল 'ইঙ্গিত'। এখানে নড়ের এক অর্থ হলো 'বায়ু'! বায়ু ছাড়া কি কোনোকিছু নড়ে? নড়ে না। এখানে 'নড়ে' হলো "বায়ু, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল, অর্থাৎ স্পেস!" আর "নড়ে"-এর আরেক অর্থ হলো 'বল (Force)'! যেখানে বায়ু নেই সেখানে কোনো কিছু নড়াতে গেলে লাগে বল। এই 'বল ছাড়া সবকিছু অচল'!*

*কী আশ্চর্য! নিশ্চয়ই "**জল পড়ে পাতা নড়ে**"-এর রচয়িতা একজন নবী (ঈশ্বরের অবতার) ছিলেন। তাইই যদি না হবে, তবে আবিষ্কার হওয়ার আগেই কীভাবে তিনি বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের "**ইঙ্গিত**" দিতে পেরেছিলেন?'*

ধর্মে বিজ্ঞানঃ নিম গাছে আমের সন্ধানঃ

https://drive.google.com/file/d/1-6T7v_L6xwrpcCctt7f6IQPgyzn_RMkg/view?usp=drivesdk

ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান রঙ্গ ! ধর্মের কিতাবগুলোর বিজ্ঞানময় ব্যাখ্যা বের করা

ঘটনার সুত্রপাত আজ থেকে দুই বা আড়াই হাজার বছর আগে। এক বস্ত্রহীন পাগল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ একটি বুনো হাতি দৌড়িয়ে যাবার সময় সেই পাগলটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। সাথে সাথেই পাগলটা উঠে সেই হাতিটিকে গালাগাল দিতে শুরু করে। সেখানে এক ভাবুক কবি বসে পুথি লেখার চেষ্টা করছিল। তার নজর পড়লো সেই পাগলের উপর। কি এক খেয়াল হলো তার সে পাগলটির গালাগালগুলো চট করে লিখে নিলো। এবং সুন্দর করে সেগুলোকে ছন্দের আকৃতি দিল। সেটি অনেকটা এরকম-

"তুই এতো মোটা, মাথায় বুদ্ধি নেই এক ফোটা।"
"দেখতে তুই বলদের মতো, তুই গাধা।
দেখতে বড়, বুদ্ধি নেই এক ফোটা।"
"মেরে হাত ভেঙ্গে দেবো।
পিটিয়ে ছাল তুলে নিবো।
আবার নতুন করে চামড়াটা তোর গজিয়ে দেবো।"
"গোল মাথাটা তোর এত্তো বড়; গোটা পৃথিবীর সমান।"
"সারাদিন ডাকাডাকি করস জানুয়ার কোথাকার?"
"এমন ঘুষি দিবো সারাদিন খালি কাটবি চক্কর।"
"লাথি দিবো পেটে, দুধ হবে না তোর।"
"বুকের মধ্যে বুদ্ধি তোর দিবো করে বের।"
"এমন ঘুষি খাবি,
সব রক্ত বের করবো, বাচ্চা কোথাও না পাবি।"
"ভাবছিস কি শক্তি বেশী পাবো না তোর সাথে।
একদিন আমি শক্তি পাবো শাসন করবো তোকে।"
"এমন জিনিস বানাবো যে তোর মাথাটা নত হবে।
জগতে আর আমার মতো কাউকে না আর পাবি!"
"পুরো পৃথিবী মুঠোয় নিয়ে
দেখবো আমি উকি দিয়ে।
লুকালি তুই কোথায় গিয়ে?"
"বুঝবি তখন আমি কি না করতে পারি।
তোর জন্ম মৃত্যু বেঁচে থাকা
বশ্ করতে না ছাড়ি।"

দিনে দিনে পাগলটির অনেক ভক্ত জুটে গেলো। ভুল করে সেই পাগলটির ভক্তদের হাতে একদিন সেই কবির লেখাটি পৌছে গেল। এরপর কালে কালে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেলো। কিন্তু সেই পাগলের ভক্তরা বংশ পরম্পরায় বেঁচে থাকলো।

তার দুই হাজার বছর পরের কথাঃ

একবিংশ শতাব্দিতে এসে সেই পাগলের ভক্তদের কাছে এখন সেই পাগলটি ভগবান তুল্য হয়ে গেছে। তারা তাকে দেবতার আসনে তুলে দিয়েছে। দিনরাত তার পুঁজা করা হয়। কিছু বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তাদের কাজগুলো দেখে হাসাহাসি শুরু করে দিলো। তারা পাগলটির ভক্তদেরকে উপহাস করে বলতে লাগলো এই বিজ্ঞানময় জগতে এসেও এরা কুসংস্কারকে আকড়ে ধরে বসে আছে। শুনতে শুনতে পাগলের অন্ধভক্তকুল বিরক্ত হয়ে গেলো। আবার মনের ভেতর থেকে কিছুতেই তারা তাদের অন্ধবিশ্বাসকে বের করতে পারছিল না। অপরদিকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদেরকে কোন জবাবও দিতে পারলো না। এমন পরিবেশের মধ্যেই সময় অতিবাহিত হতে লাগলো। একদিন সেই পাগলের ভক্তকুলে একটি বাচ্চার আবির্ভাব হলো। সে পড়াশুনা করে অনেক জ্ঞান অর্জন করলো। কিন্তু মনের মধ্য থেকে সেই কুসংস্কারগুলো দুর হলো না। তাই সে তার অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্য সে বিজ্ঞানের সাথে তার অন্ধবিশ্বাসের মিল খুজতে লাগলো। সে যেহেতু বিশ্বাস করে তার বিশ্বাসটাই সত্য তাই সে ধরেই নিলো তার ধর্মের কথাগুলো বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যাবে না। এই অন্ধবিশ্বাসে সে তার প্রভু পাগলা বাবার নামে রচিত লেখাগুলো ভালো করে দেখতে

লাগলো। পড়তে পড়তে তার মনে হলো যে পাগলা বাবার বাণীগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানের কথা গুলো লেখা আছে। সে উত্তেজিত হয়ে একটি বই লিখে ফেললো তার ধর্মগ্রন্থটি কতটা বিজ্ঞানময় এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা কিভাবে সেই দুই হাজার বছর আগের তার ধর্মগুরুর লেখাগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে সেটা দেখিয়ে।

সে একটা একটা করে প্রমাণ দেখাতে থাকলো কিভাবে তার ধর্মগুরুর রচনার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের অতিসাম্প্রতিক কালের আবিষ্কারগুলোর ধারণা মিলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় সে টিভি, রেডিও এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে দাবী করলো, যেহেতু দুই হাজার বছর পুরোনো তার ধর্মগুরুর লেখার সাথে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ণ মিল আছে তাই তার ধর্মগুরু সত্য এবং তার ধর্মটিও সত্য। এ নিয়ে আস্তিককুলের মধ্যে বিরাট হইচই পরে গেলো। বছরের পর বছর ধরে প্রচার হতে লাগলো (মানে সেই পাগল বাবার ভক্তকুল প্রচার করতে থাকলো) সেই ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোর কথা মিলে গেছে। তারা নানা রকমের যুক্তি উপস্থাপন করে করে বিজ্ঞানীদেরকে দাঁত-মুখ-কান ভাঙ্গা জবাব দিতে থাকলো। তারা দাবী করলো যদি সেই পাগলা বাবা দেবতাই না হবে তবে তার বাণীর সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের কিভাবে মিল থাকে?

এমন কঠিন প্রশ্ন থেকে বাঁচার তাগিদে সমগ্র বিজ্ঞানীগন আদজল খেয়ে মাঠে নামলেন ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য। তারা সেই পাগলা বাবার বাণী খুলে যা পেলেন এবং তার সাথে বিজ্ঞানের মিল দেখানোর নিয়মগুলো দেখে যা পেলেন তা মোটামুটি এরকম-

প্রমান ১:

পাগলা বাবা তার লেখায় বলেছে প্রাণীদের আকৃতি যত বড়ই হোক না কেন তারা মানুষের চেয়ে কম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। যদি পাগলা বাবা দেবতাই না হবে তবে সে দুই হাজার বছর আগে কিভাবে জানলো যে মানুষই সবচেয়ে বুদ্ধিমান? সে কি সব প্রাণীদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছে যে তাদের বুদ্ধিমত্তা মানুষের চেয়ে বেশী নাকি কম? আমাদের গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা বলেছেন,- "তুই এতো মোটা, মাথায় বুদ্ধি নেই এক ফোটা।"

এখানে "তুই" বলতে মানুষ বাদে সমস্ত প্রাণীজগতকে বুঝানো হয়েছে। আফ্রিকার জঙ্গলের ভাষায় তুই শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। এটি দিয়ে পশুকে ডাকা হয়। আর তুই শব্দটি "তু" থেকে এসেছে যার অর্থ পশু বা বুদ্ধিহীন প্রাণী। আবার বলা হয়েছে মাথায় বুদ্ধি নেই এক ফোঁটা। বুদ্ধিমত্তা যে মানুষের মাথায় থাকে এটা দুই হাজার বছর আগের এক সাধারণ মানুষ কিভাবে জানলো? জ্ঞানবান দেবতা ছাড়া এটা কেউ বলতে পারে?

প্রমাণ ২:

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে, প্রাণী দেহের আকৃতি যত বড়ই হোক না কেন সেই প্রানীর বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করে প্রাণীটির মস্তিষ্ক কতটুকু তার উপর। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় মানুষের মস্তিস্কের আকৃতি সব প্রাণীর থেকে বড়। আর তাই মানুষই পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। অপরদিকে তিমি মাছের আকৃতি বিশাল হওয়া সত্যেও এর মস্তিস্কের আকৃতি ছোট বলে তিমি মাছের বুদ্ধিমত্তা অনেক কম। দা গ্রট দেবতা "পাগলা বাবা" বলেছেন,- "দেখতে তুই বলদের মতো, তুই গাধা। দেখতে বড়, বুদ্ধি নেই এক ফোটা।"

এই বাণীটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে তুই অর্থাৎ পশু এবং মাছেরা হলো বলদের মতো। এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা গাধা নামক প্রাণীটির মতো। এই বাণিটিতে পশুদেরকে আকার আকৃতিতে বিশাল বুঝাতে "বলদ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা যেহেতু অনেক নিচের স্তরের তাই তাদেরকে গাধার মতো বুদ্ধিহীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আফ্রিকার জঙ্গলের ভাষা অনুযায়ী গাধা শব্দটি এসেছে "গা" অর্থ আকৃতি বিশাল এবং "ধা" অর্থ বুদ্ধিহীন বা স্বল্প বৃদ্ধি। আফ্রিকার জঙ্গলের ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো "ধা" শব্দটি যখন "গা" শব্দটির পরে ব্যবহৃত হয় তখন এর সঠিক অর্থ হয় কম বুদ্ধির প্রাণী।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই গাধা শব্দটি দিয়ে বিশাল আকৃতির কম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন প্রাণীকে বুঝানো হয়েছে। এখন অবিশ্বাসীদের কাছে মিলিয়ন ডলারের প্রশ্নঃ যদি দা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা একজন দেবতাই না হবেন তবে তিনি সেই দুই হাজার বছর আগে কিভাবে জানলেন যে মানুষের চেয়ে বিশাল বিশাল আকৃতির তিমি মাছের বুদ্ধিমত্তা এতো কম? তিনি থাকতেন আফ্রিকার জঙ্গলে যেখানে তিমি মাছ দেখা অসম্ভব। তাহলে না দেখেই তিনি কিভাবে বললেন যে তিমি মাছের আকৃতি বিশাল হওয়া হত্তেও সেটির মস্তিস্কের আকৃতি এতো কম? একজন আফ্রিকার স্বাধারণ মানুষের পক্ষে এই কথাটি বলা অসম্ভব। তাও আবার দুই হাজার বছর আগে। অতএব আরেকবার প্রমাণিত হলো যে দা গ্রেট পাগলা বাবা একজন দেবতা সমতুল্ল ছিলেন অর্থাৎ একজন দেবতা ছিলেন। মানুষের পক্ষে এসব কথা সেই দুই হাজার বছর পূর্বে জানা সম্ভব ছিল না।

প্রমাণ ৩:

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে মানুষের ও পশুদের দেহের চামড়ায় একধরণের নার্ভ টিস্যু আছে। সেই নার্ভ টিস্যু সংকেত বহন করে মস্তিষ্কে পৌছে দেয়। এজন্যই মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীরা স্পর্শ অনুভব করে এমনকি নানা রকমের ব্যাথা অনুভব করে এই নার্ভ টিস্যুগুলোর কারণে। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে প্রাণীর চামড়ায় নার্ভটিস্যু আছে অর্থাৎ নার্ভাস সিস্টেম আছে। আর বিজ্ঞান আমাদের এটা জানিয়েছে এই কিছুদিন আগে। কিন্তু আমাদের দা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা এই তথ্যটি আমাদের জানিয়েছে সেই দুই হাজার বছর পূর্বে। তিনি বলেছেন,- "মেরে হাত ভেঙ্গে দেবো। পিটিয়ে ছাল তুলে নিবো। আবার নতুন করে চামড়াটা তোর গজিয়ে দেবো।"

এই বাণীটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে দেবতা পশুদেরকে এবং যারা অবিশ্বাসী তাদেরকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যারা তার কথার অবাধ্য হবে তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন। তাদের শাস্তির পরিমাণ এতো বেশী হবে যে তাদের শরীরের চামড়া অর্থাৎ ত্বক পর্যন্ত উঠে যাবে। এবং আবার নতুন চামড়া বা ত্বক গজানো হবে যাতে আবার করে শাস্তি দেওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হলো সেই দুই হাজার বছর আগের একজন আফ্রিকার জঙ্গলের মানুষ কিভাবে জানতে পেরেছিল যে চামড়ার নিচেই নার্ভটিস্যু আছে। মানুষের শরীরে যে নার্ভাস সিস্টেম আছে সেটি কি দুই হাজার বছরের পূর্বের কোন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব? সে সময়তো মানুষ শুধু চামড়া বা ত্বককেই দেখতে পেতে। সেই সময়ের মানুষের পক্ষে কি জানা সম্ভব যে চামড়াতে নার্ভ টিস্যু থাকে যা প্রাণীকে ব্যথার অনুভূতি দেয়। এটা একমাত্র কোন অতি ক্ষমতাবাণ দেবতারই জানা সম্ভব। যে তথ্যটি বিজ্ঞান আবিষ্কার করলো এই সেদিন সেই তথ্যটিই কিনা দেওয়া আছে সেই দুই হাজার বছর পূর্বের একটি গ্রন্থে। চিন্তা করে দেখেন !

প্রমাণ ৪:

আধুনিক বিজ্ঞান মাত্র কিছু কাল আগে আবিষ্কার করেছে যে পৃথিবীর আকৃতি গোলাকৃতির। প্রাচীন কালের মানুষ ভাবতো তারা যেমনটা দেখে যে পৃথিবী সমতল ঠিক তেমনি পৃথিবীর আকৃতি সত্যিই সমতল। এই ভ্রান্ত ধারণাটি দুই হাজার বছর আগে কেউ জানতো না। এই মাত্র কয়েক শতক আগে মানুষ প্রমাণ পেয়েছে যে পৃথিবী সমতল নয়। বরং পৃথিবী হলো গোলাকৃতির। দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা বলেছেন,- "গোল মাথাটা তোর এত্তো বড়; গোটা পৃথিবীর সমান।"

এই বাণীটিতে বলা হয়েছে প্রাণীদের মাথার আকৃতি যেমন গোল ঠিক একই ভাবে পৃথিবীর আকৃতিও গোল বা গোলাকৃতির। শুধু তাই নয় বলা হচ্ছে গোলাকৃতির পৃথিবীর আকৃতি বিশাল।

এখন আপনার একটু চিন্তা করে দেখুন যদি এই বাণী কোন দেবতার না হতো তবে কিভাবে এই অতিসাম্প্রতিক আবিষ্কারটির কথা সেই দুই হাজার বছর আগের কিতাবে লেখা থাকে? অবশ্যই এই বাণীটি কোন মানুষের নয়। দুই হাজার বছর আগের কোন মানুষ জানতোই না যে পৃথিবীর আকৃতি গোলাকৃতির। বরং তখন সবাই ভাবতো পৃথিবীর আকৃতি সমতল। অথচ দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদের বলছেন যে পৃথিবীর আকৃতি গোলাকৃতির মাথার মতই গোল। আপনারা জানেন যে পৃথিবীর আকৃতি সম্পূর্ন গোল নয়। এর মাঝের অংশ গোল এবং দুই পাশে সামান্য চ্যাপ্টা। একদম মাথার আকৃতির মতো। মাথা যেমনটা মাঝের অংশ গোল এবং উপর ও নিচে বর্তুলাকার ঠিক একই ভাবে পৃথিবীর আকৃতিও বর্তুলাকার। অর্থাৎ দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা সেই দুই হাজার বছর আগেই বলে গেছেন যে পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার। অথচ বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে কিছুদিন আগে।

প্রমাণ ৫:

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে পশুপাখিদেরও ভাষা আছে। তবে তাদের ভাষা মানুষের ভাষার মত নয়। তারা নানা রকমের শব্দ করে তাদের ভাব প্রকাশ করে। বিজ্ঞানীরা এই সেদিন আমাদের জানিয়েছে যে ছোট ছোট প্রাণীদেরও একটি বিশেষ ধরনের ভাষা থাকে। প্রাণীজগতেও যে মানুষের মতো ভাষা আছে সেটি প্রাচীণকালের মানুষের জানা ছিল না। এই কিছুদিন আগেই মাত্র মানুষ জানতে পেরেছেন যে প্রাণীদেরও ভাষা আছে। অথচ সেই দুই হাজার বছর আগে দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদের বলে গেছেন যে,- "সারাদিন ডাকাডাকি করস জানুয়ার কোথাকার?"

এই বাণীটিতে বলা হয়েছে প্রাণীরাও কথা বলে। তারা নানা ভাষায় ডাকাডাকি করে যা তারা তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য করে। এই বাণীটিতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো জানোয়ার। আফ্রিকা জঙ্গলের ভাষা অনুযায়ী জানুয়ার শব্দটির অর্থ হলো পশু ও পাখি। জানুয়ার শব্দটি এসেছে "জান" অর্থ প্রাণ এবং "য়ার" অর্থ সকল। আর জানুয়ার শব্দটি দিয়ে যখন ডাকাডাকা বুঝানো হয় তখন এর অর্থ হয়ে যায় সকল প্রাণী। আর আফ্রিকা জঙ্গলের ভাষায় ডাকাডাকি শব্দটি দিয়ে কথা বলা বা ভাবের আদান প্রদাণ

বুঝানো হয়। অর্থাৎ এই বাণীর সঠিক অর্থ হলো পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে ভাষা বিদ্যমান। চিন্তা করে দেখুন যা বিজ্ঞান আবিষ্কার করলো এই কিছুদিন আগে সেটা দুই হাজার বছর আগের একজন মানুষের পক্ষে বলা কিভাবে সম্ভব? এটি শুধু কোন অতিক্ষমতাবাণ দেবতার পক্ষেই বলা সম্ভব।

প্রমাণ ৬:

আধুনিক বিজ্ঞান আজ আমাদের জানাচ্ছে যে আমাদের এই পৃথিবী স্থির নয়। প্রাচীণকালের মানুষ যেমনটা মনে করতো যে আমাদের এই পৃথিবীটা বুঝি স্থির। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান দেখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের পৃথিবীটা স্থির নয়। বরং এটি প্রতিনিয়ত সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। দুই হাজার বছর পূর্বে দ্যা গ্রেট দেবতা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবী চক্রাকারে ঘুরছে। তিনি বলেছেন, - "এমন ঘুষি দিবো সারাদিন খালি কাটবি চক্কর।"

দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদের জানাচ্ছেন যে তার ক্ষমতা অসীম। সে চাইলেই যে কাউকেই যা খুশি তাই করতে পারেন। তিনি চাইলে সবাইকে সঠিক পথে আনতে পারেন। তার ক্ষমতা অসীম। তিনি আরো বলেছেন যে তিনি তার বল প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীকে চক্রাকারে ঘূর্ণনশীল করে তৈরি করেছেন। যা প্রাচীণকালের মানুষ জানতো না।

এই বাণীটিকে দেবতার শক্তি বুঝতে 'ঘুষি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আফ্রিকা জঙ্গলের ভাষায় 'ঘুষি' শব্দটি এসেছে 'পুষি' শব্দটি থেকে। আর আফ্রিকার ভাষায় 'পুষি' অর্থ শক্তি বা ক্ষমতা। এই বাণীতে দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি তার ক্ষমতা বলে পৃথিবীকে এমন অবস্থা করেছেন যে তা শুধু সারাদিন অর্থাৎ সব সময় সূর্যের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরছে। "সারাদিন খালি কাটবি চক্কর" অর্থাৎ পৃথিবী সব সময়ই চক্রাকারে ঘুরবে। আফ্রিকা জঙ্গলের ভাষায় ঘুষি শব্দটি যখন চক্রাকারে ঘুরার অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন এর দ্বারা গোলাকার কোন বৃহৎ কিছুর চক্রাকারে ঘুর্নন বুঝায়। অর্থাৎ দ্যা গ্রেট দেবতা সেই দুই হাজার বছর পূর্বেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার এবং এটি চক্রাকারে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে সেই দুই হাজার বছর আগের একজন স্বাধারণ মানুষ কিভাবে জানলো যে আমাদের পৃথিবী শুধু গোলাকারই নয় বরং এটি সূর্যের চারপাশে প্রতিনিয়ত চক্রাকারে ঘুরছে। কোন মানুষের পক্ষে কি এমন কথা বলা সম্ভব যা বিজ্ঞান মাত্র কিছুদিন আগে আবিষ্কার করেছে? এর উত্তর হলো দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা কোন মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেবতা।

প্রমাণ ৭:

দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদেরকে সেই দুই হাজার বছর আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দুধ হয় পেটের ভিতর থেকে। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে মানুষ এবং প্রাণীদের মধ্যে যারা দুধ প্রদান করে তাদের দুধ তৈরী হয় তাদের পেটের খাবার থেকে উৎপন্ন পুষ্টি থেকে। দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদের জানাচ্ছেন যে,- "লাথি দিবো পেটে, দুধ হবে না তোর।"

অর্থাৎ দ্যা গ্রেট দেবতা আমাদের জানাচ্ছেন যে হে দুগ্ধ প্রদানকারী মানব ও পশুগণ তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং আমার উপাসনা করো। যদি তোমরা তা না করো তবে তোমাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করবো। আমি তোমাদের পেটে আঘাত করবো ফলে তোমরা খাদ্য হজম করতে পারবে না। ফলে তোমরা দুগ্ধ উৎপাদন করতে পারবে না।

মানুষ ও পশুরা যে খাবার খায় তা থেকে যে দুধ তৈরি হয় সেটা আগেকার দিনের মানুষরা জানতো না। তারা ভাবতো যে দুধ হয় বিশ্রাম নেবার কারণে। আর আধুনিক বিজ্ঞানের দুধ বিষয়ক আবিষ্কারের আগে কোন মানুষই জানতো না যে কিভাবে মায়ের দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। অথচ সেই দুই হাজার বছর পূর্বেই দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদের সে সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে গেছেন। যা পাগলা বাবা বলেছেন সেই দুই হাজার বছর আগে আর বিজ্ঞান সেটা আবিষ্কার করেছে এই কিছুদিন আগে। তাহলে একবার ভেবে দেখুন সেই দুই হাজার বছর আগে যেখানে বিজ্ঞানের জ্ঞান পৌছাতেই পারেনি সেখানে একজন মানুষ কিভাবে বিজ্ঞানের আধুনিক কালের আবিষ্কারের কথা জানতে পারলো? এর কারণ হলো দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা ছিলেন একজন সর্বজ্ঞানী দেবতা।

প্রমাণ ৮:

আগেকার দিনের মানুষ ভাবতো যে মানুষের বুদ্ধিমত্তা থাকে তার বুকে। আধুনিক কাল পর্যন্ত ইউরোপিয়ান বিজ্ঞান আমাদেরকে জানিয়েছে যে মানুষের বুদ্ধি থাকে তার বুকের ভিতরে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান এই কিছুদিন আগে আবিষ্কার করেছে যে মানুষের বুদ্ধিমত্তা তার বুকে থাকে না। বরং মানুষের বুদ্ধিমত্তা থাকে তার মাথায়। তার মস্তিষ্কে। দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদের জানিয়েছেন যে,- "বুকের মধ্যে বুদ্ধি তোর দিবো করে বের।"

↥

অর্থাৎ দ্যা গ্রেট দেবতা মানুষ ও পশুদের বুদ্ধিমত্তা বুকে রাখেননি। তাহরে কোথায় রেখেছেন? আগেই বলেছি দ্যা গ্রেট দেবতা 'মাথা মোটা' বলেছেন। অর্থাৎ পশু ও মানুষের বুদ্ধিমত্তা মাথায় থাকে। মাথার ভিতরে যে মস্তিষ্ক আছে সেখানেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা থাকে। দ্যা গ্রেট দেবতা আমাদের দুই হাজার বছর আগেই বলে দিয়েছন যে তোমরা মানুষের বুকের ভেতর বুদ্ধি মত্তা খুজো না; কারণ দ্যা গ্রেট দেবতা বুদ্ধিমত্তা বুকের ভিতর থেকে বের করে দিয়েছেন। এবং বুদ্ধিমত্তা মাথার মস্তিষ্কের ভেতরে রেখেছেন। যা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করলো এই সেদিন অথচ দ্যা গ্রেট দেবতা তা বলেছেন সেই দুই হাজার বছর পূর্বেই।

প্রমাণ ৯:

প্রাচীণকালের মানুষ ভাবতো তারা দৈহিক মিলনের মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম দেয়। তাদের বিশ্বাস ছিল একমাত্র দেবতা ছাড়া কোন নারীই পুরুষের সাথে মিলন ব্যতিত বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না। এবং তারা মনে করতো বাচ্চা জন্ম দানে কোন রক্তের দরকার হয় না। এবং বাচ্চা শুরুতেই পূর্নরুপে পেটে সৃষ্টি হয়। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে বাচ্চা পূর্ণরুপে পেটের মধ্যে তৈরী হয় না। বরং এটি তৈরি হয় রক্তের মাধ্যমে। পুরুষের শুক্রানু এবং নারীর ডিম্বানু পরস্পরের সাথে মিলে যায় এবং রক্ত ও পুষ্টির মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম নেয়। একই কথা আপনারা পাবেন আমাদের দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার বাণীতে। তিনি বলেছেন- "এমন ঘুষি খাবি, সব রক্ত বের করবো, বাচ্চা কোথাও না পাবি।"

এই বাণীটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে যদি নারীর শরীরের সব রক্ত বের করে দেওয়া হয় তবে সে আর সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। আফ্রিকার জঙ্গলের ভাষায় রক্ত শব্দটি এসেছে "র"-এর ভক্ত (অর্থাৎ রক্ত) শব্দটি থেকে। আফ্রিকার জঙ্গলের ভাষায় "র" দিয়ে এক বিশেষ বস্তু কে বুঝায় যা নরম তুলতুলে কেঁচুর মতো ঝুলন্ত বস্তুকে বুঝায়। আর যখন "র" শব্দটি দিয়ে ভক্তকে বুঝায় (যেমন "র"-এর ভক্ত) তখন এর অর্থ হয়ে যায় তুলতুলে নরম শিশু স্বদৃশ্য সুন্দর সৃষ্টি। অর্থাৎ দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার পবিত্র বানী সেই দুই হাজার বছর আগেই বলেছে যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্ম কিভাবে হয়। প্রাণীদের এবং মানুষের বাচ্চা জন্মের সময় বা সৃষ্টির সময় নরম তুলতুলে কেঁচুর মতো পদার্থের থাকে সেটা দুই হাজার বছর আগের কোন মানুষের জানা সম্ভব ছিল না। দ্যা গ্রেট দেবতা কি সেই দুই হাজার বছর আগে মানুষের পেটে কিভাবে বাচ্চার সৃষ্টি হয় সেটা দেখেছিল?

আধুনিক বিজ্ঞান বলে মানব ভ্রুণ দুই সপ্তাহ বাদে নরম তুলতুলে কেঁচুর মতো ঝুলন্ত বস্তু স্বদৃশ্য হয়ে যায়। দুই হাজার বছরের পুরোনো আমাদের দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার বাণীতে লেখা আছে যে মানব সন্তান জন্মের সময় কেঁচুর মতো নরম তুলতুলে ঝুলন্ত বস্তুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার মানব জন্ম পদ্ধতির সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের হুবহু মিল রয়েছে। মানুষের সন্তান যে রক্ত ছাড়া বাঁচতে পারবে না সেটা আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এই কিছুদিন আগে। যা আধুনিক বিজ্ঞান জানলো এই কিছুদিন আগে সেটা দুই হাজার বছরের পুরোনো বাণীতে কিভাবে লেখা থাকে!

প্রমাণ ১০:

আজ থেকে দুই তিন হাজার বছর আগে মানুষ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে করতে জীবন অতিবাহিত করেছে। তার কোন প্রযুক্তির জ্ঞান ছিল না। তারা মানুষের তৈরি অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করতো। তারা তীর ধনুক, তলোয়ার বর্শা ইত্যাদি ব্যবহার করতো। তারা জানতো না যে মানুষ এক সময় এতো উন্নত হবে যে তারা বন্দুক, কামান, এমনকি বোমা আবিষ্কার করবে। এবং তারা পুরো পৃথিবীকেই শাসন করবে। তারা পৃথিবীর সব প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ট হবে এবং সমস্ত পৃথিবীর সব প্রাণীকেই বশ করতে পারবে। শুধু তাই নয় প্রকৃতির বড় বড় প্রাণী যেমন হাতি বা তিমিকে যে মানুষ বশ করতে পারবে সেটা দুই হাজার বছর আগের মানুষের জানা ছিল না। এ সম্পর্কে দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদের বলেছেন- "ভাবছিস কি শক্তি বেশী পাবো না তোর সাথে। একদিন আমি শক্তি পাবো শাসন করবো তোকে।" "এমন জিনিস বানাবো যে তোর মাথাটা নত হবে। জগতে আর আমার মতো কাউকে না আর পাবি!"

এই বাণী দুটোতে বলা হয়েছে যে প্রাচীনকালে মানুষের বাহুবল কম ছিল। তারা প্রকৃতিতে বিদ্যমান শক্তিশালী প্রাণী যেমন বাঘ, সিংহ ইত্যাদির সাথে পেরে উঠতো না। সেই সময়ের মানুষ যে আজকের দিনের আধুনিক শক্তিশালী প্রযুক্তিতে উন্নত মানুষে পরিণত হবে সেটাই এই বাণীটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দুই হাজার বছর পুর্বেই দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে মানুষ এক সময় আধুনিক অস্ত্র শস্ত্র আবিষ্কার করবে। তারা রকেট, এটমিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, ইত্যাদি আবিষ্কার করে পুরো পৃথিবীকেই শাসন করবে। মানুষ এমন প্রযুক্তি আবিষ্কার করবে যে পৃথিবীর সব প্রাণী মানুষের কাছে মাথা নত করবো।

চিন্তা করুন, দুই হাজার বছর পূর্বের একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে কি কখনও জানা সম্ভব ছিল যে এক সময় মানুষ এতো এতো প্রযুক্তি আবিস্কার করবে? রকেট, মহাকাশ যান, বোমা এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলা হয়েছে সেই দুই হাজার বছর আগে অথচ আধুনিক বিজ্ঞান তা আবিষ্কার করলো এই সেদিন।

প্রমাণ ১১:

আজ প্রযুক্তি এতো উন্নত হয়েছে যে মানুষ আজ ঘরে বসেই সারা পৃথিবীর খবর জানতে পারছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষের সাথে যুগাযুগ করতে পারছে মুহূর্তেই। শুধু তাই নয় মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর সব তথ্যই দেখতে পাচ্ছে হাতের মুঠোর মধ্যে থাকা মোবাইল ডিভাইসটির মাধ্যমে। আজ এমন প্রযুক্তি রয়েছে যে মানুষ আজ কোন মানুষের অবস্থান যেকোন জায়গায় থেকেই বের করতে পারে। সে শুধু তার মোবাইল ফোনটিতে সার্চ দিবে আর তার দরকারী মানুষের অবস্থান সে জেনে যাবে। অথচ এই তথ্যটি দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা সেই দুই হাজার বছর আগেই দিয়ে গেছেন। দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা তার বাণীতে বলেছেন.- "পুরো পৃথিবী মুঠোয় নিয়ে দেখবো আমি উকি দিয়ে। লুকালি তুই কোথায় গিয়ে?"

এই বাণীটিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে মানুষ এক সময় এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করবে যা দিয়ে সে যে কাউকেই খুজে বের করতে পারবে। সে কোথায় আছে বা কোথায় লুকিয়েছে সব তথ্যই সে যন্ত্রটির মাধ্যমে বের করতে পারবে। অর্থাৎ দুই হাজার বছর আগেই দ্যা গ্রেট পাগলা বাবা আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন যে মানুষ এক সময় স্মার্ট মোবাইলফোন আবিষ্কার করবে। শুধু তাই নয় মানুষ যে এক সময় ঘরে বসেই পৃথিবীর সব খবর জানতে পারবে এবং পৃথিবীটা যে তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে সেটিই এই বাণিটির মাধ্যমে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন আমাদের দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা। আধুনিক বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে এই সেদিন সেটা পাগলা বাবা বলেছেন দুই হা জার বছর আগে। চিন্তা করে দেখুন!

প্রমাণ ১২:

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এতো এতো উন্নত যে মানুষ যেকোন রোগেরই চিকিৎসা করাতে পারে। ৯৯% ক্ষেত্রে মানুষের রোগ ভালো করার ক্ষমতা মানুষের আছে। এছাড়া ভয়ংকর রকমের দুর্ঘটনায় আক্রান্ত রোগীকেও বাঁচিয়ে তুলতে পারে। ভালো চিকিৎসা দিয়ে যেমন মৃতপ্রায় মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে ঠিক একই ভাবে মানুষের আয়ু দীর্ঘ করার ক্ষমতাও মানুষ লাভ করেছে। এখন মানুষ আগের তুলনায় অনেক দিন বাঁচে। অর্থাৎ মানুষের গড় আয়ু অনেক বেড়ে গেছে। দ্যা গ্রেট দেবতা আমাদের বলেছেন, "বুঝবি তখন আমি কি না করতে পারি। তোর জন্ম মৃত্যু বেঁচে থাকা বশ্ করতে না ছাড়ি।"

এই বাণীর মাধ্যমে দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে মানুষ এব সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি সাধন করবে। তারা প্রযুক্তিতে ও বিজ্ঞানের আবিষ্কারে অনেক উন্নতি সাধন করবে। তারা এতোটাই উন্নত হবে যে তারা অনেক আপাত অসম্ভব কিছুকে সম্ভব করতে সক্ষম হবে। এটা আমাদের দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা সেই দুই হাজার বছর আগেই বলে গেছেন। আর আজকে আধুনিক বিজ্ঞান তা সত্য বলে দেখিয়েছে। দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা আরো বলেছেন, মানুষ এক সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানে এতোটা উন্নতি সাধন করবে যে তারা মানুষ সহ সব পশুপাখিদের জন্ম মৃত্যু নির্ধারন করতে পারবে। তারা মৃত্যু প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রন করার মতো ক্ষমতা রাখবে। আজ আমরা দুই হাজার বছর পরে এসে দেখতে পাচ্ছি যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষকে কৃত্তিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। যা আমাদের গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা দুই হাজার বছর পূর্বেই বলে গেছেন। মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করা, জন্ম নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা আবিষ্কার এবং কৃত্তিম ভাবে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার ধারণা সেই দুই হাজার বছর আগেই আমাদের গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা দিয়ে গেছেন। আর সেই ধারণা অনুসরন করেই আধুনিক বিজ্ঞান এসব আবিষ্কার করেছে।

- তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার রয়েছে সবগুলোরই ইঙ্গিত আমাদের দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা সেই দুই হাজার বছর আগেই দিয়ে গেছেন। আর সেটা পড়ে এবং অক্ষরে অক্ষরে অনুসরন করে মানুষ গবেষনা করে এসব আবিষ্কার করেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরাই আমাদের দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার বাণীগুলো পড়েই এইসব আবিষ্কার গুলোর ইঙ্গিত পেয়েছে এবং সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো করেছে। অর্থাৎ একথা নির্দ্বিধায় প্রমাণিত হয় যে আমাদের দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার বাণীগুলো আধুনিক বিজ্ঞানে সাথে একদম মিলে যায়। যেহেতু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করার দুই হাজার বছর আগেই পাগলা বাবা এগুলো বলে গেছেন তাই এটা নিঃসন্দেহেই প্রমাণীত হয় যে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারই আমাদের গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার বাণীগুলো নকল করেই করা হয়েছে।

  আমাদের দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার মাত্র একটি বাণীকাব্য (সুরা) থেকে বিজ্ঞানের এতো এতো আবিষ্কারের কথা জানতে পারছি। তাহলে আপনারাই চিন্তা করুন যে আমাদের দ্যা গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার সম্পুর্ণ বাণীগুলো পড়লে কি পরিমাণ বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পাওয়া সম্ভব!

- আর তাই একথা নির্দিধায় বলা যায় যে আমাদের গ্রেট দেবতা পাগলা বাবা একজন অতিক্ষমতাবান দেবতা। এবং তার প্রবর্তিত ধর্ম জংলী ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। যারা এই ধর্ম অনুসরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে একশো সত্তরটি স্বর্গের অসীম সুখ। আর যদি তারা এই ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে তবে তাদের জন্য রয়েছে একশো বাহাত্তরটি নরকের অসীম যন্ত্রনা। অতএব সবারই উচিত দলে দলে জংলী ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা। পৃথিবীর সব শিশুই জংলী ধর্মের অনুসারী হয়ে জন্মে। পরবর্তীতে তার বাবা মা তাকে ভিন্ন ধর্মে কনভার্ট করে ফেলে। এজন্যই সবার উচিত জংলী ধর্মে সামিল হয়ে অশেষ পুন্য অর্জন করা।

  যারা জংলী ধর্মের সমালোচনা করবে তাদের জন্য রয়েছে একশো বাহাত্তরটা নরকের শাস্তি। এবং আমাদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেবার জন্য রয়েছে ইহজগতে ধর্ম অবমাননার শাস্তি।

  আমাদের ধর্ম জংলী ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে; যা প্রমাণ করে আমাদের ধর্মটিই একমাত্র সত্য ধর্ম।

  (মহান গ্রেট দেবতা পাগলা বাবার প্রতি দরুদ পাঠ করুন!)

কিন্তু জংলী ধর্মের অনুসারীর লেখা বইটি পড়ে বিজ্ঞানীরা প্রতিবাদ করে বলতে লাগলো এটাতো ভূল কথা বলেছে। এই বাণীগুলোতে বিজ্ঞানের কিছুই বলা নেই। বরং নানা রকমের ভূল কথা বলা হয়েছে। প্রাচীণকালের সাধারণ মানুষের বলা কিছু কথার অর্থকে বদলে দিয়ে এবং নানা রকমের ভিন্ন ব্যাখ্যা এনে এর সাথে বিজ্ঞানের মিল দেখানো হয়েছে। নানা রকমের তুচ্ছ কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিজ্ঞানময় বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই বাণীগুলোর সাথে বিজ্ঞানের কোনই মিল নেই। এগুলো প্রাচীণকালের মানুষের লেখা কিছু অস্পষ্ট বুলি মাত্র। এর সাথে বিজ্ঞানের কোনই মিল নেই। এই লেখক যেভাবে দাবী করেছে যে এই বাণীগুলোর সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মিল রয়েছে সেটা পুরোটাই বানানো কথা। বরং নানা রকমের গোজামিল দিয়ে পৃথিবীর সব ধর্মের অনুসারীদের মতই তাদের ধর্মগ্রন্থকে বিজ্ঞানময় দাবী করা হয়েছে। ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের মিলের যে দাবী করা হয় তা সম্পূর্ণই মিথ্যা।

এই বক্তব্য শুনার পর জংলী ধর্মের অনুসারীরা রে রে করে উঠলো। তারা ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানার অপরাধে বিজ্ঞানীদের উপর আক্রমন করে বসলো।

রোজা ও অটোফেজির মধ্যে পার্থক্য ও মুমিনদের মিথ্যাচার, অপপ্রচার

ইসলামিক রোজা নিয়ে ইসলামিস্টদের প্রচার করা বিভিন্ন প্রোপাগাণ্ডার জবাব

ফেসবুকে প্রতি বছর 'অটোফ্যাগি মানেই রোযা', এ বিষয় নিয়ে যে অপবিজ্ঞান ও ভ্রান্তবিজ্ঞান (সিউডোসায়েন্স) সবাই ছড়িয়ে থাকে, সে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। রোজার মাস আসলেই মুসলিমরা গর্ব করে রোজার নানা ফজিলত ব্যক্ত করে। **তারা ফাস্টিং এবং অটোফেজির যে** বিষয় গুলো নিয়ে আসে, সেটার সাথে আসলে রোজার কোন সম্পর্ক নেই। রোজা আর ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিংকে তারা এক করে ফেলে।

চারিদিকে রোজার উপকারিতা নিয়ে মহা ধুমধামে প্রচারণা চললেও এই কথাটা বুঝিয়ে বলার কেউ নেই যে রোজা আর ফাস্টিং আসলে এক নয়। এবং ইদানীং এর সাথে যোগ হয়েছে অটোফেজি, যার কারণে মুমিনরা আরও বেশি রোজা নিয়ে গর্ব করছে। ফাস্টিং আসলে ইসলামে প্রথম নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় ফাস্টিং প্রচলিত আছে। মুসলিমরা রোজা রাখলে তাকে বলা হয় 'সিয়াম'। খ্রিস্টানরা রোজা রাখলে তাকে বলা হয় 'ফাস্টিং'। হিন্দু বা বৌদ্ধরা রোজা রাখলে তাকে বলা হয় 'উপবাস'। মেডিক্যাল সাইন্সে রোজা রাখকে বলা হয় 'অটোফেজি'।

'অটোফেজি' তে গবেষণা করে বিজ্ঞানী ইয়োশিনোরি ওহশোমি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল। এ টি ওজন কমানো এবং শরীরের টক্সিক উপাদান গুলো বের করে দিতে সাহায্য করে। কিন্তু মুসলিমদের রোজা এই বিষয়ে কয়েকটি দিক থেকে ভিন্ন। এই লেখায় প্রতিটি বিষয় কি এবং এর পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

- ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা অটোফেজি কি?

"অটোফেজি" আক্ষরিক অর্থ হল নিজেকে খাওয়া। আমরা যখন না খেয়ে থাকি তখন আমাদের শরীরের কোষ গুলো বেকার হয়ে যায়। কিন্তু তারা নিষ্ক্রিয় বসে না থেকে শরীরের আবর্জনা গুলো পরিষ্কার করতে থাকে। আমরা যখন দীর্ঘ সময় খাওয়া থেকে বিরত থাকি, তখন আমাদের শরীরের কোষ গুলো বাইরে থেকে খাওয়া না পেয়ে নিজেই নিজেকে খাওয়া শুরু করে। এ সময়ে আমাদের শরীরের যেমন অতিরিক্ত মেদ কমাতে সাহায্য করে, তেমনি আমাদের শরীরের টক্সিক জিনিষ **গুলো** Detox and Flush Out **হয়ে যায়।** আমাদের শরীরে কোষ গুলো অনেক কাজ করে ফলে তারা কোষের ময়লা আবর্জনা গুলো ভালো ভাবে বের করে দিতে পারে না। আমরা যদি খাওয়া বন্ধ করে দেই তাহলে শরীরের কোষ গুলো এই আবর্জনা বের করে দিতে সময় পায় এবং এই Flush করার জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়।

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং হল খাওয়া এবং খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকার একটি সাইকেল। যেখানে আপনি দিনের মধ্যে একটা সময়ে খাদ্য খাবেন এবং কিছু সময় খাদ্য না খেয়ে শুধু পানি বা Liquid খেয়ে থাকবেন।

- ফাস্টিং কিভাবে করতে হয়?

অটোফেজির খাওয়া এবং ফাস্টিং করার সাইকেল বিভিন্ন ভাবে প্রাকটিস করা যায়। যেমন আপনি 6 Popular Ways to Do Intermittent Fasting এই আর্টিকেল টি তে পড়ে দেখতে পারেন। ফাস্টিং এর সময় আপনি কোন ধরণের সলিড খাবার খেতে পারবেন না। তবে আপনি কি খাবেন সেটার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি কখন খাবেন সে বিষয় টা হল জরুরী । আপনি দিনে ঘড়ি ধরে চাহিদা অনুযায়ী ১৩ থেকে ২৪ ঘণ্টা খাওয়া দাওয়া ছাড়া থাকবেন। এবং এটা করবেন সপ্তাহে দুইবার। তবে অবশ্যই আপনাকে ফাস্টিং অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ পানি খেতে হবে।

- ফাস্টিং এ কি কি খাওয়া যাবে?

অনেকেই প্রশ্ন করে যে ফাস্টিং করলে কি কি খাওয়া যাবে বা যাবেনা। এখানে Intermittent Fasting 101 — The Ultimate Beginner's Guide আর্টিকেল অনুযায়ী, ফাস্টিং অবস্থায় আপনি আপনার খুশি মতো যে কোন ধরনের লো ক্যালোরি লিকুইড খেতে পারবেন। যেমন গ্রিন টি, কফি, জুস ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং ডাক্তাররা বেশি বেশি পানি এবং জুস খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

- রোজা কি ফাস্টিং? রোজার সাথে অটোফেজির পার্থক্য কি?

মুসলিমরা মনে করে যে রোজা আর ফাস্টিং একই জিনিস। কিন্তু এটা তাদের ভুল ধারণা। রোজা আর ফাস্টিং এর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন রোজা রাখা হয় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু ফাস্টিং করা হয় ঘড়ি ধরে ১৩-২৪ ঘণ্টা। রোজার মধ্যে পানি খাওয়া যায় না কিন্তু ফাস্টিং এ ডাক্তাররা প্রচুর পরিমাণ পানি খাওয়ার পরামর্শ দেন। রোজা টানা এক মাস রাখতে হয় কিন্তু ফাস্টিং সপ্তাহে ২-১ বারের বেশি নয়।

রোজা আসলে অন্যান্য ধর্মের উপবাসের মত ইসলাম ধর্মের একটি রীতি।
রোজা:
১। এখানে মেডিকেল কোন ভালো দিক চিন্তা করে করা হয় না।
২। কোন খাবারই গ্রহণ করা যায়না।
৩। প্রচন্ড গরম যেসব যায়গায়, সেখানকার শ্রমিক লোকদেরও কায়িক পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হয়। বডি থেকে প্রচুর পানি ফহামে বের হয়ে ডিহাইড্রেটেড হয়ে ইন্টারনাল অরগানের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেলেও কিছু করার নেই। আল্লাহর নামে চলিলাম, মরি বাঁচি! নানা ধরণের শারীরিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলেও সহ্য করতে হয়
৪। রোজা সূর্য ওঠার আগ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কোথাও ৬ ঘন্টা কোথাও ২৩-২৪ ঘন্টা! অবস্থান হিসেবে আলাদা, ব্যক্তি বিশেষে সক্ষমতা অনুসারে নয়।
৫। সারাদিন না খেয়ে সারা রাত যত খুশি যত খুশি খাওয়া যায়।
৬। টানা এক মাস করতে হয়।
৭। অতি প্রাচীন কাল থেকেই নানা ধর্মে বা অঞ্চলে নানাভাবে প্রচলিত এবং কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

- মেডিকেল ফাস্টিং (অটোফেজি):

১। বিশেষজ্ঞের পরামর্শে শুরু ও শেষ হয়।
২। প্রধানত নানা রকম টেস্ট করতে, ওজন কমাতে, চিকিৎসার প্রয়োজনে করতে হয়। সুস্থ থাকতেও করা যেতে পারে। সাধারণত সপ্তাহে এক দিন যা সারা বছর করা যেতে পারে।
৩। পানি, নানা তরল খাবার বা ওষুধ এমনকি সামান্য খাবার গ্রহণ করা যায়।
৪। নির্দিষ্ট ব্যায়াম/কাজকর্ম করতে হয় বা এড়িয়ে চলতে হয়।
৫। ব্যাক্তি ও চাহিদা অনুযায়ী সময় নির্ধারিত হয়। সাধারণত সপ্তাহে ২-১ দিন, ১৩ ঘন্টা থেকে ২৪ ঘন্টা হতে পারে।
৬। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট খাবার খেতে হয়।
৭। নির্ধারিত সময়ে করতে হয়।
৮। কোন সমস্যা দেখামাত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়।
৯। এটা বিজ্ঞানসম্মত ।
তাই, রোজা কিছুতেই মেডিকেল ফাস্টিং বা অটোফেজি নয়।

- রোজা থাকলে কি কি ক্ষতি হতে পারে?

আমাদের দেশে আমরা যেভাবে সারা দিন না খেয়ে দিন শেষে ইচ্ছা মতো ভাজা পোড়া খাই, তা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এতে শরীরের টক্সিসিটি আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
আমাদের রোজা রাখার পর হালকা খাবার খাওয়া উচিৎ এবং ভাজা পোড়া, তেল যুক্ত খাবার পরিহার করা উচিৎ । আমাদের যতদূর সম্ভব লিকুইড জাতীয় খাবার, ফল মূল, এবং শাস্থ সম্মত খাবার খাওয়া উচিৎ।
মুমিনরা মুলত অটোফেজি বা মেডিকেল ফাস্টিং এর উপকারিতা গুলোই রোজার উপকারিতা বলে চালিয়ে দেন। এটা একটি অপ প্রচার ছাড়া কিছুই নয়।
দীর্ঘক্ষণ পানি পান না করাঃ শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থভাবে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত পানি পান করা আবশ্যক। কিন্তু রোজা রাখলে আমরা ১৩-১৯ ঘন্টা শরীরে কোন পানি সাপ্লাই দেইনা, উপরন্তু এসময় মূত্রত্যাগ এবং ঘামের কারণে শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়, যা সাথে সাথে পূরণ করার কোন উপায় থাকেনা। এ থেকে শরীরে মারাত্মক ডি-হাইড্রেশন হয়। যাদের

ব্লাড প্রেশার, ডায়বেটিস, রক্ত শুন্যতা, হাইপার টেনশন, ইত্যাদি রোগ আছে অথবা গ্যাস্ট্রিক আলসার রোগ আছে, তাদের জন্য রোজা মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।

হ্যা, রোজা বা উপবাসের কিছু কিছু উপকারিতা আছে। তবে সে রোজা ইসলামী বিধানের রোজা নয়।**সেই রোজার মধ্যে অল্প খাওয়া বাধ্যতামূলক**।

রোজা ও অটোফেজির মূল পার্থক্য হলো রোজার সময় কিছুই খাওয়া যায় না। অন্যদিকে অটোফেজির সময় অল্প কিছু খাবার এবং জল বা জুস খাওয়া বাধ্যতামূলক। আসলে ধর্মের কারণে মানুষগুলি এভাবে মিথ্যা বলে অপপ্রচার চালায় আর কিছু মডারেট মুসলিমরা এটা নিয়েই লাফালাফি শুরু করে দেয়, সত্যতা যাচাই না করেই।

.

- রোজার ওপর গবেষণা করে ওশুমি নোবেল পেয়েছেন?

#নোবেল পুরস্কার আসলে কোন বিষয়ে পেয়েছেন ইওশিনোরি?

২০১৬ সালে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে ইওশিনোরিকে অটোফ্যাগির মেকানিজম আবিষ্কারের জন্য। নোবেল কমিটির ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী তিনি অটোফ্যাগির মেকানিজম আবিষ্কার করেছেন। কোথায়? বলা বাহুল্য, তিনি ইস্ট কোষে সেই মেকানিজম আবিষ্কার করেছেন। ইস্ট হল সেই ছত্রাক, যা আমরা পাউরুটি তৈরীতে ব্যবহার করি। তিনি প্রথম দেখেছিলেন ল্যাবরেটরীতে মিডিয়াতে (অর্থাৎ, পেট্রিডিশে যে গ্রোথের জন্য মিডিয়া ব্যবহৃত হয়) সেখানে নিউট্রিয়েন্ট কনটেন্ট কিছুটা কমিয়ে দিলে ইস্টে কিছু অতিরিক্ত কোষ গহবরের মত তৈরী হয়। তিনি বলেছিলেন এই গহবরগুলো সাধারণ কোষ গহবর নয়, এগুলো অটোফ্যাগোসোম, অর্থাৎ ইস্ট কোষ নিজের অপ্রয়োজনীয় অঙ্গানুগুলো ভেঙ্গে ওই গহবরে নিয়ে রিসাইকেল করে এমিনো এসিডে ভেঙ্গে আবার কোষে নিচ্ছে নতুন কাজে ব্যবহার করতে।

তিনি এই প্রক্রিয়ার উপরে গবেষণা করে, ইস্টের কোন জিন দায়ী এবং কোন সিগন্যালে কোন জিন কিরকম প্রোটিন তৈরী করে এই কাজটি করে সেগুলো আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

ইস্ট কোষ রোযা করেনা। কাজেই রোযার উপর গবেষণা করে ২০১৬ তে ওশুমি নোবেল পেয়েছেন, ব্যাপারটি চরমতম মিথ্যা।

☞ নোবেল কমিটির সারসংক্ষেপ অনুযায়ী ওশুমির চারটি পেপারে চারটি কাজের উপর মূলত নোবেল দেয়া হয়েছে। এই চারটি পেপার হলঃ

1. Takeshige, K., Baba, M., Tsuboi, S., Noda, T. and Ohsumi, Y. (1992). Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction. Journal of Cell Biology 119, 301-311
2. Tsukada, M. and Ohsumi, Y. (1993). Isolation and characterization of autophagy-defective mutants of Saccharomyces cervisiae. FEBS Letters 333, 169-174
3. Mizushima, N., Noda, T., Yoshimori, T., Tanaka, Y., Ishii, T., George, M.D., Klionsky, D.J., Ohsumi, M. and Ohsumi, Y. (1998). A protein conjugation system essential for autophagy. Nature 395, 395-398
4. Ichimura, Y., Kirisako T., Takao, T., Satomi, Y., Shimonishi, Y., Ishihara, N., Mizushima, N., Tanida, I., Kominami, E., Ohsumi, M., Noda, T. and Ohsumi, Y. (2000). A ubiquitin-like system mediates protein lipidation. Nature, 408, 488-492

এই চারটি কাজই ইস্ট কোষের উপরে করা, এবং সর্বশেষ পাবলিকেশন ২০০০ সালে করা। খেয়াল করুন প্রথম পাবলিকেশন ১৯৯২তে, শেষটি ২০০০ এ। সাধারণত একজন বিজ্ঞানীর অনেকবছর ধরে করা অনেক আগের কাজকে নোবেল দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এমন না যে যেই বছরে করেছেন সেই বছরে নোবেল দিয়ে দিল। এত সহজ না ব্যাপারটা।

- **# তাহলে আমরা কেন জানি যে রোযার ওপর গবেষণা করে ওশুমি নোবেল পেয়েছেন?**

☞ এই গুজবের শুরু হয়েছে ২০১৭ সালে, প্রখ্যাত ফেসবুক সেলিব্রিটি আরিফ আজাদ আর হোসাইন একটি ভ্রান্ত স্ট্যাটাস দেন ফেসবুকে যে রোযাকে মডার্ন সায়েন্স বলে অটোফ্যাগি। সেই থেকেই চলছে। আরিফ আর হোসাইনও কতগুলো অসমর্থিত ওয়েবসাইট থেকে বানিয়ে লেখাটা লিখেছেন কিছু লাইক পাবার আশায়। কোনো রিসার্চ আর্টিকেলের উপর ভিত্তি করে লিখেননি। আর বাংলাদেশের কিছু আলতু ফালতু অনলাইন পোর্টালও এটি কপি করে দিয়েছে হিট পাবার আশায়। অথচ রোযার সাথে অটোফ্যাগির এখন পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই।

অটোফ্যাগি শরীরে হয় চারটি কারণেঃ

১। নিউট্রিয়েন্ট ডেপ্রাইভেশন (অর্থাৎ পুষ্টি উপাদান কম হলে)

২। হাইপোক্সিয়া (অর্থাৎ শরীরে অক্সিজেন কম হলে)

৩। ইনফেকশন (শরীরে ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হলে

৪। শরীরে গ্রোথ ফ্যাক্টর কম হলে (অর্থাৎ ধরেন বিভিন্ন ধরনের গ্রোথ প্রোটিন/হরমোন কম হলে)

বলতে গেলে শরীরে স্ট্রেস থাকলে। এখন এর জন্য সব জার্নাল আর্টিকেলেই বলা আছে, ক্যালরিক রেস্ট্রিকশন/নিউট্রিয়েন্ট রেস্ট্রিকশনের কথা। আপনি কম খাবেন অথবা খাওয়া বন্ধ রাখবেন, আর্টিফিসিয়ালি বডিতে স্ট্রেস দিবেন, অটোফ্যাগি হবে। কিন্তু এর সিস্টেম আছে। পানি ছাড়া সেটা হবে কি হবেনা তা নিশ্চিত নয়। স্বীকৃত সব মাউস মডেলে পানি খেতে দেয়।

আর অটোফ্যাগির ফলে কী সুবিধা-অসুবিধা হল না হল তা হোস্ট বডির উপর নির্ভর করে। এখন ধরেন আপনি সুস্থ আমি অসুস্থ। আপনার উপর অটোফ্যাগির প্রভাব আর আমার উপর অটোফ্যাগির প্রভাব এক নাও হতে পারে। আর সব রোগেই অটোফ্যাগি যে ভালো প্রভাব ফেলে তাও না।

- **রোযায় ওজন কমে, তাই অনেক রোগ ভালো হয়ে যায় ?**

অনেকে রোযায় ভারীখাবার, তেলের খাবার, বা রাতে পর্যাপ্ত খাবার না খাওয়ায় ওজন কিছুটা কমলেও রোযা শেষে আবার সব আগের মত হয়ে যায়। রোযার মাস শেষে মানুষের ঘুমের প্যাটার্ন পরিবর্তিত হয়ে যায়, যার ফলে শরীরে সিরাম লেপটিন, ইনসুলিন, কর্টিসল ইত্যাদির মাত্রা পরিবর্তিত হয়, তাই খাদ্যাভাস আবার পরিবর্তিত হয়ে যায়। রোযার মাসের শেষের দিকে ওজন কিছু কমলেও ২-৫ সপ্তাহের মধ্যে শরীর যে কি সেই আবার আগের মত হয়ে যায়।

লেখাটিকে এককথায় সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হলো-

☞ অটোফ্যাগি হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যা শুধুমাত্র শরীরে তখনই হয় যখন আপনি মেটাবলিক স্ট্রেসে আছেন, অথবা নিউট্রিয়েন্ট ডেপ্রাইভড স্টেটে আছেন, অর্থাৎ শরীরে পুষ্টি উপাদান কম এমন অবস্থায়। এই প্রক্রিয়ায়, যেসব কোষীয় অঙ্গানু পুরনো হয়ে গেছে এবং প্রয়োজন নেই তা কোষ ভেঙ্গে ফেলে অটোফ্যাগোসোম তৈরীর মাধ্যমে। অর্থাৎ ছোট ছোট কম্পার্ট্মেন্টে ওই অঙ্গানুগুলোকে আবদ্ধ করে এরপর ভেঙ্গে ফেলে এমিনো এসিডে। এটি একধরনের কোষীয় বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়া, ও প্রয়োজনীয় পদার্থগুলো রিসাইকেল করবার প্রক্রিয়া।

☞ না খেলে অবশ্যই শরীরে মেটাবলিক স্ট্রেস তৈরী হয়, নিউট্রিয়েন্ট ডেপ্রাইভেশন হয়। তখন শরীরে ইনসুলিন কমে যায়, গ্লুকাগন বেড়ে যায়। এই গ্লুকাগন হরমোন সিগন্যাল দেয় শরীরে অন্যান্য গ্রোথ হরমোন বাড়াতে। নতুন করে বিভিন্ন প্রোটিন তৈরী হয়। এছাড়া অনেকগুলো জিন সুইচ অন হয়, যার মধ্যে mTor, TOR ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এমনকি শরীরে বেশী প্রোটিন থাকলেও অটোফ্যাগি প্রসেস বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে যেকোনো ক্যান্সার রোগী না খেয়ে থাকলে আসলে লাভ হবে কিনা তা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে কারণ তার শরীরে এমনিতেই বেশী প্রোটিন।

☞ ক্যালোরিক রেস্ট্রিকশন হল অটোফ্যাগির ফিজিওলজিক্যাল ইন্ডিউসার। রাপা হল ফার্মাকোলজিক্যাল ইনডিউসার (ঔষধ)। এছাড়া p53 জিন যদি বন্ধ করে দেয়া যায়, তাহলেও অটোফ্যাগি হয়। ** ইন্ডিউসার মানে হল যা কোনো জিনিসকে শুরু হতে উস্কে দেয়। এছাড়া atg, Sirt-1 ইত্যাদি বহু জিন আছে যা অটোফ্যাগি স্পেসিফিক। (এখন পর্যন্ত অটোফ্যাগির সাথে জড়িত ৩২টি জিন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তিন ধরনের অটোফ্যাগি প্রক্রিয়াঃ মাইক্রো, ম্যাক্রো এবং চ্যাপেরন মেডিয়েটেড আবিষ্কৃত হয়েছে) অটোফ্যাগি, অর্থাৎ ক্যালোরিক রেস্ট্রিকশন বুড়িয়ে যাবার প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দেয়, এটি বিভিন্ন আর্টিকেলে লেখা আছে।

কিন্তু এ বিষয়ে উল্লেখ্য, ক্যালোরিক রেস্ট্রিকশন এবং ফাস্টিং/অর্থাৎ রোযা রাখা এগুলো কিন্তু এক জিনিস নয়, তা শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জানে।

☞ শরীরে এমিনো এসিডের তিন ধরনের বিপাক প্রক্রিয়া আছে। কিছু এমিনো এসিড লিভারে চলে যায় ও গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে। কিছু এমিনো এসিড ট্রাই কার্বক্সিলিক এসিড সাইকেল (TCA cycle) এ ঢুকে ও গ্লুকোজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। আর কিছু এমিনো এসিড নতুন প্রোটিন তৈরীতে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ রিসাইকেল হয়। এখন যদি শরীরে এর বেশী এমিনো এসিড থাকে, তাহলে শরীর তা বর্জ্য আকারেই বের করে দিবে।

এ বিষয়ে আরও উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে ইয়োশিনোরি উশুমি যে অটোফ্যাগি বিষয়ক গবেষণার জন্য নোবেল পেয়েছেন, তার বিষয়বস্তু হল অটোফ্যাগি-সেলুলার রিসাইকেলিং প্রসেস অর্থাৎ মেকানিজমটির বিষয়ে গবেষণা করে। তিনি অটোফ্যাগি ও রোযা অথবা অটোফ্যাগি ও পানি না খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপরে গবেষণা করে নোবেল পাননি, এ বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। আর এ গবেষণার মূল ভিত্তি হল স্ট্রেস হলেই অটোফ্যাগি হয়, এই স্ট্রেস শরীরে হয় হয় নিউট্রিয়েন্ট (পুষ্টি উপাদান) কম হলে, ইনফেকশন হলে, হাইপোক্সিয়া হলে (অর্থাৎ শরীরে অক্সিজেন কম হলে) এবং শরীরে গ্রোথ ফ্যাক্টর কম থাকলে। আমি সূত্র হিসেবে ন্যাচার জার্নালের রিভিউ দিয়ে দিচ্ছি।

☞ আরেকটি অপবিজ্ঞান যা ছড়ানো হচ্ছে ফেসবুকে, তা হল ক্যান্সারকে নাকি অটোফ্যাগি প্রতিহত করে!

ক্যান্সার অথবা আলঝেইমার রোগের মূল ভিত্তি হল অধিক গ্রোথ। আলঝেইমারে প্রোটিন একিউমুলেশন হয়। অর্থাৎ অনেক প্রোটিন জমা হয়। এখন গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হল টার্গেটেড অটোফ্যাগি কীভাবে করা যায়, অর্থাৎ শরীরের একটা জায়গায় ক্যান্সার অথবা আলঝেইমার হচ্ছে ব্রেইনে, তাহলে ওই জায়গার কোষগুলোকে কীভাবে সিগন্যাল দিয়ে সেখানে অটোফ্যাগির মাধ্যমে সেই প্রোটিনগুলোকে ধ্বংস করা যায়। সেক্ষেত্রে তৈরী হওয়া অতিরিক্ত এমিনো এসিড রিসাইকেল হবে, না শরীর বের করে দিবে তা শরীর সিদ্ধান্ত নিবে। কেউ যদি রোযা/উপবাস করে ভাবেন যে আমি ক্যান্সার থামিয়ে ফেললাম, তাহলে খুবই ভুল কথা, কারণ এসব রোগের চিকিৎসার জন্য সারা শরীরে অটোফ্যাগি না বরং টার্গেটেড অটোফ্যাগি প্রয়োজন।

এ বিষয়ে আরও উল্লেখ্য, ন্যাচারের রিভিউটিতে দেখা যাচ্ছে, অনেক প্রি-ম্যালিগন্যান্ট কোষ (অর্থাৎ যারা পুরো ম্যালিগন্যান্ট হয়ে যাবে যাবে ভাব) এমন কোষগুলো অনেকসময় অটোফ্যাগি ব্যবহার করে জিনোটক্সিক যে স্ট্রেস থাকে ক্যান্সারে, তাকে বাইপাস করে একেবারে ক্যান্সার ছড়াতে সাহায্য করে। অর্থাৎ অটোফ্যাগির নেগেটিভ ব্যবহারও শরীরে আছে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলে অটোফ্যাগির যেমন এন্টি-টিউমোরাল ভূমিকাও আছে, প্রোটিউমোরাল ভূমিকাও আছে। অর্থাৎ কখনো কখনো ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, কখনো ক্যান্সার বাড়িয়ে দেয়। অনেক সময় ক্যান্সার কোষগুলো অটোফ্যাগির মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করে ও শরীরের আরও ক্ষতি করে। আলঝেইমার, পার্কিনসন, হান্টিংটন, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারে অটোফ্যাগি দিয়ে আসলেই চিকিৎসা (টার্গেটেড থেরাপি) সম্ভব কিনা বা এর ভূমিকা কী এ বিষয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

☞ অনেকসময় ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অথবা অটোইমিউন রোগগুলোর জন্য অটোফ্যাগির ভালো ভূমিকার কথা ফেসবুকে অনেকে ছড়িয়ে থাকে। এর ভেতরে অনেক ভুল আছে।
সত্য হলো, শরীরে ইনফেকশন হলে অটোফ্যাগি প্রক্রিয়ায় শরীর অনেক সময় তা তাড়িয়ে থাকে। কিন্তু আমরা জানি ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস ক্রমাগত মিউটেশনের মাধ্যমে নিজেদের জিনোমে পরিবর্তন আনে। এভাবে অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া এই অটোফ্যাগি প্রক্রিয়া নকল অথবা বাইপাসের মেকানিজম অর্জন করে ফেলে। তখন কিন্তু অটোফ্যাগি কোনো সুস্থতার গ্যারান্টি দিতে পারেনা, বরং তখন ট্রেডিশনাল ট্রিটমেন্টেই যেতে হবে।

☞ **ক্রমাগত না খেয়ে থাকা আসলেই কি সবসময় অটোফ্যাগি চালাতে থাকে? না, বরং এতে শরীরেরই ক্ষতি হয় বেশী।** ফাস্টিং-ফিডিং সাইকেলের একটি ভারসাম্য থাকতে হবে। অটোফ্যাগি পরিমাপক বিষয়ক যে পেপাগুলোর উল্লেখ আছে, সেখানে কিন্তু পানি খাওয়ার কথা বলা আছে। নিউট্রিয়েন্ট রেস্ট্রিকশন এবং ওয়াটার রেস্ট্রিকশন কিন্তু এক কথা নয়। অর্থাৎ পানি খেতে হবে।

☞ ভালো অটোফ্যাগি আছে, মন্দ অটোফ্যাগিও আছে। এটি নির্ভর করে হোস্টের শারীরিক অবস্থা কেমন তার উপর।

- শেষ কথাঃ শরীরের বর্জ্য পদার্থ পানির সাথেই কিডনী ছেঁকে বের করে দেয়। পানি সারাদিন না খেয়ে থাকাটা অটোফ্যাগি প্রসেস না। অটোফ্যাগির মাধ্যমে শরীরের যেটুকু এমিনো এসিড লাগবে তা শরীর রেখে দিবে, যা লাগবেনা তা বের করে দিবে। আর ক্যান্সার ও অন্যান্য অসুখের মূল বিষয়টিই হল অধিক গ্রোথ। জাংক প্রোটিন তো বের করে দিতেই হবে সেক্ষেত্রে। ড্রাই ফাস্টিং অর্থাৎ পানি ছাড়া থাকা ১-৩ দিনের বেশী অত্যন্ত ক্ষতিকারক। **কেউ কেউ ধারণা করে থাকে, শরীরের ভেতরের রোগজীবাণু পানি পায়না দেখে মরে যায়, তাই এ ধরনের ড্রাই ফাস্টিং অত্যন্ত উপকারী। বাস্তবতা হল, শরীর নিজের পানি নিজে প্রস্তুত করতে থাকে এ সময়, বিভিন্ন ফ্যাট বার্নিং বিক্রিয়ার মাধ্যমে, কাজেই রোগজীবাণু পানি না পাবার বিষয়টি সত্য নয়।** সারাদিনে শরীর বিভিন্ন মেটাবলিক রিয়েকশনের মাধ্যমে প্রায় ১ লিটার পর্যন্ত পানি প্রস্তুত করতে পারে। **কিন্তু প্রতিদিন ড্রাই ফাস্টিং এর ফলে ডিহাইড্রেশন হয়ে যায়।** নিউট্রিয়েন্ট ডেপ্রাইভেশন-ক্যালোরিক রেস্ট্রিকশন এর সাথে ওয়াটার রেস্ট্রিকটেড ফাস্টিং(রোযা) কে মিলিয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রচার করবেন না দয়া করে। মিথ্যাচার করে বিজ্ঞানকে ধর্মের সাথে মিলালে ওটা সায়েন্স হয়না বরং সিউডোসায়েন্স হয়ে যায় যা শুধু অজ্ঞ মূর্খ এবং অন্ধবিশ্বাসী মানুষদের টুপি পরিয়ে রাখে।

তথ্যসূত্রঃ

1. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016]]
2. https://www.cambridge.org/.../3791BAE2A6C52218994B3BEF291BF6EE
3. Effect of Ramadan Fasting on Weight and Body Composition in Healthy Non-Athlete Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis
4. Caloric restriction and resveratrol promote longevity through the Sirtuin-1-dependent induction of autophagy
5. Mechanism and medical implications of mammalian autophagy
6. Autophagy: cellular and molecular mechanisms
7. Autophagy and human diseases
8. Autophagy and Its Effects: Making Sense of Double-Edged Swords

নবী মুহাম্মদের ডানকাত হয়ে ঘুমানোর অভ্যাস কি বিজ্ঞানসম্মত বা স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে উপকারী নাকি এর উলটা ?

একটিমাত্র ছবিই বোঝার জন্য যথেষ্ট। তাই আর বিস্তারিত আলোচনা করে ইসলামের আর অপমান করলাম না।
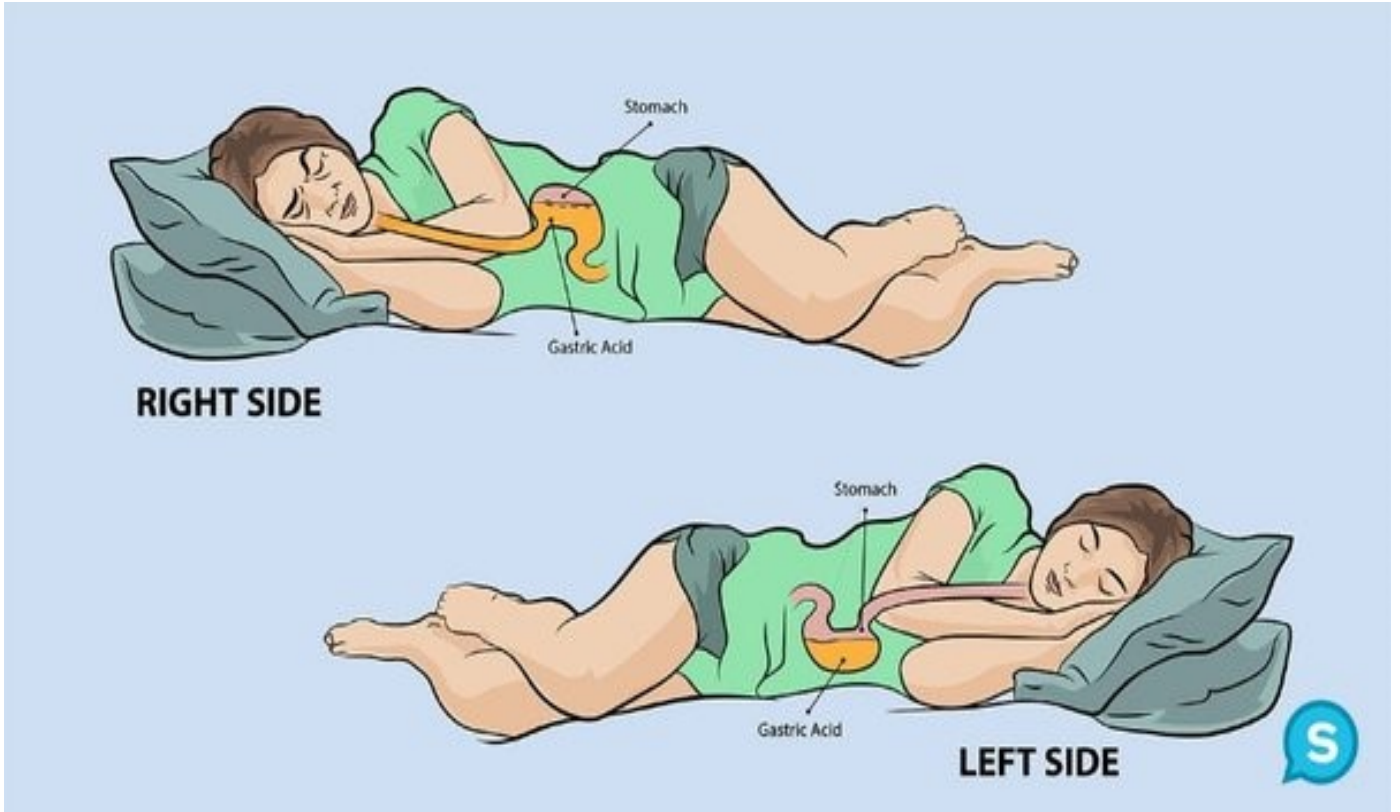
যেসব মডারেট মুমিনেরা দাঁড়িয়ে পানি খাওয়ার অপকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অপকারিতা বয়ান করে, এই উপসংহারে চলে যায় যে- "দেখেছেন ইসলাম এই সম্বন্ধে ১৪০০ বছর আগেই আমাদের বলে গেছে", তারা কি আদৌ কখনো এ বিষয়ে ইসলামে জেনেছেন ? ইসলাম আপনাদের মুখে চুনকালি লাগায় দিছে আপনারা জানেনও না।

সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)| হাদিস নং: ৫৬১৫ | Sahih al-Bukhari, Hadith No. 5615

আলী (রা)-এর নিকট পানি আনা হলে তিনি দাঁড়িয়ে তা পান করলেন। এরপর তিনি বললেনঃ লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পান করাকে মাকরূহ মনে করে, অথচ আমি নবী সা কে দেখেছি, তোমরা আমাকে যেমনভাবে(দাঁড়িয়ে) পান করতে দেখলে তিনিও তেমনি করেছেন।

এখানে পর পর ৩টি হাদীস সহীহ্ সানাদে ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। দাঁড়িয়ে পানি পান করার বৈধতার পক্ষে উক্ত ৩টি হাদীস দেখা যাচ্ছে। আমাদের এদেশে কাউকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখলে তার সম্পর্কে ভীষণ খারাপ ধারণা পোষণ করা হয়, যা একেবারেই অমূলক, অযৌক্তিক বটে। রসূল ﷺ এবং 'আলী দাঁড়িয়ে পানি পান করেছিলেন বলে সহীহ্ সানাদে এখানে যে ৩টি হাদীসের উল্লেখ রয়েছে তাতে সত্যই প্রমাণিত হয় যে, দাঁড়িয়ে পানি পান করা দূষণীয় নয়। রসূল (ﷺ)-এর 'আমলকে অস্বীকার করা শয়তানের প্ররোচনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে কোন অবস্থায়ই রসূল (ﷺ) এর চেয়ে বেশী তাক্বওয়া ও পরহেজগারী দেখানো নিঃসন্দেহে ভন্ডামি। অতএব উপরোক্ত আলোচনা হতে শিক্ষণীয় এই যে, রসূল (ﷺ)-এর অনুগমন অনুসরণ করার মধ্যেই পরহেজগারী সীমাবদ্ধ আছে বলে মানতে হবে।

পরিচ্ছেদঃ ৭৪/১৬. দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা।

بَاب الشُّرْبِ قَائِمًا

৫৬১৫. নাযযাল (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কূফা মসজিদের ফটকে 'আলী (রাঃ)-এর নিকট পানি আনা হলে তিনি দাঁড়িয়ে তা পান করলেন। এরপর তিনি বললেনঃ লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পান করাকে মাকরূহ মনে করে, অথচ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, তোমরা আমাকে যেমনভাবে পান করতে দেখলে তিনিও তেমনি করেছেন। [৫৬১৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫২০৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১০০)

أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ" أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.

প্রকাশ থাকে যে, এখানে পর পর ৩টি হাদীস সহীহ্ সানাদে ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। দাঁড়িয়ে পানি পান করার বৈধতার পক্ষে উক্ত ৩টি হাদীস দেখা যাচ্ছে। আমাদের এদেশে কাউকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখলে তার সম্পর্কে ভীষণ খারাপ ধারণা পোষণ করা হয়, যা একেবারেই অমূলক, অযৌক্তিক বটে। রসূল ﷺ এবং 'আলী দাঁড়িয়ে পানি পান করেছিলেন বলে সহীহ্ সানাদে এখানে যে ৩টি হাদীসের উল্লেখ রয়েছে তাতে সত্যই প্রমাণিত হয় যে, দাঁড়িয়ে পানি পান করা দূষণীয় নয়। রসূল (ﷺ)-এর 'আমলকে অস্বীকার করা শয়তানের প্ররোচনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে কোন অবস্থায়ই রসূল (ﷺ) এর চেয়ে বেশী তাক্বওয়া ও পরহেজগারী দেখানো নিঃসন্দেহে ভন্ডামি। অতএব উপরোক্ত আলোচনা হতে শিক্ষণীয় এই যে, রসূল (ﷺ)-এর অনুগমন অনুসরণ করার মধ্যেই পরহেজগারী সীমাবদ্ধ আছে বলে মানতে হবে।

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষণঃ সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন) ৭৪/ পানীয় (كتاب الأشربة)

কোরানের ফেরাউনের কিচ্ছা কাহিনী এবং মুমিনদের মিথ্যাচার

আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম। **আর ফিরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী তাদের পিছু নিল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল।.........।** **সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক**।
কোরআন ১০/৯০-৯২

❖ প্রথমেই আমাদের জানা থাকা জরুরি যে, **ফেরাউন কে ?**
ফেরাউন/ফারাও কোন একক ব্যক্তি নয়। এই শব্দটি হল- প্রাচীন মিশরীয় রাজবংশের রাজাদের উপাধি। (নবাব বা মুঘল সম্রাট যেমন উপাধি)।
তাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেউ তার অজ্ঞতার কারণে যদি শুধু ফেরাউন বলতে কোনো নির্দিষ্ট কোনো লোককে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে সেটা অবশ্যই স্পষ্ট ভুল, যা কোরআনের বক্তা করেছেন।

❖ এখন মিশরের যাদুঘরে রাখা যে মমিটিকে কোরআনের উল্লিখিত ফেরাউন হিসেবে দাবী করা হয়, সেটি কতটুকু সত্য ?

দাবীটি সম্পূর্ণ ভুয়া, এবং কোরআনকে গোঁজামিল দিয়ে সত্য প্রমাণের আরও একটি নির্লজ্জ ব্যর্থ চেষ্টা। কেননা মিশরের যাদুঘরে রাখা এই ফেরাউনের মমিটি মোটেও কোরআনে উল্লিখিত ফেরাউনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। **প্রমাণ-**

'দ্বিতীয় রামেসিস(যাকে মুমিনরা কুরআনে বর্ণিত ফেরাউন হিসেবে দাবী করা শুরু করে)' মিশরের ফারাওদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন এজন্য তাকে বলা হয় রামেসিস দ্যা গ্রেট। তিনি ছিলেন মিশরের উনবিংশতম রাজবংশের তৃতীয় ফারাও/রাজা। এই ফেরাউনের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ১৩০৩; মৃত্যু আগস্ট ১২১৩ খ্রিস্টপূর্ব; শাসনকাল হচ্ছে, ১২৭৯-১২১৩ খ্রিস্টপূর্ব। ৬৬ বছর শাসন করে ৯০ বছর বয়সে উনি মারা গেছিলেন। তার উচ্চতা ছিল পাচফুট সাত ইঞ্চি।

❖ এই দ্বিতীয় রামেসিসের মমি বর্তমানে কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছিল ?

এই ফেরাউনের মমি তৈরি করে তা ভ্যালি অব দ্য কিংসের KV7 নামের সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। ডাকাতির (রত্ন সামগ্রীর লোভে প্রচুর চুরি ডাকাতি হত) জন্য সেখান থেকে উনার মমি রাজ সংগ্রহশালায় TT320 নামের সমাধিতে স্থানান্তর করা হয়। এখান থেকেই পরবর্তীতে ১৮৮১ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদরা দ্বিতীয় রামেসিসের মমির-গায়ে-জড়ানো-কাপড়ে-লেখা হায়ারোগ্লিফিক্স লিপি থেকে তার পরিচয় আবিষ্কার করেন। **বর্তমানে এটি কায়রো জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে**। যার সাথে কোরআনের ফেরাউনের তথ্যের কোনো মিল নেই।

❖ দ্বিতীয় রামেসিস এর মমি ফ্রান্সে কেন নেওয়া হয়েছিল?

১৯৭৪ সালে ইজিপ্টোলজিস্টরা বুঝতে পারেন যে মমিটি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই সেটাকে পরীক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং একদল ডাক্তার দিয়ে বোর্ড গঠন করে তা পরীক্ষা করার জন্য। এরপর পচনকৃত অংশের মেরামত করা হয়।
১৯৭৫ সালে এই মমির ফরেন্সিক পরীক্ষা করেন ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান পিয়ারে ফার্নাড সিকাল্ডি। দ্বিতীয় রামেসিসের মৃত্যুর কারন সেই পরীক্ষাতেই উঠে আসে।

❖ মৃত্যুর কারন কি ছিল?

মমিটিকে পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে- He(Ramesses II) died because of suffering from terrible dental infections, old age complications related severe arthritis and hardening arteries. অর্থাৎ উনি (দ্বিতীয় রামেসিস) মারা গেছিলেন, 'দাঁতের মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগে এবং বার্ধক্যজনিত শারীরিক ব্যধী- আর্থ্রাইটিস, ধমনী শক্ত হয়ে যাওয়া' র কারণে। যেটা কোরানের সাথে অমিল।

❖ এখন আসুন ইসলামিস্টদের ভন্ডামীতে। রামেসিসের মমিতে লবন কি সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুর জন্য?

মমির শরীরে লবণ থাকার কারণে মরিস বুকাইলি ও কতিপয় মুমিন দাবী করে- এই লবণ যেহেতু পাওয়া গেছে, সেহেতু মমিগুলো অনেকদিন সমুদ্রের তলদেশে ছিল। সেটা একটা ডাঁহা মিথ্যা কথা। কেননা-

মমি করার একটি ধাপে মমিকে শুষ্ক করে ন্যাট্রন লবন দিয়েই শুকানো হত (নোনা মাছ যেমন লবন দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়)। পানি বা জলবায়ু আসলে মমির পচনকে তরান্বিত করে, এবং তা শুকাবার জন্যেই এ ধরণের লবণ ব্যবহার করা হতো। এই ফেরাউনের এই মমিটি কখনোই সমুদ্রের তলদেশে ছিল না। ইসলামের সাথে মেলাবার জন্য খুব কৌশলে তথ্য বিকৃত করা হয়েছে।

[**কে ছিল মরিস বুকাইলি?** মরিস বুকাইলি ছিল সৌদি রাজপরিবারের চিকিৎসক। ১৯৭৬ সালে সৌদি রাজ পরিবারের ফরমায়েসে সে একটি বইটি লেখে- বাইবেল কোরান ও বিজ্ঞান নামে যেখানে সে উল্লিখিত দাবীটি করে। সে নিজেই জানতো এই দাবী পুরোটাই ভাওতাবাজী তাই সে নিজেকে কখনো মুসলিম হিসেবে ঘোষণা দেয়নি।

এই ড. বুকাইলি গিয়েছিলেন মিশরের কায়রো মিউজিয়াম ভ্রমনে। সেখানে দেখেছিলেন ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিসের মমিও। তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, মমিটাতে ফাঙ্গাস (ছত্রাক) ও অন্যান্য কীট আক্রমণ করেছে। তার মাধ্যমে বিষয়টা আলোচনায় আসে। এরপর ফ্রান্স সরকার বুঝিয়ে রাজি করায় মিশর সরকারকে রেমেসিসের মমি ফ্রান্সে ট্রিটমেন্টের জন্য পাঠাতে। এরপর ফ্রান্সে এনে Criminal Identification Laboratory of Paris এর প্রধান ফরেনসিক বিজ্ঞানী প্রফেসর পিয়েরে ফার্নান্ড সেকাল্ডি এর তত্ত্বাবধানে একদল বিজ্ঞানী মমিটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ট্রিটমেন্ট এর কাজ করা হয়। কাজ শেষে সেটি আবার মিশরে ফেরত পাঠানো হয়। রেফারেন্স উকিপিডিয়ার এই পেইজে Tomb KV7 অংশে।

এখানে লক্ষনীয় বিষয় যে, রেমেসিসের মমি কোন গবেষণা কিংবা কোরানের বাণীকে সত্য প্রমাণের জন্য নেয়া হয়নি। নেয়া হয়েছিলো এর ছত্রাক এর আক্রমন রোধ করে মেরামত করার জন্য। আর, ঐ ট্রিটমেন্টে যেসব বিজ্ঞানী অংশ নেন, তাদের মধ্যে ছিলেন না বুকাইলি সাহেব। যাহোক, এর কিছুদিন পর যদি বুকাইলি সাহেব ফেরাউনের সাথে কোরানের বাণীর মিল বানিয়ে বই লিখে ফেলেন।]

সারাংশঃ মুসলিমরা যে ফেরাউনের লাশকে সাগরের নিচ থেকে আবিষ্কৃত দাবি করে, যে ফেরাউনের লাশকে ফ্রান্সে পাঠানো হয়েছিল, সে ফেরাউনটি হচ্ছে দ্বিতীয় রেমেসিস (Ramesses II). মুসলিমদের দাবি অনুযায়ী, ফিরাউনের লাশ লোহিত সাগরের তলদেশ থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে। এটি একটি বড় রকমের মিথ্যাচার। সাগরের তলদেশ থেকে কোনো মমিই উদ্ধার করা হয়নি। আর দ্বিতীয় রেমেসিসের মমি উদ্ধার করা হয়েছে DB320 নামে একটা সমাধিতে। সেখানে দ্বিতীয় রেমেসিস ছাড়াও আরও ৫০ টি মমি উদ্ধার করা হয় একই সাথে। তবে, দ্বিতীয় রেমেসিসকে প্রথমে kv7 নামে একটা সমাধিতে রাখা হয়েছিল। পরে সেখান থেকে তাকে Pinudjem II এর মমির পাশে DB320 এ স্থানান্তর করা হয়।

বাইবেলে তো মুসা নবী কর্তৃক সাগর দুইভাগ হয়ে যাওয়ার কিচ্ছা-কাহিনী আছেই, তবে বাইবেলে বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের লোকজন ডুবে মরেছে, স্বয়ং ফেরাউনের কথা বলা হয়নি। আর নবী মুহাম্মদের সময়কালে প্রাচীন মিশরীয় মমির কথা সকলেরই জানা ছিল। তাই ফেরাউনরা মৃত্যুর পর তাদের লাশ সংরক্ষণ করে রাখে মমি করে, এটা মুহাম্মদ অবশ্যই শুনেছেন। তাই, কোরআনে ঐ সাগর দুই ভাগ হওয়ার কিচ্ছা ও লাশ সংরক্ষনের ঘটনা জুড়ে দেয়া।

------------------*সুতরাং, বাস্তব(real/fact) তথ্যপ্রমাণসমূহের ভিত্তিতে কোরআনের লেখকের এই ভবিষ্যতবাণীটি [আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। কোরআন ১০/৯০-৯২] ভুল হিসেবে প্রমাণিত হলো।*--------------------

References

(a) Egyptian Mummies
(b) Mummied Ibis
(c) Falcon-Shaped Wooden Coffin, With Falcon Mummy
(d) Natron
(e) Egyptian mummy CT scan video, Smithsonian’s National Museum of Natural History
(f) Ramesses II
(g) Ramesses the Great By John Ray

1. Leprohon (2013), pp. 114–115.
2. Tyldesley (2001), p. xxiv.
3. Clayton (1994), p. 146.
4. "Mortuary temple of Ramesses II at Abydos". Archived from the original.
5. Anneke Bart. "Temples of Ramesses II". Archived from the original .
6. "Rameses". Webster's New World College Dictionary. Wiley Publishing. 2004. Archived
7. "Ramses". Webster's New World College Dictionary. Wiley Publishing. 2004. Archived
8. Putnam (1990), p.
9. Kulkarni, P., Ji, Z., Xu, Y., Neskovic, M., & Nolan, K. (2023). Exploring Semantic Perturbations on Grover. arXiv preprint arXiv:2302.00509.
10. Diodorus Siculus. "Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books I-V, book 1, chapter 47, section 4". www.perseus.tufts.edu. Archived
11. "Ozymandias". PBS. Archived f

12. O'Connor & Cline (1998), p. 16.
13. von Beckerath (1997), pp. 108, 190.
14. Brand (2000), pp. 302–305.
15. Christian Leblanc. "Gerard".
16. Parisse, Emmanuel (5 April 2021). "22 Ancient Pharaohs Have Been Carried Across Cairo in an Epic 'Golden Parade'". ScienceAlert.
17. Darnell, J. C., & Manassa, C. (2007). Tutankhamun's Armies: Battle and Conquest During Ancient Egypt's Late Eighteenth Dynasty. John Wiley & Sons.
18. Josephus © 2011–2023 by Peter Lundström — Some Rights Reserved — V. 4.0
19. A.H. Gardiner, Ramesside Administrative Documents, (Oxford, 1948), 30, 10,and 14
20. RJ Demarée, Announcement of the Passing of Ramesses II, JEOL 46 (2016), p.125
21. Gabriel, R. (2002). The Great Armies of Antiquity. Greenwood Publishing Group. p. 6. ISBN 9780275978099.
22. Grimal (1992), pp. 250–253.
23. Drews (1993), p. 54:
24. Gale, N.H. (2011). "Source of the Lead Metal used to make a Repair Clamp on a Nuragic Vase recently excavated at Pyla-Kokkinokremos on Cyprus". In V.
25. O'Connor & Cline (1998), pp. 112–113.
26. Tyldesley (2000), p. 53.
27. "The Naue Type II Sword". Archived
28. Richardson, Dan (2013). Cairo and the Pyramids (Rough Guides Snapshot Egypt). Rough Guides UK. p. 14. ISBN 978-1-4093-3544-3. Archived
29. Grimal (1992), pp. 253 ff.
30. Tyldesley (2000), p. 68.
31. The Battle of Kadesh in the context of Hittite history Archived Wayback Machine
32. Decisive Battles that Shaped the World, Dougherty, Martin, J., Parragon, pp.10–11.
33. Grimal (1992), p. 256-257.
34. Kitchen (1996), p. 26., p. 33, p. 46-47.
35. Kitchen (1982), p. 62–64, p. 68., p73–79., p. 215., p. 119.
36. Stieglitz (1991), p. 45.
37. "Beit el-Wali". University of Chicago. Archived
38. Ricke, Hughes & Wente (1967)
39. Eyre, Christopher (1998 p. 171.
40. "Sed festival". The Global Egyptian Museum. Archived
41. "Renewal of the kings' Reign : The Sed Heb of Ancient Egypt". Archived
42. Westendorf (1969)
43. Amelia Ann Blandford Edwards. "Chapter XV: Rameses the Great". Archived
44. Kitchen. Pharaoh Triumphant. pp. 49–50. ISBN 0 85668 215 2.
45. Saadia Gaon, Judeo-Arabic Translation of Pentateuch (Tafsir), s.v. Exodus 21:37 and Numbers 33:3 (רעמסס: "עין שמש");
46. Van Seters, John (2001). "The Geography of the Exodus". In Dearman, John Andrew; Graham, Matt Patrick; Miller, James Maxwell (eds.). The Land that I Will Show You: Essays on the History and Archaeology of the Ancient Near East in Honour of J. Maxwell Miller. Sheffield Academic Press. p. 265. ISBN 978-1-84127-257-3.
47. Diodorus Siculus (1814). The Historical Library of Diodorus the Sicilian. Printed by W. M‘Dowall for J. Davis. pp. Ch. 11, p. 33.
48. Skliar (2005)
49. Guy Lecuyot. "The Ramesseum (Egypt), Recent Archaeological Research" (PDF).
50. "À l'école des Scribes" (in French). Archived
51. Siliotti (1994)
52. Török, László (2001). The Image of the Ordered World in Ancient Nubian Art: The Construction of the Kushite Mind, 800 Bc-300 Ad. Brill. p. 48.
53. "Giant Ramses statue gets new home". BBC News. 25 August 2006. Archived
54. Hawass, Zahi. "The removal of Ramses II Statue".
55. "Egypt: Prehistoric 'Pharaoh's Seat' Discovered in Egypt - Document - Gale General OneFile". .
56. "Egyptian archeologists unearth pharaoh's celebration compartment in Cairo". Xinhua News Agency.
57. "Red Granite Bust of Ramesses II Unearthed in Giza". Archaeology Magazine. 13 December 2019. Archived
58. James, Peter (2020). Manetho, with an English translation by W.G. Waddell. Alpha Editions. p. 151.
59. "La momie de Ramsès II. Contribution scientifique à l'égyptologie". Archived
60. "Rameses II | Theban Mapping Project". thebanmappingproject.com. Retrieved 19 March 2023.
61. Rohl (1995), pp. 72–73, 75., 78–79.
62. "NMEC". nmec.shorthandstories.com. Retrieved 18 August 2023.
63. Tyldesley (2000), p. 14.
64. Romer, John. Valley of the Kings. Castle Books. p. 184.
65. Maspero, Gaston (1892). Egyptian Archaeology. Putnam. pp. 76–77.
66. Farnsworth, Clyde H. (28 September 1976). "Paris Mounts Honor Guard For a Mummy". New York Times. p. 5. Archived October 2019.
67. Stephanie Pain. "Ramesses rides again". New Scientist. Archived
68. "Was the great Pharaoh Ramesses II a true redhead?". The University of Manchester. Archived
69. Ceccaldi, Pierre-Fernand (1987). "Recherches sur les momies: Ramsès II". Bulletin de l'Académie de Médecine. **171** (1): 119.
70. "Bulletin de l'Académie nationale de médecine". Gallica. 6 January 1987. Archived
71. Tyldesley (2001)
72. Brier (1994), p. 153., pp. 200–201.
73. Diop, Cheikh Anta (1991). Civilization or barbarism : an authentic anthropology (First ed.). Brooklyn, New York. pp. 67–68. ISBN 1556520484.
74. "Ancient pharaoh's hair returns to Egypt".
75. An X-ray atlas of the royal mummies. Chicago: University of Chicago Press. 1980. pp. 207–208. ISBN 0226317455.
76. Brier (1998), p. 153.
77. Chhem, RK; Schmit, P; Fauré, C (October 2004). "Did Ramesses II really have ankylosing spondylitis? A reappraisal". Can Assoc Radiol J. **55** (4): 211–217. PMID 15362343.
78. Saleem, Sahar N.; Hawass, Zahi (2014). "Brief Report: Ankylosing Spondylitis or Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis in Royal Egyptian Mummies of the 18th–20th Dynasties? Computed Tomography and Archaeology Studies". Arthritis & Rheumatology. **66** (12): 3311–3316. doi:10.1002/art.38864. ISSN 2326-5205. PMID 25329920. S2CID 42296180.
79. "'Cleaned-Up' Mummy Flown Home to Egypt". Los Angeles Times. Associated Press. 11 May 1977. p. 20. Archived from the original on 30 October 2019. Retrieved 30 October 2019. CAIRO (AP)—The 3,212-year-old mummy of Pharaoh Ramses II was returned from Paris Tuesday, hopefully cured by radiation of 60 types of fungi and two strains of insects.

80. "Tomb of Ramses II sons". Archived
81. Tyldesley (2000), pp. 161–162.
82. Percy Bysshe Shelley. "Ozymandias". First publication(11 January 1818). "Ozymandias". The Examiner. No. 524.
83. Sanders, Ed (1997). 1968: A History in Verse. Black Sparrow Press. p. 255.
84. Grabbe, Lester (2014). "Exodus and History". In Dozeman, Thomas; Evans, Craig A.; Lohr, Joel N. (eds.). The Book of Exodus: Composition, Reception, and Interpretation. BRILL. pp. 61–87. ISBN 9789004282667.
85. John Ray. "Ramesses the Great".

...

...

ত্যানাপ্যাচানো মডারেট মুমিন ও ডিপ্লোম্যাটিক সুগারকোটেড ভন্ড ইসলামিক এপোলোজিস্টদের মুখোশ উন্মোচন

কুরানের অনুবাদ পড়তে(নিজ মাতৃভাষায় বুঝে পড়তে) সাধারণ মুসলমানদের আতঙ্কিত করা হয়_এর ইসলামিক ভিত্তি কতটুকু? কুরআনের অর্থ বুঝা কি অনেক জটিল? সাধারণ মানুষের পক্ষে কোরান পড়ে সঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব নয়? কোরান কি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার কিতাব যা বুঝতে হলে অনেক ব্যাখ্যার প্রয়োজন ??

কুরআনে কি এতই কঠিন/জটিল/মতভেদপূর্ণ/বক্রতা বা প্যাঁচযুক্ত/ অস্পষ্ট/বিভ্রান্তিময় - শব্দ,বাক্য,উপমা/দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হয়েছে যে_ এটা পড়ে একেকজন একেক অর্থ বুঝে?

চলুন জেনে নিই- এ সম্বন্ধে কোরআনের রচয়িতা কি বলেছেন =

- ✓ আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি **প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ**। An-Nahl 16:89
- ✓ আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন। Al-Baqarah 2:187
- ✓ যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং **তাতে রাখেননি কোন বক্রতা**। Al-Kahf 18:1
- ✓ আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর **আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন**, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর। Al-Baqarah 2:242।
- ✓ **অবশ্যই** আমি তোমাদের জন্য **আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি**। Aal-e-Imran 3:118, An-Nur 24:18
- ✓ রাসূলের তো একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া। At-Taghabun 64:12
- ✓ তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। An-Nahl 16:44
- ✓ আমি **সুস্পষ্ট আয়াতরূপে কুরআন নাযিল করেছি**। Al-Hajj 22:16
- ✓ **এটা মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা**। Aal-e-Imran 3:138
- ✓ আমি নাযিল করেছি কিতাবে **মানুষের জন্য, তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা**র পর। Al-Baqarah 2:159
- ✓ নিশ্চয় আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। বক্রতামুক্ত আরবী কুরআন।Az-Zumar 27-28
- ✓ অবশ্যই **আমি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি**। Al-An'am 6:97, Al-An'am 6:126
- ✓ আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। Al-An'am 6:55, Ar-Ra'd 13:2
- ✓ আর **অবশ্যই আমি এ কুরআনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি**। Al-Isra' 17:41
- ✓ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন। Al-An'am 6:114
- ✓ এটি কিতাব যার আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। Hud 11:1
- ✓ আর আমি তার জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং **প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা**। Al-A'raf 7:145
- ✓ **প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ।** Yusuf 12:111
- ✓ আর **আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি**। Al-Isra' 17:12
- ✓ আল্লাহ **তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন।** Al-Baqarah 2:266
- ✓ আর তারা তোমার কাছে যে কোন বিষয়ই নিয়ে আসুক না কেন, আমি এর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। Al-Furqan 25:33
- ✓ **নিশ্চয় আমি একে নাযিল করেছি** যাতে তোমরা বুঝতে পার। Yusuf 12:2
- ✓ আরবী ভাষায় এ কোরআন, যাতে কোন জটিলতা নেই। সূরা আল-যুমার ৩৯: ২৮

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী বলেন-

"""" মহান আল্লাহ বলেছেন- "সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন জটিলতা/বক্রতা(বক্র বা প্যাঁচযুক্ত অর্থ/ عِوَجًا, ইওয়াজা] রাখেননি (কুরআন ১৯:১)।

মহান আল্লাহ নিজের প্রশংসার সাথে সাথে বললেন যে তিনি বান্দার উপর এমন এক কিতাব পাঠিয়েছে যাতে কোন জটিলতা নেই। মহান আল্লাহ একদম পরিষ্কার বলে দিলেন যে পবিত্র কুরআনে কোনো জটিলতা নেই। কুরআনে কোনো দুর্বোধ্য কথা, জটিলতা নেই। এখানে আরবি শব্দ عِوَجٍ (ইওয়াজিন) মানে হলো জটিলতা, বক্রতা, প্যাচানো কথা।

জটিলতা, অস্পষ্টতা নেই তার মানে কুরআনকে সহজ ও সরল করা হয়েছে যাতে করে এটা সবার কাছে বোধগম্য হয়।

কোরআনের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাখাল বালক থেকে শুরু করে রাষ্ট্র প্রধানের কাছে তাঁর বক্তব্য ফুটিয়ে তোলা। যাতে সবাই বুঝতে পারে। জটিলতা,বক্রতা,প্যাঁচযুক্ত কথা নেই অর্থাৎ কুরআনকে **সহজ ও সরল এবং স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে** , সেই কথাকে আরও জোর দিতে মহান আল্লাহ পুনঃপুনঃ একই সূরায় ৪ বার বলে দিলেন আরও সূক্ষভাবে–

"**নিশ্চয় আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি- বোঝার জন্য**"। (কুরআন, সূরা ক্বামার, ৫৪:১৭, ৫৪:২২, ৫৪:৩২, ৫৪:৪০)

কুরআনের অর্থ- উপলব্ধি করা, এ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহন করা, মহান আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কুরআন কারীম ভাষাশৈলির দিক দিয়ে অতি উচ্চতরের কিতাব হওয়া সত্ত্বেও কোনো মানুষ আন্তরিকতা সহকারে একটু মনোনিবেশ করলেই সহজেই কুরআন বুঝে নিতে পারবে। এ কথাটাই কুরআনের অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন। “”

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীর এ কথা উল্লেখ করে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ঐক্যমত্য আকীদাহ হিসেবে সৌদি দারুস সালাম ফতোয়া বোর্ড থেকে বলা হয়েছে-

"কিন্তু এখন কথাটা হচ্ছে, যেখানে আল্লাহ্ স্বয়ং এতোবার বলছেন- কুরআনে জটিলতা নেই, এটি বোঝার জন্য সহজ করা হয়েছে, তারপরও কেন এটাকে আমরা বোঝার সময় কঠিন/জটিল বলছি, বোঝা যাবে না বলছি?

আসলে বাস্তবতা হচ্ছে, আমরাই এটিকে জটিল করেছি- স্বার্থের কারনে। **যারা এটাকে জটিল, কঠিন বলছে তাদের কথা কুরআনের বক্তব্যের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।**

তাই স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন- যেসকল ব্যক্তি(অধিকাংশই মুসলিম) কোরআনের কথায় কথায় জটিলতা খুঁজে পায়, কোরআনের স্পষ্ট কথাকে- জটিল করে, গোজামিল দিয়ে, মনগড়া ব্যাখ্যা(ত্যানা পেঁচিয়ে), অপব্যাখ্যা, কুযুক্তি দিয়ে অন্য অর্থ দাঁড় করাতে চায়, – বুঝতে হবে এটা ঐসকল ব্যক্তির সমস্যা, তাদেরই আসলে অন্তরে রোগ রয়েছে। এবং এটা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বড় অপরাধ।"

এখন, যেসব মডারেট মুমিন- কুরানের নিজস্ব অর্থে সন্তুষ্ট না হতে পেরে, কুরানের কয়েকটি আয়াতের নিজস্ব অর্থে__ আল্লাহ নামক সত্তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার বা বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে প্রমাণিত বিষয়সমূহের সাপেক্ষে কোরআন ভুল সাব্যস্ত হওয়ার ঘোর আশঙ্কায়- সেসকল আয়াতকে রূপক বা এরকম যেকোন মনগড়া ব্যাখ্যা দেন অথবা বিজ্ঞানের সাথে মিলাতে বা কন্ট্রাডিকশন এড়াতে- কোরানের কিছু কিছু শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে নিজস্ব অর্থ বা ব্যাখ্যা দাঁড় করান ---- তাদের ও তাদের এসকল মনোভাব,কার্যক্রম,পদক্ষেপগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ইসলামে আছে কিনা এবং তাদের এ ব্যাপারে ইসলামের সিদ্ধান্ত কি দেয়া আছে - চলুন সামান্য একটু দেখে নেয়া যাক :::-

> **ইসলামের যে কোন কিছুর ব্যাখ্যা নবির সময়কালিন ও পরবর্তী তিন প্রজন্ম যে ভাবে বুঝেছিলেন ঠিক সে ভাবেই বুঝতে হবে, এই ক্ষেত্রে এমনকি পরবর্তী ইসলামি পণ্ডিতদের ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।** তারা শুধুমাত্র নতুন কোনো বিষয় উদ্ভুত হলে বর্তমান সব দায়ীদের ঐক্যমত্য অনুসারে সে বিষয়ে কিয়াস/ইজতিহাদভিত্তিক মাসাআলা বা ফতোয়া দিতে পারে।]]

কোরআনের প্রত্যেকটা শব্দ, আয়াতের মানে সাহাবী এবং তাবে-তাবেঈনরা যা বুঝেছেন, যা বলেছেন, যা ব্যাখ্যা করেছেন___ এর বাইরে পরবর্তীতে আসা কোনো মানুষের নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যা ইসলামের নিকট কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না।

১) সহীহ: বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮

আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- "যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"

ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে নিজের মনগড়া কিছু সংযোজন করবে যার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন প্রকার দলীল কুরআন ও সুন্নাহয় থাকবে না তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ- ঐ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করা মানুষের জন্য একান্তই আবশ্যক। ঐ বিষয়ে তাকলীদ করা এবং তার অনুসরণ করা কোনক্রমেই জায়িয হবে না। এ হাদীসটি ইসলামের মৌলিক নীতিমালার মূল।

২) সহীহ বুখারী ৭৪১০(তাওহীদ পাব্লি.)[http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=32277]

কোরআনে আল্লাহর বাণীঃ যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি।[1] (সূরা সোয়াদ ৩৮/৭৫)

[1] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বাস্তব বা প্রকৃত হাত রয়েছে তা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু তার হাত **অস্বীকার** করা **বা অপব্যাখ্যা করা যাবে না।** যেমন মনগড়া ব্যাখ্যা করা হয়:- হাত দ্বারা উদ্দেশ্য শক্তি, রাজত্ব, নি'আমাত, অঙ্গীকার ইত্যাদী। আবার বলা হয় কুদরতী হাত। **এসব নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা- যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ'র পরিপন্থী।** সুতরাং তার প্রকৃত হাত রয়েছে, **কুদরতী(Metaphor/রূপক) হাত নয়।**

৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন:- مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

-"**যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় মনগড়া কিছু বলে, সে যেন জাহান্নামে নিজ ঠিকানা বানিয়ে নেয়**।"

[[রেফারেন্স :-

তিরমিজীঃ আস-সুনানঃ- কিতাবুত্ তাফসীরঃ ৫/১৯৯ হাদিসঃ ২৯৫০. „

নাসায়ীঃ সুনানে কোবরাঃ ৫/৩০ হাদিসঃ ৮০৮৪. „

বায়হাকীঃ শু'আবুল ঈমানঃ ২/৪২৩ হাদিসঃ ২২৭৫-২২৭৬. „

আহমদঃ আল-মুসনাদঃ- ১/২৩৩ হাদিসঃ ২০৬৯. „

মিশকাত শরীফ, কিতাবুল ইলম ২য় পরিচ্ছেদ. „

আবি শায়বাহঃ আল-মুসান্নাফঃ- ৬/১৩৬পৃ. হাদিসঃ ৩০১০১.]]

৪) হযরত জুনদুব(রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন:- مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

— "যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় মনগড়া কিছু বলে এবং তা যা ই হোক না কেন, ভুল করেছে বলে সাব্যস্ত হবে (কেননা, সে মনগড়া কথা বলে ভুল পন্থা অবলম্বন করেছে)। "

[[রেফারেন্স :-

তিরমিজীঃ আস-সুনানঃ কিতাবুত তাফসীরঃ ৫/১৯৯ হাদিসঃ ২৯৫১-২৯৫২. „

নাসায়ীঃ সুনানে কুবরাঃ ৫/৩১ হাদিসঃ ৮০৮৫-৮০৮৬. „

তাবরানীঃ মু'জামুল কাবিরঃ ২/১৬৩ হাদিসঃ ১৬৭২. „

তাবরানীঃ মু'জামুল আওসাতঃ ৫/২০৮ হাদিসঃ ৫১০১. „

বায়হাকীঃ শু'য়াবুল ঈমানঃ ২/৪৩৩ হাদিসঃ ২২৭৭.

মিশকাত শরীফ, কিতাবুল ইলম ২য় পরিচ্ছেদ. „

আবু ই'য়ালাঃ আল-মুসনাদঃ ৩/৯০ হাদিসঃ ১৫২০.]]

মডারেট মুমিনদের লুঙ্গী, ইসলাম টেনে খুলে দিয়েছে, তাদের গোঁজামিল দিয়ে বানানো মনগড়া ব্যাখ্যা- প্রকৃত ইসলামের কাছে বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্যতা নেই অথচ তারা জানেওনা। কি একটা হাস্যকর অবস্থা !।

Shongshoy.com থেকে কিছু টপিক ও রেফারেন্স নিচে দেয়া হল, লেখার উপর ক্লিক করলে রেফারেন্স চলে আসবে

কুযুক্তি/লজিক্যাল ফ্যালাসি	
1. যুক্তি কাকে বলে?	14. আপেক্ষবাদের কুযুক্তি | Appeal to worse problems/ Not as bad as
2. অজ্ঞতার কুযুক্তি | Argument from Ignorance	15. কুমতলব বা খারাপ উদ্দেশ্য কুযুক্তি | Appeal to motive
3. অপ্রমাণের বোঝা | Burden of proof	16. গাঁথন বা বিভাজনের কুযুক্তি | Fallacy of composition / Division
4. জনপ্রিয়তার কুযুক্তি| Argument from popularity	17. জ্ঞানতাত্ত্বিক পক্ষপাত | কগনিটিভ বায়াস | Confirmation Bias
5. চক্রাকার কুযুক্তি | Circular logic	18. তালগাছ আমার কুযুক্তি | Argument from final Consequences
6. প্রাধিকারের কুযুক্তি | Argument from authority	19. নীতিগত হেত্বাভাস বা কুযুক্তি | Moralistic fallacy
7. শুন্যস্থানের ঈশ্বর | God of the gaps	20. ন্যায্য বিশ্ব অনুকল্প | Just-world hypothesis
8. সহি ইসলাম নহে কুযুক্তি | No true scotsman	21. প্রকৃতির দোহাই কুযুক্তি | Naturalistic fallacy
9. ঈশ্বরের দোহাই | Appeal to heaven	22. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কুযুক্তি | Argument from personal experience
10. খড়ের মানুষ হারানো কুযুক্তি | Straw man Fallacy	23. ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণী কুযুক্তি | Ad Hominem Fallacy
11. চেরি পিকিং কুযুক্তি | Cherry picking fallacy	24. ব্যাখ্যা ও অজুহাত বা ন্যায্যতাকে গুলিয়ে ফেলা
12. অপ্রাসঙ্গিক তর্কের কুযুক্তি | Red herring	25. লক্ষ্য পরিবর্তন কুযুক্তি বা Moving the goalposts
13. আপিল টু নরমালিটি কুযুক্তি | Appeal to normality	

মুহাম্মদের মোজেজা	
• মোজেজার পরীক্ষায় ফেল্টু নবী	• পাকনামি করতে গিয়ে ধরা খাওয়া
• সূর্যকে থামিয়ে দিয়েছিল নবী	• নামাজে দেরী হওয়ার গপ্প
• নবীদের শরীর মাটিতে পচবে না	• ভুল ভবিষ্যতবাণীঃ দাজ্জালের কোন চোখ কানা?
• আয়িশার চরিত্র নিয়ে নবীর সন্দেহ	• ভুল ভবিষ্যতবাণী: কেয়ামত কবে হবে

মুহাম্মদ সম্পর্কিত

মুহাম্মদের বর্বরতা

মুহাম্মদের যৌনজীবন

• নারীর প্রতি নবীর কোন লোভ ছিল না? • খাজিদার মৃত্যুর একমাসের মধ্যে আয়িশাকে বিবাহ • রাস্তায় নারী দেখে নবীর উত্তেজনা • সারারাত সেক্স ম্যারাথন • নবীর লাম্পট্য সম্পর্কে আয়িশা • মেরাজের রাতে উম্মেহানীর ঘরে	• যৌন নির্যাতক নবী • নবীর হারেমখানা • নবীর মুতা বিবাহ • দাসীদের হাত ধরে ঘোরাঘুরি • অসুস্থতার কারণে বিবি তালাক • ইচ্ছেমত নারীভোগ
দাসপ্রথা সম্পর্কিত	
• দাসীর সাথে সহবাস • আধুনিককালে দাসপ্রথার বৈধতা • নাবালিকা দাসীর সাথে সহবাস • সহবাসের উদ্দেশ্যে যৌনদাসী ক্রয় • বাজারে মুসলিমদের দাসী কেনাবেচা • দাসী খরিদের সময় যোনি পরীক্ষা • উম্মে ওয়ালাদ কাকে বলে? • সর্বোচ্চ কতজন যৌনদাসী রাখা যাবে? • দাসীদের সাথে আযলের কারণ • দাসীর সতর নাভী থেকে হাঁটু • বিবাহিত দাসীর বিবাহ বাতিল করে ভোগ • ইসলামে জন্মসূত্রে দাসদাসী হওয়া • দাসদাসীর জীবনের মূল্য কম	• দাসদাসী গবাদি পশুর মত • দাসী অদল বদল করে ভোগ • অন্যের বিবাহিতা গর্ভবতী দাসী ভোগ • দাসদের সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষমতা • দাসদাসীর জন্য যাকাত নেই • দাসদাসীর পালিয়ে যাওয়া কুফরী • মুক্তদাসের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার মালিকের • ইসলাম দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করেছে? • ইসলামে দাসদাসী বলা হারাম? • মুমিনের যুক্তিঃ যুদ্ধবন্দী নারীরা স্বেচ্ছায় সহবাস করতো! • মুমিনের যুক্তিঃ যুদ্ধবন্দীদের যৌনচাহিদা পূরণ! • মুমিনের যুক্তিঃ স্বামীহীন মেয়েদের আশ্রয়দান!

আক্রমণাত্মক জিহাদ	
• ইসলাম কবুল না করা পর্যন্ত কিতাল • কাফেররা শুরু না করলেও আক্রমণ • যুদ্ধবন্দীদের প্রচুর রক্ত প্রবাহিত করা	• শিরক নিশ্চিহ্ন না হওয়া অবধি জিহাদ • আক্রমণের হুমকি দেয়া চিঠি • ভারত আক্রমণ করলে পুরষ্কার
ইসলামী শরীয়ত	
• অমুসলিমদের ধর্মপ্রচার ও উপাসনালয় নির্মানে নিষোধাজ্ঞা • যাদু হারাম ও যাদুকরের মৃত্যুদণ্ড • কাফের হত্যা করলে মৃত্যুদণ্ড নেই • সর্বোচ্চ ফতোয়াঃ মূর্তি ভাঙ্গার আবশ্যকতা	• অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ • অমুসলিমদের রাস্তার কিনারায় ঠেলে লাঞ্ছিত করা • অমুসলিমের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য • জারজ সন্তান সম্পত্তি পায় না • শিশুদের মারপিট করে ধর্ম পালন
হালাল হারাম	
• হায়েনা, বেজি খাওয়া হালাল • উটের প্রস্রাব হালাল ও পবিত্র • অমুসলিমদের সাথে বসবাস নিষিদ্ধ	• ফার্স্টব্লাড কাজিন বিবাহ হালাল • ৪টি ছাড়া সব খেলা হারাম • শিশুদের ভিন্নধর্ম শিক্ষা দেয়া হারাম
উদ্ভট মিথ্যা দাবী	
• নিল আর্মস্ট্রং মুসলিম হয়েছিলেন? • জাকির নায়েকঃ মুহাম্মদ কি কল্কি অবতার? • জাকির নায়েকঃ ভবিষ্য পুরানে মুহাম্মদ ? • জাকির নায়েকঃ বাইবেলে মুহাম্মদ?	• জাকির নায়েকঃ দাহাহা বা উটপাখির ডিম • ধর্মান্ধ দেশে ধর্ষণ কম? • মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে সিনা? • সুনিতা উইলিয়ামস মুসলিম হয়েছে?

জ্বীনভুত শয়তান ফেরেশতা

• জিনদের খাদ্য হাড্ডি ও গোবর • জ্বীন আপনার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে • শয়তান ও নবজাতকের কান্না • শয়তান ডিম পাড়ে এবং ছানা জন্ম দেয়	• শয়তান পাদ মারে • জিব্রাইলের ৬০০ ডানা • ফেরেশতারা মেঘের মধ্যে আলোচনা করে

আল্লাহ সম্পর্কিত

• আদমকে নিজ আকৃতিতে তৈরি • আল্লাহ কি নিরাকার? • কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর ছায়া • আল্লাহর হাত আছে • আল্লাহর পা আছে	• ভবিষ্যৎ জানা আল্লাহ গোস্বা করে • আল্লাহ শ্রেষ্ট আত্মপ্রশংসাকারী • আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ষড়যন্ত্রকারী • আল্লাহ প্রয়োজনে মিথ্যা বলে • আল্লাহর ভুল শপথ

নবীর অনুসারীদের/ সাহাবীদের কীর্তি

• নারী উত্যক্তকারী উমর • উমরের যৌন নির্যাতন ও জবরদস্তি শিশুবিবাহ • উমর রাস্তায় দাসীদের পেটাতেন • মসজিদে বাচ্চা পেটাতো উমর • আলীর দাসীবাঁদী উম্মে ওয়ালাদ • মদ খেয়ে আলীর মাতলামি • আলীর নাবালিকা দাসী ধর্ষণ	• অমুসলিম নারীকে উলঙ্গ করার হুমকি • সাহাবীদের স্ত্রীদের পরকীয়া প্রেম • হযরত হাসানের রঙ্গিন জীবন • মুয়াবিয়ার দরবারে নগ্ন দাসী • আয়িশা এবং আলীর দ্বন্দ্ব • আলী ফাতিমার চাচাতো ভাই! • আলী-ফাতিমা বনাম আবুবকর-উমর

অন্য নবীদের কীর্তিকলাপ	
• আদম ছিল ৯০ ফুট লম্বা • নূহ নবী ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন • নগ্ন মুসার কাপড় নিয়ে পাথরের দৌঁড় • মুসার থাপ্পড়ে আজরাইলের চোখ কানা	• মৃত সোলায়মানের একবছর দাঁড়িয়ে থাকা • সোলায়মানের রাতের সেক্স ম্যারাথন • **হাবিল-কাবিলের আপন বোন**

নারী সম্পর্কিত	
• নারী হচ্ছে ভোগ্যপণ্য • দেনমোহর = লজ্জাস্থানের মূল্য • নারীর খৎনা করা • নারীর জ্ঞান বুদ্ধি কম! • স্ত্রী প্রহারের বৈধতা • নারীই সমস্ত দুর্দশার কারণ • নারী নেতৃত্ব দিতে পারবে না • স্বামীর চাহিবা মাত্র সহবত করতে বাধ্য • নারীরা অধিক জাহান্নামী • তালাক দেয়ার অধিকার স্বামীর • তিনজন ছাড়া সকল নারী অপূর্ণাঙ্গ • নারী অশুভ বা নারীতে অমঙ্গল • নারী, গাধা এবং কালো কুকুর • নারী হচ্ছে বিপর্যয়কর • **স্বামী সিজদার উপযুক্ত**	• নারীরা বাঁকা • বন্ধ্যা নারীদের বিয়ে করা যাবে না • পরপুরুষের সাথে স্ত্রীকে দেখলে কতল • অল্পবয়সী কুমারী মেয়েদের বিয়ে করার পরামর্শ • বহুবিবাহকে উৎসাহ দেয়া • কুমারী মেয়েদের প্রতি আসক্তি • কুমারীদের যোনীপথ উষ্ণ • তালাকপ্রাপ্তা নারী খোরপোষ পাবে না • ধর্ষণ করার পরে মোহরানা দিয়ে ফয়সালা করা • নারীদের রাস্তার মাঝ দিয়ে চলা যাবে না • স্ত্রী স্বামীর দাসী সহবতে বাধা দিতে পারবে না • উঁচু স্তনের স্বর্গবেশ্যা • জিহাদীদের জন্য ৭২ হুর • জান্নাতে মুমিনদের যৌনশক্তি

This entire pdf is dedicated to the following brains-
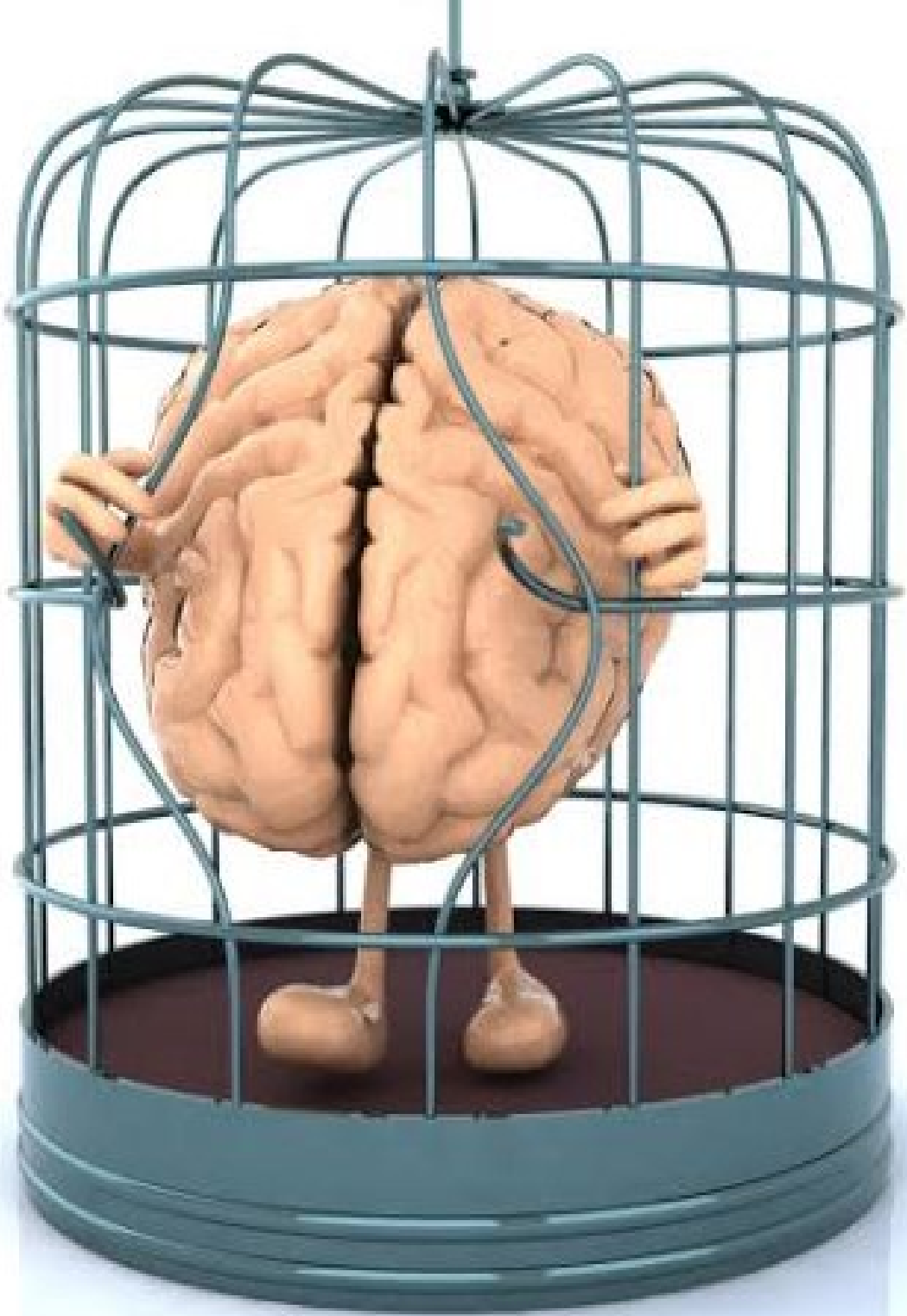
। মিথ্যার মুখোশ উন্মচিত হয়ে গেছে, আর তা হওয়ারই ছিলো ।

সত্যকে কখনো ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না, গলাটিপে হত্যা করা যায়না। আলোর মতো অন্ধকারের প্রহর কাটিয়ে সে ঠিকই বেরিয়ে আসে ।